ভারতীয় ধর্মনীতি

ভারতীয় ধর্মনীতি

সম্পাদিকা

অমিতা চ্যাটার্জী

যাদবপুর দর্শন গ্রন্থমালা ঃ দ্বিতীয় সিরিজ

এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড

সহযোগে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

মুখবন্ধ

ভারতীয় দার্শনিক মহলে যে-কোনো গ্রন্থের প্রারম্ভে পাঠকের সুবিধার্থে অনুবন্ধ-চতুষ্টয় নিরূপণ করার রীতি আছে। এই চারটি অনুবন্ধের মধ্যে 'বিষয়', 'প্রয়োজন' ও 'অধিকারী' নির্দেশিত হলে সহজেই পাঠক গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হন। এই গ্রন্থের শিরোনাম থেকে বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে ভারতীয় এথিক্স অর্থাৎ নীতিশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যেই এখানে বিভিন্ন স্বাদের কিছু প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। 'এই জাতীয় প্রবন্ধ সংকলনের আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল কি?'— এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরী কারণ, শুনেছি, বিনা প্রয়োজনে অতি মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিও কোনো কাজে প্রবৃত্ত হন না। উত্তরে বলি — প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিল — নানাবিধ প্রয়োজন ছিল — পাঠকের দিক থেকে তো বটেই প্রবন্ধকারের দিক থেকেও কিছু কম নয়। আর এই ক্ষুদ্র সংকলনটির সংকীর্ণ পরিসরে সে-সমস্ত প্রয়োজন যে মিটিয়ে ফেলা গেছে এমনও নয়। এ যে নিতান্তই স্বল্পারম্ভ — সে-বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন, তবুও কামনা করি 'অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু'।

প্রয়োজনের কথায় ফেরা যাক। একবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে সারা পৃথিবী জুড়ে চলেছে নৈতিকতার আলোচনা। সে আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করলে আমরা ক্রমাগতই পিছিয়ে পড়ব। কারণ মানুষের মূল্যবোধ যতই পরিবর্তিত হচ্ছে, কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে আমাদের সম্মুগ্ধতা ততই বাড়ছে। কখনো এমনও মনে হয়, নীতিহীনতা বা তথাকথিত দুর্নীতিপরায়ণতাই বোধ হয় বর্তমান নীতি। তাই সমকালীন মানুষের প্রশ্ন ঃ আমাদের পুরোনো মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা সম্ভব কি? সনাতন আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা কি আমাদের টেনে নিয়ে যাবে অবলুপ্তির পথে? প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের মত আমরাও কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব? যা-কিছু এতদিন সত্য বলে মেনেছি, ধ্রুব বলে জেনেছি, কল্যাণ-সুন্দর বলে চিনেছি, সে-সবই কি বিসর্জন দিতে হবে, যদি আমরা পা বাড়াই আধুনিক সভ্যতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পথে? প্রাচীন ও নবীন জীবনবোধের মধ্যে কোথাও কি খুঁজে পাওয়া সম্ভব সামঞ্জস্যেব সূত্র? এ বিশ্বে সত্যিই কি আছে শাশ্বত কোনো নৈতিক আদর্শ যা নতুন প্রজন্মের কাছে প্রকাশ করতে হবে যুগোপযোগী মাধ্যমে? এই প্রশ্নগুলির ও এ রকম আরো অনেক সমস্যার সমাধান করতে হলে ভারতের সনাতন নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হতে হবে, অবহিত হতে হবে। তারপর খতিয়ে বিচার করে দেখতে হবে সেই সব আদর্শগুলির শাশ্বতিকতা ও যুগোপযোগিতা। এই দুটি নিরিখেই অকিঞ্চিৎকর প্রমাণিত হলে, ঐতিহ্য থেকে সরে যাওয়ার, দূরে যাওয়ার কথা ভাবা যেতে

পারে, নচেৎ নয়। সংকলিত প্রবন্ধগুলিতে সনাতন ভারতের নৈতিকতার বহুমুখী বিকাশ ও বিচিত্র প্রকাশকে তুলে ধরে নব-মুল্যায়নের প্রচেষ্টা করা হয়েছে; সুতরাং এই সংকলনের প্রাসংগিকতা অনস্বীকার্য।

অধিকারী প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে সংক্ষেপে বলে নিই এই সংকলনটি পরিকল্পনার ইতিহাস। ইদানীং কালে ভারতবর্ষের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার পাশাপাশি ভারতীয় নীতিবিদ্যার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার প্রচলন হয়েছে। আমদের সৌভাগ্যক্রমে ১৯৫৬ সাল থেকেই তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক *গোপীনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য, ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অপরিসীম দূরদর্শিতা বলে ভারতীয় নীতিবিদ্যা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে দর্শনের পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত হয়ে আছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, চল্লিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে ভারতীয় নীতিবিদ্যার চর্চা হওয়া সত্ত্বেও এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য কোনো পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক গ্রন্থ অথবা গবেষণামূলক গ্রন্থ রচিত হয়নি। ইংরেজীতেও যে এ বিষয়ে অসংখ্য রচনা আছে এমন নয়। অনেক খুঁজলে গুটি কয়েক বই এবং প্রবন্ধ ও বক্তৃতামালার সংকলন পাওয়া যায়, তবে এগুলির অধিকাংশই দুষ্প্রাপ্য। এ ছাড়া, কোনো কোনো বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় রামায়ণ ও মহাভারতের আলোয় নৈতিকতা বিষয়ে সামান্য কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু যাদবপুরের পাঠ্যক্রমে নৈতিকতা প্রসঙ্গ এসেছে প্রধানত বিভিন্ন দর্শনের সূত্র ধরে; *যেখানে পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি ছাত্রদের বিশেষ কাজে লাগে না।* এই শূন্যতা পূরণের প্রয়োজন ছিল। সুযোগ এল, যখন বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগের পরিদর্শকবৃন্দ ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন বিবেচনা করে দর্শন বিভাগকে উপদেশ দিয়ে গেলেন বাংলায় পাঠ্যসূচী অনুযায়ী গ্রন্থ রচনার ও প্রকাশনার। এরপরে ১৯৫৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ বাংলায় ছাত্রদের উপযোগী বিভিন্ন দার্শনিক গ্রন্থ প্রকাশনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই পরিকল্পনারই আংশিক রূপায়ণ ভারতীয় নীতিবিদ্যার উপর এই প্রবন্ধ সংকলনটি। যাদবপুরের পাঠ্যসূচী অনুসারে পরিকল্পিত হলেও, প্রবন্ধগুলি গবেষণামূলক। সুতরাং আশা করা যায়, কেবলমাত্র দর্শনের ছাত্রছাত্রীরাই নন, এ বিষয়ে উৎসাহী সাধারণ পাঠকও এরকম একটি সংকলন হাতে পেলে উপকৃত হবেন।

প্রথমে আমরা যখন এই কাজ হাতে নিই তখন ব্যাপকতর পরিসরে সংকলনটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে পরিকল্পনা ও রূপায়ণের ব্যবধান দাঁড়িয়েছে অনেকখানি। সেজন্য আমরা আন্তবিকভাবে দুঃখিত। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা মহাভারতের নীতি ও ধর্ম বিষয়ে কোনো প্রবন্ধ সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে সান্ত্বনা এইটুকুই যে মহাভারতের সারাৎসার সংগৃহীত হয়েছে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-তে এবং এই সংকলনে গীতায় উল্লিখিত নৈতিক চিন্তা ও আদর্শ বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। নাস্তিক দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে থেকে কেবল মাত্র বৌদ্ধ ও চার্বাক দর্শনসম্মত নৈতিক আলোচনা

সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জৈন সম্প্রদায় বা অন্যান্য অহিন্দু সম্প্রদায়ের উপর আলোচনার অভাব অশ্রদ্ধার নয়, আমাদের অক্ষমতার পরিচায়ক। পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটি সংশোধন করার চেষ্টা থাকবে। আমাদের যত্ন ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বইটিতে বেশ কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। সেজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

এই সংকলনটি প্রকাশের বিভিন্ন স্তরে আমরা অনেকের সাহায্য পেয়েছি। প্রবন্ধ রচয়িতাদের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলে বাংলা ভাষায় ভারতীয় নীতিবিদ্যার চর্চায় নতুন মাত্রা সংযোজিত হতে চলেছে। আমরা কৃতজ্ঞ আমাদের বিভাগের রিসার্চ এসোসিয়েট ও রিসার্চ স্কলারদের কাছে যাঁরা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার কাজে আমাদের প্রভূত সহায়তা করেছেন। শ্রীসুশান্ত ভট্টাচার্য বইটি মুদ্রণের কাজ সুষ্ঠুভাবে তত্ত্বাবধান করেছেন; তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে অনুদান না পেলে এই সংকলনটি প্রকাশ করা সম্ভব হত না। তাই এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী।

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠাঙ্ক
মুখবন্ধ		৫
ভূমিকা	অমিতা চ্যাটার্জী	১১
ভারতীয় ধর্মনীতি ও তার কয়েকটি দিক	দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী	২৯
পরমপুরুষার্থ মোক্ষ	তারা চট্টোপাধ্যায়	৪১
বৈদিক বাঙ্ময়ে ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিক মূল্যবোধ	ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৬৩
ধর্মশাস্ত্রে নীতিবোধ	হেরম্বনাথ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী	৭৭
রামায়ণের নীতি-ধর্ম	নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী	৯৫
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি	ভূপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৪৫
অদ্বৈতবেদান্তে নীতি ও ধর্ম	পিয়ালী পালিত	১৮৫
বিধির অর্থ বিষয়ে অনুনৈতিক পর্য্যালোচনা	ইন্দ্রাণী সান্যাল	২০৯
নৈতিকতা ঃ চার্বাকের দৃষ্টিতে	সৌমিত্র বসু	২৪৭
বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র	মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়	২৬১
ধম্মপদ ও ভগবদ্‌গীতা—একটি তুলনামূলক আলোচনা	তারা চট্টোপাধ্যায়	২৮৫
নির্দেশিকা		৩১৩

লেখক পরিচিতি

অমিতা চ্যাটার্জী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী অধ্যাপক, গবেষণা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা।

তারা চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, লেডী ব্রেবোর্ন কলেজ।

ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

হেরম্বনাথ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, গুরুদাস কলেজ, কলিকাতা।

ভূপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

পিয়ালী পালিত অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

ইন্দ্রাণী সান্যাল অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

সৌমিত্র বসু অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

মধুমিতা চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূমিকা

অমিতা চ্যাটার্জী

বঙ্কিমচন্দ্রের আমল থেকেই বাংলা ভাষায় 'মর‍্যালিটি'-র প্রতিশব্দ হিসেবে 'নীতি' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বিভিন্ন অভিধান ও কোষ অনুসারে 'নীতি' শব্দটি যেমন একদিকে নিয়ম, অনুশাসন-বাক্য, হিতকথা ইত্যাদি বোঝায়, তেমনি অপরদিকে বোঝায় 'শুক্রাদি রচিত নীতিশাস্ত্র' যার নামান্তর হল 'রাজনীতি' (পলিটিক্‌স)। যদিও 'এথিক্স' ও 'পলিটিক্স'-এর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না (কখনো কখনো তো এই দুই শাস্ত্রের মধ্যবর্তী সীমারেখা অনির্দেশ্য হয়ে পড়ে), তবু এই দুটিকে পৃথক রাখা প্রয়োজন। অনুশাসন বা হিতের অনুষঙ্গেও 'নীতি' শব্দটির দ্যোতনা অতিব্যাপক বলতেই হয় কারণ অনুশাসন মাত্রই 'মর‍্যাল' নয় এবং হিতোপদেশগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, দেখা যায়, বিচক্ষণতা ('প্রুডেন্স') সংক্রান্ত।

'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থের ক্রোড়পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'ইংরেজ যাহাকে Morality বলে আমরা তাহাকেও ধর্ম্ম বলি'।[১] এই সংকলনের বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ করলেই বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন হবে। তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে 'এথিক্স' বোঝাতে 'ধর্মনীতি' ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। আশঙ্কা হতে পারে, এর ফলে গোলযোগ বাড়ল, কমল না। কেননা 'ধর্ম' শব্দটিও নানা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। প্রাচীন প্রয়োগের মধ্যে থেকে বঙ্কিমচন্দ্রই ছ'টি অর্থের উল্লেখ করে গেছেন। বঙ্কিমী ক্রম অনুসারে সেগুলি হল : (১) রিলিজন, যেমন বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম ইত্যাদি ; (২) নৈতিকতা বা মর‍্যালিটি, (৩) ধর্মাত্মা ব্যক্তির অভ্যস্ত গুণ ; (৪) রিলিজন, শাস্ত্র বা নীতি বিহিত কর্ম, যার ফল পুণ্য-পাপ (অনেক সময় পুণ্য-পাপকেও ধর্ম-অধর্ম বলা হয়) ; (৫) বস্তু বা ব্যক্তির স্বাভাবিক গুণ, যেমন চুম্বকের ধর্ম লৌহাকর্ষণ, জলের ধর্ম নিম্নগামিতা ; (৬) আচার ও ব্যবহার, যেমন, দেশধর্ম, জাতিধর্ম, কুলধর্ম (মনুস্মৃতি)। ওঁর মতে ধর্ম সংক্রান্ত নানা সমস্যার মূলে রয়েছে এই বিভিন্ন অর্থ বিষয়ে অস্পষ্টতা। বঙ্কিমের ভাষায়, 'এই ছয়টি অর্থ লইয়া এই দেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিয়া থাকে। এই মাত্র এক অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিয়া, পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার করে, কাজেই অপসিদ্ধান্তে পতিত হয়। এইরূপ অনিয়ম প্রয়োগের জন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের সুমীমাংসা হয় না। এ গোলযোগ আজ নূতন নহে। যে সমস্ত গ্রন্থকে আমরা হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহাতেও এই গোলযোগ বড় ভয়ানক। মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের শেষ ছয়টি শ্লোক ইহার উত্তম উদাহরণ। হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুনীতির আধুনিক অবনতি ও তৎপ্রতি আধুনিক অনাস্থার গুরুতর এক কারণ এই গণ্ডগোল।'[২]

মানবপিতা, অখিলবেদবেত্তা, ধর্মশাস্ত্রকার মনুই যদি 'ধর্ম' শব্দ প্রয়োগে বিপর্যয় ঘটিয়ে থাকেন, 'অন্যে পরে কা কথা'?

'ধর্ম' শব্দের প্রয়োগ এই ছ'টি অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তবে এর বিশদ বিবরণে প্রবেশ করার সুযোগ আমাদের নেই। কেবলমাত্র নৈতিকতা অর্থেই 'ধর্মের' যত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হয়েছে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যতরকম লক্ষণ দেওয়া হয়েছে, তাতেই আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে ধর্মের তত্ত্ব সত্যিই গুহায় নিহিত। এই সংকলনের প্রতিটি প্রবন্ধেই নৈতিকতার অনুষঙ্গে ধর্মের নানা সূক্ষ্ম অর্থ অবলম্বনে দার্শনিক বিচার করা হয়েছে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রীর প্রবন্ধে সাধারণভাবে ধর্মার্থ নিরূপণ করা হয়েছে। তাহলেও এই প্রসঙ্গের টানে আরও কিছু কথা চলে আসে।

'ধৃ' ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন 'ধর্ম' এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'যা ধারণ করে রাখে'। এতএব প্রশ্ন ওঠে ধর্ম কাকে ধারণ করে? ভারতীয় দর্শন অনুসারে ধর্ম ব্যক্তির ধারক, সমাজের ধারক, এমনকি সমগ্র বিশ্বের ধারক। সুতরাং ধর্মকে ব্যক্তিগত আদর্শ, সামাজিক আদর্শ ও বিশ্বজনীন আদর্শ রূপে গ্রহণ করা চলে। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রগুলিতে ধর্ম প্রধানত সামাজিক আদর্শ রূপেই গৃহীত হয়েছে। সমাজের উন্নতি ও হিতের মূলে আছে ধর্ম। ধর্ম ছাড়া সমাজ রক্ষিত হয় না। কারণ সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন মানুষের প্রকৃতি ও স্বাভাবিক প্রবণতা বিভিন্ন, কেউ-কেউ সাত্ত্বিক, কেউ রাজসিক, কেউ-বা তামসিক। বহুসংখ্যক ভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিমানুষের জীবনে একই ছন্দ আনে ধর্ম।

প্রাচীন ভারতে আর্যরা স্থায়ী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সমাজবদ্ধ মানুষের ধর্ম অর্থাৎ দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছিলেন। এই ধর্ম দু-ভাগে বিভক্ত — (ক) বর্ণাশ্রমধর্ম — যে কর্তব্যগুলি মানুষের জন্ম, প্রবণতা ও জীবনের স্তরভেদভিত্তিক এবং (খ) সাধারণ ধর্ম — যা বর্ণ/আশ্রম নির্বিশেষে যে কোনো মানুষের আচরণীয়। 'ভগবদ্ গীতা'তে আমরা স্বধর্মের উল্লেখ পাই। গীতায় উক্ত স্বধর্ম বর্ণাশ্রমধর্মের সমার্থক কিনা এ-বিষয়ে ধর্মবেত্তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

বর্ণাশ্রমধর্ম ও স্বধর্মের তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার্থে অতি সংক্ষেপে বর্ণাশ্রমধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরব। বর্ণের উদ্ভব সম্বন্ধে উপনিষদে ও পুরাণে নানা কাহিনী আছে। তার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত কাহিনীতে বলা হয় যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উদ্ভব হয়েছে যথাক্রমে বিরাটপুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ থেকে। পুরুষের জীবনে যেমন এই প্রতিটি অঙ্গেরই নিজস্ব ক্রিয়া ও গুরুত্ব আছে, সমাজজীবনেও তেমনি প্রতিটি বর্ণের নিজস্ব স্থান, ক্রিয়া ও গুরুত্ব আছে। আদিতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার উপর নির্ভর করে কর্মবিভাগ তথা বর্ণবিভাগ করা হয়েছিল। সব বর্ণেরই সমান মর্যাদা ছিল। কিন্তু পরে চরণের মত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যা শরীরের সমস্ত ভার বহন করে তার নিকৃষ্টতা ঘোষণা করা হল। ফলে শূদ্র হয়ে পড়ল অপকৃষ্ট বর্ণ।

এবারে দেখা যাক বর্ণভিত্তিক কর্তব্য বিভাগ কিরকম ছিল। স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা,

যাগ-হোমাদি সম্পন্ন করা, রাজকার্যে বিশেষত দেশের আইনপ্রণয়ণে রাজাকে উপদেশ দেওয়া, ইত্যাদি ব্রাহ্মণের কর্তব্য বলে পরিগণিত হত। অর্থাৎ সমাজের ধর্মীয় ও সারস্বত ঐতিহ্য রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল ব্রাহ্মণের উপর। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য ছিল রাজ্যশাসন, দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিধান, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশরক্ষা করা ও প্রয়োজনে যুদ্ধবিগ্রহ করা। অর্থাৎ প্রভূত সামাজিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল ক্ষত্রিয় বর্ণের মানুষ। বৈশ্যের কর্তব্য ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকার্য অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি বা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ভার ছিল বৈশ্যের উপর। আর শূদ্রের কর্তব্য ছিল অপর তিন বর্ণের সেবা ও পরিচর্যা। কারণ শূদ্র তাদেরই বলা হত যারা দৈহিক ক্ষমতায় বলীয়ান হলেও মানসিক ক্ষমতায় অত্যন্ত দুর্বল ছিল; ফলে আপন বুদ্ধিতে কোনো কাজ সুসম্পন্ন করা তাদের ক্ষমতার বাইরে ছিল। অতএব তাদের সর্বদাই অপর তিন বর্ণের পরামর্শ মত জীবন যাপন করতে হত। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও কর্মক্ষমতাভিত্তিক সামাজিক শ্রেণীবিভাগ পৃথিবীর বহু সমাজেই ছিল। প্লেটোর 'রিপাব্লিক'-এ আমরা এই ধরণের শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ পাই। 'রিপাব্লিক' থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রাচীন গ্রীসেও দৈহিক ক্ষমতার চেয়ে মানসিক ক্ষমতার কদর অনেক বেশি ছিল। যাঁরা কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করতেন এবং যাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি উন্নত ছিল না সমাজে তাঁদের স্থান ছিল সবচেয়ে নীচে।

বর্ণধর্মের সঙ্গে একযোগে উচ্চারিত হয় আশ্রমধর্ম। আশ্রমধর্ম বলতে আমরা কি বুঝি? জীবনের এক এক পর্যায়ে মানুষের আচরণীয় বিশেষ কর্তব্যগুলিকেই 'আশ্রমধর্ম' বলা হয়। এ-কথা বোধহয় সকলেই মানবেন যে শিশুর কর্তব্য ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কর্তব্য এক নয়, অথবা গৃহীর পক্ষে যা অবশ্যকর্তব্য সন্ন্যাসীর পক্ষে তা পরিহার্য হতেই পারে। আশ্রমধর্ম প্রবর্তনের মূলে ছিল ঠিক এই জাতীয় চিন্তা। প্রাচীন ভারতে মানুষের জীবনকাল চারটি আশ্রমে ভাগ করা হয়েছিল; (১) ব্রহ্মচর্য্য (২) গার্হস্থ্য (৩) বানপ্রস্থ্য ও (৪) সন্ন্যাস। জীবনের পর্যায়ভেদক্রমে আশ্রমধর্মগুলিও তাই চারভাগে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি উচ্চবর্ণের মানুষকেই এই চারটি স্তর অতিক্রম করতে হত। কেবলমাত্র শংকরাচার্যের মত অসাধারণ ব্যক্তিরাই দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মধ্যে দিয়ে না গিয়েও চতুর্থ আশ্রম অবলম্বন করতে পারতেন। এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে নিম্নরূপ। আশ্রমধর্মগুলি আত্মিক উন্নতির সোপান। সাধারণ মানুষের চিত্তশুদ্ধি সময় ও শ্রমসাপেক্ষ। বিভিন্ন পর্যায়ের কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমেই তাদের চিত্তমালিন্য দূর হতে পারে। ব্রহ্মচর্য্যের পরেই সন্ন্যাস গ্রহণের মতো নিষ্ঠা বা মানসিক শক্তি সকলের থাকে না। কামনাকে সম্পূর্ণরূপে অবদমিত করে রাখার চেষ্টা করলে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সে কামনা অনেক সময়ই বিকৃতভাবে প্রকাশ পায়, ফলে সে-সব ক্ষেত্রে চিত্তমালিন্য দূর করে আত্মদর্শন করার সম্ভাবনা হয় সুদূরপরাহত। তাই জীবনের দ্বিতীয় স্তরে নানা কামনাবাসনার পরিমিত পূর্তির সুযোগ রাখা হয়েছিল।

হিন্দুশাস্ত্রমতে ব্রহ্মচর্য্য হল শিক্ষা ও সংযমের কাল। জন্মের পরে কয়েক বৎসর

অতিক্রান্ত হলেই উচ্চবর্ণের বালকদের (প্রাচীনকালে বালিকাদেরও) গুরুগৃহে পাঠান হত সার্বিক শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে। ব্রহ্মচারীর জীবনে আরামের লেশ মাত্র ছিল না। আহার-বিহারে কায়িক কৃচ্ছ্রসাধন মেনে নিয়ে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশের লক্ষ্যে তাঁরা অগ্রসর হতেন। গুরুগৃহে তাঁদের কর্তব্য ছিল বেদাধ্যয়ন, গায়ত্রী-জপ, ত্রি-সন্ধ্যা আহ্নিক ও দ্বিসন্ধ্যা প্রাণায়াম, গুরুর সেবা, হোমযাগের জন্য সমিধ-আহরণ, গৃহস্থের কাছ থেকে ভিক্ষা করে অন্নসংগ্রহ, গুরুপত্নীর সাংসারিক কর্মে সহায়তা, ইত্যাদি। পরবর্তী আশ্রমে প্রবেশের উপযোগী সকল বিদ্যা-শিক্ষা সাঙ্গ করে সমাবর্তনান্তে তাঁরা স্বগৃহে ফিরতেন।

গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের পর নিজ নিজ শিক্ষা ও প্রবণতা অনুসারে তাঁরা কর্মে নিযুক্ত হতেন ও দারপরিগ্রহ করে সংসারধর্ম পালন করতেন। গৃহীর জীবনে অর্থ, কাম ও ধর্ম — এই তিনটিই পুরুষার্থ বলে বিবেচিত হত। সমাজজীবনে গার্হস্থ্যাশ্রমের গুরুত্ব অসীম। গৃহী সন্তান-উৎপাদন ও পালন করে পিতৃঋণ শোধ করেন, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে দেবঋণ শোধ করেন, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর মাধুকরীতে সাহায্য করে এবং অতিথি ও আত্মীয়-পরিজন প্রতিপালন করে নৃ-ঋণ সম্পন্ন করেন, স্বাধ্যায়ের মাধ্যমে ঋষিঋণ ও মানবেতর প্রাণীর প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করে ভূতঋণ পরিশোধ করেন। প্রকৃতপক্ষে গার্হস্থ্যাশ্রম অপরাপর আশ্রমগুলির অবলম্বনস্বরূপ। সংসারের পালনীয় কর্তব্য সমাধা করে, পুত্রের হাতে সংসারের দায়িত্ব অর্পণ করে গৃহী প্রৌঢ় বয়সে গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করে তৃতীয় আশ্রমে প্রবেশ করেন।

শাস্ত্রে বলা আছে 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ' অর্থাৎ বানপ্রস্থে সংসার ত্যাগ করে বনবাসে কালাতিপাত করা কর্তব্য। সাধারণত এই আশ্রমে স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করেন। বানপ্রস্থ হল গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের মধ্যবর্তী পর্যায়। এ পর্যায়ে গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে প্রকৃতির কাছাকাছি সরল জীবন যাপনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সন্ন্যাসজীবনে প্রবেশের জন্য এই প্রস্তুতির প্রয়োজন। বানপ্রস্থেও কিন্তু স্বাধ্যায়, স্বল্পব্যয়সাধ্য যাগক্রিয়া এবং বনের ফলমূলাদির সাহায্যে সাধ্যমত অতিথিসৎকার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ত।

কিছুকাল বানপ্রস্থ যাপনের পর চিত্ত প্রস্তুত হলে বনবাসোপযোগী পর্ণকুটিরটিও ত্যাগ করে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে সন্ন্যাস অবলম্বন করতেন। সন্ন্যাসীর জীবন বড়ই কঠোর। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময় সন্ন্যাসীর পক্ষে একদিনের বেশি একস্থানে থাকা নিষেধ। কাষায় বস্ত্র পরিধান করে মুণ্ডিত মস্তকে সন্ন্যাসী ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করেন। সংসারের কোনো বন্ধনেই তিনি আবদ্ধ হন না, এমনকি তিনি অগ্নিচয়নও করেন না। একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মোপাসনার মাধ্যমে তিনি আত্মদর্শনের পথে অগ্রসর হন। যিনি আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হন তিনি আমৃত্যু স্থিতপ্রজ্ঞের জীবন যাপন করেন এবং দেহত্যাগের পরে ব্রহ্মে লীন হন।

ঐতিহাসিকেরা বলেন প্রাচীন কালে আর্যরা পারস্য থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন,

সঙ্গে এনেছিলেন ইন্দো-ইরানীয় সমাজব্যবস্থা, সেই সমাজব্যবস্থাতেও কর্মভিত্তিক বর্ণবিভাগ প্রচলিত ছিল। তবে তাঁরা তিনটি বর্ণ স্বীকার করতেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে আর্যরা যখন ভারতে আসেন তখন স্থানীয় অনার্য রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁদের বসতি স্থাপন করতে হয়েছিল। প্রথম দিকে তাঁরা বিজিত অনার্যগোষ্ঠীর সঙ্গে অবাধ মেলামেশার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের আশা ছিল যে আর্যসভ্যতার সংস্পর্শে এসে তথাকথিত 'অসভ্য' অনার্যরাও সভ্য হয়ে উঠবেন। কিন্তু আর্যসভ্যতার জয়যাত্রা নির্বাধ হয়নি। অনেক মিশ্ররক্তের সন্তান জাত হওয়ার পরেও অনার্যরা আর্যদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারেননি। ফলে আর্যসমাজে তাদের স্থান নির্দিষ্ট হল শূদ্র নামক চতুর্থ বর্ণে। তবে তখনও আর্যসমাজে গতি ছিল, নমনীয়তা ছিল। তাই শূদ্রবর্ণের মানুষও আপন কর্মক্ষমতা প্রমাণ করতে পারলে অপরাপর উচ্চবর্ণে উন্নীত হতে পারতেন এবং অন্যদিকে উচ্চবর্ণের মানুষের মধ্যে শূদ্রবর্ণের স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষিত হলে নিশ্চিত ছিল তাদের সামাজিক অবনমন। গৌতম সংহিতায়, মহাভারতের বনপর্বে এই মর্মে নানা শ্লোক আছে। ব্রাহ্মণত্ব অথবা শূদ্রত্ব জন্মের দ্বারা নয়, গুণ ও কর্মের দ্বারাই তখন নির্ধারিত হত। এর প্রমাণ আছে গৌতমসংহিতায় যেখানে বলা হয়েছে 'ক্ষমাবান, দমশীল, জিতক্রোধ, জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ মনে করতে হবে, আর সকলে শূদ্র। যারা অগ্নিহোত্রপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাসরত ও দান্ত, দেবতারা তাঁদেরই ব্রাহ্মণ বলে জানেন। জাতি পূজ্য নয়, গুণই কল্যাণকর। চন্ডালও বৃত্তস্থ হলে ব্রাহ্মণের মর্যাদা পেতে পারেন।'[৩] মহাভারতে বনপর্বের ঋষি বলেন, 'পাতিত্যজনক, কুক্রিয়াশক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্মে সতত অনুরক্ত, তাকেই আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি।'[৪] নহুষ-যুধিষ্ঠির সংবাদেও ঋষিবাক্যের প্রতিধ্বনি পাই। রাজর্ষি নহুষের মন্তব্য ঃ 'বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শূদ্রের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। যদি সত্যাদি ধর্ম শূদ্রে লক্ষিত হয়, তবে শূদ্রও বোধ হয় ব্রাহ্মণ হতে পারে'। এর উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছেন, 'অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ লক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতে শূদ্রলক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। অতএব শূদ্রবংশজাত হলেই যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মণ বংশজাত হলেই ব্রাহ্মণ হয়, এমন নয়। কিন্তু যে-সব ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তারাই ব্রাহ্মণ এবং যে সব ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তারাই শূদ্র'।[৫]

কিন্তু কালক্রমে সমাজের গতিশীলতা রুদ্ধ হল। সুস্থিত সমাজব্যবস্থা স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করে আর্যরা চাতুর্বর্ণ্যের নিগড়ে শক্ত করে বাঁধতে চাইলেন মানুষকে। গড়ে উঠল অটল, অনড় অচলায়তন। কর্মভিত্তিক বর্ণব্যবস্থা হয়ে উঠল জন্মভিত্তিক। উদ্ভব হল জাতিভেদ প্রথার। এক বর্ণের সীমা অতিক্রম করে অপর বর্ণে পদার্পণের অধিকার বিলুপ্ত হল । এর সঙ্গে যখন যুক্ত হল স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের ভেদ, তখন মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা ঠেকানর আর কোনো উপায় রইল না। কেননা ততদিনে 'তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি বিচারের স্রোত-পথ' সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলেছে।

সনাতনপন্থী ধর্মব্যাখ্যাকারগণ মনে করেন জন্মভিত্তিক কর্মবিভাগ মেনে নেওয়ার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। প্রথমত, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও কর্মকুশলতার দুটি নিয়ামক স্বীকার করা হয় — বংশগতি ও পরিবেশ। বংশগতির প্রভাব মেনে নিলে বলতে হয় ব্রাহ্মণ-সন্তান ব্রাহ্মণের প্রবৃত্তি নিয়েই জন্মায়। তার উপরে যদি সে ব্রাহ্মণকুলেই প্রতিপালিত হয়, তাহলে পরিবেশের প্রভাবে পঠন-পাঠন, পূজার্চনা, ইত্যাদি ব্রাহ্মণোচিত কর্মে যে সে বিশেষভাবে অনুরক্ত হবে তা বলাই বাহুল্য। অন্যান্য বর্ণের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি খাটে। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও যে চোখে পড়ে? ধর্মশাস্ত্রকারগণ বলবেন সে তো নিছক ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম সব নিয়মেরই থাকে। ব্যতিক্রম আছে বলে নিয়ম করা বন্ধ হয় না। ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তগুলির জন্য সামাজিক কাঠামোর মধ্যে কিছু ব্যবস্থা রাখা চাই। প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক কাঠামোতে সেরকম ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয়ত, জন্মভিত্তিক কর্মবিভাগ জীবিকার ক্ষেত্রে অনাবশ্যক প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা রোধ করে। যে কোন জীবিকা গ্রহণের পথ যদি সমাজের যে কোন ব্যক্তির জন্য খোলা রাখা হয়, তাহলে প্রতিযোগিতার মাত্রা যে হারে বৃদ্ধি পায় তাতে সামাজিক সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। তৃতীয়ত, কেবলমাত্র স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারী কর্মে প্রবৃত্ত হলেই মানুষ জীবিকা ক্ষেত্রে সফল হয় না, তাকে কর্মোপযোগী পটুত্বও অর্জন করতে হয়। এ জাতীয় পটুত্ব নির্ভর করে প্রশিক্ষণের উপর। এখন প্রশ্ন হল ঃ একটি পাঁচ/ছয় বছরের শিশুর আচরণ লক্ষ্য করে নিশ্চিত হয়ে বলা যায় কি কোন বিষয়ে তার স্বাভাবিক প্রবণতা, কোন বিষয়েই বা তাকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হবে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলা যায় না। কিন্তু বর্ণবিভাগ জন্মভিত্তিক হলে এই অসুবিধা এড়ানো সম্ভব।

বিপক্ষী বলতেই পারেন যে তৃতীয় যুক্তিটি যথেষ্ট জোরাল নয়। কারণ, প্রাথমিক শিক্ষা সব বর্ণের ক্ষেত্রেই সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর প্রাথমিক শিক্ষাকাল শেষ হওয়ার আগেই সাধারণত অভিজ্ঞ চোখে শিক্ষার্থীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্বাভাবিক প্রবণতা সহজেই ধরা পড়ে। তখন বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। এর জন্য জন্মভিত্তিক বর্ণব্যবস্থা স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। বর্ণবিভাগের ভিত্তি কি হওয়া উচিত এ আলোচনাকে কেন্দ্র করে রাশিরাশি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লেখা হয়েছে এবং আরও লেখা যেতে পারে। এই ভূমিকাতে এ-আলোচনা বিস্তৃততর করা সম্ভব নয়। এখনকার মত শুধু এটুকু বলেই প্রসঙ্গান্তরে যাব যে দুর্ভাগ্যক্রমে জন্মভিত্তিক বর্ণব্যবস্থা জাতিভেদ প্রথায় পর্যবসিত হয়েছে — যে প্রথা ভারতীয় সমাজের এক বিশাল অংশকে মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে এবং সেই কারণেই এই প্রথা গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আধুনিক ভারতীয় সমাজের নীতির পরিপন্থী।

যে প্রশ্ন নিয়ে আমরা বর্ণাশ্রমধর্মের আলোচনা শুরু করেছিলাম এবারে সে প্রশ্নে ফেরা

যাক। প্রশ্ন ছিল স্বধর্ম ও বর্ণাশ্রমধর্ম ভিন্ন না অভিন্ন? 'স্ব' বলতে যদি বোঝায় স্বীয় স্বভাবানুকূল, তাহলে স্বধর্ম ও বর্ণধর্ম অভিন্ন হয়ে পড়ে। কারণ আমরা এতক্ষণ দেখেছি বর্ণবিভাগের আদি ও অকৃত্রিম ভিত্তি ছিল স্বাভাবিক প্রবণতা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বিখ্যাত উক্তি ঃ 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্ট গুণকর্মবিভাগশঃ' এই প্রকল্পই সমর্থন করে। গুণ বলতে অবশ্যই এখানে সত্ত্ব, রজ ও তম গুণকেই বোঝান হয়েছে। বর্ণধর্মে কখনই স্বভাব-অতিক্রমী কোনো কর্তব্যের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তবে পরবর্তীকালে বর্ণধর্ম যখন জন্মভিত্তিক হয়ে পড়ল, তখন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক প্রবণতা ও কর্মক্ষমতার সঙ্গে বর্ণধর্মের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হতে থাকল। ব্রাহ্মণকুলে জাত ব্যক্তি অব্রাহ্মণোচিত স্বভাব নিয়েও ব্রাহ্মণের অধিকার দাবি করতে লাগলেন। আর সমাজব্যবস্থায় ঘুণ ধরার ফলে সে দাবি স্বীকৃত হল। পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে দেখলে মানতে হয় যে এ দোষ বর্ণাশ্রমধর্মের নয়, দোষ ছিল বর্ণাশ্রমধর্মের অপব্যাখ্যায়। এককালে বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। যদিও ধর্মশাস্ত্রকারগণ বর্ণাশ্রমধর্মকে বৈদিক নৈতিকতার অন্যতম স্তম্ভ বলে মনে করেন এবং এ ব্যবস্থার অপরিবর্তনীয়তার উপর জোর দেন, তবুও বর্তমান ভারতীয় সমাজে এ ব্যবস্থার আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

ঊনবিংশ শতকে নবজাগরণের ফলে দেশে যখন স্বাদেশিকতার জোয়ার এল, তখন অনেক মনীষীই বর্ণাশ্রমধর্মের কালোপযোগী ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বর্ণাশ্রমধর্মের অর্থ সম্প্রসারিত করে স্বধর্মের উদার ব্যাখ্যা দেওয়ার সপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'ঈশ্বরোক্ত ধর্ম্ম যে কেবল একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থার পক্ষেই ধর্ম্ম, সমাজের অবস্থান্তরে তাহা আর খাটিবে না, এজন্য সমাজকে পূর্বাবস্থায় রাখিতে হইবে, ইহা কখন ঈশ্বরাভিপ্রায়সঙ্গত হইতে পারে না। কালক্রমে সামাজিক পরিবর্তনানুসারে ঈশ্বরোক্তির সামাজিক জ্ঞানোপযোগিনী ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়।'[৬] বঙ্কিমের মতে স্বধর্ম ও বর্ণধর্ম সমার্থক বলে গৃহীত হলে সে ধর্ম হিন্দুসমাজেই প্রযুক্ত হবে। কিন্তু তিনি মনে করতেন যে শ্রীকৃষ্ণোক্ত স্বধর্মের লক্ষ্য কেবলমাত্র হিন্দুসমাজ হতে পারে না, বরং হিন্দু-অহিন্দু নির্বিশেষে মানুষমাত্রের প্রতিই স্বধর্ম প্রযোজ্য হওয়া উচিত। 'ধর্ম' শব্দকে 'স্বাভাবিক ধর্ম' অর্থে নিয়ে বঙ্কিম বললেন প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনই স্বধর্ম। আরও স্পষ্ট করে বললে মানুষের ক্ষেত্রে স্বধর্মের অর্থ দাঁড়ায় জ্ঞান ও কর্মের অনুশীলন। কারণ ওঁর মতে বৃত্তি সঞ্চালন দ্বারা মানুষ হয় কিছু জানে অথবা কোনো কর্ম করে। জ্ঞানের পরম লক্ষ্য ব্রহ্ম। অতএব জ্ঞানার্জন যাদের স্বধর্ম (সত্ত্বগুণের প্রাধান্যবশত) তাদেরই ব্রাহ্মণ বলা যাবে। তিনি আরও বলেন যে মানুষ ভোগ্য বিষয়কে কেন্দ্র করেই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তাই কর্ম মূলত তিন প্রকার ঃ (১) ভোগ্যবিষয়ের উৎপাদন সংক্রান্ত যেমন কৃষিকর্ম, (২) ভোগ্যবিষয়ের সংগ্রহ সংক্রান্ত যেমন বাণিজ্যকর্ম এবং (৩) উৎপাদিত ও সংগৃহীত ভোগ্যবিষয়ের রক্ষাসংক্রান্ত যেমন যুদ্ধকর্ম। প্রথমটি যাদের স্বাভাবিক কর্ম বঙ্কিম

তাদের বলেন শূদ্র, দ্বিতীয়টি যাদের স্বাভাবিক কর্ম তারা বৈশ্য ও তৃতীয়টির স্বাভাবিক কর্তা হল ক্ষত্রিয়। বঙ্কিমের ব্যাখ্যার সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যার মূল পার্থক্য হল, ধর্মশাস্ত্রমতে শূদ্রের কর্ম অপর তিনবর্ণের পরিচর্যা আর শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য তিনই বৈশ্যের কর্ম। বঙ্কিম তাঁর মতের সমর্থনে লিখেছেন যে এখনকার দিনে প্রধানত শূদ্রকেই কৃষিকার্য করতে দেখা যায়। বঙ্কিম মনে করেন যে জ্ঞানধর্মী, যুদ্ধধর্মী, বাণিজ্যধর্মী, কৃষিধর্মী ও পরিচর্যাধর্মী পাঁচটি জাতি সব সমাজেই থাকা প্রয়োজন এবং এই অর্থে সব মনুষ্যসমাজেই বর্ণবিভাগ থাকবে। উপরে উল্লিখিত কর্মগুলির মধ্যে যিনি যে কর্মের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন সেটিই তাঁর কর্তব্য, সেটিই তাঁর স্বধর্ম। এই মতে স্বধর্ম পুরুষ-পরম্পরাগত বলে কল্পিত হয়নি, অতএব জাতিভেদপ্রথায় পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনামুক্ত।

মানুষের ধর্মকে তার স্বাভাবিক বৃত্তির অনুশীলন বললে ভুল বোঝার অবকাশ থাকে। স্বাভাবিক বৃত্তির অনুশীলন, যেমন, আহার, বিহার, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়পর বহু কর্ম তো পশুও স্বাভাবিক ভাবেই করে থাকে। এ ব্যাপারে মানুষে পশুতে ভেদ দেখা যায় না। অথচ বলা হয়, 'ধর্মেন হীনা পশুভিঃ সমানা'। আরও বলা যায়, কিছু কিছু মানুষের মানসিক বৃত্তি থাকে তামসিকতায় আকীর্ণ। এ-সব মানুষের ক্ষেত্রে কি তবে তামসিক বৃত্তির বিকাশ ঘটানোই ধর্ম? নিশ্চয়ই নয়। 'স্বাভাবিক' কথাটাকে এখানে 'সহজ' অর্থে গ্রহণ করলে চলবে না। রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন, 'পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব যত সহজ, মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব তত সহজ নহে।'[৭] প্রকৃতির রাজ্যে মানুষই একমাত্র স্বভাবের বিপরীত মুখে চলার সাহস রাখে। সেখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। সারা জগত যখন 'প্রেয়'-র অন্বেষণে ব্যস্ত, মানুষ তখন তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে 'শ্রেয়'-র প্রতি। এই কারণেই মহাভারতকারের মতে 'ধর্মঃ কামাদন্য প্রবর্ত্ততে'।[৮] কামনার স্রোতে আমরা সহজেই গা ভাসাই। কিন্তু ধর্ম আমাদের বলে সে-স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটতে। তাহলে স্বাভাবিক কথাটির অর্থ আমরা কিভাবে বুঝব? এখানে 'স্ব'-এর বাচ্য হিসাবে আত্মাকে গ্রহণ করতে হবে। আত্মার স্বভাব হল বিচার বা বিবেক। অতএব, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির মধ্যে বিচারবোধের সাহায্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে; বৃত্তির প্রকাশকে করতে হবে সুসংযত। এই অর্থে স্বাভাবিক শব্দটি গ্রহণ করলে বিচার-বিহীন যে কোন আচরণই হবে অস্বাভাবিক। আমাদের বিবেকচেতনা সদা জাগ্রত থাকে সাত্ত্বিক জীবনে। সুতরাং স্বভাবত তমোগুণ-প্রধান মানুষেরও প্রচেষ্টা হওয়া উচিত কর্মের মাধ্যমে তামসিকতাকে ছাপিয়ে যাওয়ার। নিষ্কামভাবে স্বধর্ম পালনের দ্বারা তামসিক ব্যক্তির পক্ষে এই উত্তরণ সম্ভব। ভগবদ্‌গীতার এই-ই শিক্ষা। শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অধ্যাপিকা তারা চট্টোপাধ্যায় রচিত দুটি প্রবন্ধে 'গীতা'র নৈতিকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

প্রথমেই আমরা বলেছিলাম যে বর্ণাশ্রমধর্ম আপেক্ষিক। ধর্মশাস্ত্রগুলিতে এই আপেক্ষিক কর্তব্যগুলি ছাড়াও আমরা এমন কতগুলি কর্তব্যের উল্লেখ পাই যা মানুষমাত্রেরই আচরণীয়।

এই কর্তব্যগুলিকে বলা হয় সামান্য ধর্ম বা সাধারণ ধর্ম। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনে যদিও সাধারণ ধর্মের বিভিন্ন তালিকা পাওয়া যায়, তবু সব তালিকাতেই কিছু ধর্মের উল্লেখ দেখি। সেই ধর্মগুলি হল ঃ অহিংসা, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, দান, সত্য, শৌচ, তপ ও জ্ঞান। যে নীতি অবলম্বনে সাধারণ ধর্মগুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল সেটির উল্লেখ আমরা পাই পদ্মপুরাণে ঃ 'আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ'। অর্থাৎ নিজের কাছে যা প্রতিকূল অপরের প্রতি সেরূপ আচরণ না করাই বিধেয়। মহাভারতেও আমরা পাই একই কথার প্রতিধ্বনি ঃ 'নতৎ পরেষু সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ'। পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যাতেও এই নীতির প্রয়োগ বহুবার আমরা দেখেছি। সামান্য ধর্মের তালিকাটি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে প্রতিটি সামান্য ধর্মেরই দুটি দিক আছে — আত্মসম্বন্ধী ও সমাজসম্বন্ধী। সামান্য ধর্মের আচরণ যেমন ব্যক্তিজীবনে আত্মোন্নতির সহায়ক, তেমনি সমাজজীবনের ভিত্তিও বটে। তাই কেবলমাত্র হিন্দু সমাজে নয় দেশ-কাল-ধর্মনিরপেক্ষভাবে সকল মানবসমাজেই এই ধর্মগুলির আচরণ পরিলক্ষিত হয়। ধর্মশাস্ত্রে সামান্য ধর্মগুলির মধ্যে কোন প্রধান-অপ্রধান ভেদ করা হয়নি। তবে এক এক যুগে এক একটি ধর্মকে 'যুগধর্ম' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন সত্যযুগে যুগধর্ম ছিল সত্য, ত্রেতায় তপ, দ্বাপরে যজ্ঞ, আর কলিযুগে যুগধর্ম হল দান। সামান্য ধর্মগুলি নিঃশর্তভাবে পালনীয় হলেও বিশেষ পরিস্থিতিতে এদের ব্যতিক্রমও স্বীকৃত হয়েছে। শাস্ত্রে বিশেষবিধির মাধ্যমে ব্যতিক্রমগুলি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং যে স্থলে সামান্যবিধি ও বিশেষবিধি দুই-ই বর্তমান সে স্থলে বিশেষবিধিই অনুসরণীয় বলা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সাধারণভাবে শাস্ত্রে হিংসার নিষেধ করা হলেও যজ্ঞীয় হিংসা দোষের নয়। সামান্য ধর্ম সাধারণত বর্ণাশ্রমের গণ্ডি নির্দেশ করে। অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করতে হবে বলে সামান্যবিধি উপেক্ষা করা চলে না। যেমন অতিথিসেবা গৃহীর কর্তব্য। কিন্তু সঙ্গতিহীন গৃহস্থ চুরি করে অতিথিসেবার সামগ্রী সংগ্রহ করলে সে কর্ম শুদ্ধ হয় না এবং গৃহস্থকে পাপ স্পর্শ করে। অতএব সামান্য ধর্মগুলিকে বর্ণাশ্রমধর্ম পালনের পূর্বশর্ত হিসাবে স্বীকার করা প্রয়োজন।

দুই

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষীয়রা নৈতিকতা বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তবুও ভারতে নীতিবিদ্যা বলে কোনো স্বতন্ত্র শাস্ত্র গড়ে ওঠেনি। ধর্মনীতি সংক্রান্ত তত্ত্ব তাই আমাদের ধর্ম, দর্শন, পুরাণ ও সাহিত্যের নানা আলোচনা থেকে সংগ্রহ করে নিতে হয়। এই কারণে আমরা একেবারেই আশ্চর্য হই না যখন দেখি যে পুরুষোত্তম বিলিমোরিয়া ভারতীয় 'এথিক্স'-এর উপর প্রবন্ধ* শুরু করেন এই প্রশ্ন দিয়ে ঃ 'ভারতবর্ষে নীতিবিদ্যার অস্তিত্ব কোনোকালে ছিল কি?'

ভারতবর্ষে নীতিবিদ্যা কেন স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে গড়ে ওঠেনি সে প্রসঙ্গে পণ্ডিতেরা অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছেন। তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত হল : নানা কারণে ভারতে স্বতন্ত্র নীতিশাস্ত্র গড়ে ওঠা সম্ভবই ছিল না। সেই কারণগুলো কি কি একবার ঝটিতি দেখে নেওয়া যাক।

পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যামতে স্বাভাবিক ও পরিণতবুদ্ধি মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মই নৈতিক বিচারের বিষয় হতে পারে। অর্থাৎ প্রাক্‌শর্ত হিসাবে ব্যক্তির 'ফ্রি-উইল' অথবা কর্মে স্বাধীনতা স্বীকার না করে নৈতিকতার আলোচনা শুরু করাই অসম্ভব। অথচ সনাতন হিন্দু চিন্তাতে ফ্রি-উইল স্বীকার করা হয়নি। যেমন ঈশ্বরবাদী দর্শনে ঈশ্বরকেই সর্বময় কর্তা বলে মানা হয়েছে। ঈশ্বর সর্বজীবের অন্তরে আসীন হয়ে তাদের চালিত করছেন। অজ্ঞানে আবৃত জীব নিজেকে কর্তা বলে মনে করে কিন্তু তাদের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সর্বভূত পরিচালিত হয়।[১০] ঈশ্বর যেন যন্ত্রী আর জীব তার হাতের যন্ত্র। তিনি যেমন বাজান, আর সকলই তেমনি বাজে। সুতরাং জীবের পক্ষে স্বেচ্ছায় বা স্বাধীনভাবে কোনো কর্ম করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে মানুষের কর্ম বিষয়ে নৈতিকতার প্রশ্ন তোলা কি যুক্তিযুক্ত?

চার্বাক ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত দর্শন সম্প্রদায়ই কর্মবাদে বিশ্বাসী। অনেকেই মনে করেন কর্মবাদ ও 'ফ্রি-উইল' পরস্পরবিরোধী। কর্মবাদকে তারা নিয়ন্ত্রণবাদ (ডিটারমিনিজম্)-এর সঙ্গে এক বলে মনে করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষের সমস্ত কর্মই 'প্রাক্তন' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অতএব তাদের কর্মে স্বাধীনতা নেই।

আরও বলা হয়, অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন মেনে নিলেও নৈতিকতা প্রসঙ্গ অবান্তর হয়ে পড়ে। অদ্বৈত বেদান্ত মতে ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু অর্থাৎ সত্য, জগৎ-সংসার মিথ্যা। সংসারে আবদ্ধ জীব যদি মিথ্যাই হয়, তাহলে তাদের পারস্পরিক আচরণ ও আচরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী কোনো কিছুরই গুরুত্ব থাকে না। নৈতিক বিচারেরও কোনো প্রসঙ্গ ওঠে না।

এ-সব কিছু সত্ত্বেও কিন্তু নৈতিক বিচারের প্রসঙ্গ উঠেছে। ঈশ্বরবাদী, কর্মবাদী ও অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন সব ক্ষেত্রেই উঠেছে। অদ্বৈত বেদান্তে জগৎকে মায়া বলা হয়েছে এ-কথা যেমন ঠিক, সংসারদশায় জীবের নৈতিক কর্তব্যের ধারণাও তেমনি ঠিক। একমাত্র পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই জগৎ-প্রপঞ্চ মিথ্যা কিন্তু ব্যাবহারিক অবস্থায় সমাজবদ্ধ জীবের দায়িত্ব-কর্তব্য তা বলে মিথ্যা নয়। নৈতিক কর্তব্য পালনের মধ্যে দিয়ে জীবের চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং চিত্তশুদ্ধি হলে তবেই জীব ব্রহ্মজ্ঞান লাভের, আত্মদর্শনের অধিকারী হয়। অদ্বৈত বেদান্ত সম্মত নৈতিকতা বিষয়ে এ সংকলনে লিখেছেন অধ্যাপিকা পিয়ালী পালিত।

ভারতীয় দর্শনের কর্মবাদ কিন্তু পূর্ণনিয়ন্ত্রণবাদ নয়। কর্মবাদের মূল কথা হল 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। এর ভিত্তি বিশ্বজাগতিক নৈতিক শৃঙ্খলা, বেদে যাকে 'ঋত' বলা হয়।

কর্মবাদের দুটি অনুসিদ্ধান্ত হল ঃ (ক) কৃতনাশ এবং (খ) অকৃতাভ্যাগম কখনও হয় না। কৃতকর্মের ফল ভোগ বিনা নাশ হয় না। অতএব প্রতিটি জীবকে তার কর্মফল ভোগ করতেই হবে এবং কর্মফল ভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারও মুক্তি নেই। অন্যদিকে, একের কর্মফল কখনও অপরের উপর বর্তায় না। কর্মবাদে বিশ্বাসই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করার যৌক্তিক ভিত্তি। যেহেতু কৃতনাশ কখনও ঘটে না, সেহেতু একজন্মে কর্মফল ভোগ শেষ না হলে অপর জন্মে ভোগ করতেই হবে। বিশেষত মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ববর্তী কর্মের ফল যেহেতু বর্তমান জন্মে ভোগ করা সম্ভব নয়, সেহেতু জন্মান্তর অবশ্যস্বীকার্য।

কর্মবাদ মানার অর্থ কিন্তু এমন নয় যে আমাদের প্রতিটি কর্মই পূর্ব-পূর্ব কর্মের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত। কর্মবাদী ভারতীয় দর্শনে অদৃষ্টকে মানা হয়েছে এ কথা সত্য, পুরুষকারের ভূমিকাও কিন্তু সেখানে অস্বীকৃত হয়নি। আবার, অকৃতাভ্যাগম মানার ফলে বলা যায় যে নিয়ন্ত্রণ যদি থেকেও থাকে তবে তা আত্মনিয়ন্ত্রণবাদ। নিজেরই পূর্বকৃত কর্মের ফল বর্তমান জন্মের কর্ম-প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এমনকি ঈশ্বরেরও কর্মফলের অন্যথা ঘটাবার ক্ষমতা নেই। ঈশ্বর নৈতিক জগতের নিয়ামক মাত্র। তিনি প্রতি জীবের সঙ্গে তার অদৃষ্টকে যুক্ত করেন। কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তির ব্যবস্থা জীবকেই করতে হয়। ফলকামনা রহিত হয়ে বিধিবিহিত কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জীব আপন কর্ম ক্ষয় করতে সক্ষম হয়।

কর্মের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা না থাকা মানেই যে পূর্ণনিয়ন্ত্রণবাদ নয়, এমতের পক্ষে আরও পরিপোষক যুক্তি দেওয়া সম্ভব। বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ঐচ্ছিক ক্রিয়া ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য করেন। প্রতিবর্তক্রিয়া ও জীবনযোনি প্রযত্নকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অন্তর্গত করে নৈতিকতার পরিধির বাইরে রাখা হয়। পূর্ণনিয়ন্ত্রণবাদ মানলে ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। পূর্ণনিয়ন্ত্রণবাদ স্বীকার করলে বিধি ও নিষেধের প্রবর্তকত্ব ও নিবর্তকত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে। অথচ সব বৈদিক সম্প্রদায়ই বিধি-নিষেধের প্রবর্তনা/নিবর্তনা মানার পক্ষপাতী। এই কারণেই প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনগুলিতে কর্মবাদ ও জীবকর্তৃত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধনের প্রয়াস দেখা যায়। এ ছাড়া, প্রতিটি জীবের পক্ষেই নিজের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে কর্মক্ষয় করা, উচ্চতর জীবন যাপন করা এবং সর্বশেষে মোক্ষ লাভ করা সম্ভব। অতএব কর্মবাদ-স্বীকার নীতিশাস্ত্র গড়ে ওঠার পক্ষে মুখ্য বাধা স্বরূপ ছিল — এ কথা মানা যায় না। ভারতে স্বতন্ত্র নীতিশাস্ত্রের অভাব তাই কোনমতেই নৈতিকতা বিষয়ে উদাসীনতার পরিচায়ক বলে বিবেচিত হতে পারে না। বরং হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের আকরগ্রন্থগুলিতে কর্তব্যবোধজাত কর্মের অসংখ্য বিধি নতুন করে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের রূপরেখা অঙ্কনে আমাদের উৎসাহিত করে।

তিন

ভারতীয়, বিশেষত, হিন্দুদর্শনের অপরাপর শাখার মত নৈতিকতারও মূল বলে চিহ্নিত হয়েছে অখিল বেদ। বেদে যে-বিষয়ে স্পষ্ট বিধান নেই, সে-সব বিষয়ে নৈতিক অনুমোদনের অধিকার আছে স্মৃতিশাস্ত্রের। শ্রুতি বা স্মৃতি কোনটিতেই যখন নৈতিক সমস্যার সমাধান মেলে না, তখন নির্ভর করতে বলা হয়েছে সদাচারী ব্যক্তির আচরণ ও তদভাবে নিজের বিচারবোধের উপর। তবে কোন ক্ষেত্রেই নৈতিক অনুশাসন বেদের মূল ধারণার পরিপন্থী হতে পারবে না। বৈদিক সমাজে মানুষের জীবনযাত্রার সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে অধ্যাপক ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্যের রচনায়। বেদোত্তরকালে ধর্মশাস্ত্রগুলিতে নৈতিক বিধিবিধান যে রূপ নিয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক হেরম্বনাথ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী।

আমরা জানি নৈতিকতার কেন্দ্রবিন্দু হল 'শুভ' (মর্যালি গুড)-এর ধারণা। আমাদের দেশে শুভের ধারণা নিহিত আছে চাতুর্বর্গ্যবাদে অর্থাৎ চারটি পুরুষার্থ স্বীকরণে। শাস্ত্রে বলা হয় পুরুষের অন্বিষ্ট বিষয় চারটি — অর্থ, কাম, ধর্ম ও মোক্ষ। সাধারণ মানুষের জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে অর্থ ও কামের অন্বেষণে ; তবে অর্থার্জনের প্রয়োজন কামনাপূরণের জন্য। একমাত্র কৃপণ ব্যক্তিই অর্থের জন্য অর্থের অন্বেষণ করেন। কামনাপূরণের ফল সুখ এবং মানুষ স্বভাবতই সুখ চায়। কিন্তু সুখ ভারতীয় জীবনচর্যার চরম লক্ষ্য নয়। কারণ চার্বাক ভিন্ন অপরাপর দর্শন-সম্প্রদায়ের মত হল জীবনে সুখ সর্বদাই দুঃখসংলিপ্ত হয়ে আসে। সুখ চাইলে দুঃখ এড়ানো যায় না। সুখ ক্ষণিকও বটে, পুণ্যবল ক্ষয় হলে স্বর্গসুখও শেষ হয়। মানুষের জীবনের লক্ষ্য তাই হওয়া উচিত দুঃখনিবৃত্তি, সুখলাভ নয়। চার্বাকরাই কেবলমাত্র বলেন সুখ-দুঃখ সংজড়িত বলে সুখলাভের প্রচেষ্টা না করা মূঢ়তা। এই সংকলনে চার্বাকের ব্যতিক্রমী নৈতিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক সৌমিত্র বসু।

অর্থার্জন ও কামনাপূরণ করা চাই ধর্মসঙ্গতভাবে, না হলে সর্বনাশ সুনিশ্চিত। আশ্চর্যের কথা এই যে, ভারতীয় দর্শনে সচরাচর (ব্যতিক্রম প্রাভাকর মীমাংসক) ধর্মের জন্য ধর্মাচরণ করার বিধান দেওয়া হয়নি। ধর্ম আচরণীয় কারণ ধর্মাচরণের ফল অভ্যুদয় (অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমৃদ্ধি) ও নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ)। আগেই বলা হয়েছে অভ্যুদয় আত্যন্তিক বা ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তি নয়। সুতরাং চাতুর্বর্গ্যবাদ অনুসারে মোক্ষই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বা পরম পুরুষার্থ। মোক্ষই শ্রেয়, মোক্ষই শুভ, তাই মোক্ষার্থে বিহিত কর্মই নৈতিক।

অর্থ, কাম, ধর্ম ও মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থের মধ্যে বৈষম্য লক্ষণীয়। অর্থ, কাম ও ধর্ম সামাজিক নৈতিকতার ভিত্তি কিন্তু মোক্ষ আত্ম-সম্বন্ধী আদর্শ। ভাবতত্ত্ববিদেরা

মনে করেন প্রাচীন ভারতে অন্তত রামায়ণের কাল পর্যন্ত (রামায়ণের নীতি ও ধর্মবিষয়ে অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) ত্রিবর্গবাদই প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে মোক্ষ চতুর্থ পুরুষার্থ হিসাবে যুক্ত হয়। ত্রিবর্গবাদ ছেড়ে চাতুর্বর্গ্যবাদ মানলে নৈতিকতত্ত্বের কোনো উৎকর্ষ সাধিত হয় কি? মোক্ষ কী অর্থে পুরুষার্থ? ব্যক্তিসত্তার বিসর্জন কি মোক্ষ, না কি ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ? এই সমস্ত কূট প্রশ্নের সমাধান করার চেষ্টা করেছেন অধ্যাপিকা তারা চট্টোপাধ্যায় 'পরমপুরুষার্থ মোক্ষ' প্রবন্ধে।

পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় 'শুভ' ও 'ভাল'-র মধ্যে পার্থক্য করা হয়, কারণ ভাল মানেই নৈতিক ভাল নয় : পার্থক্য করা হয় বাস্তব ও ঔচিত্যের মধ্যে। চাতুর্বর্গ্যবাদে এই জাতীয় পার্থক্য করা হয়েছে কি? অনেকে বলেন অর্থ ও কাম মানুষ চায়, কঠোপনিষদে সেগুলিকে বলা হয়েছে প্রেয়; কিন্তু ধর্ম ও মোক্ষ চাওয়া উচিত। সুতরাং প্রথম দুটি পুরুষার্থ আছে বাস্তবের স্তরে, তৃতীয় ও চতুর্থটি ঔচিত্যের স্তরে। তৎসত্ত্বেও প্রশ্ন ওঠে, মোক্ষ কি কেবল নীতিনিয়ামক? মোক্ষ মানে যদি হয় আত্মদর্শন বা অমৃতত্বের অধিকার, তবে সে মোক্ষকে কি একটি নৈতিক আদর্শ বলা যাবে? অমৃতের পুত্র মানুষের অমৃতত্ব তো সিদ্ধ হয়েই আছে, 'প্রাপ্তস্য প্রাপ্তি'কে কি আদর্শের পর্যায়ে ফেলা যায়?

চার

পৃথিবীর সুপ্রাচীন ধর্ম ও দর্শনগুলির বৈশিষ্ট্য হল ঃ অতি বিচিত্র ভিন্নমুখী সব তত্ত্বের সহাবস্থান। বৈদিক নৈতিকতার ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। এখানে যেমন কর্তব্যের জন্য কর্তব্য পালনের বিধান পাওয়া যায়। তেমনি পাশাপাশি শুভফল লাভের আশায় কর্তব্যের বিধানও দেখা যায়। এই কারণেই 'হিন্দু নৈতিকতা কি কর্তব্যতাত্ত্বিক না ফলমুখী'? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমাদের ধাঁধায় পড়তে হয়। গীতার নিষ্কামকর্মের তত্ত্বে ও প্রাভাকর সম্মত বিধির প্রেরকত্ববিচারে আমরা পাই ফল-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু নৈয়ায়িক ও ভাট্টমীমাংসকের আলোচনায় বিধিবাক্য পালনের সঙ্গে ফলেচ্ছার ঘনিষ্ঠ যোগ লক্ষিত হয়। বিধিবাক্যের অনুনৈতিক পর্য্যালোচনায় অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী সান্যাল বিধিবাক্যের স্বরূপ ও বিধায়কত্ব বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিষয়ান্তরে যাব।

আমরা আগেই বলেছি যে বেদ ও ধর্মশাস্ত্রগুলি বৈদিক নৈতিকতার মূল। সুতরাং এই সমস্ত শাস্ত্রবিহিত আচরণ ধর্ম বলে গৃহীত হয়েছে। যে সমস্ত শুভকর্মে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নেই, শাস্ত্রে সে বিষয়ে বিধি এবং যে সমস্ত অনিষ্টকর্মে মানুষের স্বভাবতই অনুরক্তি সে-বিষয়ে নিষেধের নির্দেশ আছে। অর্থাৎ বিধি ও নিষেধ মানুষকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে উঠে কর্তব্য করতে বলে। অতএব, প্রশ্ন ওঠে, মানুষের বিধিবিহিত আচরণের প্রেরণা কি?

বিধির বিধায়কত্বই বা কোথায় নিহিত? ন্যায়মতে মানুষ বিধিবিহিত আচরণ করে ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের ভিত্তিতে। অন্যান্য যে কোনো কর্মের মত বিধিবিহিত কর্মেও প্রবৃত্তি জন্মায় সুখপ্রাপ্তি অথবা দুঃখপরিহারের আকাঙ্খা থেকে। বিধিবিহিত আচরণ যেহেতু ইষ্টের জনক, সেহেতু সেইমত আচরণ করা উচিত। তবে নৈয়ায়িক কান্টের মতো মনে করেন না যে নৈতিক শুভের ধারণা মানুষের কাছে 'প্রদত্ত'। নৈয়ায়িকের কাছে ইষ্টের ধারণা সর্বদাই ব্যক্তিগত অভিলাষ-নির্ভর। ভাট্ট মীমাংসক কিন্তু মনে করেন যে ফলেচ্ছা মানুষকে বিধিবিহিত আচরণে প্রবর্তিত করলেও বিধির নৈতিকতা ইষ্টের ধারণার উপর নির্ভরশীল নয়। বিধির বিধায়কত্ব বিধির মধ্যেই নিহিত থাকে। প্রাভাকর মীমাংসক প্রবর্তকত্ব অথবা বিধায়কত্ব কোনো ক্ষেত্রেই ফলেচ্ছার ভূমিকা স্বীকার করেন না। এঁদের মতে বিধি যথার্থ অর্থে স্বতন্ত্র। বিধির মধ্যেই আছে বিধিবিহিত কর্মে মানুষকে নিযুক্ত করার ক্ষমতা। তাই বিধিকে এঁরা 'নিয়োগ' বলেন। বিধিবাক্য উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই কর্তার আত্মাতে প্রেরণার উদ্রেক করে এবং সেই প্রেরণা বা কর্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হয়েই যে কোনো মানুষ বিধি অনুসরণ করেন।

কেবলমাত্র বিধির স্বরূপ বা বিধায়কত্বের ব্যাখ্যাতেই যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে তা নয়, মানুষের কাজের নৈতিকতা বিচারেও ভিন্নমুখী মতবাদ খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষ সাধারণত বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু অনেক সময়েই কর্মের অভিপ্রেত ফলের পরিবর্তে (অথবা অতিরিক্ত) অনভিপ্রেত ফলও উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে যে, মানুষ কি তার কৃতকর্মের যে কোনো ফলের জন্যই সমানভাবে দায়ী? অভিপ্রেত কর্মফল ও অনভিপ্রেত কর্মফলের নৈতিক মূল্য কি এক?. কৃতকর্মের নৈতিকতা কিসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে? ফলের ভিত্তিতে না উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে? না কি সব কর্মের ক্ষেত্রেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিক মূল্য স্বীকার করতে হবে?

সাধারণভাবে বৈদিক ধর্মনীতিতে শাস্ত্রবিহিত বা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম ভিন্ন অপরাপর কর্মের নৈতিকমূল্য স্বীকৃত হয় না। কৃতকর্মের নৈতিকতা তাই নির্ধারণ করা হয় যে বুদ্ধিতে কর্ম করা হয়েছে তার ভিত্তিতে অর্থাৎ কর্তার উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি ভালভাবে বোঝা যাবে।

(ক) কূপখনন পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হয় এবং প্রাণিহিংসা ও প্রাণিবধ পাপকর্ম বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। কোন গরু যদি কূপগহ্বরে পড়ে মরে, তবে কূপকর্তা কি দোষী/পাপী সাব্যস্ত হবেন? হবেন না, কারণ কূপখনন করানোর সময় প্রাণিহিংসা কূপকর্তার অভিপ্রেত ছিল না।

(খ) ধরা যাক কোনো ব্যক্তি শরসন্ধান অভ্যাস করছিলেন। তার অজ্ঞাতসারে তারই নিক্ষিপ্ত শরে এক ব্রাহ্মণকুমার নিহত হলেন। তীরন্দাজকে কি এক্ষেত্রে ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করবে? যেহেতু ব্রহ্মহত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে তীরন্দাজ শরনিক্ষেপ

করেননি, সেহেতু তিনি ব্রহ্মহত্যার দায়ে দায়ী হবেন না। তবে, অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও তীরন্দাজ সমাজের ক্ষতি করেছেন। অতএব, প্রায়শ্চিত্ত করা তার কর্তব্য যদিও এক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান ইচ্ছাকৃত ব্রহ্মহত্যার দায়ে কর্তব্য প্রায়শ্চিত্তের চেয়ে অনেক লঘু।

(গ) কোনো ব্যক্তি যদি হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো কাজ করেন যা সরাসরি না হলেও পরম্পরায় মারক, তবে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রাণিহত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবেন।

কোনো কোনো দার্শনিক কিন্তু মনে করেন কৃতকর্মের নৈতিক মূল্য কর্তার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে না। যে কোন নিষিদ্ধ কর্মই অনৈতিক, তা সে যে উদ্দেশ্যেই করা হোক না কেন। এমনকি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত হলেও এ-জাতীয় কর্ম প্রত্যবায়াপূর্ব বা পাপ উৎপন্ন করে। শ্রীধরস্বামী এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন কিন্তু ভিন্ন কারণে। শ্রীধরস্বামীর মতে, অনিষ্ট কর্ম অনিচ্ছাকৃত হলেও কর্তার পাপ উৎপন্ন হয় কারণ অসাবধানতা কোন অজুহাত হতে পারে না। যথেষ্ট সতর্ক হলে অনিচ্ছাকৃত অনিষ্টকর্ম পরিত্যাগ করা সম্ভব।

বৈদিক নৈতিকতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ঃ সমস্ত নৈতিক বিধির পরিস্থিতি-নির্ভরতা (অবশ্যই এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম আছে যেমন প্রাভাকর মীমাংসক)। অনেকেই এটি ভারতীয় ধর্মনীতির ত্রুটি রূপে উল্লেখ করেছেন। কারণ পাশ্চাত্য নীতিবিদদের বিশেষত কান্টের প্রভাবে তাঁরা মনে করেছেন যে নিঃশর্ত ও দেশ-কাল-ব্যক্তি-নিরপেক্ষ আদেশই নিয়ামক বিধি রূপে গণ্য হতে পারে। অথচ আমরা দেখি যে ধর্মশাস্ত্রে অহিংসা-সংক্রান্ত নীতির মত সামান্যধর্ম-নির্ভর নীতিগুলিরও পরিস্থিতি ভেদে ব্যতিক্রম স্বীকার করা হয়েছে। যেমন শাস্ত্রে সাধারণভাবে হিংসার নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু কোনো কোনো যজ্ঞে পশুবলির বিধান দেওয়া হয়েছে।[১১] আরও দেখা গেছে যে আত্মরক্ষার্থে হিংসা নিন্দনীয় নয় ; বরং আততায়ীকে দেখা-মাত্র বধ করার নির্দেশ আছে। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বধর্মরক্ষার জন্য অর্জুনকে যুদ্ধে প্ররোচিত করেছেন। আবার, কায়মনোবাক্যে সত্য পালনীয় — এই নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মহাভারতে অপরের প্রাণরক্ষার্থে মিথ্যাভাষণ ও মিথ্যাচার সমর্থিত হয়েছে। তবে পরিস্থিতি-নির্ভর নীতিনির্দেশ ভারতীয় নৈতিকতার ত্রুটি বলে বিবেচিত হওয়া সঙ্গত নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে নৈতিকতার বিমূর্ত সার্বিক কাঠামো নিরূপণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রকার নীতি নির্দেশ করেননি। বাস্তব জীবনে নৈতিক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত, জীবনজিজ্ঞাসার সম্মুখীন সম্মুগ্ধ মানুষকে দিগ্‌দর্শন করানোই বরং তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। নীতিবিদেরা যখনই বিমূর্ত পরিকাঠামোর উপর প্রতিমা নির্মাণ করেন, অরূপ ছেড়ে রূপের জগতে পদার্পণ করেন, তখন তাদের সার্বিককে ছেড়ে বিশেষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই হয়। ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তগুলিকে আর উপেক্ষা করা

চলে না, নৈতিকতার পরিসরেই তাদের স্থান দিতে হয়। ফলে নৈতিক নিয়ম নিঃশর্ত থাকে না, হয়ে ওঠে পরিস্থিতি-নির্ভর। পরিস্থিতি-নির্ভর নীতিনির্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর জন্যে যে স্বচ্ছ-দৃষ্টি ও সংবেদনশীল মানসিকতার প্রয়োজন ধর্মশাস্ত্রকারগণের মধ্যে তার অভাব ছিল না।

ভারতীয় ধর্মনীতির আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে যদি শীলের উল্লেখ না করা হয়। ধর্মশাস্ত্রে ও দর্শনে অনেকগুলি সদ্‌গুণের প্রশংসা করা হয়েছে। সেইসব সদ্‌গুণ বা শীলগুলি হল ঃ ব্রহ্মণ্যতা, দেবপিতৃভক্তি, সৌম্যতা, অনসূয়া, মৃদুতা, অপারুষ্য, প্রিয়বাদিতা, কৃতজ্ঞতা, শরণ্যতা, কারুণ্য ও প্রশান্তি। আদর্শ চরিত্রে এ-সব সদ্‌গুণের সমাবেশ দেখা যায়। তবে এ-সমস্ত গুণার্জন কেবলমাত্র প্রশংসনীয়, অবশ্য-কর্তব্য নয়। তাই এগুলির স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে কর্তব্য-অতিরিক্ততা-র (সুপারেরোগেটরি) স্তরে। সদাচারের মধ্য দিয়ে শীলের প্রকাশে পুণ্য নেই, অকরণেও পাপ বা প্রত্যবায় হয় না।

বৈদিক নৈতিকতার পাশাপাশি বৌদ্ধ নৈতিকতার বিচার করলে বোঝা যায় যে দুই-এর মধ্যে সাদৃশ্য কতখানি। হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের পার্থক্য প্রচুর, বিশেষত আধিবিদ্যক তত্ত্বে। বৌদ্ধরা নিত্য আত্মা স্বীকার করেন না যদিও জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন। তাঁরা নিরীশ্বরবাদী ও বেদবিরোধী। (অবশ্যই হিন্দু নৈতিকতা ঈশ্বর স্বীকারের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু ঈশ্বরবাদীর ঈশ্বরচিন্তার সঙ্গে নৈতিকতাকে মেলানোয় কোনো বাধা নেই।) বর্ণবিভাগ বৌদ্ধদের কাছে গ্রাহ্য নয়, সব মানুষকেই তারা সমদৃষ্টিতে দেখার পক্ষপাতী। বৌদ্ধমতে জগৎ ও জীবন দুঃখময় কিন্তু বৈদিক দার্শনিক জগতে দুখঃসংপৃক্ত সুখ লভ্য বলে মানেন। তবুও উভয়ের লক্ষ্য এক — আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তি। এই প্রবন্ধ সংকলনে ধম্মপদ অবলম্বনে বৌদ্ধ নৈতিকতার ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপিকা মধুমিতা চট্টোপাধ্যায় এবং গীতা ও ধম্মপদ-এর আলোতে হিন্দু ও বৌদ্ধ নৈতিকতার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন অধ্যাপিকা তারা চট্টোপাধ্যায়।

পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা ভারতীয় ধর্মনীতির আলোচনায় কখনও কান্টীয় নৈতিকতার, কখনও উপযোগবাদের কখনও বা নৈতিক আদর্শবাদের ছায়া দেখতে পান। প্রাচীন ভারতীয় নীতিচর্চায় এ-সব আধুনিক বিদেশী ভাবধারার প্রসঙ্গ টেনে আনা কতটা যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। তবুও তুলনা করতে গেলে বলতে হয় ভারতীয় ধর্মনীতির চিন্তার সঙ্গে সদ্‌গুণকেন্দ্রিক নীতিশাস্ত্র বা 'ভারচু-এথিক্স'-এর সাদৃশ্য আছে।[১২] পাশ্চাত্যে সদ্‌গুণকেন্দ্রিক নৈতিকতার সূত্রপাত হয়েছিল প্রাচীন গ্রীসে প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের দর্শনে। এঁরা দুজনেই বলেন যে সব রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমিতে সব সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় গণতন্ত্রে যে-সব গুণের সমাদর হয় একনায়কতন্ত্র সেগুলির অনুকূল হয় না। তৎসত্ত্বেও ব্যক্তিজীবনে ও রাষ্ট্রজীবনে গ্রীক দার্শনিকেরা কতগুলি মহদ্‌গুণের উপস্থিতি জরুরী বলে মনে করেছিলেন, যেমন, সাহস, ইন্দ্রিয়সংযম, মিতাচার,

ন্যায়বোধ ইত্যাদি। এইসব মহদ্‌গুণের উপস্থিতি ও প্রাধান্য অনুসারে তাঁরা মানব-চরিত্রের বিভাগও করেছিলেন।

আধুনিক নীতিবিদেরা কান্টীয় নৈতিকতা ও উপযোগবাদের বিকল্প হিসাবে সদ্‌গুণকেন্দ্রিক নৈতিকতার পর্যালোচনা করেন। 'ভারচু এথিক্স' অনুসারে ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণ করা যায় না। তাই নিঃশর্তভাবে 'আমার কর্তব্য কি?' এ প্রশ্ন করার কোনো মানে নেই। নৈতিক প্রশ্ন সার্থক হয় বিশেষ চারিত্রিক আদর্শের অনুষঙ্গে। আমার পরিবেশ, পটভূমি অনুসারে যে চরিত্রকে আমি আদর্শ চরিত্র বলে মনে করি, নিজেকে সেইভাবে গড়ে তুলতে হলে আমার কর্তব্য কি হতে পারে — তা নির্দেশ করাই নীতিবিদের কাজ। আদর্শ চরিত্রের মানুষ বাস্তব জীবনে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হলে কিরূপ আচরণ করবেন — এটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক প্রশ্ন। এই জাতীয় নৈতিকতা পরিস্থিতি-নির্ভর নৈতিকতার সঙ্গে সুসমঞ্জস।

ভারতীয় ধর্মনীতির আলোচনা থেকে এ-কথা স্পষ্ট যে বৈদিক-অবৈদিক নির্বিশেষে সকলেই চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন কর্মের নৈতিক মূল্য-বিচার করেছেন। হিন্দু ভারতে যেমন 'ক্ষান্ত', 'দান্ত', জিতেন্দ্রিয়, আত্মজ্ঞানী ও যোগযুক্তাত্মা ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠপুরুষরূপে বিবেচিত হয়েছেন ঠিক তেমনি বৌদ্ধভারতেরও আদর্শ ছিল 'উপশান্ত, সুপ্রবুদ্ধ ব্রাহ্মণ'। জৈন ধর্ম ও দর্শনেও ক্ষমাশীল, দয়াবান, ইন্দ্রিয়জয়ী কেবলজ্ঞানীকেই শ্রেষ্ঠত্বে বরণ করা হয়েছে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সনাতন ভারতের আদর্শ ছিল ব্রহ্মণ্যতা। কেবলমাত্র দর্শন নয়, লোকায়ত জীবন যাত্রাও পরিচালিত হত আদর্শ চরিত্রের আলোতে। এ বিষয়ে 'রামায়ণের নীতি-ধর্ম' প্রবন্ধের উপসংহারে অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর মন্তব্য অতি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। উনি লিখেছেন, 'রাষ্ট্রের মতো বিরাট, সমাজের মতো বিশাল কোন বস্তুও রামায়ণের মধ্যে যদি খুঁজতে যাই, তবে তার আগে একটি আদর্শ পরিবারকে আমাদের মাথায় রাখা উচিত। রামায়ণের সেই পরিবার ভারতবর্ষে শত শত আদর্শ পরিবারের জন্ম দিয়েছে। শত শত সেইরকম পরিবার ভারতবর্ষের সামাজিক গঠন ও রাষ্ট্রকেও অনুপ্রাণিত করেছেন। রামায়ণের সহজবোধ্য ধর্মনীতি মেনে ভারতবর্ষের একটি স্ত্রী রামের মতো পতি লাভ করতে চেয়েছে, আর নিজে সীতার মতো সতী হতে চেয়েছে।' জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক একটি আদর্শ চরিত্রকে সামনে রেখে তার আদলে সাধারণ মানুষ তার নিজের চরিত্র গঠন করতে চেয়েছে এবং সেই মতো নৈতিক বিধান নির্বাচন করে নিতে সমাজ ও ঐতিহ্য তাকে সাহায্য করেছে। বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে হয়ত পুরাণ বা মহাকাব্যের আদর্শ চরিত্র আমাদের অনুপ্রাণিত করে না। কিন্তু আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও নিরলস সাধনায় আমাদের যুগোপযোগী আদর্শ মানুষ আমরা নিশ্চয়ই খুঁজে নিতে পারি। তারপরে আপন-আপন আদর্শকে ধ্রুবতারার মত সামনে রেখে নৈতিকতার পথ বেয়ে এগিয়ে চলবে নতুন প্রজন্মের মানুষ — যে পথের প্রান্তে পৌঁছলে

নিশ্চিত হবে শ্রেয়োলাভ; আর সে চলার আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে পাওয়া যাবে নীতিদীপ্ত মানুষের স্বচ্ছন্দোময় সমাজ।[১৩]

টীকা ও তথ্যপঞ্জী

১। বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ,

২। ঐ, পৃঃ ৬৭২

৩। 'ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ।
অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ শুচীন্।
উপবাসরতান্ দান্তাহস্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ।
ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।'

৪। মহাভারত, বনপর্ব্ব, মার্কণ্ডেয়সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়, ২১৫ অধ্যায়।

৫। মহাভারত, বনপর্ব্ব অজগর পর্ব্বাধ্যায়, ১৮০ অধ্যায়।

৬। 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৯৫

৭। 'ধর্ম' রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী,

৮। মহাভারতে ধর্মের অর্থ বিষয়ে অরিন্দম চক্রবর্ত্তী রচিত প্রবন্ধ 'যিনি ধর্ম তিনিই বক' দ্রষ্টব্য; শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা,

৯। পুরুষোত্তম বিলিমোরিয়া, 'ইণ্ডিয়ান এথিক্স্', এ কম্প্যানিয়ন টু এথিক্স, পিটার সিঙ্গার সম্পাদিত, ব্ল্যাকওয়েল,

১০। 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া!!
শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ১৮/৬১।

১১। যজ্ঞীয় হিংসাকে ধর্ম বলে মানতে নারাজ সাংখ্য-সম্প্রদায়ও। ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ে সাংখ্যমত অন্যান্য দার্শনিক মত থেকে স্বতন্ত্র এবং এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

১২। জিতেন্দ্রনাথ মহান্তি 'দ্য আইডিয়া অব দ্য গুড ইন ইণ্ডিয়ান ফিলজফি' প্রবন্ধে 'ভারচু এথিক্স্'-এর সঙ্গে ভারতীয় নৈতিকতার সাদৃশ্যের উল্লেখ করেছেন, এ কম্প্যানিয়ন টু ওয়র্ল্ড ফিলজফিস, এলিয়ট ডয়েট্‌শ্ ও রন বন্‌টেকো সম্পাদিত, ব্ল্যাকওয়েল,

১৩। ভূমিকাটি যত্ন করে পড়ে মূল্যবান মতামত দেওয়ার জন্য আমি আমার সহকর্মী শেফালী মৈত্র ও সৌমিত্র বসুর কাছে কৃতজ্ঞ।

ভারতীয় ধর্মনীতি ও তার কয়েকটি দিক

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী

ভাল বীজ বপন করলে ভাল ফসল হয়, মন্দ বীজ বপন করলে মন্দ ফসল হয়, এ প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সত্য যাঁরা স্বীকার করেন তাঁরা অবশ্যই এ জগতে একটা নৈতিক বা ধর্মনৈতিক শৃঙ্খলা মানতে বাধ্য। আমাদের শাস্ত্রেও একথা স্বীকৃত। ভারতের ধর্মনীতি মানবের চরমকল্যাণ বা নিঃশ্রেয়সকে লক্ষ্য করে, মানব সমাজের সুশৃঙ্খল কল্যাণমুখী শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা নির্বাহকে উদ্দেশ্য করেই গড়ে উঠেছিল, বা ঋষি মুনিগণ কর্তৃক উপদিষ্ট হয়েছিল। মুনি যাজ্ঞবল্ক্য ধর্মের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'অয়মেব পরমো ধর্মঃ যদ্যোগেনাত্মদর্শনম।'[১] যোগ অবলম্বনে আত্মদর্শন পরম বা চরম ধর্ম। এ বাক্যেই ধর্মের চরম লক্ষ্য বা আধ্যাত্মিক ভিত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আবার তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলছে 'ধর্মে বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, লোকে ধর্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি'।[২] ধর্মই সকল জগতের প্রতিষ্ঠা বা ভিত্তি, প্রজাগণ শ্রেষ্ঠ ধার্মিকজনের কাছেই যায়, ধর্মের দ্বারা পাপকে বিদূরিত করে। এ বাক্যে সেই ধর্মনীতির কথাই বলা হয়েছে যা মানবসমাজকে পাপমুক্ত করে শুদ্ধ কল্যাণের পথে চালিত করে।

সুতরাং ভারতীয় ধর্মনীতি কেবলমাত্র সুখে শৃঙ্খলায় সামাজিক জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য সাধারণ সামাজিক মানুষের গড়া কতকগুলি নীতি ও নিয়ম নয়, তা থেকে অনেক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সত্যসমূহ যা লঙ্ঘন করলে অকল্যাণ ও শাস্তি অবশ্যম্ভাবী — যেমন কোনও প্রাকৃতিক বা বৈজ্ঞানিক সত্যকে অগ্রাহ্য বা লঙ্ঘন করে অগ্নিতে হস্ত-প্রদান শাস্তি ও দুঃখ আনয়ন করে।

প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদের মন্ত্রভাগে এই ধর্মকে 'ঋতং' 'সত্যং' বলে অভিহিত করা হয়েছে — কারণ এই ধর্ম প্রাকৃতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ম সমূহের ন্যায়ই সত্য। তাই বৃহদায়ণ্যক উপনিষদে মানব সমাজে ধর্মের প্রয়োজন ও সর্বোচ্চ স্থান, ধর্মের মহাশক্তি বুঝিয়ে একটি মনোজ্ঞ কাহিনীর উপর খুব জোর দিয়ে বলা হয়েছে — 'যো ধর্মঃ সত্যং বৈতৎ। [৩] অর্থাৎ যাহা ধর্ম তাহাই সৎ। আর এক দিক দিয়েও সত্যই যে ধর্ম তা নিশ্চিতরূপে বোঝা যায়। 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন 'ধর্ম' শব্দটি 'যাহা ধারণ করে রাখে' তাকেই বুঝায়। সে হিসাবে বিশ্বের প্রধান ধারক হলেন ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর যাঁকে ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে 'স্ব সেতু বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়'।[৪] এ সকল লোক যাতে সম্ভেদ-মিশ্রণ-বিশৃঙ্খলা প্রাপ্ত না হয়, সে জন্য তিনিই (পরমেশ্বরই)

সেতুস্বরূপ (বাঁধ), তিনিই ধারক। আবার বৃহদারণ্যকে বলা হয়েছে, 'অস্যৈব প্রশাসনে গার্গী সূর্য্যচন্দমসৌ বিধৃতৌ তিষ্টতঃ'—এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনেই হে গার্গি! সূর্য্য ও চন্দ্রমা বিধৃত হয়ে আছে — অর্থাৎ স্বস্থানে থেকে নিজ নিজ ব্যাপার সম্পাদন করছে। কিন্তু এ-ধর্ম হল পরম তত্ত্ব, পরম সত্য। যোগ অবলম্বনে এ ধর্মের উপলব্ধি অধ্যাত্ম-সাধকের, যোগীর পক্ষেই সম্ভব, সাধারণ মানব সমাজের পক্ষে নয়। অথচ ধর্মশাস্ত্র বলছেন — সকল মানুষকেই ধর্ম রক্ষা করে চলতে হবে। 'ধর্ম এব হতো হন্তি, ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ'।[৫] ধর্ম হত (বিনষ্ট) হলে (হন্তাকে) বিনাশ করে, আর রক্ষিত হলে ধর্মই রক্ষা করে। সুতরাং সব মানুষকেই ধর্ম রক্ষা করে চলতে হবে। এ ধর্মের স্বরূপ কী যা সবাইকে রক্ষা করে চলতে হবে?

এর জবাবে বলা হয়েছে — যা কিছু বেদাদি শাস্ত্রে মানুষের হিতকর রূপে বিহিত হয়েছে তাই ধর্ম।[৬] আচার্য প্রশস্তপাদ আরও পূর্ণতা সম্পাদন করে বলেছেন, 'অখণ্ড সদভিপ্রায়ে বেদাদি বিহিতের অনুষ্ঠানই ধর্ম, অসদভিপ্রায়ে অনুষ্ঠান বেদবিহিত হলেও ধর্ম হবে না'।[৭] মহর্ষি কণাদ বলেছেন, 'যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ'। যার অনুষ্ঠানে মানুষের অভ্যুদয় (উন্নতি) এবং নিঃশ্রেয়স (চরমকল্যাণ) সিদ্ধ হয় তাই ধর্ম। কিন্তু এই ধর্ম মানুষের এত হিতকর হলেও সকল মানুষই স্বভাবত ধর্মকে চায় না; কারণ ধর্মানুষ্ঠানে ও ধর্মপথে চলতে অনেকটা ত্যাগ স্বীকার, সংযম ও ক্লেশ স্বীকার করতে হয়। তাই মানুষের মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে শাস্ত্রকারগণ মানুষের আকাঙ্খিত, মানুষের অভিলষিত বা পুরুষার্থ চার প্রকার নির্ণয় করেছেন — (১) ধর্ম, (২) অর্থ, (৩) কাম, ও (৪) মোক্ষ। এই সব পুরুষার্থ কিছু কিছু মানব স্বভাবতই চায়, কিন্তু তার পূর্ণতা বা সফলতা আয়াসসাধ্য। শাস্ত্রকারগণ ধর্মের উল্লেখ সর্বপ্রথম করেন। তার উদ্দেশ্য এই যে, এই ধর্ম আয়াসসাধ্য হলেও সকল মানুষেরই অবশ্য পালনীয় বা রক্ষণীয়। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে ধর্ম রক্ষিত হলে রক্ষা করে, বিনষ্ট হলে বিনাশ করে। এটি একটি বহুযুগের পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য, যদিও আমরা অধিকাংশ মানুষই এই সত্যে পূর্ণ আস্থা রাখি না; দুর্বলতাবশত লোভ-লালসাবশত আস্থা রাখতে পারি না। ধর্মের উল্লেখ প্রথমেই এই জন্য যে, অর্থ, কাম, মোক্ষ আমি চাইতেও পারি, না চাইতেও পারি, কিন্তু মনুষ্যসমাজে ধর্ম আমাকে পালন করতেই হবে। ধর্ম অবশ্য পালনীয় ও রক্ষণীয়। অর্থ, কাম এবং মোক্ষের অনুশীলন বা সেবা আমাদের করতে হবে ধর্মের অবিরোধে। ধর্মকে বিনষ্ট করে অপর কোনটির অনুশীলন করলে সে পুরুষার্থও সার্থক হয়ে পূর্ণতা লাভ করবে না, নিজের ও মনুষ্য সমাজের অহিত সাধন করবে। সমাজে যত অশুভ, পাপ, উৎপীড়ন দেখা যায়, তা এই ধর্মকে লঙ্ঘন করে অর্থ ও কাম প্রচেষ্টার ফলেই হয়ে থাকে। এমন কি ধর্ম লঙ্ঘন করে মোক্ষের প্রচেষ্টার দ্বারাও অশুভের উৎপত্তি হয়। সুতরাং অর্থ, কাম ও মোক্ষ আমি না চাইতেও পারি, কিন্তু ধর্ম অবশ্য রক্ষণীয়। এটাই ভারতীয়

ধর্মনীতির একটি মূলকথা। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন — ধর্মই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মেরুদণ্ড।

অধিকন্তু আমাদের শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, আহার নিদ্রা, ভয়, মৈথুন — এ চারটি মানুষে ও পশুতে তুল্য বিদ্যমান; কেবলমাত্র ধর্ম বা ধর্মবোধই মানুষের বিশেষত্ব। তাই ধর্মহীন মানুষ পশুরই সমান।[৮]

এই ধর্মনীতি, সর্বদেশের সকল মানুষের জন্য যা প্রযোজ্য, তাকে সামান্য ধর্ম বলা হয়। যেমন মনুসংহিতায় যে দশটি ধর্মের লক্ষণ বলা হয়েছে সে সবই সর্বদেশের সর্বকালের মনুষ্য মাত্রেরই ধর্ম। যথা —

'ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহ।
ধী বিদ্যাসত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।[৯]

এই সামান্য ধর্ম ব্যতিরেকেও মানুষের স্ত্রী-পুরুষভেদে, বর্ণভেদে, আশ্রমভেদে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ ধর্ম বিহিত আছে যা সকলের জন্য নয়। ধর্মের নিরূপণের প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদও বলেছেন, 'তত্র সামান্যানি ধর্মে শ্রদ্ধা, অহিংসা, ভূতহিতত্বং সত্যবচনম্স্তেয়ং ব্রহ্মচর্যমনুপধা (ভাবশুদ্ধি) ক্রোধবর্জনম্ শুচিদ্রব্যসেবনম্, বিশিষ্টদেবতাভক্তিরূপবাসোঽপ্রমাদশ্চ'।[১০]

সামান্য ধর্মের বিবরণের অনন্তর বিশেষ ধর্মের বিবরণে অবশ্য প্রশস্তপাদ কেবলমাত্র বর্ণভেদে এবং আশ্রমভেদে ধর্মভেদেরই বিবরণ দিয়েছেন। মহাভারতে, মনুসংহিতা প্রভৃতিতে স্ত্রীধর্ম বিশেষ ধর্মরূপে বিস্তৃত নিরূপিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ব্রাহ্মণাদি বর্ণের যা স্বভাবজাত কর্ম বলে নির্দিষ্ট হয়েছে সে সবই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বিশেষ ধর্ম। ভারতবর্ষের সমাজে এই বর্ণবিভাগ জন্মগত হয়ে পড়াতে নানা বিতর্ক, সমস্যা, আপত্তির সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু এই চার শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবীর সকল সমাজেই বিদ্যমান। এই চার শ্রেণীর মানুষ না থাকলে সমাজ অচল হয়ে পড়ে। এই চার বর্ণবিভাগ পৃথিবীর সর্বত্র আছে এবং থাকবে। সকল মানুষই সকল প্রকার কর্ম সম্পাদন করতে অসমর্থ, তাই কর্মবিভাগ, কর্মের সামর্থ্যানুসারে বর্ণবিভাগ প্রাকৃতিক, সুতরাং বৈজ্ঞানিক সত্য। স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্য ভারতের জন্মগত বর্ণভেদেরও একটি বিশেষ সুফলের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ রূপে স্বীকার করাতে ক্ষত্রিয় জাতির কী লাভ হল? বরং তিনি ক্ষত্রিয়ই থাকলে ক্ষত্রিয় সমাজ উন্নততর হত না কী? ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণত্ব সামাজিক মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্বীকৃত থাকাতে সব জাতিগুলোই ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণত্বের দিকে অগ্রসর হয়ে উন্নীত হবে। এটাই ছিল বর্ণধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই প্রধান ধর্মশাস্ত্রকার মনু বলেছেন, 'এই দেশে প্রসূত ব্রাহ্মণগণ থেকে পৃথিবীর সকল লোক নিজ নিজ চরিত্র শিক্ষা করুক'।[১১] কী সে চরিত্র যা ভারতের ব্রাহ্মণ থেকে ভারতের সকল বর্ণকে, এবং পৃথিবীর সকল মানবকে নিতে হবে? সত্যনিষ্ঠা,

ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, শৌচ (বাহ্য ও আন্তর), সন্তোষ — এই চরিত্রই ভারতের ব্রাহ্মণকে আদর্শ সামাজিক মানুষরূপে গণ্য করেছিল।

সে যা হোক্, বর্ণভেদ পৃথিবীর সর্বত্র আছে এবং সত্য ও সপ্রয়োজন বলেই থাকবে। এই বিভিন্ন বর্ণের ধর্ম বা কর্তব্যও ভিন্ন ভিন্নই হবে। গীতায় সংক্ষেপে এই চার বর্ণের কর্তব্য বা ধর্ম বলা হয়েছে। 'জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্যই ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম। দান, প্রভুত্বের ক্ষমতা, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হওয়া — এই গুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম। কৃষিকর্ম, গোরক্ষা, বাণিজ্য প্রভৃতি বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম — সুতরাং ধর্ম; পরিচর্যা (শ্রম ও সেবা) শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম'।

এ প্রসঙ্গে ভারতের (হিন্দুর) কর্তব্যের ধারণাও বিশেষ আলোচ্য বিষয়। গৃহস্থ হিন্দুর পঞ্চ মহাযজ্ঞ অবশ্য কর্তব্য।[১২] হিন্দুর কর্তব্য ঋণশোধাত্মক। 'জায়মানো বৈ ত্রিবিধঋণবান্ জায়তে' — অর্থাৎ জন্ম থেকেই মানুষ এই তিনটি ঋণযুক্ত হয়। শাস্ত্রবাক্যকে ভিত্তি করে প্রথমে মানুষের ত্রিবিধ ঋণ এবং সেই ঋণশোধের নিমিত্ত ত্রিবিধ কর্তব্যের বিধান করা হয়েছে। এই তিনটি ঋণই পারলৌকিক ঋণ। (১) দেবঋণ, (২) পিতৃঋণ ও (৩) ঋষিঋণ। দেবযজ্ঞ অর্থাৎ দেবতার পূজার (যাগ যজ্ঞাদিও) দ্বারা দেবঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য। (২) শ্রাদ্ধ, তর্পণাদি এবং বিবাহিত হলে সৎ সন্তান উৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ কর্তব্য। (৩) বেদাধ্যয়ন, অধ্যাপনা, অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ ও প্রবচনের দ্বারা ঋষিঋণ পরিশোধ করতে হবে। এতদ্‌ব্যতিরিক্ত আরও দুই প্রকার ঐহিক ঋণ যুক্তিযুক্তভাবেই কর্তব্যে যুক্ত হয়েছে — নৃঋণ ও ভূতঋণ। অতিথি সেবা অর্থাৎ সাহায্যপ্রার্থী মানুষের সেবার দ্বারা নৃঋণ অর্থাৎ মানুষের কাছে ঋণ শোধ করতে হবে। আবার, কুকুর, বিড়াল, কাক প্রভৃতির কাছেও আমরা প্রচুর ঋণী; সুতরাং তাদের প্রতি ঋণও আমাদের পরিশোধ করা কর্তব্য। তাদের জন্য কিছু অতিরিক্ত রন্ধন করে, পৃথকভাবে রেখে তাদের ভোজনের জন্য দিতে হবে। ভগবদ্‌গীতা বলেছেন — যাদের যা প্রাপ্য তাদের তা না দিয়ে কেবল নিজের উদর পূরণের জন্য যারা রন্ধন করে তারা 'স্তেন' — অর্থাৎ চোর, প্রবঞ্চনাকারী।

ভারতের অর্থাৎ হিন্দুর কর্তব্যের ধারণা বিষয়ে আলোচনার পর স্বতই একটি মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম প্রশ্ন এসে পড়ে যে মানুষের স্বেচ্ছানুসারে কর্ম করবার সামর্থ্য বা কর্মে স্বাধীনতা আছে কিনা? মানুষের কর্ম করবার, বা না করবার স্বাধীনতা থাকলে তবেই বিধান বা নিষেধের সার্থকতা থাকে, নতুবা নহে। যা আমরা করে থাকি তা যদি করতে বাধ্য বলেই করি, তবে আমাদের ধর্মের বিধান বা নৈতিক বিধান দেওয়া নিরর্থক হয়ে পড়ে। 'প্রত্যহ সন্ধ্যোপাসনা করিবে' এই বিধান, অথবা 'সুরাপান করিবে না' এই সব বিধি-নিষেধের কোনই সার্থকতা থাকে না যদি এই সব কর্ম করাতে বা না করাতে আমাদের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা না থাকে। সুতরাং যেহেতু ধর্মনীতি সত্য, কর্মে স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতাও সত্য অবশ্য স্বীকার করতে হবে। নিজের ইচ্ছামত করতে পারা, না করতে পারা, বা

অন্য প্রকারে করতে পারাই স্বাধীনতা শব্দের সর্বসম্মত অর্থ। তবে এই কর্মে স্বাধীনতাও আমাদের নিরঙ্কুশ নয়, অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ইচ্ছা করলেই আমি হস্ত সঞ্চালন করতে পারি, কিন্তু ইচ্ছা করলেই আমি আকাশে উড্ডীন হতে পারি না। সুতরাং বুঝতে হবে কর্মে আমাদের অনেকটা স্বাধীনতা আছে বলেই শাস্ত্রের বা ধর্মের সার্থকতা আছে। ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেব এই কথাই বলেছেন — কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ।[১৩] অর্থাৎ শাস্ত্রের (বিধি, নিষেধের) সার্থকতা হেতু জীবকে কর্তা মানতেই হবে, জীবের কর্মে স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা আছে স্বীকার করতে হবে। কর্মে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার কথাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর প্রসিদ্ধ উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। একটা গরু বিশ হাত লম্বা দড়ি দিয়ে খুঁটিতে বাঁধা আছে; এই দশহাতের মধ্যে সে যেখানে খুশী যেতে পারে; কিন্তু তার বাইরে সে যেতে পারে না। সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা।

কিন্তু আর একটি সমস্যা হল — ইচ্ছায় আমাদেব স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য আছে কিনা? অর্থাৎ ইচ্ছা করলেই আমরা ইচ্ছা করতে, বা না করতে, বা অন্য প্রকারে ইচ্ছা করতে পারি কিনা? একটু বিচার করলেই বোঝা যায় যে ইচ্ছাতে আমাদের কোনই স্বাধীনতা নেই। ইচ্ছার কতগুলি বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কারণ আছে। সেগুলি থাকলে ইচ্ছা হতে বাধ্য; সেই নির্দিষ্ট বিষয়েই ইচ্ছা হবে, অন্য প্রকার ইচ্ছা হবে না। আর ইচ্ছার সেই নির্দিষ্ট কারণ না থাকলে কিছুতেই আমার সে বিষয়ে ইচ্ছা হবে না। যেমন, কোনও বন্ধুগৃহে বন্ধুর সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও ভোজনে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে বন্ধু যদি বলে, 'একটু ইচ্ছা করই না', তাতে অনেক সময় বলতে হয়, 'কী করে ইচ্ছা করব, পেট একেবারেই ভর্ত্তি, অথবা গা বমি বমি করছে, খেলেই বমি হয়ে যাবে'। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা ইচ্ছা করলেই ইচ্ছা করতে পারি না, যদি না ইচ্ছার কারণসমূহ-শরীরের সুস্থতা, ক্ষুধা, রুচি, সুখজনকতা জ্ঞান প্রভৃতি না থাকে। এগুলি থাকলে অবশ্য ইচ্ছা হতে পারে। তার্কিকগণের ভাষায়, বলবত্তর-অনিষ্ট-জনকত্বজ্ঞান না থেকে যদি ইষ্ট (সুখ) সাধনত্ব জ্ঞান থাকে তবেই সে বিষয়ে ইচ্ছার উদয় হয়। অর্থাৎ এ বিষয় বা কাজ থেকে আমার কিছু অভিলষিত বস্তু (বা সুখ) লাভ হবে, কিন্তু বেশী (বলবত্তর) কিছু অনিষ্ট (ক্ষতি) হবে না — এইরূপ নিশ্চয় যদি থাকে তবেই সে বিষয়ে বা কাজে আমাদের ইচ্ছার উদয় হয়, নতুবা নয়। এতে সুখ কিছু হলেও বেশী ক্ষতি বা অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে এরূপ জ্ঞান হলে তাতে ইচ্ছার উদয় হয় না। ইচ্ছার সম্পূর্ণতা বা পূর্তি হতে হলে একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া প্রয়োজন, তার নাম 'চিকীর্ষা'। ইচ্ছার উদয় হলেও সর্বক্ষেত্রে 'চিকীর্ষা' অর্থাৎ সেই ইচ্ছাপূর্তির জন্য কিছু করতে ইচ্ছা হয় না। চিকীর্ষা হতে হলে আর একটি কারণ প্রয়োজন। কোনও বিষয়ে (বস্তু বা কর্মে) ইচ্ছা হবার পর যদি এরূপ বোধ (জ্ঞান) হয় যে এই বিষয়টি আমার কৃতিসাধ্য বা প্রযত্ন-সাধ্য, তবেই সে বিষয়ে চিকীর্ষা উৎপন্ন হয়। আর ইচ্ছা হলেও যদি মনে (বোধ) হয় যে এটি আমার

চেষ্টা-সাধ্য বা কৃতি-সাধ্য নয় তবে সে বিষয়ে চিকীর্ষা — কিছু করবার ইচ্ছা উৎপন্ন হবে না। সুতরাং কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান চিকীর্ষা উৎপত্তির হেতু।

ধর্মনীতির আলোচনায় ইচ্ছা ও চিকীর্ষার আলোচনা করা হল এজন্য যে ধর্মনীতি প্রায়শ বিধি-নিষেধ প্রধান। 'করাতে' বা না করাতে মানুষের স্বাতন্ত্র্য থাকলে তবেই ধর্মনীতির সার্থকতা হতে পারে। যদিও ইচ্ছাতে মানুষের কোনই স্বাধীনতা নেই, প্রধানত ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানই ইচ্ছার জনক, তথাপি শুভ বিষয়ে এবং শুভকর্মে যাতে শ্রোতার ইষ্টসাধনতা জ্ঞান জন্মে, সেজন্যই উপদেশ শ্রবণ ও শাস্ত্রশ্রবণ অত্যন্ত প্রয়োজন। ঐ শিক্ষা বা উপদেশ শ্রবণ থেকেই সদ্‌বিষয়ে, ধর্মবিষয়ে, 'ইষ্টসাধনতাজ্ঞান' জন্মায়। তা থেকেই সে বিষয়ে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়ে ধর্মে প্রবৃত্তি ও অধর্মে নিবৃত্তি হতে পারে। সুতরাং উভয়পক্ষেই শাস্ত্রপাঠের ও উপদেশ প্রদানের সার্থকতা আছে। শিক্ষাপ্রদানের সার্থকতা আছে।

ভারতীয় ধর্মনীতি অত্যন্ত ব্যাপকনীতি, জীবনের সকল ক্ষেত্রই এর অন্তর্গত। এমন কি বিচারালয়ের কাজকর্মও ধর্মনীতি অনুসারে চলবে, তাই বিচারালয়ের নাম ধর্মাধিকরণ। রাজকর্ম, প্রজাধর্ম, স্বামীর ধর্ম, স্ত্রীর ধর্ম, ব্রহ্মচারীর ধর্ম, গৃহস্থের ধর্ম, বাণপ্রস্থীর ধর্ম এমন কি সন্ন্যাসীর ধর্মও ধর্মনীতির অন্তর্গত। পরলোকবাধক এবং (সামাজিক) ব্যবহার বাধক দ্বিবিধ পাপতত্ত্ব ও তার প্রায়শ্চিত্ত, মানব জীবনের সকল বিষয়ই ধর্মনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সুতরাং ধর্মনীতির আলোচ্য বিষয়।

এবারে যে কয়েকটি সিদ্ধান্তের উপর বা স্তম্ভের উপর ভারতীয় ধর্ম (এথিক্স) প্রতিষ্ঠিত তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। কার্যকারণভাব প্রায় সকল দর্শনে ও ধর্মেই স্বীকৃত। কিন্তু তাকে ভিত্তি করে 'কর্ম ও কর্মফলবাদ' সকলের স্বীকৃত নয়। তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে।

একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর আমি হস্তের দ্বারা সবলে আঘাত করলাম, সঙ্গে সঙ্গেই হস্তে প্রতিঘাত ও বেদনা অনুভব করলাম। ঐ প্রতিঘাত ও বেদনা যে আমারই কৃত আঘাতেরই ফল বা প্রতিক্রিয়া তা বুঝতে আমার একটুও বিলম্ব বা বিচার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমার নিকটেই একটি ধাতুখণ্ড লম্বমান রজ্জুতে আবদ্ধ হয়ে 'পেণ্ডুলামের' মত ঝুলছে। আমি সেই ধাতুখণ্ডে হস্তের দ্বারা কিঞ্চিৎ আঘাত (ধাক্কা) দিলাম। ধাতুখণ্ড বিশেষ কিছু প্রতিঘাত না করে কিঞ্চিৎ দূরস্থিত প্রাচীরে যেয়ে প্রবল আঘাত করে দ্রুত বিপরীত দিকে ধাবিত হয়ে আমারই কপালে এসে প্রতিঘাত করল। তখন আমি যদি ভাবি যে আমি তো এই ধাতুখণ্ডের কিছু (কোন ক্ষতিসাধন) করিনি, তাহলে সে কেন আমার কপালে এত আঘাত করে ক্ষত সৃষ্টি করল? আমার এ চিন্তা বা অভিযোগ কি সত্য? আমার এ ক্ষত বা ক্ষতি যে আমার কর্মেরই প্রতিক্রিয়া, কর্মের একটু বিলম্বে সংঘটিত — তা বুঝতে বেশী বুদ্ধি বা বিচার প্রয়োজন হয়না। কিন্তু যে ক্ষেত্রে আমাদের

কর্মেরই প্রতিক্রিয়াটি বেশী বিলম্বে আসে, হয়তো আমাদের ক্রিয়াটি বিস্মৃত হবার পরে আসে, তখন আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবি ও অভিযোগ করি, 'আমি তো কারো কোনও ক্ষতি করি নি তবে কেন অকারণে আমি আঘাত পেলাম'? এটাই কর্ম ও কর্মফলের রহস্য। আমাদের নিজেদের চিন্তা ও কর্মের কথা আমরা বিস্মৃত হই বলেই, নানা সংশয় অভিযোগ দেখা দেয়। এই আঘাতের প্রতিঘাত, কর্মের শুভাশুভ ফল বিলম্বে হলেও অবশ্যম্ভাবী। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদ সিদ্ধান্ত করেছেন, 'পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মনা ভবতি, পাপঃ পাপেন'।[১৪] অর্থাৎ পূণ্যকর্মের দ্বারা শুভফলই লাভ হয়, পাপকর্মের দ্বারা অশুভ (পাপ) ফলই লাভ হয়। এই কর্ম ও কর্মফল নিয়ে ধর্মশাস্ত্রে অত্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। সেগুলি অবশ্য শ্রুতিমূলক বা ঐতিহ্যমূলক। অর্থাৎ যে কর্মের যেরূপ ফল নির্দিষ্ট হয়েছে, সেগুলি বৈজ্ঞানিক বা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত (rational) বলে দাবী করবার কোনও উপায় নেই, কারণ অন্তররাজ্যে মানুষের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিশক্তি খুবই সীমাবদ্ধ। প্রসঙ্গত বলা যায় যে এই কর্ম ও কর্মফলতত্ত্ব ভগবান বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধগণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে মানেন। বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য যোগৈশ্বর্যসম্পন্ন শারিপুত্র যখন শেষজীবনে এক অরণ্যে ধ্যানস্থ ছিলেন তখন একদল দস্যু তাঁকে আক্রমণ করে এমন আঘাত করল যে তাঁর অস্থি প্রভৃতি ভগ্ন হয়ে তিনি মৃত্যুকাল আসন্ন বুঝতে পেরে যোগবলে ভগবান বুদ্ধের নিকট আগমন করলেন, তাঁর পদপ্রান্তে দেহত্যাগের উদ্দেশ্যে। তাঁর ঐ অবস্থা দেখে বুদ্ধের অন্য শিষ্যগণ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার আশ্রিত এরূপ মহাত্মার কেন এরূপ দুর্ভোগ হল'? বুদ্ধদেব বললেন, 'আমাকে একটু ধ্যানস্থ হয়ে জানতে দাও'। ধ্যানান্তে তিনি বললেন যে বহু বহু জন্ম পূর্বে এই শারিপুত্র তার পিতাকে অত্যন্ত প্রহার করেছিল। সেই কর্মের ফলভোগ অবশিষ্ট ছিল। তারই ফলে শারিপুত্রকে এই দুঃখ ও দুর্গতি ভোগ করতে হল।

এই কর্ম-কর্মফলবাদকে ভিত্তি করে আর একটি সিদ্ধান্ত ভারতীয় (হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন) ধর্মনীতিতে স্থান পেয়েছে যা অত্যন্ত প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ। তা হল জন্মান্তরবাদ। বর্তমান জন্মই সব নয়, এটা অসীমের যাত্রাপথে একটি পদক্ষেপ মাত্র। পশ্চাতের বহু জন্মের কর্মের বোঝা আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি। তার দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছি। স্বতন্ত্র কর্মে আমাদের সামর্থ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, পূর্বেই বলা হয়েছে। জন্মান্তরবাদ আবার একটি নৈতিক নিয়মের ওপর ভিত্তি করে গঠিত। সেই নৈতিক নিয়মটি হল 'অকৃতাভ্যাগম' ও 'কৃতনাশ'। জগতে দেখা যায় ভাল বীজ বপন করলে ভাল ফসল লাভ হয়, নিকৃষ্ট বীজ বপন করলে নিকৃষ্ট ফসল লাভ হয়। ইংরাজীতে কথা আছে — 'As you sow, so will you reap'। প্রকৃতির রাজ্যে এ নিয়ম অত্যন্ত বলবান। সুতরাং এই যে কিছু মানুষ, কিছু প্রাণী জন্ম থেকেই নানা সুযোগ, সুবিধা, ভাল পরিবেশ, সুখ-সমৃদ্ধি, প্রতিভা, দক্ষতা, বা শুভ প্রবৃত্তি লাভ করছে, তা কোনও কিছু না করেই লাভ করছে, বীজ বপন

না করেই ফসল কাটছে — তা হতে পারে না। নিশ্চয়ই পূর্বে তার বীজ বপন করা ছিল। এমন কিছু করা ছিল, যার ফলে এ সমস্ত সে লাভ করেছে। নতুবা বলতে হয়, কিছু না করেই সে শুভ-অশুভ ফল পাচ্ছে, একেই বলে অকৃতাভ্যাগম — না করে পাওয়া। আবার পক্ষান্তরে কিছু মানুষ বা প্রাণী যে জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী, অদক্ষ, দরিদ্র, অশুভ পরিবেশে জাত, দুষ্প্রবৃত্তি নিয়ে জাত — এগুলিও সে যদি কিছু না করেই দৈবাৎ পেয়েছে বলা হয়, এরও নাম অকৃতাভ্যাগম। এ জন্মে তো তেমন কিছুই করে নি, তাই এই সব ঘটার জন্য তার পূর্ব জন্ম স্বীকার করতে হয়। এসব বৈজ্ঞানিক সত্য স্বীকার করতে ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের হয়তো মনে ভালো লাগে না, হয়তো মন ব্যথিত হয়, কিন্তু সত্য তো বড়ই নির্মম কঠোর। আমাদের ভাল লাগা না লাগার তোয়াক্কা সে রাখে না। আবার পক্ষান্তরে আমরা বলে থাকি লোকটা এত অন্যায় করছে, পাপ করছে, অথচ দিব্যি সুখে আরামে আছে. এ সকল অন্যায় ও পাপের ফল একদিন সে পাবেই। যদি একথা মানতে হয়, তবে পরজন্ম মানতেই হয়। নতুবা 'কৃতনাশের' আপত্তি অর্থাৎ (কর্ম) করেও কোনও ফল না পাওয়ার আপত্তি হয়ে পড়ে। কারণ, এজন্মে অনেক ক্ষেত্রেই সে সব অন্যায়ের ফল হতে দেখা যায় না।

সুতরাং 'অকৃতাভ্যাগম' এবং 'কৃতনাশের' আপত্তি নিবারণের জন্য পূর্বজন্ম ও পরজন্ম অর্থাৎ জন্মান্তর মানতে হয়। আবার, ব্যক্তি বিশেষের বাদ্যযন্ত্রবিশেষে বা অঙ্কশাস্ত্রে বিনা শিক্ষায় বিশেষ নৈপুণ্য দেখা যায়। কিন্তু কখনো কখনো ব্যক্তি বিশেষের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও নৈপুণ্য আসে না। এ সব ক্ষেত্রে পূর্বজন্মের শিক্ষাকেই কারণ বলা হয়। জড়বাদীরা অবশ্য এসব ঘটনাকে heredity বা পূর্ব পুরুষের থেকে পাওয়া বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে থাকে; পিতৃপুরুষ থেকে দেহের বেশীর ভাগই প্রাপ্ত হলেও মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা বংশানুক্রমতা (heredity) দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের ভাষ্যে ও আচার্য শঙ্করের ঔপনিষদ ভাষ্যে এ বিষয়ে বহু আলোচনা বিদ্যমান। বহু সত্য ঘটনাও জন্মান্তরের প্রমাণ স্বরূপ ঘটে থাকে। নৈতিক ব্যবস্থা — 'শুভ কর্মে শুভ, মন্দে মন্দ ফল' — একথা জানলে জন্মান্তর মানতেই হয়।

তবে একথাও ঠিক যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না হলে যুক্তি তর্ক দিয়ে জন্মান্তর বিশ্বাস করা ও বিশ্বাস করানো দুঃসাধ্য। মাঝে মাঝে এমন সব ঘটনা সত্যই ঘটে যার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে জড়িত জনেরা জন্মান্তর স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

অদৃষ্ট বা কর্মাশয়

ভারতীয় ধর্মনীতিতে অদৃষ্টতত্ত্বের প্রাধান্য ও অবশ্যস্বীকৃতির কথা পূর্বেও বলা হয়েছে। 'পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মনা ভবতি পাপঃ পাপেন' — ইহাই নীতিধর্মের বা ধর্মনীতির মূল

কথা। এই কর্ম সাধারণত তিন প্রকার বলা হয়। পুণ্যকর্ম, পাপকর্ম ও উভয় মিশ্রিত কর্ম। 'অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধঃ কর্মণঃ ফলম্'[১৫] ভগবদ্‌গীতার উক্তি। কিন্তু যোগশাস্ত্রের মতে কর্ম চার প্রকার। শুক্ল, কৃষ্ণ, শুক্ল-কৃষ্ণ (মিশ্র) এবং অশুক্লাকৃষ্ণ। যোগীদের যে নিষ্কাম সেবাত্মক কর্ম বা (কৈবল্যের জন্য) ধারণা-ধ্যানাদি কর্ম তা অশুক্লাকৃষ্ণ। সে দিক দিয়ে বিচার করলে গীতার কর্মযোগ ও ঈশ্বর প্রীতির জন্য ঈশ্বরপূজারূপ কর্ম এবং আত্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে চিত্তশুদ্ধিজনক যে নিষ্কাম কর্ম হয়, তাকেও অশুক্লাকৃষ্ণ কর্মই বলা উচিত। কারণ, তারও অন্য কোনও ফল কাম্য নয়।[১৬]

অন্য বিভাগ অনুযায়ী কর্ম তিন প্রকার — সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান। পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত কর্মসমূহের মধ্যেও যেগুলি নানা কারণে ফল উৎপাদনের সুযোগ না পেয়ে জমা থাকে ভবিষ্যতে সুযোগমত ফলোৎপাদনের জন্য, সেগুলি সঞ্চিত কর্ম। আর যে সব পূর্ব কর্ম ফল প্রদানে উন্মুখ হয়ে ফল প্রদানের জন্য একটি জন্ম বা দেহ উৎপন্ন করে, সেগুলি ফল প্রদান আরম্ভ করে দিয়েছে বলে তার নাম 'প্রারব্ধ' কর্ম। নিক্ষিপ্ত তীর যেমন তার বেগ অনুসারে যতদূর যেয়ে 'ক্ষীণে বেগে পততি' অর্থাৎ তার বেগ ক্ষয় হয়ে গেলে আপনিই পতিত হয়, সেরূপ প্রারব্ধ কর্ম শেষ হলে জ্ঞানীর দেহ ও জীবন আপনি শেষ হয়। কারণ তার সঞ্চিত কর্ম ও ক্রিয়মান কর্ম ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের দ্বারা ভস্মীভূত হয়। সুতরাং জন্মান্তর গ্রহণের কোনও কারণ না থাকায় জ্ঞানী দেহান্তে ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হয়।[১৭]

একটি উপনিষদ বাক্যে এ বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ কথা রয়েছে যা ধর্মনীতিতে স্থান পাবার যোগ্য। সেখানে বলা হয়েছে যে জ্ঞানী যখন পাপপুণ্য বিমুক্ত হয়ে ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন, তাঁর বিষয় সম্পত্তি কিছু থাকলে আত্মীয়েরা প্রাপ্ত হন, তাঁর পাপ সেই জ্ঞানী বিদ্বেষকারীরা প্রাপ্ত হয়, আর তাঁর সকল পুণ্য তাঁর সেবাকারী ভক্তেরা প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য এই যে জ্ঞানী সাধককে কখনো বিদ্বেষ করবে না। বরং তাতে অনুরক্ত হয়ে তাঁর সেবা করলে মহৎ ফল প্রাপ্ত হবে।[১৮]

ব্রহ্মাত্ম জ্ঞানের দ্বারা সকল কর্ম ভস্মীভূত হলেও[১৯] প্রারব্ধ কর্ম নষ্ট হয় না। জ্ঞানীরও প্রারব্ধ ভোগ করতে হয়। এ বিষয়ে আরও কিছু সূক্ষ্ম কথা আছে। জ্ঞানীরও প্রারব্ধ ভোগ করতে হয় কারণ, ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই দেহ ও জীবন বিনষ্ট হয় না। এ সিদ্ধান্তের পক্ষে প্রধান যুক্তি হল এই যে, ঐরূপ দেহ ও জীবন না হলে জ্ঞানী গুরু বলে কেউই থাকতো না, যাঁর কাছ থেকে তত্ত্বোপদেশ নেওয়া চলত। তাই জ্ঞানী গুরু পেতে হলে জ্ঞানীর প্রারব্ধভোগ মানতেই হবে। কিন্তু পক্ষান্তরে এরূপও বলা চলে যে, যেহেতু জ্ঞানীর দেহাত্মাভিমান থাকে না, দ্বৈতের মিথ্যাত্বের দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে থাকে, তাই জ্ঞানীর বস্তুত পক্ষে কোনও ভোগ হয় না।[২০] অপরেরা তাঁর ভোগ হচ্ছে দেখলেও জ্ঞানীর কাছে সে

ভোগ অপর যে কোন জনের ভোগের তুল্যই হয়। তাই জ্ঞানী 'পশ্যন্ অপি ন পশ্যতি', 'সচক্ষুবচক্ষুরিব'। 'তিনি দেখেও কিছু দেখেন না, চক্ষুমান হয়েও তিনি চক্ষুহীনের ন্যায়' এ সব কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

আরেক দৃষ্টিতে কর্ম ছয় প্রকার। বেদান্তসারে কাম্য, নিষিদ্ধ, নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা — এই ছয় প্রকার কর্ম বর্ণিত আছে।

(১) শাস্ত্রোক্ত নির্দিষ্ট ফল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কৃত যে কর্ম তাই কাম্যকর্ম, যথা — যাগযজ্ঞ ইত্যাদি।

(২) বিশেষ নিমিত্ত উপস্থিত হলে শাস্ত্রে অবশ্য করণীয় বলে নির্দিষ্ট কর্ম নৈমিত্তিক; যথা — পুত্র জন্মে জাতেষ্টিযাগ বিহিত আছে।

(৩) প্রত্যহ অবশ্য করণীয় বলে যে সব সন্ধ্যা, পঞ্চ-মহাযজ্ঞ প্রভৃতি শাস্ত্রে বিহিত আছে তাই নিত্যকর্ম।

(৪) পাপজনক বা অনিষ্টফল জনক যে সকল কর্ম শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে তা নিষিদ্ধকর্ম। যথা — সুরাপান, ব্যভিচার, ব্রহ্মবধ প্রভৃতি।

(৫) কেবলমাত্র পাপক্ষয়ের উদ্দেশ্যে কৃত যে সকল উপবাস চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি কর্ম শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে তাই প্রায়শ্চিত্ত। অথবা অনুতাপ, খ্যাপন প্রভৃতি ও ঈশ্বরস্মরণ শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বলে কথিত আছে।

(৬) চিত্তের একাগ্রতা বা চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যে সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক যে মানসব্যাপার তাই উপাসনা কর্ম। শাস্ত্রে নানাপ্রকার উপাসনা বর্ণিত আছে। মোক্ষার্থীর নিকট তার প্রধান উদ্দেশ্য একাগ্রতালাভ ও চিত্তশুদ্ধি।

ভারতীয় ধর্মনীতিতে সংস্কার

কর্মের কথা, কর্মফলের কথা, তৎপ্রসঙ্গে নানাবিধ কর্মতত্ত্ব আলোচিত হল। কিন্তু আর একটি আমাদের মানসিক পদার্থ, তার্কিকদের মতে আত্মারই বিশেষগুণ, আমাদের জীবনে অত্যন্ত প্রবলভাবে আমাদের কর্মকে, জীবনকে, চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে তার নাম সংস্কার বা বাসনা বা ভাবনা বা জ্ঞানাশয়। অদৃষ্ট যেমন কর্মের আশয় বা কর্মাবশেষ, সংস্কার তেমনি জ্ঞানের আশয় বা জ্ঞানের অবশেষ। অদৃষ্ট হল কর্মজন্য (কর্মজনিত) সুখদুঃখ ভোগের হেতু। কিন্তু সংস্কার জ্ঞানজন্য (জ্ঞানজনিত) স্মৃতির হেতু। তাছাড়াও প্রত্যভিজ্ঞা, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি নানা প্রবণতারও হেতু। মনে রাখতে হবে 'সংস্কার' শব্দ দার্শনিকগণের পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত এবং ধর্মশাস্ত্রোক্ত 'দশবিধ সংস্কার' থেকে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ পদার্থ।

কেবলমাত্র সংস্কার থেকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জনিত না হয়ে সংস্কার দ্বারা জন্মায় যে জ্ঞান তাই স্মৃতি। যেমন চক্ষু মুদ্রিত করেও কোনও বন্ধুর কথা স্মরণ করা। কিন্তু সেই বন্ধুই যদি সহসা এসে উপস্থিত হয়, এবং তখন পূর্ব সংস্কার এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় দুইয়ের দ্বারাই যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় 'এই তো আমার বন্ধু শ্যাম' — এই জ্ঞানের নাম প্রত্যভিজ্ঞা। আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে স্মৃতির ন্যায় প্রত্যভিজ্ঞারও পদে পদেই প্রয়োজন হয়ে থাকে। শাস্ত্রীয় কর্মকাণ্ডেও পদে পদেই শাস্ত্রের বাক্য ও তার অর্থকে স্মরণ করা হয়। পূর্বে দৃষ্ট তিল তুলসী ও হরিতকীকে প্রত্যভিজ্ঞা করে পূজা অর্চনা করতে হয়।

আবার আমাদের বস্তু বা ব্যক্তি-বিশেষের উপর রাগ (অনুরাগ) দ্বেষও এই সংস্কার থেকেই উৎপন্ন হয়। পাতঞ্জল যোগসূত্রে বলা হয়েছে 'সুখানুশয়ী রাগঃ' এবং 'দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ'। অর্থাৎ কোনও বস্তু বা ব্যক্তি থেকে সুখ পেলে পুনরায় সেরূপ সুখ পাবার আকাঙ্ক্ষায় সে বস্তু বা ব্যক্তিকে পাবার যে আকাঙ্ক্ষা তাই রাগ, অনুরাগ বা আসক্তি। তেমনি কোনও বস্তু বা ব্যক্তি থেকে দুঃখ প্রাপ্ত হলে, সে বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি যে বিতৃষ্ণা বা পরিহারেচ্ছা জন্মে তাই দ্বেষ বা বিদ্বেষ। এইরূপে সংস্কারের বহুবিধ কার্য দৃষ্ট হয়।

আবার কর্ম বা অদৃষ্টের ফলে যে সব সুখ ও দুঃখের ভোগ হয় সেস্থলে সেই ভোগের অনুকূল বাসনার আনুকূল্য প্রয়োজন হয়। কর্মের ফল সুখ দুঃখাদির ভোগকালে সেই ভোগের অনুকূল বাসনা অর্থাৎ সংস্কারেরও অভিব্যক্তি হয়ে থাকে।[২১] নতুবা সে ভোগ সম্ভব হয় না। এজন্য সংস্কারেব পার্থক্যহেতু একই গ্রন্থপাঠে বা নাটকদর্শনে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন উপভোগ হয়ে থাকে। যেটা একজনের নিকট অত্যন্ত সুন্দর ও আনন্দজনকরূপে উপভোগ্য হয়, তা-ই অপরের ভাল লাগে না।

এ প্রসঙ্গে উপনিষদের কাহিনীটি স্মরণীয়। দেবতাগণ, মনুষ্যগণ ও অসুরগণ উপদেশ প্রার্থী হয়ে প্রজাপতির নিকট গমন করলে প্রজাপতি সবাইকে একই উপদেশ প্রদান করলেন, 'দ দ দ' ইতি।[২২] কিন্তু মানসিক অবস্থা ও সংস্কার অনুসারে দেবগণ ভিন্ন অর্থ, মনুষ্যগণ ভিন্ন অর্থ এবং অসুরগণ ভিন্ন অর্থ বুঝে নিল। দেবগণ স্বভাবত সুখী ও ভোগপরায়ণ। তাই তাঁরা অর্থ বুঝলেন যে প্রজাপতি তাঁদের 'দম' বলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম করতে উপদেশ দিলেন। মনুষ্যগণ স্বভাবত স্বার্থপর, কৃপণ। তাই তাঁরা অর্থ বুঝলেন যে প্রজাপতি তাঁদের 'দত্ত' (দান কর) বলে দানশীল হতে উপদেশ দিলেন। অসুরগণ স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, তাই উপদেশপ্রার্থী তারা বুঝল প্রজাপতি তাদের 'দয়স্ব' বলে দয়াশীল হতে উপদেশ দিলেন। এইরূপ মানসিক শিক্ষা, অবস্থা ও সংস্কার ভেদে অর্থবোধও ভিন্ন প্রকারের হয়। এ স্থলে সকলের প্রতি শ্রুতির (বৃহদারণ্যকের) উপদেশ হল 'তদেতৎ ত্রয়ং শিক্ষেদ্ দমং দানং দয়ামিতি'। অর্থাৎ সকলেই দম, দান, দয়া এই তিনটি শিক্ষা করবে। এটিই ধর্মনীতির মূল উপদেশ। বস্তুর উপভোগও নিশ্চয়ই

ভিন্ন প্রকারের হয়। ভোগ বা উপভোগে সংস্কারের অনুকূলতা অপরিহার্য। 'শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্।' একটি কুকুরকে যদি রাজা করে সিংহাসনে বসানো যায়, তবে সে কি জুতা দেখলেই জুতা কামড়াতে দৌড়াবে না? সংস্কার বশে নিশ্চয়ই দৌড়াবে।

টীকা ও তথ্যপঞ্জী

১। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা - ১

২। তৈত্তিরীয় আরণ্যক

৩। বৃহদারণ্যক - ১/৪/১১

৪। ছান্দোগ্য - ৮/৪/১

৫। মনুসংহিতা - ৮/১৫

৬। 'চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ' - জৈমিনি সূত্র।

৭। প্রশস্তপাদভাষ্য - ৬৫৯ পৃঃ (বারাণসী সংস্কৃত বিঃ বিঃ সং)

৮। মনুসংহিতা

৯। মনুসংহিতা - ৬/১২

১০। প্রশস্তপাদভাষ্য - পৃঃ ৬৬৫ (বারাণসী সংস্কৃত বিঃ বিঃ) 'অপ্রমাদ' অর্থ - নিষ্ঠাযুক্ত হয়ে প্রাত্যহিক কর্তব্য সম্পাদন।

১১। মনুসংহিতা - ২/২০

১২। মনুসংহিতা - ৩/৬৯-৭০

১৩। ব্রহ্মসূত্র - ২/৩/৩৩

১৪। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ - ৪/৪/৫

১৫। গীতা - ১৮/১২

১৬। তত্ত্ববৈশারদী - ২/১৩

১৭। ছান্দোগ্যোপনিষৎ - 'তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেথে সম্পৎস্যে।' ৬/১৪/২

১৮। মুণ্ডক - 'তস্মাদ-আত্মজ্ঞ-হ্যর্চয়েদ-ভূতিকামঃ।' - ৩/১/১০

১৯। গীতা ৪/৩৯ - জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মাণি ভস্মাসাৎ কুরুতে তথা।

২০। বিবেক চূড়ামণি

২১। যোগসূত্র - ৪/৮

২২। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ - ৫/১-৩

পরমপুরুষার্থ মোক্ষ

তারা চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় দর্শনে মোক্ষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আস্তিকদর্শনের প্রারম্ভেই প্রস্তাব থাকে যে মোক্ষলাভই তাঁদের দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। দয়াকৃষ্ণ অবশ্য দেখিয়েছেন যে মোক্ষলাভকে উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করাটা ভারতীয় শৈলীগত চিরন্তন প্রথা — দর্শনের প্রকৃত বিষয়বস্তুর সঙ্গে মোক্ষের কোনও আবশ্যিক সম্বন্ধ নাও থাকতে পারে। যেমন আমরা ন্যায়, মীমাংসা ইত্যাদি দর্শনে দেখি। তিনি আরও বলছেন যে শুধু দর্শনে নয়, অন্যান্য আলোচনাতেও মোক্ষকে চরম লভ্য বলে স্থাপনা করা হত। তিনি বাক্যপদীয়, সঙ্গীত রত্নাকর, সুশ্রুত সংহিতা ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করবার জন্য।[১] তাঁর উদ্ধৃতিগুলি থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে মোক্ষচিন্তা শুধু দর্শনের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে নি, শিল্পে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, সাধু-সন্তদের জীবনে এমন কি সাধারণ লোকের জীবনেও প্রভাব বিস্তার করেছে। আর বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিগূঢ় সম্বন্ধ থাক বা না থাক, আস্তিক নাস্তিক নির্বিশেষে প্রায় সমস্ত দর্শন মোক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য রেখেছে এবং কমবেশী আলোচনা করেছে। ভারতীয় দার্শনিকরা আধুনিক কালেও মোক্ষ প্রসঙ্গে নিজেদের মতামত রেখেছেন। এখনকার দিনে, চিন্তার ক্ষেত্রে দেশগত প্রাকার ধ্বংস হবার দরুণ আমরা অনেকেই আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধ্যানধারণাগুলি যাচিয়ে দেখতে চেষ্টা করি। সেই প্রেক্ষিতে মোক্ষের আলোচনা করবার অবকাশ আছে বলে মনে করি।

আমরা দেখি যে অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে দর্শনগুলি পৃথক পৃথক মত পোষণ করলেও, মোক্ষের ব্যাখ্যায় তাদের মধ্যে কিছু মৌল সাদৃশ্য আছে। সেই মূল ধারণাটিকে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। মোক্ষ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল মুক্তি। সাধারণ মানুষের কাছে মুক্তির আকর্ষণ অনস্বীকার্য। এখানে প্রশ্ন হল যে কোন বন্ধন থেকে মুক্তির আস্বাদ দিয়ে মোক্ষ পরম পুরুষার্থ বলে প্রতিভাত হচ্ছে? রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে মোক্ষ শব্দটির অর্থ হল জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ থেকে মুক্তি, দুঃখ থেকে মুক্তি, কর্ম থেকে মুক্তি, ঈপ্সিত বিষয়ে আসক্তি থেকে মুক্তি, আত্মা-অনাত্মার বিবেকজ্ঞান, অনন্ত শান্তি, ঈশ্বরের নৈকট্য, ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা, ইত্যাদি।[২] এর শেষ তিনটি শর্ত বিশেষ বিশেষ দর্শন মাত্র গ্রহণ করে, যেমন রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতে ঈশ্বরের সাযুজ্য, সালোক্য, সামীপ্য ইত্যাদির কথা আছে। কিন্তু প্রাথমিক শর্তগুলি প্রায় সব দর্শনই স্বীকার করেন।

তার মধ্যে মূল ধারণাটি হল দুঃখের হাত থেকে মুক্তি। পুরুষার্থ কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল সেই বিষয় যাকে পুরুষ প্রার্থনা বা কামনা করে। মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই দুঃখের থেকে নিস্তার চায়। মোক্ষে ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখনিষেধ হয় অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে ও সম্পূর্ণ ভাবে চিরকালের জন্য দুঃখের বিনাশ ঘটে। সুতরাং মানুষের কাছে মোক্ষ চরম ও পরম পুরুষার্থ।

মোক্ষ বলতে সাধারণত কি বোঝা হয় তার একটা প্রাথমিক বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। এখানে গোড়ার কথা হল জীবন দুঃখময়। এই দুঃখের মূলে আছে আমাদের আত্মা সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা — অবিদ্যা বা অজ্ঞান। আমরা লৌকিক ভাবে মনে করি যে দেহধারী সামাজিক ব্যক্তিই আত্মা, সুতরাং জৈব দেহ, চরিত্র ও সামাজিক অবস্থাগত অসংখ্য কামনা বাসনা আমাদের অনন্ত দুঃখের কারণ হয়। পুরুষ এক জন্ম থেকে অন্য জন্মে, স্থূল দেহ বিনষ্ট হলে সূক্ষ্ম দেহ আশ্রয় করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কামনা তথা দুঃখের বোঝা বহন করে চলেছে। পুরুষের আত্মজ্ঞান হলে এই প্রবাহ শেষ হয় ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট দুঃখ, কামনা ইত্যাদি সব ধ্বংস হয়। প্রাচীন সমস্ত দর্শন মনে করে যে আমাদের আত্মা সম্বন্ধে সাধারণ প্রচলিত ধারণাটি ব্যবহারানুগুণ হলেও ভ্রমাত্মক — এমন কি নৈরাত্ম্যবাদী বৌদ্ধও ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীনেরা বলেন যে মোক্ষ হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞান। এঁরা সকলেই দাবী করতে পারেন যে চরম তত্ত্বজ্ঞান রূপেই মোক্ষ পরম পুরুষার্থ। সে ক্ষেত্রে সমগ্র দর্শনের আলোচনা ব্যতিরেকে মোক্ষের আলোচনার আর অবকাশ থাকে না। আমরা কিন্তু এই প্রবন্ধে মোক্ষকে মানব জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষিত মূল্য রূপেই বোঝবার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হল জীবন দুঃখময় কি না, দুঃখনিষেধ পরম মূল্যবান কি না, পুরাতন ধারণার সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করে, মোক্ষকে নতুন করে বোঝা সম্ভব কি না — ইত্যাদি। এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে মোক্ষের স্বরূপ আমি আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি।

এখানে আরও লক্ষণীয় এই যে মোক্ষ শব্দটির বিভিন্ন পর্যায়শব্দ দর্শন সাহিত্যে প্রচলিত আছে — যথা অপবর্গ, কৈবল্য, নির্বাণ, নিঃশ্রেয়স, ইত্যাদি। এর অনেকগুলিই নিষেধাত্মক, যেমন অপবর্গের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল দুঃখাদির বর্জন, বা কৈবল্য হল আত্মার অনাত্মা থেকে সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত অবস্থা বা নির্বাণ মানে নিভে যাওয়া, ইত্যাদি। আমরা দেখতে চাইছি মোক্ষকে নিশ্চিতরূপে শ্রেয় বা পরম মূল্যবানরূপে।

এক

প্রচলিত মূল্যগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করে এদের চতুর্বর্গ আখ্যা দেওয়া হয়। দর্শনের পরিভাষায় এইগুলি প্রয়োজন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলছেন যে যার দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে

জীব কর্মে প্রযুক্ত হয় তাই প্রয়োজন। ন্যায়মতে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তিতে পুরুষের মুখ্য প্রয়োজন বা স্বত প্রয়োজন, তার উপায়গুলি গৌণ প্রয়োজন। কিন্তু উদ্দ্যোতকর বলছেন যে কেহ কেহ ধর্মার্থকামমোক্ষকেও প্রয়োজন বলেন।[৩] এই প্রয়োজনকে অধিকার করেই জীব কর্মে প্রবৃত্ত হয়। বেদান্ত পরিভাষাতে আমরা সামান্য একটু অন্যরকম ব্যাখ্যা পাই। প্রয়োজন হল সেই পদার্থ যা অবগত হলে তাকে আমরা নিজের করে পেতে চাই — স্ববৃত্তিতয়া ইষ্যতে। ন্যায়ের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি এখানেও দর্শিত হয় — সুখ ও দুঃখাভাব মুখ্য প্রয়োজন, কারও কারও মতে ধর্মার্থকামমোক্ষ প্রয়োজন, আর মোক্ষই পরম পুরুষার্থ।[৪]

পুরুষের সকল ঈপ্সিত বিষয়কে চতুর্বর্গে ভাগ করায় লোকযাত্রা নির্বাহে প্রায়োগিক সুবিধা হয়। সুখ ও দুঃখাভাবের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের জন্যই এইগুলিকে পুরুষার্থ বলা হয়। মোক্ষ পুরুষার্থ, কারণ মোক্ষলাভ করলে ভবিষ্যতের সমস্ত দুঃখের সম্পূর্ণ নিরশন হয়। কাম শব্দটি দ্ব্যর্থক ঃ কাম বলতে মানুষের কামনা-বাসনা এবং কামনার বিষয় উভয়ই সূচিত হয়। 'ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি' উক্তিটিতে প্রথম কামটি পুরুষের কামনা-বাসনা ও দ্বিতীয়টি কাম্য বস্তুকে বোঝায়। সাধারণত কাম শব্দেব দ্বারা স্ত্রীপুরুষের মিলনসুখ ও সংশ্লিষ্ট সুখাদি ব্যক্ত হলেও, প্রসারিত অর্থে পুরুষের সমস্ত দেহগত জৈব সুখাদি বোঝায়। কাম সুখস্বরূপ — জৈব আকাঙক্ষা চরিতার্থ হলে যে সুখভোগ হয় তাই কাম। তাই কাম স্বতমূল্যবান ও মুখ্য পুরুষার্থ। এর প্রতিতুলনায় অর্থ গৌণ পুরুষার্থ কারণ তা কাম (ও কোনও কোনও ব্যাখ্যায় ধর্ম) লাভ করবার উপায় মাত্র। অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি ব্যতিরেকে কেহ অর্থকে স্বত মূল্যবান মনে করে না। এই নিরিখে ধর্মও গৌণ পুরুষার্থ — সুখসৃষ্টির উপাযমাত্র। মীমাংসা মতে ধর্ম সুদূর ভবিষ্যতে ফল প্রদান করে।

এখানে আমরা দেখি যে চতুর্বর্গকে পুরুষার্থ আখ্যা দেওয়া হয় কারণ সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহারের মৌল ইচ্ছা এরা পূর্ণ করে। কিন্তু এই সাদৃশ্য বাহ্য। যে পুরুষ কাম ও অর্থ — জৈব ও অর্থনৈতিক মূল্য প্রার্থনা করে সে সমাজে অবস্থিত প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত পুরুষ — প্রকৃতি ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারা তার জীবন রচিত। ধর্ম বা নৈতিক মূল্যও এই জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু মোক্ষ এই ত্রিবর্গ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ত্রিবর্গ সাময়িক ভাবে পুরুষের ইচ্ছা পূর্ণ করে কিন্তু মোক্ষ কামনা-বাসনারই উচ্ছেদ সাধন করে এবং তার সাথে প্রাকৃত পুরুষের ব্যক্তিত্বের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করে। মোক্ষ মানে অবিমিশ্র সুখোপভোগ নয়, (যদিও সাধারণ মানুষের মনে এমন একটা ধারণা থাকতে পারে)। মোক্ষে সমস্ত আকাঙক্ষা চরিতার্থ হয় না, স্বর্গে এইরকম জীবনের আস্বাদ পাওয়া যেতে পারে, যদি স্বর্গ বলে কিছু থাকে, কিন্তু মোক্ষের সঙ্গে সেই স্বর্গের আকাশ পাতাল প্রভেদ। ত্রিবর্গ কামনার পরিতৃপ্তিজনিত সুখসৃষ্টি করে ও কামনাজনিত দুঃখ নাশ

করে। কিন্তু মোক্ষ নির্বাসনা অবস্থা — সেখানে সমস্ত কামনা-বাসনার মূলোচ্ছেদ ঘটে সুতরাং বাসনার তৃপ্তিজনিত সুখও নেই, অতৃপ্তিজনিত দুঃখও নেই। যে সমস্ত আনন্দমোক্ষবাদীরা মনে করেন যে মোক্ষ এক অনাবিল আনন্দময় অবস্থা, তাঁরাও বলেন যে আনন্দ আর সুখ এক নয়, আনন্দ কোনও কামনার চরিতার্থতা নয় — এটি তত্ত্বানুভূতিরূপ পরিপূর্ণতাবোধ। এই বোধের মূলেও ব্যক্তিবোধকে অজ্ঞানপ্রসূত মনে করা হয়। এখানে দয়াকৃষ্ণের একটি সিদ্ধান্ত প্রাসঙ্গিক মনে হয়। তিনি ত্রিবর্গের সঙ্গে মোক্ষের মূলগত প্রভেদ প্রতিপাদন করেন। তাঁর মতে ত্রিবর্গের সঙ্গে চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষের সংযুক্তি 'is not a fulfilment of the original three, but ultimately their denial or negation'[৫]

এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রাচীনদের মধ্যেও বর্তমান ছিল, তাঁরা প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গের মধ্যে কোনও যোগসূত্র দেখেন নি। রামায়ণ মহাভারতে অনেক স্থানেই শুধুমাত্র ত্রিবর্গের উল্লেখ আছে। রামায়ণের প্রারম্ভেই লবকুশ ধর্মার্থকাম বিবর্ধনের জন্য রামায়ণ গান করছেন। মহাভারতে কোনও কোন স্থানে তিনটি পুরুষার্থকেই সমান মূল্য দেওয়া হচ্ছে। সভাপর্বে নারদ যুধিষ্ঠির সংবাদে নারদ যুধিষ্ঠিরকে কালজ্ঞ বলে সম্বোধন করে বলছেন যে তিনি আশা করেন যে যুধিষ্ঠির ধর্ম অর্থ কামকে সমভাবে কাল বিভাজন করে সেবা করবেন। তিনি মনে করেন যে যুধিষ্ঠির কখনও অর্থের জন্য ধর্মকে, বা ধর্মের জন্য অর্থকে, বা ধর্মার্থের জন্য কামকে অবহেলা করবেন না।[৬] মহাভারতে অনেক সময়ে পাণ্ডবদের ত্রিবর্গজ্ঞ বলেও অভিহিত করা হয়। হতে পারে যে মোক্ষের ধারণা আরও পরে পরিণতি লাভ করে, কিন্তু এমনও হতে পারে যে মোক্ষ ভিন্ন বর্গের বলে — ত্রিবর্গে বৈরাগ্য বোধ না এলে মুমুক্ষা জাগে না বলে একই সঙ্গে তাদের আলোচনা হত না — এই ব্যাখ্যা দয়াকৃষ্ণের মতের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে।

তবে, একটি সূক্ষ্ম পার্থক্যের কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। আমরা পুরুষার্থকে ব্যাখ্যা করেছি পুরুষ যা প্রার্থনা করে তাই বলে। কিন্তু মূল্যের আলোচনাতে যা আকাঙ্ক্ষা করা হয় ও যা আকাঙ্ক্ষা করা উচিত — তার মধ্যে পার্থক্য করা কর্তব্য। প্রাচীন চিন্তায় সর্বত্র এই ভেদ সচেতন ভাবে অনুসৃত না হলেও, প্রেয় ও শ্রেয়ের মধ্যে ভেদ স্বীকৃত হয়েছে। যেমন দেখি স্বাভাবিক ভাবে প্রার্থিত মূল্য প্রার্থনীয় হয়ে ওঠে ধর্মানুগত হলে — ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ। ধর্মনিয়ন্ত্রিত কাম ও অর্থ মূল্যবান। প্রকৃতি-প্রসূত মূল্য অহংকেন্দ্রিক ব্যক্তির পরিপুষ্টি যোগায়, কিন্তু ধর্মনিয়ন্ত্রিত মূল্য অন্যবর্গের হতে পারে এবং তখন তারা মোক্ষের সঙ্গে সুসংগত কি না তা বিচার্য। সুতরাং দয়াকৃষ্ণের উক্তি আপাতদৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য হলেও এই প্রসঙ্গে শেষ সিদ্ধান্ত না-ও হতে পারে।

এই আলোচনাতে আমি মোক্ষ সম্পর্কে বলেছি যে মোক্ষ অন্য সব পুরুষার্থ থেকে পৃথক কারণ এটি নির্বাসনা অবস্থা; আমি আরও বলেছি যে মোক্ষে অহংকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের

বিনাশ ঘটে। এই দুটি বক্তব্যেরই আরও বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। তবে এই দুটি শর্ত সাময়িক ভাবে মেনে নিয়ে, আমি বলে রাখতে চাই যে আমার সিদ্ধান্ত রাজেন্দ্র প্রসাদের একটি মতের বিরোধী। তিনি পুরুষার্থের আলোচনায় ত্রিবর্গের সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন ও সুযুক্তি সহকারে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে পুরুষার্থগুলি সামাজিক ও ক্রিয়ামূলক। তাঁর মতে অর্থ কামের উপায় ও কাম ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মূল্য, ধর্ম সামাজিক মূল্য সুতরাং অন্য দুটিও তাই। ধর্মকে সামাজিক বলবার কারণ হল যে আমাদের নৈতিক কর্তব্যগুলি সমাজের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ধর্মাচরণই সমাজকে বিধৃত রাখে ও তার সাম্যাবস্থার মূলে আছে। তাঁর এই মত আংশিক ভাবে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। ধর্মের সম্পূর্ণ সামাজিক ব্যাখ্যা নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করা যায় না। তিনি আরও বলেন যে প্রথম ত্রিবর্গ সামাজিক ও মোক্ষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক; তাঁর মতে যদিও কেহ কেহ বলেন যে মোক্ষে ব্যক্তিত্বের বিনাশ ঘটে — এই ধারণা ভুল। এইখানে আমি তাঁর সঙ্গে দ্বিমত। তিনি বলেন যে মোক্ষকে চতুর্থ পুরুষার্থ না বলে তাকে কামের অন্তর্গত মনে করা উচিত।[৭] আমি মনে করি যে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বিভ্রান্তিজনক। কাম পুরুষের জৈব কামনা-বাসনার পরিপূর্তিজনিত তৃপ্তিস্বরূপ। তাঁর নিজেরই ভাষায় 'it is a categorial representation or hypostatization of a man's appetitive life'।[৮] কিন্তু মোক্ষদৃষ্টিতে বাসনা বন্ধনস্বরূপ, কামনা দুঃখের আকর, অনিত্য বিষয়তৃষ্ণা অতিক্রম করতে না পারলে মোক্ষ অসম্ভব। মোক্ষকে আমরা আদৌ পুরুষার্থ বলে স্বীকার করব কি না, সেটি একটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন — কিন্তু মোক্ষের ধারণা যে প্রচলিত ত্রিবর্গ থেকে অত্যন্ত ভিন্ন তা অনস্বীকার্য।

ত্রিবর্গের আলোচনা শেষ করবার আগে ধর্ম ও মোক্ষের পারস্পরিক সম্বন্ধ আরেকটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রাচীন চিন্তায় ধর্মের সংজ্ঞা অস্পষ্ট ও বিস্তার বিশাল। মীমাংসোক্ত ধর্মের লক্ষণ চোদনালক্ষণ অর্থ। চোদনা বা প্রবর্তক বিধিবাক্য যার লক্ষণ তাই ধর্ম। এই ধর্ম ভাট্টমতে বিহিত যাগাদি কর্ম, প্রাভাকর মতে অপূর্ব। ন্যায়মতে এটি বিহিত কর্মানুষ্ঠান থেকে উৎপন্ন গুণবিশেষ। অর্থাৎ ধর্ম সঠিক কি এই প্রসঙ্গে মতবিভেদ প্রচুর, কিন্তু শ্রুতির বিধিনিষেধ সম্মত আচরণ এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। আবার মন্বাদি রচিত স্মৃতির অন্তর্গত নৈতিক নিয়মাদি তথা সমাজে প্রচলিত নীতি নিয়মাদিও ধর্ম। শিষ্টাচরণও ধর্ম বলে গণ্য হয়েছে — মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। মনুর মতে সংশয়কালে স্বীয় বিবেকের নির্দেশই ধর্ম।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে বেদবিহিত কর্মাদি থেকে শুরু করে অজস্র নীতি-নিয়ম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন নীতিকে সামান্যধর্ম বলা হয় — মনুষ্যমাত্রেরই এইগুলি পালনীয়, যথা সত্য, অহিংসা, অচৌর্য, আর্তের রক্ষণ ইত্যাদি। বিভিন্ন মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ এইগুলির দ্বারা সুসংহত হয়। এই নীতিগুলি সামাজিক। কেহ অবশ্য বলতে

পারেন যে সামান্যধর্ম আচরণের দ্বারা পুরুষের নিজের ব্যক্তিত্বের উন্নতিসাধন হয়, সমাজের মঙ্গল এখানে গৌণ। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, যে পুরুষের উন্নতিসাধন হচ্ছে, তিনি সামাজিক পুরুষ। মহাভারতে অসংখ্য কথায়-উপকথায় এই ধর্মগুলি চিত্রায়িত হয়েছে এবং তাদের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হয়েছে। এইরকম কোন কোন নীতিকে বিশেষধর্ম বলে, যেখানে পুরুষকে কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মনে করে সেই অবচ্ছেদে কর্তব্য নিরূপিত হয়। এই ভাবে, বর্ণধর্ম, কুলধর্ম বা আশ্রমধর্ম এসেছে। আবার পুরুষকে সমাজের এবং প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে দেখে, কিছু ঋণের ধারণা করা হয়েছে যে সব ঋণ পরিশোধরূপ ধর্মাচরণের মধ্যে দিয়ে সমাজ ও প্রকৃতির মঙ্গল সাধন হবে। এইগুলি দেবগণের নিকট দেবঋণ, পূর্বপুরুষের নিকট পিতৃঋণ অন্য সমকালীন মানুষের নিকট নৃঋণ, পূর্বগামী বিজ্ঞজনের নিকট ঋষিঋণ ও অন্য প্রাণীগণের নিকট পশুঋণ। মানুষ এখানে সর্বতোভাবে সামাজিক প্রাকৃত পুরুষ।

মোক্ষের প্রসঙ্গে ধর্মের আলোচনা আমরা তিনটি বিকল্পে করতে পারি —

(ক) ধর্মাচরণের দ্বারা পুরুষ কিছু ফললাভ করে
(খ) ধর্ম স্বত মূল্যবান
(গ) ধর্ম মোক্ষলাভের আবশ্যিক শর্ত

(ক) বৈদিক বিধিনিষেধ সংশ্লিষ্ট ধর্মগুলির অনেক শ্রেণীবিভাগ আছে, যথা নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম, কাম্যকর্ম, ইত্যাদি। এর মধ্যে শেষোক্তটি স্পষ্টতই কামনাপ্রসূত। কিন্তু অন্যগুলির পশ্চাতেও কামনা থাকে। যেমন মনু বলছেন যে শ্রুতি ও স্মৃতি উপদিষ্ট কর্ম সকলের অনুষ্ঠান করলে ইহলোকে কীর্তিলাভ হয় ও পরলোকে সুখপ্রাপ্তি হয়। বা গৌতম বলছেন যে ইহজন্মের ধর্মাচরণ পরজন্মের জাতি, কুল, রূপ, আয়ু, বৃত্তি, বিত্ত, সুখ, মেধা ইত্যাদি নির্ধারণ করে। কেহ বলতে পারেন যে নিত্যকর্ম অন্য বর্গের, কারণ ঐ ধর্মাচরণের দ্বারা কোন বাড়তি ফল লাভ হয় না। কিন্তু এই দাবী গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ নিত্যকর্ম আচরণ না করলে প্রত্যবায় ও তজ্জনিত পাপের ভয় থাকে। সুতরাং ধর্মাচরণ মাত্রকেই ফলাভিমুখ বলা চলে।

এইপ্রকার ধর্মকে মোক্ষের অনুমত কখনও বলা চলে না। প্রাকৃত পুরুষ যে ভঙ্গী নিয়ে অর্থ ও কাম যাচ্ঞা করে, সেই দৃষ্টিতেই ধর্মাচরণ করে। পুরুষার্থ এখানে অহংসর্বস্ব ব্যক্তির কামনার বিষয়। এই ব্যাখ্যায় দয়াকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় — মোক্ষ এইরূপ ধর্মের বিরোধী ও ত্রিবর্গ বিনষ্ট হলেই মোক্ষ সম্ভবপর হয়। ত্রিবর্গ পরস্পর সুসংবদ্ধ হলেও, তারাই স্বয়ংসম্পূর্ণ, মোক্ষ এদের থেকে গুণগতভাবে পৃথক।

(খ) প্রাভাকরদের এই মতানুবলম্বী বলা হয়, কারণ বিধিনিষেধগুলি এই দর্শনে

স্বতপ্রমা। কিন্তু বিধিগুলিকে তখনই ধর্ম বলা হয় যখন তারা সুখের অনধিক দুঃখ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ধর্ম এখানেও সুখের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ফলের সঙ্গে সম্বন্ধটি ধর্মের অর্ন্তনিহিত অংশ। এ ছাড়া ধর্ম এখানে চরম পুরুষার্থ, রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভাষায় — 'Dharmic life is an end in itself'।[৯]

কদাচিৎ ধর্মকে স্বত মূল্যবান মনে করা হয়। মহাভারতে বনপর্বে যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদী সংবাদে যুধিষ্ঠির বলছেন যে ফলকামনায় যাঁরা ধর্মাচরণ করেন, তাঁরা ধর্মবাণিজ্যক। তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন যে তিনি যজ্ঞ করেন বা দান করেন শুধু কর্তব্যবুদ্ধিতে।[১০] দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিকল্পটি সেই ভাবে আলোচিত হয় নি। এটি আলোচিত হলে, এটি পরমপুরুষার্থ হয়ে উঠত ও মোক্ষালোচনার অবকাশ থাকত কি না সন্দেহ।

(গ) ধর্মকে মোক্ষলাভের আবশ্যিক শর্ত বলা হচ্ছে যোগে। অন্যান্যরাও মানবেন যে মোক্ষলাভের জন্য মানসিক পবিত্রতা প্রয়োজন যা ধর্মাচরণের দ্বারা লভ্য। অষ্টাঙ্গিক যোগের শেষ ধাপটি সমাধি বা মোক্ষ। প্রথম দুটি ধাপ — যমনিয়মের মধ্যে নৈতিক ধর্মগুলি এসে যায়। অদ্বৈতবেদান্তে কর্মমীমাংসা বিহিত ধর্ম ও জ্ঞানরূপ মোক্ষের মধ্যে অত্যন্তবিরোধ স্বীকৃত হয়। শঙ্কর দেখিয়েছেন যে ধর্ম মোক্ষের শর্ত হতে পারে না। কিন্তু যে সাধন চতুষ্টয় বেদান্তপাঠের আবশ্যিক শর্ত বলে গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে শমদমাদি সাধন সম্পদ বা বিভিন্ন নৈতিকগুণ আছে যাদের ধর্মের অন্তর্গত বলছি।

অর্থাৎ ধর্মকে অন্তত দুইভাবে দেখা হয়েছে। এক দৃষ্টিতে ধর্ম, অর্থ ও কাম পরস্পরসদৃশ ফলাভিমুখ তারা সমাজস্থিত প্রাকৃত পুরুষকে পুষ্ট করে। অন্য দৃষ্টিতে ধর্ম মোক্ষানুগ অহংকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব নাশ করে পুরুষকে মোক্ষাভিমুখ করে তোলে। এই আলোচনাতে আবার ফিরে আসব।

দুই

ভারতের দর্শন সাহিত্যে জীবনের দুঃখময়তা স্থাপন করবার প্রচেষ্টা সর্বত্র দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধদর্শনের মূলে আছে চারটি আর্যসত্য, যার প্রথমটিই হল দুঃখসত্য — জীবন দুঃখময়। বুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে সদ্যবিগত অতীত পর্য্যন্ত এই ধারা অটুট ছিল। তিলক তাঁর গীতারহস্যে শোপেনহাওয়ারের দেওয়া একটা যুক্তির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন যে সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা চরিতার্থ হলে সুখ হয়, কিন্তু ইচ্ছামাত্রই কষ্টদায়ক এবং আমাদের কিছু কিছু ইচ্ছা বিফল হবেই। অবস্থাটিকে আমরা যদি ভগ্নাংশের আকারে সাজাই তবে তার রূপ হবে সুখোপভোগ/সুখেচ্ছা, যেখানে বিভাজক সব সময় বিভাজ্যের চেয়ে বড় হবে, ভগ্নাংশটি ক্রমশঃ পূর্ণতার থেকে দূরে সরতে থাকবে অর্থাৎ সিদ্ধান্ত

হবে যে জীবনে সুখের চাইতে দুঃখ অধিক[১১] বা মহাভারতের ভাষায় 'সুখাদ্ বহুতরং দুঃখং জীবিতে নাস্তি সংশয়ঃ'। এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য না মনে হতে পারে, শুধু সফল ও বিফল ইচ্ছাকে তুলনা করলে হয়ত সঠিক চিত্রটি ধরা যেত। কিন্তু জীবনে দুঃখাধিক্য প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি বলতে চাই যে এই প্রবণতার পশ্চাৎপটে মোক্ষকে বুঝতে হবে।

আস্তিক নাস্তিক নির্বিচারে, একমাত্র চার্বাক ও প্রাচীন মীমাংসা ব্যতিরেকে, আর সকলেই বলছেন যে মোক্ষে দুঃখের মূলোচ্ছেদ ঘটে। প্রাত্যহিক জীবনে দুঃখবিনাশের প্রয়াস কখন কখন বিফল হতে পারে, কিন্তু মোক্ষে দুঃখের আবশ্যিক বিনাশ হয় — এটি ঐকান্তিক দুঃখনিষেধ। সংসারে দুঃখ রক্তবীজের মতন — একটি দুঃখ ধ্বংস হলে অন্য দুঃখ প্রকটিত হয়, কিন্তু মোক্ষে দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ ঘটে। মোক্ষ নিষেধমাত্র — এটি একটি অভাবাত্মক অবস্থা। (মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম আছে - যাদের কথায় পরে আসছি।) ন্যায় এই অভাবটির স্বভাব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন।[১২] মোক্ষে পুরুষ দুঃখ থেকে অত্যন্ত বিমুক্ত হয়, কিন্তু এটি অত্যন্তাভাব নয়, কারণ অত্যন্তাভাব নিত্য, সুতরাং সাধ্য নয়। এটি ভবিষ্যতের সমস্ত দুঃখের নিষেধ কিন্তু প্রাগভাব নয়, কারণ প্রাগভাব প্রতিযোগীর জনক হয়, অথচ মোক্ষে অতীত ও ভবিষ্যতের দুঃখ ও দুঃখের সম্ভাবনাও বিনষ্ট হয়। এইজন্য মীমাংসা একে পণ্ড প্রাগভাব বলেছেন। ন্যায় এটিকে দুঃখের ধ্বংসাভাব বলেন। সমস্ত পুরুষার্থেই দুঃখধ্বংস হয়, কিন্তু মোক্ষ অন্য পুরুষার্থগুলির থেকে গুণগতভাবে পৃথক, কারণ এটি চরম দুঃখধ্বংসরূপ, যে দুঃখধ্বংসের পর আর দুঃখ জন্মাবে না, ও দুঃখধ্বংসের অবকাশই থাকবে না।

এইখানে প্রশ্ন উঠে যে দুঃখসম্ভাবনার বিনাশ হয় কি করে? এই প্রসঙ্গে আমরা দেখি যে বিভিন্ন দর্শনগুলি আত্মার আধিবিদ্যক বিশ্লেষণ পৃথক দিচ্ছেন। কিন্তু ব্যাবহারিক ব্যক্তি আমি যে শেষ ব্যাখ্যায় মিথ্যা এই সিদ্ধান্তে তাঁরা সহমত। তাঁরা সবাই বলেন যে প্রাকৃত সামাজিক মানুষের সঙ্গে পুরুষের যে একাত্মবোধ তা ভ্রমাত্মক ও আমাদের সকল দুঃখের মূল কাবণ। এই একাত্মবোধ থেকে উৎসারিত কামনা-বাসনা রাগদ্বেষাদিই মানুষের বন্ধনস্বরূপ, ন্যায়বার্ত্তিকের ভাষায় রাগদ্বেষৌ হি বন্ধনমিতি। কিন্তু প্রাচীন দার্শনিকেরা কেহ ব্যক্তিত্বের প্রসারণ বা অহংকেন্দ্রিকতার অতিক্রমণ চান নি, তাঁরা চেয়েছেন ব্যক্তিত্বের পরিত্যক্তি ও বিনাশ। এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ব্যক্তিকেন্দ্রিক মূল্য ও অহংকেন্দ্রিক মূল্যের মধ্যে তফাৎ করেছেন, তাঁর মতে মোক্ষে ব্যক্তিত্ববোধ বিধৃত থাকে অহমিকার নাশ হয়, কারণ আত্মা বা ব্যক্তি বা পুরুষকেই আমরা মুক্ত বলি। তাঁর ব্যাখ্যানুসারে অহমের বিনাশ মানে মোক্ষে অবাঞ্ছিত, অমার্জিত, আপাতদৃষ্ট অহংকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে বা পরিশোধিত হয়ে বাঞ্ছিত, বিশুদ্ধ, পরিমার্জিত ব্যক্তিত্ব ভাসিত হয়।[১৩] আমার মনে হয় যে এইরকম মোক্ষই বাঞ্ছনীয় এবং যে সমস্ত মহাপুরুষেরা

মুক্ত বলে গণ্য হয়েছেন তাঁরাও এইরকমই ছিলেন, কিন্তু দর্শনে যে মোক্ষের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেটি অন্যরকমের এবং সেই লক্ষণ অনুসারে মোক্ষে ব্যক্তিত্বের বিনাশই ঘটে। আমরা মুক্ত আত্মার কথা দর্শনে পাই কিন্তু আত্মা ও ব্যক্তি সমার্থক নয়। আমার মনে হয় ব্যক্তিসত্তার বিনিময়ে পুরুষকে পরমপুরুষার্থ লাভ করতে হয়। ব্যাপারটি আরেকটু বিশদ করে বোঝা দরকার।

প্রাচীন চিন্তায় দুঃখকে অন্তত তিনভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত দুঃখকে ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের স্বরূপ নির্ধারণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে, যথা সাঙ্খ্যে। দ্বিতীয়ত পরস্পর বিরোধী সুখ ও দুঃখ দুটিই স্বীকার করে নিয়ে, সুখের দুঃখাত্মকতা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং জীবনের দুঃখেব আতিশয্য মূল সিদ্ধান্ত হয়, — এটি ন্যায়পক্ষ। তৃতীয়ত জীবনের প্রতিটি বিষয়কে অনিত্য তথা ক্ষণিক মনে করে এই অনিত্যতাকেই দুঃখের মূল কারণ মনে করা হয়। এটি বৌদ্ধমত। এই তিনটি বিকল্প ব্যাখ্যা করে, এই দার্শনিকেবা দুঃখোচ্ছেদের কি বিশ্লেষণ করেছেন সেটি বোঝা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিকল্পটি প্রথমে আলোচনা করা যেতে পারে। ন্যায় মোক্ষের অভাবাত্মক দিকটি গ্রহণ করেছেন। ন্যায়সূত্র জীবনে দুঃখাধিক্য স্থাপন করে মোক্ষকে দেখছেন দুঃখনিষেধ রূপে। ন্যায়ে দুঃখের আলোচনা ত্রিমুখী। প্রথমত তাঁরা স্বীকার করেছেন যে জীবনে সুখ ও দুঃখ উভয়ই আছে — জীবন মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্নের সহিত তুলনীয়। কিন্তু বিবেকহান সম্ভব নয় বলে, অর্থাৎ বিষটি ত্যাগ করে মধুটি মাত্র গ্রহণ করা অসম্ভব বলে মুমুক্ষু দুঃখ পরিহারের জন্য সুখ ত্যাগ করতেও রাজী হন।[১৪] দ্বিতীয়ত নৈয়ায়িক বলেন যে আমরা যদি সুখ ও দুঃখকে তৌলদণ্ডে স্থাপন করি, তবে দুঃখের দিকটি গুরুভার হবে, কারণ সুখমাত্রই দুঃখের সঙ্গে নিয়ত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। সুতরাং জীবনে দুঃখাধিক্য আছে। তৃতীয়ত ন্যায় বলছেন যে জীবন ব্যাপ্ত করে দুঃখ বিরাজ করে। বিষয়কে সুখসাধন মনে করে প্রার্থনা করলে হয় 'প্রার্থিত বস্তু সম্পন্ন হয় না, অথবা সম্পন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়, অথবা ন্যূন সম্পন্ন হয়, অথবা বহু বিঘ্নযুক্ত হইয়া সম্পন্ন হয়।'[১৫] অর্থাৎ ন্যায়ের বিচারে প্রতিটি বিকল্পেই দুঃখ জন্মায় — সুখের মধ্যেই প্রোথিত আছে দুঃখের বীজ। ন্যায় কিন্তু সর্বজন্তুপ্রত্যক্ষ সুখের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নি। তাঁদের শেষ সিদ্ধান্ত হল যে সুখ স্বরূপত দুঃখ নয় কিন্তু দুঃখের উপচারবশত দুঃখ। সুখের অভাববশত জন্ম দুঃখ নয়, কিন্তু দুঃখের অনুষঙ্গবশত দুঃখ।[১৬] আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সুখের দুঃখানুষক্তির একটি অদ্ভুত ব্যাখ্যা ন্যায়বার্তিকে পাওয়া যায়। এখানে বলা হচ্ছে যে অনুষঙ্গ মানে অবিনাভাব, এবং সুখ দুঃখের অবিনাভাব মানে যেখানে সুখ সেখানে দুঃখ ও যেখানে দুঃখ সেখানে সুখ।[১৭] এই ব্যাখ্যা ন্যায়সিদ্ধান্ত স্থাপনে সহায়তা করে না।

বরঞ্চ এই যুক্তি অবলম্বন করে প্রতিবাদী বলতে পারেন যে ন্যায়ের যুক্তি জীবনে দুঃখাধিক্য প্রমাণ করে না। আশাবাদী জীবনের উজ্জ্বল দিকটির দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারেন।

ন্যায় নিজেই বলেন যে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহারের দুটি মৌল ইচ্ছার দ্বারা মানুষ চালিত হয়। এখানে পুরুষ কেন তার স্বাভাবিক সুখেচ্ছা পরিহার করে সুখকে দুঃখানুষক্ত ভাববে তা ব্যাখ্যা করা ন্যায়ের দায়িত্ব। সুখদুঃখের অবিনাভাব থাকলে পরমপুরুষার্থ মোক্ষ কেন অবিনাভাবের একটিমাত্র অঙ্গ গ্রহণ করবে? আবার ন্যায়ের অন্য দুটি যুক্তির বিরুদ্ধে বলা চলে যে শুদ্ধসুখ অলভ্য বলে সুখমাত্রই কেন পরিত্যাজ্য হবে? মানুষ বলতেই পারে যে সুখ-দুঃখ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে। চার্বাকের যে অমার্জিত আপত্তি — তুষের ভয়ে কে অন্ন ত্যাগ করে, বা কাঁটার ভয়ে কে মৎস্য বর্জন করে — তার সদুত্তর ন্যায় দিতে পারেন নি।

ন্যায়মতে মিথ্যাজ্ঞানই সংসার বীজ — বন্ধনের মূল কারণ। অনেক বিশ্লেষণ করে ন্যায় সিদ্ধান্ত করেন যে দশবিধ প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞানই অহংকারকে নিবৃত্ত করে। ভাষ্যকার বলছেন যে 'অহমস্মীতি মোহোহহঙ্কারঃ ইতি' — অনাত্মাতে অহমস্মি দৃষ্টিই অহংকার। শরীর, মন, দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিতে আত্মদৃষ্টিই হল অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি; সেই অহংকারই দুঃখের মূল ও অহংকারের উচ্ছেদই মোক্ষ। সূত্রকার বলেন যে দোষের কারণগুলির তত্ত্বজ্ঞান হলেই অহংকার নিবৃত্তি হয়। এই তত্ত্বজ্ঞান কিন্তু মোক্ষস্বরূপ নয়; মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে ক্রমশ দোষ, প্রবৃত্তি, জন্ম ও জন্মসংশ্লিষ্ট দুঃখের পরম্পরায় বিনাশ হয় — এটি অভয়, অজর, অমৃত্যুপদ অবস্থা। অপবর্গে সর্বদুঃখের তথা দুঃখের জ্ঞানের বিনাশ হয়। ন্যায় এই অবস্থাকে শান্ত বলেছেন, প্রতিবাদী বলেন এটি ভীষ্ম বা ভয়ানক অবস্থা। এই মতে মোক্ষে আত্মা অস্তিত্ববান থাকেন, সংখ্যা পরিমাণাদি গুণও থাকে, কিন্তু জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্নাদি বিশেষ গুণ সব নিষ্কাসিত হয়ে যায় আত্মা থেকে। এই অবস্থা পুরুষের কাছে পরম প্রার্থনীয় হয় কি করে? নৈয়ায়িক বলেন যে দুঃখের চাপে জীবন যখন দুর্বহ হয়ে ওঠে, তখন মৃত্যুও শ্রেয় বোধ হয়। কিন্তু আত্মহত্যা কি পুরুষার্থ হয়? এইরূপ মোক্ষ কি জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে? আদর্শরূপে কি জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এই মোক্ষ? আমার মতে এই মোক্ষ শুধু পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচায়ক। এইরকম পরম পুরুষার্থ বহুমুখ মানবজীবনের অসংখ্য বৈচিত্র্য ও অতল ঐশ্বর্যের যথোচিত মূল্য দেয় না। লক্ষণীয় এই যে মোক্ষে ব্যক্তিত্বের বিনাশ ঘটে।

এরপর আমরা প্রথম বিকল্পে উল্লেখিত সাঙ্খ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি। সম্পূর্ণ বিপরীত আধিবিদ্যক পটভূমি থেকে এসে সাঙ্খ্য সেই দুঃখের উপরেই গুরুত্ব দেন। একই ভাবে তারা ব্যাবহারিক অহংবোধকে মিথ্যাজ্ঞান প্রসূত মনে করেন ও মোক্ষকে কর্তৃত্ববোধ ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রযত্নাদির পরিত্যক্তি বলে থাকেন। প্রথম সাঙ্খ্যসূত্রই বলছেন যে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই অত্যন্ত পুরুষার্থ। ত্রিবিধ দুঃখের একটি হল আধ্যাত্মিক দুঃখ, যথা রোগশোকাদি; এখানে আত্মা বলতে ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে, কারণ তার সঙ্গেই

রোগশোকাদি সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয় হল আধিভৌতিক দুঃখ, যথা সর্পদংশন, পশু বা অন্য পুরুষ হতে আগত দুঃখ। তৃতীয় হল আধিদৈবিক দুঃখ যেগুলি অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প বা অতিপ্রাকৃতিক বিপর্যয় জনিত দুঃখ। সাঙ্খ্যমতে আমাদের এই দুঃখ বিভ্রান্তিজনিত — নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত পুরুষকে ও প্রকৃতির বিকৃতি ব্যক্তিকে (বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত, ইন্দ্রিয়াদিকে) আমরা এক মনে করি। ব্যক্তিকেন্দ্রিক দুঃখগুলিকে পুরুষের উপর বিক্ষেপ করি। আত্মা বা পুরুষ বিশুদ্ধ বিষয়ী — সাক্ষী মাত্র। সে কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা নয়। সমস্ত প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তিজনিত দুঃখাদি প্রকৃতির রাজ্যের ব্যাপার। মোক্ষ হল বিবেকখ্যাতি — প্রকৃতি ও পুরুষকে স্ব-স্বরূপে বুঝে নেওয়া। মোক্ষকে কৈবল্যও বলা হয় — যে অবস্থায় কেবল পুরুষ প্রকৃতির থেকে অসংযুক্ত হয়ে যায়।

আমরা দেখছি যে ত্রিবিধ দুঃখ দেহবুদ্ধি সংযুক্ত ব্যক্তিকেই অবলম্বন করে। ব্যক্তিপুরুষের সঙ্গে শুদ্ধপুরুষ যত গভীর ভাবে একাত্মতা বোধ করবে, তত তার দুঃখ প্রগাঢ় হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেকে দেহধারী প্রাকৃত পুরুষ মনে করে, সে ঐ পুরুষেরই মঙ্গল আকাঙক্ষা করবে, সে ঐ ব্যক্তিত্বের বিনাশ চাইবে কেন? প্রাকৃত পুরুষ দুঃখকাতর হয়ে দুঃখের নিষেধ চায়, কিন্তু সে তার প্রাকৃত অস্তিত্ব পরিত্যাগ করতে রাজী হয় কি? মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখের পরিসমাপ্তি চায়, সে নির্ভেজাল সুখও চাইতে পারে; কিন্তু বিশেষ বিশেষ দুঃখের মুক্তি অনুসন্ধান করা ও দুঃখমাত্রেরই ধ্বংস কামনা করবার মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। একটিতে কর্তৃত্ববোধ রক্ষিত হয়, অন্যটিতে কর্তৃত্ববোধ পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু কর্তাপুরুষ তার কর্তৃত্বজনিত সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে, কর্তৃত্ববোধকে পরিত্যাগ করতে রাজী হবে কেন?

সাঙ্খ্যের দৃষ্টিতে ব্যক্তিত্বের মধ্যে দুটি ভাগ আছে — একটি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ সাক্ষী, অন্যটি কর্তা ভোক্তা অহংকেন্দ্রিক ব্যক্তি। সাঙ্খ্য বিবেকখ্যাতিকে পরমপুরুষার্থ বলছেন, কারণ ঐ খ্যাতিতে বোঝা যায় যে ত্রিবিধ দুঃখ ব্যক্তির — পুরুষের নয়। কিন্তু আমার মনে হয় যে সমস্যা যদি ব্যক্তির হয় তবে ব্যক্তিকেই তার সমাধান খুঁজতে হবে। ত্রিবিধ দুঃখ একটি বিশেষ পরিকাঠামোর সঙ্গে সংজড়িত, ব্যক্তিত্ব যার অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেই কাঠামো বজায় রেখেই সমাধান খুঁজতে হবে, বর্জন তো সমাধান হতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে দেশকালে সুদূরস্থিত পাশ্চাত্য দার্শনিক লাইবনিজকে আমরা স্মরণ করতে পারি। তিনিও ত্রিবিধ দোষের উল্লেখ করেছেন — প্রাকৃতিক দোষ বা দুঃখ, নৈতিক দোষ বা পাপ, এবং আধিবিদ্যক দোষ বা অপূর্ণতা। এই প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে সাঙ্খ্যকথিত তিনটি দোষই প্রাকৃতিক, কিন্তু তিনি যে দোষ খণ্ডন করতে চাইছেন তা অপূর্ণতা নাশ করে। মনে হয় যে আধিবিদ্যক স্তরে অপূর্ণতার বোধ থাকলেই পুরুষ পূর্ণতা লাভের জন্য ঈপ্সিত হবে। সাঙ্খ্যের ব্যাখ্যায় একটা স্তরভেদ লঙ্ঘিত হয়েছে।

সংক্ষেপে সাঙ্খ্য সম্বন্ধে আমার অসন্তোষ দ্বিবিধ। যে ভাবে তাঁরা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে অত্যন্ত পুরুষার্থ বলেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত পুরুষকে শুদ্ধচৈতন্য বলা মানে ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করা। বহুপুরুষবাদের মাধ্যমে তাঁরা ব্যক্তিত্বকে ধরে রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু বিভেদকের অভাবে এই বহুপুরুষবাদ শুধু একটি অযৌক্তিক অসঙ্গতি হয়ে থেকেছে।

এর পরে আমরা শেষ বিকল্পটি আলোচনা করব। এখানে দুঃখকে জীবনের অনিত্যতার সঙ্গে সংজড়িত দেখা হয়েছে। বুদ্ধ তাঁর প্রথম আর্যসত্যেই দুঃখাধিক্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন — রোগ, জরা, মৃত্যু, প্রিয়বিয়োগ, অপ্রিয়সংযোগ ইত্যাদি দুঃখের মূল। তাঁর মতে জগতে সমস্ত বস্তু কর্মপ্রসূত বা কার্য, সুতরাং অনিত্য। এই অনিত্যবাদ ক্রমে ক্ষণিকবাদ ও পরম্পরায় নৈরাত্ম্যবাদে পরিণতি লাভ করেছে। তিনি বলেন যে আপাত সুখকরের ক্ষণিকতা ও দুঃখস্বরূপতা না জানায়, মানুষ তাকে পেতে চায়। তাঁর উপদেশের মর্মার্থ হল যে জগতে জীবন বা ঈপ্সিত বিষয় কোনটিই নিত্য নয়, সুতরাং বিষয়লাভের জন্য কামনা, বাসনা, তৃষ্ণা শুধু নিরর্থক, বিভ্রান্তিজনিত ও দুঃখজনক। এই উপলব্ধিই নির্বাণ। নির্বাণ মানে সত্তার অবলুপ্তি না কামনা-বাসনার নিঃশেষ বিনষ্টির পর এক পরমসত্তার অবিকৃত অবস্থিতি — এ ব্যাপারে বৌদ্ধদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু নির্বাণে যে সকল দুঃখের পরিসমাপ্তি হয় এ ব্যাপারে তাঁরা একমত। ন্যায় বা সাঙ্খ্যের মতন তাঁরা কোনও নিত্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁদেরই মতন মনে করেন যে ব্যক্তিসত্তা অজ্ঞান প্রসূত ও দুঃখের মূল কারণ। অহং বোধের বিলুপ্তিই তাঁদের পরম লক্ষ্য।

বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাঁদের পৃথক পৃথক আধিবিদ্যক পরিপ্রেক্ষিত থেকে ব্যক্তিসত্তার অবলুপ্তি সিদ্ধ করেন। বুদ্ধের নিজের উপদেশে ও থেরবাদে নিত্য আত্মার স্থান অধিকার করেছে প্রবহমান ক্ষণিক সত্তার সন্তান ও পঞ্চস্কন্ধের সংঘাত। অষ্টাঙ্গিক মার্গের অন্তর্গত সম্যকস্মৃতির কায়ানুস্মৃতি বলে যে এই দেহ বত্রিশ প্রকার অশুচিদ্রব্যে পরিপূর্ণ, সুতরাং কিসের জন্য 'আমি' 'আমার' এই অহংকার?[১৮] এই চিন্তা নব্যবৌদ্ধ দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ। স্থবিরবাদ বলছেন যে, যে দশপ্রকার সংযোজন বা বন্ধন থেকে মুক্ত হলে অর্হত্ব লাভ হয় তার প্রথমটি সৎকায়দৃষ্টি বা ব্যক্তিত্ববুদ্ধি — personality belief। এই মিথ্যাদৃষ্টি জন্য পঞ্চস্কন্ধকে 'আমি' 'আমার' মনে হয়। এইরূপ আত্মগ্রাহিদৃষ্টিতে আত্মাকে শাশ্বত ও নিত্য বলে প্রত্যয় হয়। এইভাবে আত্মদৃষ্টি, আত্মমান, আত্মমোহ, আত্মস্নেহ ইত্যাদি বলেছেন, যে গুলি অহংকেন্দ্রিক মনোভাব — একমাত্র অর্হৎ যাদের ভ্রমাত্মকতা বুঝতে পারেন। তাঁদের দুঃখ এবং ব্যক্তিত্ববুদ্ধি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিজ্ঞানবাদ একে দ্বৈতভাবরহিত, লোকোত্তর, শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ অবস্থা বলে থাকেন। এই অবস্থা ন্যায়ের অহঙ্কার নিবৃত্তি বা সাঙ্খ্যের কৈবল্যের সঙ্গে তুলনীয়।

এই আলোচনাতে আমি প্রাচীন দর্শনগুলির বিপক্ষে বলেছি যে তাঁরা সকলেই ব্যক্তিত্বের বিনাশের মধ্যে মোক্ষ দর্শন করেন। অর্থাৎ আমি ধরেই নিয়েছি যে পুরুষ মূলত নিজেকে ব্যক্তি মনে করে। প্রাচীন চিন্তকেরা যখন বলেন যে ব্যাবহারিক 'আমি' শেষ ব্যাখ্যায় নির্গলিত হয়ে যায় — বিন্দু নিঃশেষে মিশে যায় সিন্ধুতে তখন মোক্ষ তাঁদের আধিবিদ্যক বিশ্লেষণের অনুসিদ্ধান্ত মাত্র। মোক্ষকে এখানে আত্যন্তিক দুঃখনিষেধরূপ পরমমূল্য বলে যাচাই করা অন্যায় হবে। তখন তাকে বিশেষ দর্শনের আবশ্যিক সিদ্ধান্তরূপে মর্যাদা দিতে হবে। আমরা দেখেছি যে অন্য তিনটি পুরুষার্থ ব্যক্তিপুরুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েই অর্থবহ হয়। ব্যক্তিত্ববোধ ধ্বংস হয়ে গেলে মোক্ষ আর ব্যক্তির পরম মূল্য থাকে না। আশা করি পরের পরিচ্ছেদে আমার বক্তব্য আরও প্রাঞ্জল হবে।

তিন

মোক্ষকে পুরুষার্থরূপে বুঝতে গেলে আমাদের দুটি অসুবিধা হয়। পুরুষার্থ হচ্ছে সেই অর্থ যাকে প্রার্থনা করা হয় ও করা উচিত। পুনরাবৃত্তি দোষ হচ্ছে জেনেও আমি পুনর্বার বলছি যে মোক্ষকে প্রার্থিত, কাঙ্ক্ষিত অর্থ বললে তাকে মুমুক্ষু ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেই বুঝতে হবে। দ্বিতীয়ত মোক্ষকে মনে করা হয় নির্বাসনা অবস্থা, কিন্তু চরম ঈপ্সিত বলেই তো তা পরম পুরুষার্থ। এখানে একটি অর্ন্তবিরোধ দৃষ্ট হয়। দুটি অসুবিধাকেই একটু তলিয়ে দেখা উচিত। দুটি অসুবিধা সম্বন্ধেই প্রাচীনেরা সচেতন ছিলেন।

যেমন মধুসূদন সরস্বতী গীতাভাষ্যে বলছেন যে সুখ-দুঃখের আশ্রয় অন্তঃকরণই কর্তা ও ভোক্তা, সুতরাং অন্তঃকরণই বদ্ধ, তদ্ব্যতিরিক্ত সাক্ষীপুরুষ বা আত্মা মুক্ত হলে বৈয়াধিকরণ্য দোষ হয়।[১৯] বৈদান্তিক অবশ্য এ সমস্যার সহজ সমাধান করেন, শ্রুতি বলে বলীয়ান হয়ে বলেন যে জীবের বন্ধত্ব অজ্ঞান আরোপিত। তাঁরা আরও বলেন যে মোক্ষ কোন সাধনার দ্বারা লভ্য অর্থ নয়, মোক্ষ পারমার্থিক জ্ঞান মাত্র। কিন্তু তাঁরাও মোক্ষের সাধনীয় রূপটি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারেন নি, তাই একটু ঘুরিয়ে, 'প্রাপ্তপ্রাপ্তি' অর্থাৎ যা আছে তাকে আবার সচেতন ভাবে পাওয়া ও 'পরিহৃত-পরিহার' অর্থাৎ যা পরিহৃত তাকেই পুনরায় সজ্ঞানে পরিহার করবার কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন।[২০] অদ্বৈত দর্শনে এমনই মায়ার খেলা যে যিনি চিরমুক্ত তাঁকেও আবার নতুন করে মুক্তি লাভ করতে হয় এবং অজ্ঞানবশত মুক্তপুরুষও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন।

দর্শনের পরিভাষায় পুরুষার্থ হচ্ছে প্রয়োজন — যার দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে পুরুষ প্রবৃত্ত

হয়। প্রবৃত্তির সঙ্গে একগুচ্ছ ধারণা জড়িয়ে আছে — যেগুলি কর্তার ধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট। যখন আমরা বলি যে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ, তখন পুরুষের ইষ্টই উক্ত হয়েছে। ন্যায় বলছেন যে, প্রবৃত্তিমাত্রই স্বেচ্ছা প্রণোদিত — এই 'স্ব' টি পুরুষ। প্রাভাকরেরা বলেন যে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান প্রবৃত্তির পূর্বগামী অর্থাৎ প্রবৃত্তিটিকে পুরুষের আয়ত্তাধীন বলে জানতে হবে। তাঁরা কার্যতাজ্ঞানের কথাও বলেন, অর্থাৎ কাজটি যে পুরুষের কর্তব্য এই বোধ থাকা দরকার। গাগাভট্ট আরও সূক্ষ্ম বিচার করে দেখাচ্ছেন যে শুধু কর্তব্যের বোধই পর্যাপ্ত নয়, প্রবৃত্ত হওয়ার আগে এটিকে 'আমার কর্তব্য' বলে স্বীকার করে নিতে হবে। এই 'আমি'ও তো ব্যক্তিপুরুষ। এর কোনটি প্রবৃত্তির যথার্থ বিশ্লেষণ সে বিচারে প্রবেশ না করেও বলা চলে যে মোক্ষ প্রয়োজন হলে তাকে পুরুষের প্রেক্ষিতেই রাখতে হবে।

মোক্ষ নির্বাসনা অবস্থা সুতরাং কামনা বাসনাকে কেন বন্ধনস্বরূপ মনে করা হয়েছে, তা ভেবে দেখা যেতে পারে। কামনার অনেক দোষই ব্যাবহারিক। একটি বহুপ্রচলিত শ্লোক বলে — ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি — কামনার পরিতৃপ্তির দ্বারা কামনা প্রশমিত হয় না — কামনা পূর্ণ হলে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতন সে আরও লেলিহান হয়ে ওঠে। আরেকটি সদৃশ শ্লোক বলে যে কামনাকারী জীবের কাম্যবিষয়ে ইচ্ছাপূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কামনা তাকে পীড়িত করে। সুতরাং কষ্টদায়ক কামনা ত্যাগ করাই উচিত। কিন্তু আমরা দেখি যে অন্য সংস্কৃতিতে কামনাকে এত দোষাবহ ভাবা হয় না। পাশ্চাত্যমতে ব্যক্তিত্বের প্রসারণ, সভ্যতার অগ্রগতির মূলে আছে মানুষের জীবনতৃষ্ণা। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এই ধরণের চিন্তা আমাদের সংস্কৃতিতেও সম্পূর্ণ বিরল নয়। মহাভারত বলছেন যে, 'অসন্তোষঃ শ্রিয়ো মূলম্'। ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে যজ্ঞ, বিদ্যা, উদ্যোগ ও ঐশ্বর্যের ব্যাপারে অসন্তোষই ক্ষত্রিয়ের গুণ।

কিন্তু দার্শনিক বিশ্লেষণে কামনাই বন্ধন। ফলবাদী পুরুষ প্রবৃত্ত হয়। কর্মসমাধা হলে সাক্ষাৎ ফলের সঙ্গে আরেকটি ফল উৎপন্ন হয় যাকে পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম বা অপূর্ব বলে। এই ফল ভোগ করবার জন্য জীব জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য এবং এইভাবে জন্মমৃত্যুর প্রবাহ চলতে থাকে এবং এই ধারার থেকে নিষ্কৃতিই মুক্তি। এই প্রবাহের মূলে আছে কামনা-বাসনা যার ভিত্তি অহংকারে — মানুষের অজ্ঞানতাবশত অহমের প্রতি তীব্র আসক্তিতে। তাই অহংবোধ তথা কামনাবাসনার ধ্বংসই মোক্ষ। মুক্তপুরুষকে তাই বিচিত্ররূপে বিশেষিত করা হয় অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম বলে।

কামনাবিবর্জিত বলেই মোক্ষের অভাবাত্মক রূপটি গ্রহণ করেছেন ন্যায়-বৈশেষিক, মীমাংসা, কিছু বৌদ্ধসম্প্রদায়। আনন্দমোক্ষবাদী দাবী করেন যে মোক্ষ নিত্য সুখের অবস্থা। বাৎস্যায়ন বলেন যে রাগ বা কামনা মাত্রই বন্ধন এবং নিত্যসুখরাগও ব্যতিক্রম

নয়। আবার কোন কোন নৈয়ায়িক বলেন যে দুঃখাভাবকেই লাক্ষণিক অর্থে সুখ বলা হয়। আনন্দমোক্ষবাদী মনে করেন যে আনন্দ আর সুখ এক নয়; কোন বিশেষ আকাঙক্ষা পূর্ণ হলে সুখ হয়, কিন্তু আনন্দ অন্য এক অনুভূতি — কোনও ইচ্ছার সঙ্গে সংযুক্ত নয়। আনন্দ গুণগত ভাবে সুখ থেকে পৃথক। আনন্দ পূর্ণতার অনুভূতি — তত্ত্বজ্ঞানের আস্বাদনরূপ প্রশান্ত অবস্থা। মোক্ষ লাভ হলে, প্রার্থনা না করলেও শান্তি-সন্তুষ্টি নিষ্পন্ন হয়। আবার অন্যেরা বলেন যে শুধু অনুভূতি নয় সুখলাভের ইচ্ছা এবং আনন্দলাভের ইচ্ছাই গুণগতভাবে পৃথক। আমি দেখি যে কোন বিশ্লেষণেই ইচ্ছাকে বাদ দেওয়া যায় না — আনন্দলাভের ইচ্ছা ও দুঃখনিষেধের ইচ্ছা — ইচ্ছারূপে সদৃশ। মুক্তির ইচ্ছা না থাকলে মুমুক্ষু হয় না। সুতরাং স্বভাবগত পার্থক্য থাকলেই একটা যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে।

ন্যায় নিজ পক্ষের সমর্থনে দ্বেষ ও বৈরাগ্যের মধ্যে পার্থক্য দেখেছেন। ন্যায়মতে রাগ ও দ্বেষ বন্ধনস্বরূপ, কিন্তু বৈরাগ্য হচ্ছে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা।[২১] মুমুক্ষুর সুখে রাগ নেই, দুঃখে দ্বেষ নেই। দ্বেষ না থাকলে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা হবে কেন? ন্যায় বৈরাগ্যের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। ভোগ্য বিষয় উপস্থিত হলে তাতে বিতৃষ্ণা বা উপেক্ষাবুদ্ধি হল বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের মূলে নির্বেদ — সুখ ও তার সাধনে প্রয়োজন নেই এই বুদ্ধি। জন্মকে দুঃখানুবিদ্ধ দেখলে তবে নির্বেদ হয়। পরম্পরায় দুঃখদর্শনকে টেনে আনাতে, বৈরাগ্যকে দ্বেষ থেকে আর পৃথক করা যায় না।

বরঞ্চ ব্রহ্মসূত্রের প্রথমসূত্রের শাঙ্করভাষ্যে বৈরাগ্যের সামান্য একটু অন্য ব্যাখ্যার আভাস পাই। সাধন চতুষ্টয়ের প্রথমটি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক বা নিত্য ও অনিত্যের পার্থক্য বোধ। দ্বিতীয়টিই বৈরাগ্য — ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ — ইহলোকে ও অন্যলোকে কর্মফলভোগে বিরাগ — ভোগে উপেক্ষাবুদ্ধি। এর মধ্যে দুঃখের উল্লেখ না থাকাতে এই বিরাগকে অন্যভাবে বুঝবার অবকাশ আছে। সমস্ত কর্মফলভোগে অনীহা — যেন সুখ ও দুঃখে সদৃশ বিরক্তি। এ যেন ব্যাবহারিক জীবনের শূন্যতার বোধ — সমস্ত দৈনন্দিন মূল্যের অবমূল্যায়ন। তৃতীয়টিতে নৈতিক প্রস্তুতির কথা আছে, যার মধ্যে একটি তিতিক্ষা। শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখাদি বিরুদ্ধ যুগলের সংঘাতে বিচলিত না হওয়াই তিতিক্ষা। আমি বলছি না যে অদ্বৈত বেদান্ত মোক্ষকে দুঃখনিষেধ বলে দেখেন নি। বেদান্ত পরিভাষাকারের মতে মোক্ষ হল নিরতিশয় সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও মনে হয় যে শাঙ্কর ভাষ্যে স্বতন্ত্র চিন্তার আভাস পাওয়া যায়।

কিন্তু এই পর্য্যন্তই। শঙ্করের দর্শনে ব্যক্তিত্বশূন্য অস্তিত্বই চূড়ান্ত পরমার্থ। জীবব্রহ্ম সমীকরণে ব্রহ্ম জীবে পর্যবসিত হন না। জীব তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য মায়ার রাজ্যে নির্বাসিত করে, সচ্চিদানন্দরূপে ব্রহ্মলীন হন। মোক্ষে এই সত্য উদ্ভাসিত হয়। শঙ্কর

সম্বন্ধে মন্তব্য হচ্ছে যে তাঁর দর্শন পুরুষের ব্যক্তিত্বকে নির্মম ভাবে উপেক্ষা করে অহংবোধের অনন্তপ্রসারণ সিদ্ধ করে।[২২] সুতরাং ব্যক্তিত্ব রক্ষা করতে হলে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করা চলে না।

প্রাচীন ব্যাখ্যায় সমস্ত দুঃখের নিষেধ সমস্ত কামনা বাসনার বিলয় ও অহংবোধের মিথ্যাত্বসিদ্ধিই মোক্ষ। এর মধ্যে যেন পুরুষের প্রাকৃত সত্তার একটি অস্বীকৃতি আছে। জ্ঞান-কর্ম-আবেগ পূর্ণ পুরুষেব প্রাকৃতসত্তার বহুমুখ অনুভূতি মোক্ষপ্রসঙ্গে মূল্যহীন। শঙ্কর বলছেন যে প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার নৈসর্গিক — অর্থাৎ সর্বপ্রাণীসাধারণ এবং মোক্ষে এর কোন স্থান নেই। মীমাংসা বলছেন যে প্রপঞ্চ পুরুষকে ত্রিমুখে আবদ্ধ করে — ভোগায়তন শরীর, ভোগসাধন ইন্দ্রিয়াদি, ভোগ্য শব্দাদি — এই বন্ধন খণ্ডিত হয় মোক্ষে।[২৩] প্রাচীন চিন্তক এই প্রাকৃত রূপের অন্তরালে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের সন্ধান পেয়েছেন যিনি একমাত্র সত্য।

এইজন্যই মোক্ষরূপ পুরুষার্থের সঙ্গে অন্য পুরুষার্থগুলির মৌলিক প্রভেদ। অন্য পুরুষার্থগুলি সমাজে অবস্থিত প্রাকৃত পুরুষের মূল্য; এই পুরুষের সত্যতা অস্বীকার করে তার অতিপ্রাকৃতরূপে উপনীত হওয়াই মোক্ষ — সে উপনয়ন সাধনার দ্বারাই হোক বা জ্ঞানের দ্বারাই হোক। অদ্বৈত নির্দ্বিধায় বলছেন যে একটি প্রবৃত্তি মার্গ ও অন্যটি নিবৃত্তি মার্গ। মোক্ষ প্রকৃতির সীমার অতিক্রমণ। প্রাচীন চিন্তায় এই অতিক্রমণ সম্ভব হয় শুধুমাত্র ব্যক্তিসত্তার মিথ্যাত্বসিদ্ধির মধ্য দিয়ে। কিন্তু প্রাকৃতরূপটি মেনে নিয়ে, এই অতিক্রমণকে তো ব্যক্তিত্বের প্রসারণও বলা যেতে পারে। সেই প্রসারণের আলোকে প্রাকৃত ব্যক্তিত্বকেও নতুন করে গড়বার একটা অবকাশ থাকে। কালিদাস ভট্টাচার্য্য এই ধরণের চিন্তা করেছেন। তাঁর বক্তব্যে আসছি।[২৪]

চার

প্রাচীন ধারণা সম্যক রক্ষা করে তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন কালিদাস ভট্টাচার্য্য। মানব জীবনের আদিম রহস্য হচ্ছে যে সে একাধারে প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত। প্রকৃতির অংশ বলে সে অন্য সব ইতর প্রাণীর মতন দেশ, কাল ও কার্যকারণের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সে সচেতন, মানে সে এই নিয়ন্ত্রণ অতিক্রম করতে পারে। তাই তার ভবিষ্যৎ আচরণ আমরা কিছুটা আঁচ করতে পারি, কিন্তু পুরোটা পারি না। এই নিয়ন্ত্রণকে এইভাবে অস্বীকার করাটা তার প্রাথমিক জন্মলব্ধ স্বাতন্ত্র্য — এই স্বাতন্ত্র্যের বোধকে পূর্ণভাবে বিকশিত করাই পুরুষার্থ। তিনি আরও বলেন যে এই প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করাটা নেতিমূলক স্বাতন্ত্র্য --- যাকে তিনি বলেন Freedom From। এর পরিপূরক হল ইতিমূলক স্বাতন্ত্র্য, যাকে তিনি বলেন Freedom To।[২৫]

এই দুটির পূর্ণসংযোগই পরমপুরুষার্থ। তিনি দেখিয়েছেন যে জড়বাদ-অধ্যাত্মবাদ নির্বিশেষে অনেকেই এই স্বাতন্ত্র্যের বা Freedom-এর অনুসন্ধান করেন। কেহ একে বস্তুসৎ বলেন, কারও মতে এটি ব্যবহারানুগুণ মাত্র, কেহ স্বাতন্ত্র্যের বোধে গিয়ে থামেন, কেহ বা স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপকে সিদ্ধ করেন। তাঁর নিজের চিন্তায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যে সাধারণত প্রাচীনেরা ভেবেছেন যে প্রকৃতির আধিপত্যের সচেতন অস্বীকৃতিই মুক্তি। এইজন্য আমরা দেখি যে মুমুক্ষু স্বাভাবিক ভাবে বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি মনে করেন যে এইভাবে স্বাতন্ত্র্যে অধিষ্ঠিত হবার পর প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে অনাসক্ত ভাবে ব্যবহার করতে পারাই মুক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ। প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বর্জন না করে, পরিশোধিত দৃষ্টি নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারাই পরম কাম্য।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে এই সম্পর্ক এটি তিনভাবে প্রকাশিত হতে পারে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিষয়ের যে বিশেষ আকার সাক্ষাৎকারে ভাসিত হয়, তা নিয়ে পুরুষ সন্তুষ্ট থাকে না, সে কল্পনার সাহায্যে ব্যাপ্তি স্থাপন করে ও বিক্ষিপ্ত জ্ঞানকে সুসংহত রূপ দেয়। আবেগের ক্ষেত্রেও পুরুষ ব্যক্তিগত রাগ-দ্বেষ ক্রোধ-আসক্তির সীমা অতিক্রম করে, বিভিন্ন শিল্প-সঙ্গীতাদির সৃষ্টি করে, ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে আশ্রয় করে সত্য-শিব-সুন্দরের আরাধনা করে। নীতিবোধ ও ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আবদ্ধ না থেকে সুসংগঠিত সমাজ ও যুক্তিযুক্ত আদর্শের নৈতিক নিয়মাদি সৃষ্টি করতে চায়। আমার কাছে পুরুষের এই বিশ্লেষণটি ভাল লাগে। প্রকৃতির সীমার মধ্যে থেকেও অহরহ অতিপ্রাকৃতে উত্তরণের প্রচেষ্টা চলেছে। মুক্ত জীবন পুরুষের বদ্ধ জীবনের অনুভূতিকে ভিত্তি করে, স্বীকার করে, পরিশুদ্ধ করে। প্রাকৃত জীবনকে শূন্য মনে করে বর্জনও করে না, একমাত্র সত্য মনে করে আশ্রয়ও করে না।

তাঁর রচনায় প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তার একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমরা দেখি। তিনি যখন বলেন যে প্রত্যেক পুরুষের বিশ্বাস আছে যে সে স্ব-স্বরূপে মুক্ত, তখন মনে হয় যে তিনি অদ্বৈতের ভাষায় কথা বলছেন। কিন্তু মুক্তিকে যখন তিনি কার্যকারণের নিয়মের অতিক্রান্তি বলছেন, তখন তিনি প্রাচীন চিন্তা থেকে অনেক সরে এসেছেন। তিনি দার্শনিকদের দুই দলে ফেলেছেন — জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী। প্রথমোক্তরা প্রকৃতিকেই শেষ কথা মনে করেন ও দ্বিতীয়োক্তরা প্রকৃতিকে নস্যাৎ করে দিয়ে অতিপ্রাকৃত সত্তাকেই একমাত্র সত্য মনে করেন। উনি ন্যায় ও মীমাংসাকে প্রথমদলে রেখেছেন। কিন্তু তাঁর মতে জড়বাদ পুরুষকে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে। এই লক্ষণ মেনে নিলে ন্যায় ও মীমাংসাকে জড়বাদ বলা চলে না, কারণ তাঁদের মতেও প্রাকৃত ব্যক্তি 'আমি' শেষ ব্যাখ্যায় অজ্ঞানের ফল।

কালিদাস ভট্টাচার্য্যকে অনুসরণ করে আমরা মোক্ষকে নতুন ভাবে বুঝতে পারি।

আমাদের দর্শন সম্পর্কে বলা হয় যে তার শুরু হয় অহংকারে ও শেষ হয় নিরহংকারে। এই নিরহংকারকে আমরা দেখব পরিশুদ্ধ অহংকার রূপে — যার মধ্যে অহংবোধ থাকবে কিন্তু অহমের প্রতি জৈব আসক্তি থাকবে না। এই অহংবোধ থাকবে উচ্চতর জীবনের কেন্দ্ররূপে। এইখানে মুক্তি হচ্ছে অহমের প্রতি অন্ধ আসক্তি থেকে মুক্তি — যে আসক্তি পুরুষকে শুধুমাত্র প্রাকৃত জীবনে আবদ্ধ রাখে। এই মোক্ষে অহমের বা প্রকৃতির বর্জন নেই, কিন্তু নবরূপে অবস্থিতি আছে। কেবল মাত্র আত্মকেন্দ্রিক জীবনের সীমাবদ্ধতা ও শূন্যতাব বোধে এই মোক্ষচিন্তার জন্ম।

এখানে অবশ্যই প্রতিবাদী প্রশ্ন তুলতে পারেন যে মুক্তির প্রাচীন ধারণার চাইতে এই নতুন ধারণা কি কারণে অধিক গ্রহণযোগ্য? এর উত্তরে আমি বলব যে অন্তত তিন ভাবে পরমপুরুষার্থরূপে মোক্ষের প্রাচীন ধারণা আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করে না। প্রথমত মোক্ষ সেখানে মূলত দুঃখনিবৃত্তি মাত্র। মানুষের বিচিত্র জীবনের প্রেক্ষিতে পরম পুরুষার্থ শুধু এইটুকু হতে পারে না। জীবনের যে বিশ্লেষণ এইরকম মোক্ষের ভিত্তি সেইটিকে মনে হয় যে পক্ষপাতদুষ্ট আংশিক সত্য। অহংকেন্দ্রিক জীবনের অকিঞ্চিৎকরতা বোধ হলেই পুরুষ প্রাকৃত জীবনকে অতিক্রম করে উচ্চতর মূল্যের সন্ধান করে। প্রাকৃত-অতিপ্রাকৃতের গ্রন্থিরূপে পুরুষকে দেখলেই বলা যায় যে তার মধ্যে মুক্তির বীজ আছে যাকে বিকশিত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত প্রাচীন দার্শনিকেরা মনে করেন যে অহংকার অজ্ঞান প্রসূত। রাগ-দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, মাৎসর্য — যাদেরকে বন্ধনস্বরূপ মনে করা হয় তারা সকলেই অহংকেন্দ্রিক, সুতরাং অহংকারের বিনাশেই সকল বন্ধন ছিন্ন হয়। কিন্তু আমি মনে করি যে অহমের প্রতি আসক্তির বিনাশেই বন্ধন ছিন্ন হয়। এখানে বহিরাগত কোন চিন্তাকে উপন্যস্ত করা হচ্ছে না — ভগবদ্‌গীতা বারংবার পুরুষকে নির্মম নিরহংকার হতে বলেছেন। শঙ্করাদি আচার্যেরা যেমন নিরহংকার বলতে অহংকারের বিনাশ বুঝেছেন, তেমনই তিলক প্রভৃতি কর্মযোগীরা নিরাসক্ত অহংবোধ বুঝেছেন। নিষ্কাম কর্ম মানেই নিরাসক্ত কর্ম। ক্ষুদ্র, সীমিত, সঙ্কীর্ণ অহমের জন্য ফলের আশা না করে, কর্তব্যবোধে কর্মে ব্যাপৃত হওয়াই নিষ্কাম কর্ম।

আমরা সহজ বুদ্ধিতে দেখি যে নৈতিক কর্মের ক্ষেত্রে স্বার্থবুদ্ধি পরিত্যাগ করে, 'স্ব'কে অন্য সকল পুরুষের সঙ্গে সমদৃষ্টিতে দেখলে, কর্তব্য স্থির করা ও আচরণ করা সম্ভব হয়। কালিদাস ভট্টাচার্য্য দেখাচ্ছেন যে বিজ্ঞানীরাও বলছেন যে যতক্ষণ না personal equation অপসৃত হচ্ছে, ততক্ষণ যুক্তি দোষমুক্ত হয় না। অহমের আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারলেই উচ্চতর জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গে একেই বলে চিত্তশুদ্ধি। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে অনাসক্তি ও চিত্তশুদ্ধি থাকলে প্রাকৃত জীবনের সীমা অতিক্রম করা যায়।

এই প্রসঙ্গে আমার শেষ কথা হল যে মুক্তি অনাসক্তি স্বরূপ হলেও এটি অভাবমাত্র নয় বা নেতিবাচক অবস্থাও নয়। মোক্ষের প্রাচীন ধারণায় এই অবস্থায় ব্যক্তিত্বের বিনাশ হয় বা আত্মা থেকে সমস্ত অনুভূতি নির্গত হয়ে যায়। আমরা মনে করি যে এখানে পরিশুদ্ধ সম্প্রসারিত ব্যক্তিত্ব থেকে যায়। বুদ্ধ, শঙ্করাদি জীবন্মুক্ত পুরুষেরাও এইরকম জীবনই যাপন করেছেন। বাসনামাত্রই বন্ধন হবে কেন, প্রবৃত্তিমাত্রই রাগদ্বেষজনিত অহমের আকর্ষণ প্রসূত হবে কেন? আরেক প্রকার বাসনার কথা বলা চলে, যেটি ব্যক্তিত্বের প্রসারণের বাসনা, ক্ষুদ্র স্বার্থে আবদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে উচ্চতর মূল্য সন্ধান করবার বাসনা, শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি হতে মুক্ত হবার বাসনা। প্রাচীন চিন্তাকে পুনরাবৃত্তি করে বলতে পারি যে এই বাসনা বন্ধনস্বরূপ নয়, এটি সাধারণ বাসনা থেকে গুণগত ভাবে পৃথক। শুধু প্রাচীনেরা মনে করতেন যে জীবন্মুক্তি শেষ হয় বিদেহমুক্তিতে, নির্বাণ অবধারিত ভাবে চলে মহাপরিনির্বাণ অভিমুখে — আমাদের মনে হয় যে জীবন্মুক্তিই শেষ কথা হওয়া উচিত। মোক্ষকে আমরা নির্বাণ বা কৈবল্য না বলে নিঃশ্রেয়স বলতে চাইছি।

যদি তাত্ত্বিক বলেন যে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ অনুযায়ী অহংকেন্দ্রিক প্রবৃত্তিই একমাত্র প্রবৃত্তি, নিরহংকারী কর্তা স্ববিরোধী চিন্তা, তবে আমরা বলব যে কমবেশী অনাসক্তি আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেখি, সেই অনাসক্তিই উচ্চতর জীবনের আবশ্যিক শর্ত, তাকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করাই সাধনা। নিয়ামক আদর্শ রূপে (regulative ideal) একে সামনে রাখা যেতেই পারে।

এই ধরণের চিন্তা আমাদের সাহিত্যে সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, শুধু সেগুলিকে একত্রিত করে একটি সুসংহত রূপ দেবার অপেক্ষা। গীতার কথা আগেই উল্লেখ করেছি, যেখানে শ্রীভগবান অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন নিষ্কাম নিরাসক্ত চিত্তে জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধারণত বহির্জগৎ ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য করে, সেই ঘাতপ্রতিঘাতে আমরা প্রকৃতির অঙ্গমাত্র। গীতা বলছেন যে ইন্দ্রিয় স্ববশে থাকলে রাগদ্বেষমুক্তের ইন্দ্রিয় ব্যবহারও প্রসন্নতা আনে। গীতোক্ত ভক্তের বর্ণনাতেও নিরহংকারের গুরুত্ব প্রকট হয়। ভক্তের ব্যক্তিত্ব থাকে, কিন্তু তার সকল প্রবৃত্তি কৃষ্ণার্পিত বলে ব্যক্তিত্ব বন্ধনস্বরূপ হয় না। কোথাও বা রসের ব্যাখ্যায় দেখি যে ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন অংশটি বর্জন করতে পারলে আবেগ রসে উত্তীর্ণ হয়। আবার ঈশ্বরের লীলা (যার মধ্যে দর্শন চিন্তার শ্রেষ্ঠতম কর্মের ধারণা বিধৃত রয়েছে) এমন একটি কর্ম, যার মধ্যে চাওয়া-পাওয়ার স্পর্শ নেই — সেটি যেন সীমাহীন আনন্দের অনিরুদ্ধ প্রকাশ। এককথায় বিন্দুকে নিঃশেষে সিন্ধুতে বিসর্জন না দিয়ে, তাকে পরিশুদ্ধ করে, তার মধ্যে সত্য-শিব-সুন্দরকে প্রকটিত করাই মোক্ষ। এটি নিছক অবরুদ্ধ প্রাকৃত জীবন থেকে মুক্তি, ও প্রাকৃতের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের উদ্বোধন।

এখানে প্রশ্ন থাকে যে অন্য তিনটি পুরুষার্থের সঙ্গে মোক্ষের সম্বন্ধ কি? অন্য তিনটি পুরুষার্থ যদি প্রাকৃত সামাজিক জীবের পুষ্টিমাত্র হয় তবে মোক্ষ তাদের নিবৃত্তি। কিন্তু ধর্ম যদি চিত্তশুদ্ধি হয় তবে ধর্ম ও মোক্ষ সংজড়িত। অর্থ ও কামকে পুরুষার্থরূপে ধর্মনিয়ন্ত্রিত মনে করা হয় বটে, তবে সেই ধর্ম ও মোক্ষাভিমুখ ধর্ম এক নয়। সুতরাং তাদের সঙ্গে মোক্ষের কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না।

টীকা ও তথ্যপঞ্জী

প্রবন্ধটির প্রথম খসড়া Friday Group-এ পঠিত হয় ও সদস্যদের সমালোচনার আলোকে পুনর্লিখনের পর ইংরাজী ভাষায়, 'Mokṣa, the Parama Puruṣārtha' নামে *JICPR*, vol. ix, no. 1 এ প্রকাশিত হয়।

১। Daya Krishna, 'Three Conceptions of Indian Philosophy' in *Indian Philosophy — A Counter Perspective* Oxford University Press, p. 33 (henceforth IP).

২। Rajendra Prasad, 'Theory of Puruṣārtha' in *Karma, Causation and Retributive Morality*, ICPR,

৩। ন্যায় সূত্র, ভাষ্য, বার্ত্তিক — ১/১/১ ও ১/১/২৪

৪। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, বেদান্তপরিভাষা, পঞ্চানন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা। যদবগতং সৎ স্ববৃত্তিতয়া ইষ্যতে, তৎ প্রয়োজনম্। ... তত্র সুখদুঃখাভাবৌ মুখ্যে প্রয়োজনে (পৃঃ ৩১৯)। ইহ খলু ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যেষু চতুর্বিধা পুরুষার্থেষু মোক্ষ এব পরম পুরুষার্থ, পৃঃ ৪

৫। Three Myths about Indian Philosophy in IP, p. 7.

৬। মহাভারত, সভাপর্ব
ক্বচিদর্থেন বা ধর্মং ধর্মেনার্থমথাপি বা।
উভৌ বা প্রীতিসারেন ন কামেন প্রবাধসে।। ৫/১৯
ক্বচিদর্থঞ্চ ধর্মঞ্চ কামঞ্চ জয়তাম্ বর।
বিভজ্য কালে কালজ্ঞ সমম্ বরদ সেবসে।।৫/২০

৭। TP, pp. 279, 283-84, 302.

৮। TP, p. 278

৯। TP. p. 299

১০। মহাভারত বনপর্ব

ধর্মবাণিজ্যক হীনো জঘন্য ধর্মবাদিনাম্।। ২৭/৫
ধর্মং চরামি সুশ্রোণি ন ধর্মফলকারণাৎ।। ২৭/৪
নাহং ধর্মফলান্বেষী, রাজপুত্রি চরাম্যুত।
দদামি দেয়মিত্যেব যজে যষ্টব্যমিত্যুত।। ২৭/২

১১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারহস্য, বালগঙ্গাধর তিলক, অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদক ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, কলিকাতা, পৃঃ ৯৩

১২। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায়দর্শন,
৪/১/৬৭ আলোচনা।

১৩। TP, '... to say that the (mukta) liberated is egoless is to say that his apparent, crude, undesirable ego is effaced or sublimated for the liberation of the genuine, refined or desirable ego', p. 295.

১৪। ন্যায়দর্শন, ভাষ্য - অনিষ্টহানায় ঘটমান ইষ্টমপি জহাতি। বিবেকহানস্যাশক্যত্বাদিতি। ১/১/২২

১৫। ঐ - ৪/১/৫৬ আলোচনা।

১৬। ঐ - দুঃখানুষঙ্গাদ্দুঃখং জন্মেতি, ন সুখস্যাভাবাৎ।

১৭। নায়বার্ত্তিক - অনুষঙ্গোঽবিনাভাবঃ। তৎস্বরূপমাহ যত্রৈকং সুখং বা দুঃখং বা তত্রেতরং দুঃখং বা সুখং বা। ১/১/২

১৮। বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা সিদ্ধি, সম্পাদক সুকোমল চৌধুরী, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা,

১৯। মধুসূদন সরস্বতীকৃত শ্রীমদভগবদ্গীতার টীকা, সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম, কলিকাতা,

২০। বেদান্ত পরিভাষা — লোকেঽপি প্রাপ্তপ্রাপ্তি পরিহৃতপরিহারয়োঃ প্রয়োজনত্বম্ দৃষ্টমেব। এবং প্রাপ্তস্যানন্দস্য প্রাপ্তিঃ, পরিহৃতস্যানর্থস্য নিবৃত্তিঃ মোক্ষঃ প্রয়োজনম্। পৃঃ ৩২৩

২১। ন্যায়দর্শন, ভাষ্য - ১/১/২১

২২। N. V. Banerji, *The Concept of Philosophy*, University of Calcutta,

২৩। পার্থসারথিমিশ্র, শাস্ত্রদীপিকা, সম্পাদক লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়, চৌখাম্বা, ১৯১৩। ত্রেধা হি প্রপঞ্চং বধ্নাতি .. ভোগায়তনম্ শরীরম্, ভোগসাধনানীন্দ্রিয়াদিনি, ভোগ্যঃ শব্দাদয়ঃ বিষয়ঃ তদস্য ত্রিবিধস্যাপি বন্ধস্যাত্যন্তিক বিলয়ো মোক্ষঃ।

২৪। কালিদাস ভট্টাচার্য্য অনেক গ্রন্থে ও প্রবন্ধে মোক্ষের আলোচনা করেছেন, যার

মধ্যে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করা চলে — ভারতীয় সংস্কৃতি অনেকান্ত বেদান্ত, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, বর্দ্ধমান, Freedom, Compared and Evaluated' in *Communication, Identity and Self-Expression : Essays in Memory of S. N. Ganguly*, eds., S. P. Banerjee and Shefali Moitra, Oxford University Press, Delhi.

২৫। 'Notions of Freedom, Compared and Evaluated' p 106.

বৈদিক বাঙ্ময়ে ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিক মূল্যবোধ

ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বিশ্বের প্রাচীনতম শাস্ত্র বেদ। এই বেদ চারভাগে বিভক্ত — ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। এই চতুর্বেদের মন্ত্র অংশকে বলে সংহিতা, সংহিতার পরে আসে ব্রাহ্মণ, তার পরে আরণ্যক ও উপনিষদ। বিশাল বৈদিক সাহিত্যের শেষ ভাগে পাওয়া যায় ছয়টি বেদাঙ্গের উল্লেখ। সংহিতা থেকে শুরু করে বেদাঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত এই সুবিশাল বৈদিক সাহিত্যের মর্মস্থলে প্রবেশ করে তার নির্যাস আহরণ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন কাজ। 'সব ব্যাদে আছে' কথাটি ব্যঙ্গ করে বলা হলেও সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও নীতিসম্পর্কিত সকল বিষয়েব উল্লেখ কিন্তু ভারতীয় জ্ঞানরাশির প্রাচীনতম উৎস বেদেই খুঁজে পাওয়া যাবে। কোন এক সুদূর অতীতে তপোনিষ্ঠ ঋষিদের ধ্যানলব্ধ যে শাশ্বত বাণী অখিল জ্ঞানের আকররূপে 'বেদ' মূর্তির রূপ পরিগ্রহ করেছিল সেই বেদে ছড়িয়ে রয়েছে ধর্মচেতনার স্বাক্ষরবাহী অজস্র মণিমুক্তা। এর পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয়ও বৈদিক সাহিত্যে একেবারে দুর্লভ নয়।

ঋগ্বেদ দিয়েই আমাদেব যাত্রা শুরু করা যাক। চার বেদের প্রাচীনতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ এই বেদের মন্ত্রসংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি। দশটি মণ্ডলে বিভক্ত ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহে সে যুগের ধর্মীয় চেতনার অভিব্যক্তি পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট করে। ন্যায়, নীতি, নিয়ম, শৃঙ্খলা ও কর্তব্যবোধের নিদর্শনও এখানে সেখানে চোখে পড়ে। তাই বৈদিক ঋষিদের স্তুতিতে প্রাত্যহিক জীবনযাপনে আশাবাদের সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। যদিও তাঁরা অমরত্ব লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ও স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গ পাবার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন, তবুও তাঁরা ছিলেন অন্তরে অন্তরে জীবনমুখী। তাঁরা সব সময়ই সুদীর্ঘ জীবন, নিরাময স্বাস্থ্য, সুস্থ সন্তান, ধন, ঐশ্বর্য, খাদ্য ও পানীয়ের প্রাচুর্য এবং শত্রুজয়ের প্রার্থনাই করে গিয়েছেন। তাঁদের চিন্তায় ও কর্মে নৈরাশ্যবাদের চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবন সত্যই হোক আর মায়াময়ই হোক, যথার্থই হোক আর অযথার্থই হোক তাঁরা জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে চেয়েছেন। তাইতো ঋগ্বেদের মন্ত্রে ধ্বনিত হয়েছে — 'পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্' (৭/২৬/১৬)। শত বৎসর জীবিত থাকার উদগ্র বাসনা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে বৈদিক আর্যদের জীবনের প্রতি সুগভীর মমত্ববোধ। তাই তাঁদের ধর্মীয় বিচারবোধে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। প্রকৃতিপূজনে অভ্যস্ত তাঁরা যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কিংবা দেবদেবীর স্তুতিতে বাস্তবমুখিনতাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে স্বীকার

করে নিয়েছেন। শুধু ঋগ্বেদেই নয় অথর্ববেদ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও শত বৎসর জীবিত থাকার প্রার্থনা পদে পদে ধ্বনিত হয়েছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে স্পষ্টই বলা হয়েছে — পুত্রপৌত্র সমেত আমরা যেন শত বর্ষ জীবিত থাকি।[১]

বৈদিক সাহিত্যে বিশেষত ব্রাহ্মণসমূহে জীবন যে কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের নামান্তর তার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। অথর্ববেদের এক স্থানে বলা হয়েছে মানুষ ঋণ নিয়ে জন্মায় — এই জন্মেই তাকে সেই ঋণ শোধ করে যেতে হয়। শতপথব্রাহ্মণে এই বিষয়টি দৃঢ়ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে — যে জন্মায় সে ঋণ নিয়েই জন্মায়। দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণের প্রতি তার সেই ঋণের বোঝা ইহজন্মেই শোধ করে যেতে হয়।[২] দেবতার্চনার দ্বারা সে দেবঋণ পরিশোধ করে, বেদ অধ্যয়ন করে সে ঋষিঋণ থেকে মুক্ত হয়, শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করে সে পিতৃ-ঋণ শোধ করে আর অতিথিসেবার মাধ্যমে সে মনুষ্যঋণ থেকে মুক্ত হয়। সে যুগের, আণৃন্যভাবনা থেকেই, তৎকালীন সুউচ্চ নৈতিক ভাবধারা ও উন্নত মানের জীবনাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়।

ন্যায়বোধ, নীতিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই ধর্ম, পুণ্য, সত্য, নিয়ম প্রভৃতি স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। তাই এদের পাশাপাশি অধর্ম, পাপ, মিথ্যা, অন্যায় সম্পর্কে সেকালের মানুষদের কী ধারণা ছিল তা জানার কৌতূহল হয়। সেকারণে ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের দুটি সূক্তের কয়েকটি মন্ত্রে পাপ-সচেতনতাকে নৈতিক মূল্যবোধের মানদণ্ডরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ পাপবোধ থাকলে তবেই মানুষ পুণ্যের পথে অগ্রসর হয়। সেরকম ধর্ম-অধর্ম, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় এই পবস্পর বিপরীতধর্মী তত্ত্বসমূহের বিশ্লেষণও নৈতিক ভাবধারাকে নিজস্ব পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বরুণদেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত বশিষ্ঠ ঋষির এই সূক্তদ্বয়ে, পাপের অনুশোচনা ও পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। প্রথম সূক্তে পাপবোধক অনৃত, আগস্ ও এনস্ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। দ্বিতীয় সূক্তের (৭/৮৮/৫৬) দুটি মন্ত্রেও পাপমুক্ত হওয়ার প্রার্থনা ধ্বনিত হয়। নৈতিক জগতে 'ঋত' অর্থাৎ নিয়মের উল্লঙ্ঘন ঘটলেই পাপের আবির্ভাব হয়। এখানে সত্য ও ন্যায়ের উল্লঙ্ঘনকেই অর্থাৎ অনৈতিক আচার-আচরণকেই 'পাপ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেরকম ধর্মীয় ক্ষেত্রে যজ্ঞানুষ্ঠান না করলে কিংবা দেবাদেশ লঙ্ঘন করলে মানুষ পাপে পতিত হয়। সৎ বা অসৎ আচরণ থেকে উদ্ভূত পুণ্য বা পাপরূপ ফলের যে অপরিবর্তনীয় নিয়ম তখন প্রচলিত ছিল তাতেই কর্মবাদের সর্বপ্রথম বীজ নিহিত ছিল — এমন ধারণা বোধহয় অমূলক নয়। এই কর্মবাদের বন্ধনে মানুষ ও দেবতা উভয়েই সমভাবে বাঁধা পড়ছিল। ঋগ্বেদে আদর্শ নৈতিক জীবনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতিনিবেদন ও যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা দেবতানির্দিষ্ট পথে সুষম ঐক্যে জীবন অতিবাহিত করার বিষয় পরিস্ফুট। আনোভদ্রীয় সূক্তের সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রে (১/৮৯/৮) সার্বজনীন প্রার্থনায় দেখি তারই প্রতিধ্বনি — 'যা

ভাল তাই যেন আমরা শ্রবণ করি, যা শুভ তাই যেন আমরা দেখি'।[৩] দুর্জনের সমুন্নতি, সজ্জনের অধোগতি, ধর্মের হ্রাস, অধর্মের অভ্যুত্থান — কখনও যেন চোখে না দেখি, উপরন্তু সজ্জনের সমুন্নতি, ধর্মের অভ্যুত্থান, অধর্মের বিনাশ, তরুণদের কর্তব্যপরায়ণতা ও বলশালী ব্যক্তিকর্তৃক দুর্বলের রক্ষাবিধান যেন নিরন্তর প্রত্যক্ষ করতে পারি। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে তাই স্পষ্টোক্তি শুনি[৪] — যা ভাল ও সত্য তাই শোনা উচিত। বহুভাবে উচ্চারিত বাক্য শ্রোত্রেন্দ্রিয় গ্রহণ করে। শ্রোত্রেন্দ্রিয় আনন্দময় ও সুন্দর বাক্য শোনে। শ্রোত্রেন্দ্রিয় সকল দিক হতে শোনে'। 'আমরা চক্ষুরিন্দ্রিয়যুক্ত তাই অন্ধ নই। আমরা জীবিত থেকে জ্যোতি লাভ করি। স্বর্গীয় জ্যোতি ও অমরত্ব প্রাপ্ত হই'।[৫]

নীতিদর্শনের অন্যতম সোপান মানুষের কর্তব্যবোধ। কর্তব্যের যথাযথ অনুষ্ঠান করে ও অকর্তব্যের আচরণ থেকে বিরত থেকে তবেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায়। সেকারণে শুধু নিজের জন্য নয়, অপরের জন্যও কিছু করার প্রয়োজন আছে। সে কথাই ঋগ্বেদের একটি সুপ্রসিদ্ধ সূক্তে, (১০/১১৭) বারংবার ধ্বনিত হয়েছে। সেখানে ধন ও অন্নদানের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে ভিক্ষু আঙ্গিরস বলছেন — 'দেবতারা যে ক্ষুধার সৃষ্টি করছেন সে ক্ষুধা প্রাণহারিণী। আহার করলেও মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু দাতার ধন হ্রাস পায় না। অদাতা কখনও সুখী হয় না। যখন কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যাচ্ঞারব করতে করতে আসে ও অন্ন ভিক্ষা করে তখন অন্নবান হয়েও যে হৃদয় কঠিন করে রাখে ও আগে নিজেই ভোজন করে, সে কখনও সুখী হয় না। ক্ষুৎপীড়িত ব্যক্তি অন্নকামনায় ভিক্ষা করলে যিনি অন্ন প্রদান করেন তিনিই দাতা। তিনি সম্পূর্ণ যজ্ঞফল লাভ করেন, শত্রুদের মধ্যেও তিনি মিত্র লাভ করেন। এক সঙ্গের সঙ্গী যদি নিকটে আসে, তবে যে ব্যক্তি বন্ধু হয়েও তাকে অন্নদান না করে তবে সে বন্ধুই নয়। তার গৃহ গৃহই নয়, তার নিকট থেকে চলে যাওয়াই উচিত।' বস্তুত দান একটি দৈবী সম্পদ বা দিব্য বৃত্তি। সেকারণে দান বিশেষ করে মানুষের ধর্ম। উপরোক্ত দানসূক্তের একটি মন্ত্র উদার মনের পরিচয় বহন করে। এতে, সাম্যবাদের বীজও নিহিত আছে। ঋষি বলছেন — 'যার মন উদার নয় তার মিথ্যা ভোজন করা। বলতে কি, তার ভোজন তার মৃত্যুস্বরূপ। সে দেবতাকেও দেয় না, বন্ধুকেও দেয় না। তার কেবলই পাপ, যে একা একা খায়।' ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে (৫/৮৫/৭) বরুণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে — 'হে বরুণ, যদি আমরা কখন কোন দাতা, মিত্র, বয়স্য, ভ্রাতা, নিকট প্রতিবেশী কিংবা আগন্তুকের প্রতি কোন অপরাধ করে থাকি, তা হলে তুমি তা নষ্ট কর।' এই প্রার্থনা থেকে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে বন্ধু, প্রতিবেশী, সহযোদ্ধা এমন কি অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি অপরাধ করাও পাপের সামিল। এই পাপ বিনাশ করার জন্য ও অপরাধ খণ্ডনের জন্য বরুণের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে। মদ্যপান, দ্যূতক্রীড়া, কুহকতন্ত্র, অবৈধ সহবাস, হঠকারিতা, আত্মপ্রবঞ্চনা প্রভৃতিকে নৈতিক জীবনের বিচ্যুতিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর থেকেই প্রমাণিত হয় সে যুগের নৈতিক জীবনাদর্শ কত উন্নত ও মহনীয় ছিল।

নীতিদর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে অবশ্যম্ভাবীরূপে এসে পড়ে সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্মবিশ্বাস। বৈদিক সাহিত্যে বিশেষ করে ব্রাহ্মণসমূহে নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। 'সর্বমেধ' নামক এক বিশেষ ধরণের যজ্ঞে আন্তর সত্তার মুক্তিসাধনে সব কিছুকে বিসর্জন দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। সৎভাবে জীবনযাপনের প্রধান শর্ত হিসাবে প্রার্থনা ও সৎকর্মের অনুষ্ঠান করতে হবে যা মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করবে। তাই নৈতিক জীবনের ভিত্তিই হল কথায় ও কাজে সত্যবাদিতা। অতিশয় পরিমাণে যজ্ঞনির্ভর ব্রাহ্মণগুলিতেই এই যজ্ঞক্রিয়ার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। সে যুগের জনসাধারণ তাই দিশেহারা হয়ে জানতে চাইছে যজ্ঞ কি তাদের পুণ্যার্জনে সাহায্য করবে অথবা পাপের পথে নিয়ে যাবে? তাই শতপথব্রাহ্মণে(১০/৫/৪/১৬) দক্ষিণা অথবা তপস্যার চেয়ে জ্ঞানই উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত। এরই স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনি শতপথব্রাহ্মণে (১/২/৫/২৪)[৬] 'মনুষ্যগণ অবিশ্বাসে নিমজ্জিত। যারা যজ্ঞ করে তারা পাপী হয় আর যারা যজ্ঞ করে না তারা শ্রেয়কে লাভ করে।' কিন্তু তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (৩/১২/৩) তপস্বিতাই চরম আদর্শরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। অনুতাপজনিত স্বীকারোক্তি যে অপরাধ বা পাপকে প্রশমিত করে তার পরিচয়ও শতপথব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। বাহ্যিক ও আভ্যন্তর উভয় শুচিতা ব্রাহ্মণসমূহে দৃঢ়ভাবে উপন্যস্ত হয়েছে। সত্যপরায়ণতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, সহমর্মিতা এবং চুরি ও হত্যা থেকে বিরত থাকাই সৎ ও সুস্থ জীবনযাপনের অনিবার্য সামগ্রী — ব্রাহ্মণগুলিতে এ কথাই বলা হয়েছে। ধর্মে বা সত্যে বিশ্বাসই আমাদের শ্রদ্ধার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রদ্ধাই জ্ঞানের ভিত্তি। এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করি উপনিষদের প্রসিদ্ধ সেই উক্তি — 'যারা অরণ্যে শ্রদ্ধা এবং তপস্যা আশ্রয় করে উপাসনা করে, তারা মৃত্যুর পর আলোর পথ ধরে চলে যায়, যারা গ্রামে থেকে ইষ্টাপূর্ত এবং দানের উপাসনা করে, তাদের ধরতে হয় ধোঁয়ার পথ।' (ছা. উ. ৫/১০/১) ঋগ্বেদের শ্রদ্ধাসূক্তে (১০/১৫১) কিন্তু শ্রদ্ধাকে যজ্ঞ ও দানের সঙ্গেও যুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য এই দৃষ্টিই প্রাচীন এবং সম্যক্ দৃষ্টি সন্দেহ নেই। দ্রব্যযজ্ঞই হোক আর জ্ঞানযজ্ঞই হোক, এই দুয়েরই ভিত্তি হল শ্রদ্ধা। কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যানে এটি আরো স্পষ্টরূপ পেয়েছে। ঋষি বাজশ্রবসের শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ তাকে নিয়ে যাবে অনন্দ লোকে, আর নচিকেতার কিশোর হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবেশ তার সামনে খুলে দিল লোকোত্তরের দুয়ার (ক. উ. ১/১/২ - ৩)। শ্রদ্ধাতেই সাধনার আরম্ভ, তাই শ্রদ্ধা পৃথিবীকেই আশ্রয় করে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা থাকলে তবেই দেবতার অস্তিত্ব বোধগম্য হয়[৭]। শ্রদ্ধার মহিমা বর্ণনে ব্রাহ্মণগুলি মুখর। যিনি শ্রদ্ধার গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন তাঁর কাছে দেবতারাও অকিঞ্চিৎকর। দেবতার সাহায্য ছাড়াই যজ্ঞ যে শ্রদ্ধার মাধ্যমে ফল উৎপন্ন করে —

এ তত্ত্ব তিনি জানেন। তাই তো কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৭/১/৮/২) ঋষি অত্রি শ্রদ্ধাকেই দেবতার আসনে বসিয়েছেন — শ্রদ্ধা আর দেবতা মিলে মিশে একাকার — তাই তো তিনি 'শ্রদ্ধাদেব'। কৌষীতকিব্রাহ্মণে বলা হয়েছে — 'যিনি শ্রদ্ধাশীল হয়ে যজ্ঞ করেন তাঁর ঈশ্বরভক্তি কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না'[৮]। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের স্পষ্টোক্তি — 'দেবী শ্রদ্ধাই সত্যের প্রথম ফল। শ্রদ্ধাই বিশ্বের নিয়ন্ত্রক ও জগতের ভিত্তিভূমি' (৩/১২/৩/২)। জাগতিক আহুতির অভাবে শ্রদ্ধাকেই মানসিক আহুতির দ্রব্য হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে। তাই এই আহুতিদানকে 'শ্রদ্ধাহোম' বা 'ভাবনাহোম' বলে সেখানে অভিহিত করা হয়েছে। শ্রদ্ধাহোমের উল্লেখ ঐতরেয়ব্রাহ্মণেও (২৫/২) দৃষ্টিগোচর হয়। যজ্ঞনির্ভর ব্রাহ্মণসাহিত্যে শ্রদ্ধা ও সত্য উভয়ই দৃঢ়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাই ঐতরেয়ব্রাহ্মণে দেখতে পাই[৯] রূপকের আবরণে বলা হয়েছে যে, যজ্ঞে যজমান ও যজমানপত্নী উভয়ে যথাক্রমে সত্য ও শ্রদ্ধাস্বরূপ। এই মিথুন উত্তম মিথুন এবং এই মিথুন স্বর্গলোক জয় করে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে ব্রাহ্মণসমূহে যজ্ঞের প্রাধান্য থাকলেও শ্রদ্ধা ও সত্যের ভূমিকা সেখানে একেবারে গৌণ নয়। ঋগ্বেদের শ্রদ্ধাসূক্তের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। এই সূক্তের ঋষিরা শ্রদ্ধা কামায়নী। অর্থাৎ শ্রদ্ধার জন্ম কাম থেকে। এই কাম যে হৃদয়ের আকূতি তারও ইঙ্গিত সূক্তের মধ্যেই আছে[১০]। অবশ্য এই কাম দিব্য কাম, তার অমৃতত্বের পিপাসা। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে[১১] শ্রদ্ধা অমৃত দোহনকারী কামবৎসরূপা ... ঋতের প্রথমজাত দেবী বিশ্বের ধারয়িত্রী, জগতের প্রতিষ্ঠা, দৈবী অধীশ্বরী, ভুবনের অধিরাজ্ঞী। তাই তাঁর কাছে প্রার্থনা — 'তিনি আমাদের জন্য অমৃতময় লোক ধারণ করুন'।[১২]

ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের শ্রদ্ধাসূক্তে (১০/১৫১) 'শ্রদ্ধা' দেবীরূপে উপাসিতা হয়েছেন। এর প্রথম মন্ত্রে বলা হচ্ছে — দেবযজন বা সাধনার প্রথম কর্তব্যই হল অগ্নিসমিন্ধন এবং তাতে নিজেকে আহুতি দেওয়া। এ দুয়ের মূলে রয়েছে শ্রদ্ধা। অগ্নি নবজীবনের উষায় জাগরিত হন। উষা প্রাতিভসংবিতের অরুণ রূপ। নেপথ্য হতে সবিতার প্রেরণা তার পরিণাম। তার পরেই দিকচক্রবালের উর্ধ্বে ভগের আবির্ভাব ঘটে। শ্রদ্ধা থাকে তাঁর মস্তকে অর্থাৎ আগে শ্রদ্ধা, তার পর দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন মেলে। সোমযাগের তিনটি সবনে অর্থাৎ প্রাতঃ, মাধ্যন্দিন ও সায়ংসবনে যে আহুতি দেওয়া হয় তা বস্তুত শ্রদ্ধারই আহুতি। দেবতাকে যে দেয় বা দিতে চায়, সেই প্রকৃত অর্থে সম্ভোগের অধিকারী। শ্রদ্ধাই দেব-প্রশস্তিকে তার কাছে প্রিয় করে তোলে। হৃদয়ের আকূতি নিয়ে যে শ্রদ্ধার উপাসনা করে, সে-ই আলোর সন্ধান পায়। সৃষ্টির মূলে যে দেবযজ্ঞ, শ্রদ্ধাই তার আধার। আর দেবতাদের শ্রদ্ধা ওজস্বী সেই অসুরদের প্রতি। এই দেবতারা 'বায়ুগোপাঃ' যেহেতু সৃষ্টির আদিতে মাতরিশ্বা বায়ু অদিতিহৃদয়ের প্রথম উচ্ছ্বাস। তা হতেই দেবযজ্ঞের প্রবর্তন বলে দেবতারা 'বায়ুগোপাঃ' নামে পরিচিত হলেন। ধর্মে বা সত্যে বিশ্বাসই হল

শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধার উন্মেষ হলেই মানুষ তার বাহ্যিক আবরণ ছিন্ন করে আন্তরসত্তায় উদ্ভাসিত হয়।

শ্রদ্ধাসূক্তের আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রদ্ধাকে যজ্ঞ ও দানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞও অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। প্রথম বা আদিম ধর্ম যজ্ঞ বা আত্মত্যাগ। যার উল্লেখ পাই ঋগ্বেদে[১৩]। বৈদিক সাহিত্য যজ্ঞকেন্দ্রিক। বৈদিক ঋষির সমস্ত সাধনা যজ্ঞের পরিবেশে সমুজ্জ্বল। যজ্ঞ আর্য-সভ্যতার মূলে, মধ্যে এবং বর্তমানে সমভাবে আপন অসীম প্রভাব বিস্তার করেছে। যজ্ঞের দীপশিখা আজও ভারতের প্রতিগৃহে দীপ্যমান, আজও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্রিয়াকর্মে তার প্রভাব অব্যাহত। যজ্ঞের দুইটি রূপ — এক রূপ ক্রিয়াবহুল হবনক্রিয়া যার পরিচয় মেলে যজুর্বেদে ও ব্রাহ্মণগুলিতে। আর এক রূপ এর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। যজ্ঞ আর্যজাতির জীবনকে আদ্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করত। তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এক অবিচ্ছিন্ন যজ্ঞক্রিয়া বললে ভুল করা হয় না। গর্ভাধান, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি তার সর্ববিধ সংস্কারের জন্য যজ্ঞ অপরিহার্য কর্ম। এক কথায় আর্যের জীবন যজ্ঞময়।

যজ্ঞ বুঝতে গেলে তিনটি শব্দের ব্যাখ্যা প্রয়োজন — দ্রব্য, দেবতা ও ত্যাগ। দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগই যজ্ঞ। এখানে দেবতা বলতে সংকীর্ণ অর্থে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য প্রভৃতিকে বোঝায়। যে দ্রব্য ত্যাগ করা হত তাকে বলে হব্য। ঘৃত, চরু, পুরোডাশ, সোমরস প্রভৃতি পদার্থ হব্যরূপে প্রসিদ্ধ। আর ত্যাগকর্মের নাম আহুতি। যজ্ঞ কতগুলি নিত্য, কতগুলি নৈমিত্তিক. কতগুলি কাম্য। আবার কতগুলি স্মার্ত্ত, কতগুলি শ্রৌত।

যে কোন যজ্ঞই হোক না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ত্যাগের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। মনুষ্যজীবনের প্রত্যেক কর্মই যজ্ঞ। আমাদের যা কিছু করণীয় সবই যজ্ঞের সুরে সুর মিলিয়ে করতে হবে। সে সুর আধ্যাত্মিকতার সুর, আত্মসমর্পণের বা ত্যাগের সুর। যজ্ঞের মৌলিক অর্থ ত্যাগ, ত্যাগের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তাই ভোজন করতে হবে। একেই বলে হবিঃশেষ ভক্ষণ, ইহাই যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত। এই অমৃতের সন্ধান পেলেই মানুষ তার হীনত্ব'র পঙ্ক থেকে মহত্ত্বের পাদপীঠে উন্নীত হয়। সে পশুজীবন ত্যাগ করে দেবজন্ম লাভ করে — পশুত্ব থেকে দেবত্বে তার উত্তরণ ঘটে। এই সর্বজীবনব্যাপী ত্যাগযজ্ঞের মর্ম উদ্ভাবন প্রসঙ্গে বেদোক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞের আলোচনা প্রয়োজন। প্রতিটি গৃহস্থের পাঁচটি নিত্যকর্তব্য আছে, তাকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলে। যথাবিধি বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ। পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, দেবতাদের উদ্দেশ্যে হোমাদির অনুষ্ঠান দেবযজ্ঞ, পশুপক্ষীদের আহার্যদান, ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবার নাম নৃযজ্ঞ। দেবতারা মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা, পিতৃগণ তাকে মানবজন্ম দিয়েছেন, ঋষিরা যে বিদ্যা প্রচার করেছেন, সেই বিদ্যাই তাকে দ্বিতীয় জন্মের অধিকারী করেছে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন. প্রতিবেশী হতে আরম্ভ করে সমাজের

সকলেই তাকে রক্ষা করছেন, এমন কি পশু-পক্ষী, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত কোন না কোনভাবে তার জীবনরক্ষায় সাহায্য করছে। সেকারণে সকলের কাছে তার ঋণ আছে। তাকে সারা জীবন ধরে এই ঋণ শোধের চেষ্টা করতে হবে। এক-একটা ঋণশোধের চেষ্টার অভ্যাস এক-একটা যজ্ঞ। প্রত্যেক যজ্ঞেই কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তাই তৈত্তিরীয়-আরণ্যক বলছেন — দেবতার উদ্দেশ্যে আগুনে অন্ততপক্ষে একখানা সমিৎ ফেলে দিলেও দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়।[১৪] পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে এক গণ্ডূষ জল দিলেও পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। ভূতগণের অর্থাৎ পশুপক্ষীর উদ্দেশ্যে অন্ন দিলেই ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন হয়।[১৫] ব্রাহ্মণ অতিথিকে কিছু অন্ন দান করলেই মনুষ্যযজ্ঞ সম্পন্ন হয়।[১৬] বেদাধ্যয়ন করবার সময় অন্ততঃ একটি ঋক্, একটি যজুঃ বা একটি সাম প্রত্যহ অধ্যয়ন করলে ব্রহ্মযজ্ঞ সম্পন্ন হয়।[১৭]

প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্যরূপে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান দৃষ্টিগোচর হয়। জগতে মানুষ যে একাকী আসে নি এবং একা যাবে না, সমস্ত জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক বাঁধা আছে, সমগ্র জগৎ যে তাকে একযোগে স্থির ও প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, এই বিষয়টি সর্বদা স্মরণে রেখে জগতের যাবতীয় প্রাণীবর্গের নিকট ঋণ-স্বীকারে সে বাধ্য এবং প্রত্যহ কোন না কোন অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পন্ন করে সে যে ঋণী এই তত্ত্ব সে মনের মধ্যে জাগ্রত রাখবে। বস্তুত এই ঋণ পরিশোধ কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বিশ্বব্যাপারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে প্রাত্যহিক ত্যাগ-স্বীকারের অভ্যাস করা উচিত। ব্যাপক অর্থে ত্যাগের নামান্তরই যজ্ঞ। এস্থলে সমগ্র জগৎই দেবতা। জগতে যা কিছু আছে তা সবই দেবতা। প্রত্যেকের নিকট মানুষ ঋণী এবং সেই ঋণ স্বীকারের জন্য প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে কিছু না কিছু ত্যাগস্বীকার করে, তাকে যজ্ঞানুষ্ঠান করতে হয়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে—এই পাঁচটি মহা যজ্ঞ দিনে দিনে অনুষ্ঠান ও দিনে দিনে সমাপ্ত করতে হবে।[১৮]

পাঁচটি মহাযজ্ঞের অন্তর্গত ব্রহ্মযজ্ঞকে সকলের উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। তপোব্রত ঋষিগণের নিকট হতে প্রাপ্ত সেই বেদবিদ্যাকে সযত্নে রক্ষা করতে হবে। রক্ষার জন্য প্রত্যহ অধ্যয়ন আবশ্যক এবং এই অধ্যয়নই ব্রহ্মযজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ। দেবযজ্ঞ হল বিসৃষ্টি, আর তারই অনুসরণে মনুষ্যযজ্ঞ হল উৎসৃষ্টি অর্থাৎ উৎসর্গ, যার মূলে আছে দেবতারই প্রেরণা। যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী ও সম্ভার সুগভীর অর্থব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। এ কারণে উপনিষদে একে 'অতিসৃষ্টি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাই শতপথব্রাহ্মণে দেখি — 'এই যে ব্রহ্মযজ্ঞ, বাক্যই এর জুহু, মন এর উপভৃৎ, চক্ষু এর ধ্রুবা, মেধা এর স্রুব, সত্যই অবভৃথ, স্নান স্বর্গলোক এর সমাপ্তি।'[১৯]

ধর্ম ও সংস্কৃতির মূলমন্ত্র এই যজ্ঞতত্ত্বকে শ্রদ্ধার সহিত বুঝতে হবে। এর প্রকৃত অনুশীলন করলে মানুষ পশুর জীবন থেকে দেবত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পৃথিবী

পরমাত্মায় বিধৃত। তিনি সমস্ত চরাচর পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করছেন। অনাসক্ত হয়ে ত্যাগের দ্বারা ভোগ করতে হবে। ধনের আকাঙক্ষা কোনওভাবে করা উচিত নয়, কারণ ধনসম্পদ বাস্তবিকপক্ষে কারুর নয়। ধন কেবলই হস্ত পরিবর্তন করে। এই বিশ্ব চরাচর সেই অমৃতময়ের নিলয় — এই কথা মনে রেখে সর্বত্র পরমাত্মার অধিষ্ঠান অনুভব করতে হবে। মানুষ স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ বলে বিশ্বজগতের কর্মের ধারা হতে সে বিচ্ছিন্ন। দেবজীবন লাভ করতে গেলে মানুষকে বিশ্বজীবনের সহিত সঙ্গতি রেখে চলতে হবে। এইভাবে বিশ্বের সঙ্গে তার যোগই যজ্ঞ। জীবনের প্রতিটি কর্মকে যখন বিশ্বকর্মের সহিত সমঞ্জস করে দেখি তখনই তা যজ্ঞকর্মে পরিণত হয়। বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য নৈতিক জগতের অধিপতি বরুণের কাছে প্রার্থনাতে এই আকুতিই ব্যক্ত হয়েছে — 'হে বরুণ, আমি যেন মৃন্ময় গৃহে না থাকি, আমি যেন তোমার চিন্ময় গৃহের খোঁজ পাই। হে মহাত্মা, তুমি আমাকে সুখী কর, হে বরুণ, আমি যদি ভয়ে কম্পিত হয়ে, তোমার পাশে আবদ্ধ হই, তবে তুমি আমায় যেন দয়া কর। হে বরুণ তুমি চিরশুচি, আমি দীন, কর্তব্যপরান্মুখ তাইতো সংসারপাশে বদ্ধ। হে দেবতা, অমৃত-সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়েও আমি তৃষ্ণায় কাতর। তুমি আমায় অমৃত দানে সুখী কর। হে বরুণ, আমাদের দ্রোহ, পাপ, ত্রুটি যতই হোক না কেন, আমরা মর্ত্য মানুষ অমর্ত্যজনের সঙ্গে যতই বিরোধ করি, তখন তুমি যেন আমাদের পরিত্যাগ করো না'[২০] (ঋ. ৭/৮৯)।

বৈদিক যুগের নৈতিক জীবনাদর্শের পশ্চাতে অধ্যাত্মবাদের প্রভাব বড় কম নয়। তাই সে যুগের নীতিদর্শন ও নিয়মশৃঙ্খলার আলোচনা করতে হলে আধ্যাত্মিক চিন্তাও এসে পড়ে। প্রথমে ঋগ্বেদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক্। চলমান ভূতবর্গ দুটি পৃথক মার্গে গমনাগমন করে — একটি পিতৃপুরুষগণের গমনমার্গ যাকে পিতৃযাণ বলা যেতে পারে, অপরটি দেবতাদের ও মনুষ্যগণের গতিপথ যাকে দেবযান আখ্যায় অভিহিত করা যায়। দশম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে এর পরিচয় পাই[২১] 'কি দেবতা কি পিতৃলোক কি মনুষ্যবর্গ, এঁদের আমি দ্বিবিধ গতি শুনেছি'। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, পরলোকে যাবার পথ এর দ্বারা সূচিত হচ্ছে। দেবতাদের সহিত স্বর্গে বাস ও সূর্যের সঙ্গলাভ এবং অমরত্বপ্রাপ্তি সে যুগে পরম আকাঙ্ক্ষিত সম্পদরূপে গণ্য হত। মৃত্যুর পর মানুষ যমলোকে গমন করে। মর্তবাসীদের মধ্যে যমই প্রথম মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তিনি সেই লোকের মার্গ আবিষ্কার করেন। এই যমলোকের কর্তৃত্ব তাঁর হাতে এবং এই লোক মৃত ব্যক্তিদের গন্তব্যস্থল। পরলোকগত আত্মা এই ইষ্টাপূর্তের পথ দিয়েই সেই লোকে গমন করে, যেখানে যম ও পিতৃপুরুষগণ অমরত্বলাভের আনন্দে আত্মহারা। সেই আত্মারাও এত বিষয়ভোগে উদগ্রীব যে তারা সোম, দুগ্ধ, সুরা, মধুপানে ও সঙ্গীতের মাধ্যমে অফুরন্ত আনন্দ অনুভব করেন। এখানে বিস্ময়ের কথা কিছুই নেই, যেহেতু সমগ্র মানবজাতির প্রচেষ্টা হল দেবত্বে উন্নীত হওয়া। যজ্ঞানুষ্ঠান ও দেবতার্চনের দ্বারা এই স্বর্গলোক জয়

করা যায় যেখানে আত্মা স্বমহিমায় উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হয়। স্বর্গের পাশাপাশি নরকের উল্লেখও ঋগ্বেদে দৃষ্টিগোচর হয়। যারা 'অব্রত' অর্থাৎ পাপী তাদের শাস্তিদানের ক্ষেত্ররূপে নরক চিহ্নিত হয়েছে। এই নরকের বর্ণনাও সেখানে পাওয়া যায় — নরকলোক 'নিম্ন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন' ও একধরণের 'গর্ত' বিশেষ (ঋ. ১০/১৫২/৪)। দেহ ধ্বংস হলেও জীবাত্মা অমর — এ বিশ্বাস ঋগ্বেদের যুগে পরিলক্ষিত হয়। এর সপক্ষে ঋগ্বেদ ১/১৬৪/৩০ মন্ত্রের শেষ অংশে দেখি 'মর্ত্যের সঙ্গে একত্র উৎপন্ন মর্তের অমর জীব স্বধাভক্ষণ করে চিরকাল গমন করে'[২২] (জীবো মৃতস্য চরতি স্বধাভিরমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ)। 'যে পূর্বপুরুষেরা পৃথিবীলোকে আছেন অথবা যাঁরা মানুষের মধ্যে বাস করছেন' (ঋ. ১০/১৫/২) — এ জাতীয় উক্তি থেকে আত্মার প্রেতরূপে মনুষ্যের বাসস্থানে পুনরায় গমনরূপ বিশ্বাস সূচিত হয় না, কিন্তু এর দ্বারা তাদের শ্রাদ্ধকর্মে নিবেদিত আহুতির গ্রহণরূপ অর্থ বোঝায়। এরি মধ্যে পরবর্তী যুগে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বীজ লুকিয়ে রয়েছে বলা চলে। আবার ঋগ্বেদের অন্যত্র বলা হচ্ছে —'হে মৃত, তোমার আত্মা পৃথিবী অথবা স্বর্গে, কিংবা জলে কিংবা উদ্ভিদে শরীরের অবয়বগুলি নিয়ে গমন করুক' (ঋ. ১০/১৬/৩) একে কি যথার্থ পুনর্জন্মবাদ বলা চলে? ঋগ্বেদের ১০/৫৮ সূক্তে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে যমের নিকট থেকে স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র, সূর্যের কিরণমণ্ডল, ঊষা এমন কি যদি তা পর্বতমালার উপরও চলে গিয়ে থাকে তবে তাকে ফিরিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং জন্মান্তরবাদ বীজাকারে নিহিত ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। পরবর্তী যুগে স্বাভাবিকভাবেই এই মতবাদ পত্রে, পুষ্পে পল্লবিত হয়ে মহীরুহের আকার ধারণ করেছে।

ঋগ্বেদের পরে অন্যান্য সংহিতাসমূহে ও ব্রাহ্মণসাহিত্যে স্বর্গের বর্ণনা উপলব্ধ হয়। অথর্ববেদেও মৃত ব্যক্তির পরলোকে গমন ও সেখানে যমের সান্নিধ্যে পিতৃপুরুষগণের দর্শনলাভের কথা বলা আছে। ঋগ্বেদোক্ত নির্ঋতি-ভাবনা থেকেই অথর্ববেদের নরক-লোক বিকশিত হয়েছে। শতপথ, জৈমিনীয় ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণে নরকের ভয়াল ও ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মাঝে আমরা আরণ্যকগুলিকে পাই। তাই আরণ্যকে যজ্ঞক্রিয়ার বাহুল্য যেমন চোখে পড়ে না তেমনই আবার উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের বাড়াবাড়িও নেই। এখানে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের চেয়ে উপাসনার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আরণ্যকগুলিতে বাহ্য যজ্ঞানুষ্ঠানের চেয়ে আন্তর বা আভ্যন্তর যজ্ঞপ্রক্রিয়াকেই সর্বোচ্চ আসনে বসানো হয়েছে। এক কথায় আরণ্যক ব্রাহ্মণোক্ত কর্মমার্গ ও উপনিষদ্-প্রদর্শিত জ্ঞানমার্গের মধ্যে মিলনসেতু রচনা করেছে। যেকারণে উপাসনাই ভক্তের চরম লক্ষ্য ও পরম প্রাপ্তি — এটাই আরণ্যকের মূল মন্ত্র বলা চলে।

এবার উপনিষদের যুগে প্রবেশ করা যাক। চতুরাশ্রমের উল্লেখ উপনিষদগুলোতে থাকলেও তার ব্যাপকতা আমরা পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যে লক্ষ্য করি। দর্শনের ভিত্তিভূমি

উপনিষদে দার্শনিক চিন্তার পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধের সুগভীর অভিব্যক্তি পাঠকচিত্ত আকৃষ্ট করে। কর্মবাদের যে বীজ ব্রাহ্মণগুলিতে নিহিত আছে তার পরিপূর্ণ বিকাশ এই নৈতিক ভাবধারার প্রকৃষ্ট পরিচয় বহন করে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শীক্ষাবল্লীর নবম অনুবাদকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবনাদর্শের বিবরণ পাই। স্বাধ্যায় এবং প্রবচনের দ্বারা বিদ্যার অনুশীলন এবং সম্পাদনের ধারা তাকে অব্যাহত রাখতে হবে। ঋত, সত্য, তপ, দম এবং শম হবে তার আশ্রয়। তাঁকে অগ্ন্যাধান করে অগ্নিহোত্রী হতে হবে। অতিথিসৎকার ও মানুষের প্রতি যথাকর্তব্য করতে হবে। সন্তান উৎপাদন করে গৃহকে সুব্যবস্থিত করতে হবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিষ্যের প্রতি আচার্যের উপদেশে নীতিদর্শনের চরম পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। এই উপদেশ যে সর্বকালীন তা বর্তমান যুগের সমাবর্তন উৎসব থেকেই বোঝা যায়। অতি পরিচিত হলেও উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। 'সত্য বলিবে। ধর্মাচরণ করিবে। অধ্যয়নে প্রমাদ করিবে না। সত্য হতে বিচ্যুত হইবে না। ধর্ম হইতে বিচ্যুত হয়ো না। আত্মরক্ষাবিষয়ে অনবহিত হয়ো না।[২৩] মঙ্গলজনককার্যে প্রমাদ গ্রস্ত হয়ো না। স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনায় প্রমাদগ্রস্ত হয়ো না। দেবকার্য ও পিতৃকার্যে ভ্রান্ত হয়ো না। মাতাকে দেবতা জ্ঞান কর। পিতাকে দেবতা জ্ঞান কর। আচার্যকে দেবতা জ্ঞান কর। অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে সেবা কর। যে-সকল কর্ম অনিন্দিত তাই অনুষ্ঠান কর, অন্যগুলি নয়। আমাদের যা শাস্ত্রসম্মত আচরণ তাই তোমার অনুষ্ঠেয়।'[২৩] অপরগুলি অনুষ্ঠেয় নয়। শ্রদ্ধার সহিত দেবে। অশ্রদ্ধায় দান করবে না। সামর্থ্যানুসারে দান করবে। বিনম্রভাবে দান করবে. সভয়ে দান করবে। মিত্রভাবে দান করবে। বৃহদারণ্যকেও (৫/২) নৈতিক তত্ত্বরূপে আত্মসংযম, সত্যবাদিতা ও সহানুভূতির কথা বলা হয়েছে। এই পরম ও শাশ্বত সত্যের অন্বেষণে উদগ্র অভীপ্সা ঐ উপনিষদেই ব্যক্ত হয়েছে। 'আমাকে অসত্য হইতে সত্যে নিয়ে যাও। অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও। মৃত্যু থেকে অমরত্বে নিয়ে যাও।'[২৫]

সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভের পথে মানুষের জাতি, সামাজিক পদমর্যাদা ও পার্থিব শক্তির কোন ভেদাভেদই থাকে না। কঠোপনিষদে নচিকেতার আখ্যানে তাই দেখি যে, কিশোর সুখৈশ্বর্য ও ভোগের বিপুল আয়োজনে প্রলোভিত না হয়ে যমের কাছে সেই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য বর প্রার্থনা করেছিল। প্রার্থনা বা চাওয়া দু'রকমের হতে পারে — যম নচিকেতাকে বলেছিলেন। এর মধ্যে একটা হল শ্রেয় অর্থাৎ কল্যাণকর আর অন্যটা হল প্রেয় অর্থাৎ প্রীতিকর। সোজা কথায় প্রথমটা আমার ভাল লাগে আর দ্বিতীয়টা হল আমার পক্ষে ভাল। ঐ উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীর শুরুতেই যম বলেছেন — শ্রেয় ভিন্ন আর প্রেয়ও ভিন্ন, ভিন্ন প্রয়োজন-সম্পাদক এরা উভয়েই পুরুষকে আবদ্ধ করে অর্থাৎ শ্রেয় ও প্রেয় আলো-আঁধারের মত পরস্পর ভিন্ন স্বভাব হলেও উভয়েই মনুষ্যকে আবদ্ধ করে।[২৬] শ্রেয় হল বিবেকস্বরূপ আর প্রেয় হল অবিবেকস্বরূপ ও

প্রবৃত্তিজনক ধনবহুল সংসারমার্গ যাতে মনুষ্য নিমগ্ন হয়। যমের কথায়[২৭] 'যে ধনবহুল মার্গে অনেক মানুষ নিমগ্ন হয় তা তুমি গ্রহণ করনি'। নচিকেতাকে এই প্রেয় অর্থাৎ ধনসম্পদ, পুত্র, পরিবার-পরিজন প্রভৃতি আকৃষ্ট করেনি কিন্তু সে শ্রেয় অর্থাৎ পরমার্থবিষয় জানতে ইচ্ছুক। তাই শেষ পর্যন্ত দণ্ডধর যম তাকে আত্মবিদ্যার উপদেশ দান করেন। পাপাচরণ থেকে নিবৃত্ত হয়ে, ইন্দ্রিয়লোলুপতা থেকে বিরত হয়ে প্রজ্ঞানের দ্বারা এই আত্মজ্ঞানকে লাভ করা যায়। তাই আত্মজ্ঞানের সাধনরূপে পাপাচরণের নিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়-সংযম ও চিত্তের একাগ্রতাকে অবলম্বন করতে হবে।

উপনিষদসমূহে নৈতিক মূল্যবোধের যে চিত্র উদঘাটিত হয়েছে তা সূত্রসাহিত্যের যুগেও অক্ষুণ্ণ ছিল বলা চলে। শ্রৌতসূত্রগুলিতে যজ্ঞের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হলেও গৃহ্যসূত্রগুলিতে গৃহস্থের পরম ধর্ম হিসাবে অতিথিসেবাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। অতিথিকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন ও মধুপর্ক দানের প্রথা সেযুগে প্রচলিত ছিল। স্নাতককে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিধি-নিয়ম মেনে চলতে হত। তাকে বাক্য ও মনের শুচিতা রক্ষা করে চলবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। নৈতিক পবিত্রতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। গৃহস্থের পক্ষে আত্ম-সংযমই তার নীতিদর্শনের মূল ভিত্তি। মনুষ্যস্বভাবের চাঞ্চল্যবশত সঙ্গীদের, ছাত্রদের কিংবা ভৃত্য-পরিজনবর্গের অবিশ্বস্ততার প্রতিও গৃহীদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। দেহ ও মনের শুচিতা রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। গুরুজনদের সম্মানপ্রদর্শন ও আত্মসম্মানকে নৈতিক গুণরূপে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

সূত্রসাহিত্যে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার যে পরিচয় মেলে তাতে দেখি শুচিতা ও পরিচ্ছন্নতার নিরন্তর উল্লেখ। এটিকে সে যুগের মানুষেরা কেবল অভ্যাস হিসেবেই গড়ে তোলেননি কিন্তু এটা 'ব্যসন' (ভাল অর্থে) রূপে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। আচমন ও হস্তপাদাদি প্রক্ষালন যে কোন কর্মানুষ্ঠানের পূর্বে সম্পন্ন করে তবেই সেই ক্রিয়া সম্পন্ন করা যেত। মনের প্রসন্নতা, সত্যবাদিতা, তপশ্চর্যা, স্নান ও আচমনের দ্বারা নিজেকে শুদ্ধ করে তবেই কার্য আরম্ভ করতে হত। এইভাবে আত্মসংযম ও আত্মশুচিতার মাধ্যমে নৈতিক জীবনাদর্শের উজ্জ্বল নিদর্শন সূত্রসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

উপসংহারে, বর্তমান যুগের পটভূমিকায় বেদোক্ত ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিক জীবনবোধের বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। সে যুগের ন্যায়, নীতি, নিয়ম, শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যসচেতনতা ও সর্বোপরি সত্যের প্রতি অবিচল বিশ্বাস বৈদিক আর্যগণের জীবনধারাকে এক সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করত। বহুলপরিমাণে যজ্ঞনির্ভর সামাজিক জীবনে সে যুগের মানুষেরা সকলের কাছেই তাঁদের ঋণস্বীকারের কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করেছেন। পাঁচটি মহাযজ্ঞের অন্তর্নিহিত এই তত্ত্ব ত্যাগের মাধ্যমে সূচিত হয়েছে। সমাজে বাস করতে হলে একা খেলে হবে না, সকলকে সেই অন্ন ভাগ করে দিতে হবে। এই যে সকলের

সাথে অচ্ছেদ্য সামাজিক বন্ধন তার মূলে আছে বিশ্বজনীন মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধ। কেউ ক্ষুদ্র নয়, কেউ হীন নয়, কেউ নীচ নয়, সকলের মধ্যেই বৈদিক আর্যেরা দেবভাবের সন্ধান পেয়েছেন। এই দেবভাবের মহিমায় মণ্ডিত প্রতিটি মানুষ বিশ্বমানবতাবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে পৃথিবীকে সকলের বাসযোগ্য আদর্শ নিবাসস্থল রূপে গড়ে তুলবে। তখন সকলে ঈর্ষা, দ্বেষ, অসন্তোষ, মিথ্যাচার ও সমস্ত রকম অন্যায় বিসর্জন দিয়ে এক সুস্থ ও শক্তিশালী সমাজ গঠন করতে পারবে। তাই বিংশ শতকের শেষপাদে এসে আমরা যদি বৈদিক ভারতের ঋত, সত্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও তপস্যামণ্ডিত আদর্শ নৈতিকজীবনকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে যুক্ত করতে পারি তবে সেটাই হবে আমাদের চরম প্রাপ্তি ও পরম সম্পদ।

টীকা ও তথ্যপঞ্জী

১। শতং জীবেম শরদঃ সবীরাঃ। তৈ. ব্রা. ১. ২. ১

২। ঋণং হ বৈ জায়তে যোঽস্তি। স জায়মান এব দেবেভ্য ঋষিভ্যঃ পিতৃভ্যো মনুষ্যেভ্যঃ। শ. ব্রা. ১/৭/২

৩। ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। ঋক্‌বেদ, আনোভদ্রীয় সূক্ত, ১/৮৯/৮

৪। শ্রোত্রেণ ভদ্রমুত শৃণ্বন্তি সত্যম্। শ্রোত্রেণ বাচং বহুধোদ্যমানাম্। শ্রোত্রেণ মোদশ্চ মহশ্চ শ্রূয়তে । শ্রোত্রেণ সর্বা দিশ আশৃণোমি। তৈ. ব্রা. ২/৫/২/৩

৫। ঐ ; অনন্ধাশ্চক্ষুষা বয়ম্। জীবা জ্যোতিবশীমহি। সুবর্জ্যোতিকৃতামৃতম্।

৬। অশ্রদ্ধা মনুষ্যান্ বিবেদ যে যজন্তে পাপীয়ংসস্তে ভবন্তি য উ ন যজন্তে শ্রেয়াংসস্তে ভবন্তীতি। শ. ব্রা ১/২/৫/২৪

৭। শ্রদস্মৈ ধত্ত য জনায় ইন্দ্রঃ (ঋগ্বেদ ২/১২/৫ঘ) ক. উ. ২/১২/৫

৮। স যঃ শ্রদ্দধানো যজতে তস্যেষ্টং ন ক্ষীয়তে। কৌষীতকিব্রাহ্মণ ৭/৪

৯। শ্রদ্ধা পত্নী সত্যং যজমানঃ শ্রদ্ধা সত্যং তদিত্যুত্তমং মিথুনম্, শ্রদ্ধয়া সত্যেন মিথুনেন স্বর্গান্ লোকান্ জয়তীতি। ঐ. ব্রা. ৭/২/১০

১০। শ্রদ্ধাং হৃদয্যয়াকূত্যা শ্রদ্ধয়া বিন্দতে বসু। ঋ. ১০/১৫১/৪গ

১১। কামবৎসা অমৃতং দুহানা ... দেবী প্রথমজা ঋতস্য, বিশ্বস্য কর্ত্রী জগতঃ প্রতিষ্ঠা, ঈশানা দেবী ভুবনস্যাধিপত্নী। তৈ. ব্রা. ৩/১২/৩/১-২

১২। সা নো লোকমমৃতং দধাতু। তৈ. ব্রা. ৩/১২/৩/১-২

১৩। যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি। ঋ. ১/১৬৪/৫০ ঋ. ১০/৯০/১৬

১৪। যদগ্নৌ জুহোত্যপি সমিধং তদ্দেবযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে। তৈ. আ. ২/১০

১৫। যৎ পিতৃভ্যঃ স্বধা করোত্যপস্তৎ পিতৃযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে। ঐ
যদ্ ভূতেভ্যো বলিং হরতি তদ্ভূতযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে। ঐ

১৬। যদ ব্রাহ্মণেভ্যোহন্নং দদাতি তন্মনুষ্যযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে। ঐ

১৭। যৎ স্বাধ্যায়মধীয়ীত একামপৃচং যজুঃ সাম বা তদ্ ব্রহ্মযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে।।

১৮। পঞ্চ বা এতে মহাযজ্ঞাঃ সততি প্রতায়ন্তে, সততি সন্তিষ্ঠন্তে। তৈ. আ. ২/১০

১৯। স্বাধ্যায়ো বৈ ব্রহ্মযজ্ঞঃ, বাগ্ জুহূঃ, মন উপভৃৎ, চক্ষুর্ধ্রুবা, মেধা স্রুবঃ, সত্যমভৃবঃ, স্বরুদয়নীয়ঃ (শ. ব্রা. ১১/৫/৬/১)

২০। মো ষু বরুণ মৃন্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমম্। মৃকা সুক্ষত্র মৃকয় ।। ১ ।।
যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ। মৃকা সুক্ষত্র মৃকয় ।। ২ ।।
ক্রত্বহঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে। মৃকা সুক্ষত্র মৃকয় ।। ৩ ।।
অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্। মৃকা সুক্ষত্র মৃকয় ।। ৪ ।।
যৎ কিং বেদং বরুণ দৈব্যে জানেদৃভিদ্রোহং মনুষ্যাউশ্চরামসি।
অচিত্তী যৎ তব ধর্মা যুযোপিহ মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীবিষঃ ।। ৫ ।।

২১। দ্বে শ্রুতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্যানাম্। ঋ. ১০/৮৮/১৬

২২। জীবো মৃতস্য চরতি স্বধাভিরমর্ত্যো মর্ত্যেক সযোনিঃ। ঋ. ১/১৬৪/৩০ঘ

২৩। সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়াম্মা প্রমদঃ।... সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূতৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। তৈ. উ. ১/১১/১

২৪। দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মানি তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি। তৈ. উ. ১/১১/২
নো ইতরানি। ... শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াহদেযম্।
শ্রিয়া দেযম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। তৈ. উ. ১/১১/৩

২৫। অসতো মা সদ্ গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। বৃ. উ. ১/৩/২৮

২৬। অন্যচ্ছ্রেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। ক. উ.১/২/১

২৭। নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাং মজ্জন্তি, বহবো মনুষ্যাঃ। ক. উ.১/২/৩

গ্রন্থপঞ্জী

১। ঋগ্বেদসংহিতা (মূল)

২। কৃষ্ণযজুর্বেদ-তৈত্তিরীয়সংহিতা (মূল)

৩। শুক্লযজুর্বেদ-বাজসনেয়িসংহিতা (মূল)

৪। অথর্ববেদসংহিতা (মূল)

৫। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ (মূল)

৬। কৌষীতকিব্রাহ্মণ (মূল)

৭। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ (মূল)

৮। শতপথব্রাহ্মণ (মূল)

৯। তৈত্তিরীয়ারণ্যক (মূল)

১০। কঠোপনিষদ্ (মূল)

১১। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ (মূল)

১২। বৃহদারণ্যোকোপনিষদ্ (মূল)

১৩। আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র (মূল)

১৪। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র (মূল)

১৫। আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র (মূল)

১৬। বৌধায়নগৃহ্যসূত্র (মূল)

১৭। পারাশরগৃহ্যসূত্র (মূল)

১৮। খাদিরগৃহ্যসূত্র (মূল)

১৯। বৌধায়নধর্মসূত্র (মূল)

২০। গৌতমধর্মসূত্র (মূল)

২১. *The Vedic Age*, (Vol. I) ets., R. C. Majumdar and A. D. Pusalker.

২২. *India of the Age of the Brāhmaṇas*, Jogiraj Basu.

২৩. *Veda Mimamsa*, (Vol. III), Anirvan.

২৪. *The Ethics of the Hindus*, by Sushil Kumar Maitra.

ধর্মশাস্ত্রে নীতিবোধ

হেরম্বনাথ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী

ধর্মশাস্ত্র বলিতে আমরা বুঝি বেদোত্তরকালে মনু প্রভৃতি ঋষিকল্প[১] বেদবিদ্যানিষ্ণাত পৌরুষেয় প্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্তৃক বিরচিত গ্রন্থরাশি যাহাতে বেদ বা শ্রুতিতে বিপ্রকীর্ণ জ্ঞানকে লোকোপকৃতির জন্য সুশৃঙ্খলভাবে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই সমস্ত পণ্ডিত-ব্যক্তিগণ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে অতীন্দ্রিয় বেদের প্রথম দর্শন করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের ঋষিত্ব অঙ্গীকৃত হয়। মহাভারতের শান্তিপর্বে এই কথাই অন্যভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে যুগান্তে অন্তর্হিত (লুপ্ত) ইতিহাসসম্বলিত বেদগ্রন্থকে মহর্ষিগণ তপস্যার মাধ্যমে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া লাভ করিয়াছেন।

মনুস্মৃতির ভাষ্যকার মেধাতিথি মনু সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় দান করিয়াছেন —

> মনুর্নাম কশ্চিৎ পুরুষবিশেষোহনেকবেদশাখাধ্যয়নবিজ্ঞানানুষ্ঠানসম্পন্নঃ স্মৃতিপরম্পরা-প্রসিদ্ধঃ।[২]

অর্থাৎ মনু হইলেন একজন বিশিষ্ট পুরুষ যিনি অনেক বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তদনুসারে বৈদিকশাস্ত্রের অনুষ্ঠানসম্পন্ন এবং যিনি পরম্পরাক্রমে স্মৃতিগ্রন্থে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যে মনুর নাম করা হইল এবং যে মনুর কথা একাধিকবার সশ্রদ্ধভাবে উল্লিখিত হইয়াছে শ্রুতিতে, সেই মনু বেদের প্রতিপাদ্য লৌকিক এবং অলৌকিক বিষয়কে তাঁর শাস্ত্র নির্দেশিত করিয়াছেন বলিয়াই স্মৃতিশাস্ত্র রচয়িতাগণের মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য অবিসংবাদিত। বৃহস্পতি নামক স্মৃতিকার এই কথাটিই সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন—

> বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
> মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে।। (বৃহস্পতিস্মৃতিসংস্কারকান্ড, নং ১৩)

অর্থাৎ মনুর নির্দেশিত বিধির বিরোধী যে স্মৃতিশাস্ত্র তাহা প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

বিভিন্ন যুগে অবশ্য বিভিন্ন স্মৃতিকারের স্মৃতি প্রামাণিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। মনুর স্মৃতিশাস্ত্র সত্যযুগে পরমপ্রমাণভূত—

> কৃতে তু মানবা ধর্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
> দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পরাশরস্মৃতিঃ।। (বৃহস্পতিস্মৃতি, সংস্কারকান্ড, নং ১৪)

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ও পবিত্রতম গ্রন্থ হইল বেদ এবং তাহার মধ্যে আবার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হইল ঋগ্বেদ। সেই ঋগ্বেদে একাধিক ক্ষেত্রে মনুকে 'পিতা' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[৩] অর্থাৎ বৈদিক কালেই মনু একটি সনাতন নৈতিক মার্গের প্রবর্তক রূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যাহা হইতে বিচ্যুতি কাম্য বলিয়া স্বীকৃত হইত না। অতএব প্রার্থনা—'মা নঃ পথঃ পিত্র্যান্ মানবাদধিদূরং নৈষ্ট পারাবতঃ'[৪]। এই মনুর নির্দেশকে যে তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২.২.১০.২) এবং তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে (২৩.১৬.১৭) ভেষজকল্প রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার মাধ্যমে আমরা স্পষ্টই সংকেত পাই যে মনুর বিধান সমাজে দিগ্‌দর্শক উপকারক রূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতেই। তৈত্তিরীয় সংহিতায় উক্তিটি হইল—'যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদত্তদ্ভেষজম্'। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণের বচনও প্রায় অনুরূপ—'মনুর্বৈ যৎ কিঞ্চাবদত্তদ্ভেষজং ভেষজতায়ৈ।' অর্থাৎ মনু যাহা নির্দেশ দান করিয়াছেন, তাহা ঔষধ (কল্প), (অতএব অবশ্য পালনীয়)।

যে শ্রুতি স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রের উৎস তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে বেদের সংহিতা চারিখানি। তাদের মধ্যে প্রাচীনতম ঋগ্বেদে আছে দশটি মন্ডলে বিভক্ত ১০২৮টি সূক্ত, যাহার মুখ্য প্রকৃতি হইল ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, প্রভৃতি দেবগণের প্রতি প্রাণের আর্তি স্থাপন এবং হোমাদি প্রত্যর্পণে প্রীত দেবগণের নিকট লৌকিক পুত্র, বিত্ত প্রভৃতির জন্য প্রার্থনা।[৫] অথর্ববেদ ৭৩১ সূক্তের সংহিতা এবং ইহা বিশটি ভাগে বিভক্ত। ধর্মের লৌকিক রূপ, ভূত, প্রেত, পিশাচাদি, রোগোপশম, মন্ত্র, তন্ত্র প্রভৃতির সংযোগের ফলে এই বেদের বেদত্ব কিন্তু যথোপযুক্তভাবে স্বীকৃতি লাভ করে নাই।[৬] আর্চিক ও উত্তরার্চিক নামক দুইটি ভাগে বিভক্ত সামবেদ সংহিতায় ৭৫টি মন্ত্র ব্যতীত সব কয়টিই ঋগ্বেদ সংহিতা হতে গৃহীত এবং বিশেষ ভাবে এই গ্রন্থ সঙ্গীতার্থক, তবে মনে রাখিতে হইবে যে সামবেদের একটি প্রক্রিয়াত্মক গ্রন্থ (Ritual Book) আছে যাহার নাম হইল সামবিধানব্রাহ্মণ যাহার উত্তরার্দ্ধটিকে বর্ণনা করা চলে ইন্দ্রজালবিদ্যাসমৃদ্ধ রূপে (Handbook of Magic), কারণ অনেকগুলি সামমন্ত্রকে ইন্দ্রজালিক উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত করা যায় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

যাগযজ্ঞ সম্পর্কীয় বেদ হইল যজুর্বেদ এবং ইহা যে বহু শাখায় প্রবিভক্ত ছিল তাহা আমরা মহাভাষ্য প্রণেতা পতঞ্জলির উক্তি হইতে অবগত হই। তিনি বলেন—'সহাপ্রবর্ত্মা সামবেদঃ একশতমধ্বর্য্যুশাখাঃ.....'। বর্তমানে আমরা পাই কৃষ্ণযজুর্বেদীয় কাঠক, কপিষ্টক, তৈত্তিরীয় ও মৈত্রায়নী শাখা আর শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতা। এই সংহিতায় সংমিশ্রিত আছে পদ্য (ঋক্) ও গদ্য ('যজুস্') যাহা হইতে এই বেদের সংজ্ঞা উদ্ভূত। ঋক্ মন্ত্রগুলি প্রায়ই ঋগ্বেদ হইতে সংকলিত। যাগযজ্ঞপ্রধান এই যজুর্বেদে যজ্ঞের অনুষ্ঠানের কল্যাণাত্মক সামাজিক দিকটি অশ্বমেধযজ্ঞের প্রার্থনার মধ্যে সুপরিস্ফুট।[৭]

প্রার্থনার মন্ত্রটির সারাংশ হইল এই যে, এই রাষ্ট্রে বেদবিদ্যাজ্ঞানোপেত ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করুক, এই রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করুক ক্ষত্রিয়গণ, যাহারা বীর, ব্যাধিবর্জিত, ধনুর্ধারী ও মহারথসম্পন্ন, এই রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করুক দুগ্ধবতী, গাভী দ্রব্যবহনপটু বৃষভ, ... এই যজমানের বীর ও শক্তিমান পুত্র জন্মগ্রহণ করুক। বরুণদেব যথা সময়ে যথা ঋতুতে বর্ষণ করুক, ঔষধি সকল ফলযুক্ত হউক, আমাদের যোগক্ষেম কল্পিত হউক (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি হইল যোগ এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ হইল ক্ষেম)। এইরূপ প্রার্থনার মাধ্যমে ঋষিগণ ধনধান্যে সমন্বিত সর্বপ্রকার সুখশান্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ একটা সমাজের কল্পনা করিয়াছেন যাহাতে কল্যাণাত্মক রাষ্ট্রের রূপটি পরিস্ফুট।

যজুর্বেদের ধারাই বহন করিয়া আছে যে সাহিত্য তাহা ব্রাহ্মণস্বরূপক। কাহিনী, ব্যাখ্যা অর্দ্ধদার্শনিক পদ্ধতিতে যাগযজ্ঞবিষয়ক আলোচনার জন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহকে যাগযজ্ঞবিজ্ঞান (Science of Sacrifice) বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে। ক্রমে ক্রমে আমরা লক্ষ্য করি যে প্রায় প্রতিটি বেদের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদের সহিত সম্পর্কিত। পাঁচিশটি অধ্যায় সম্বলিত পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ সামবেদীয়, কৃষ্ণযজুর্বেদের ব্রাহ্মণ হইল তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ও শত অধ্যায় সম্বলিত শতপথব্রাহ্মণ শুক্লযজুর্বেদের সহিত যুক্ত—ইহারই অন্তিম অংশে আমরা পাই বহুখ্যাত বৃহদারণ্যক উপনিষদ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যাগযজ্ঞ স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্য কর্মের সাধন নহে। যজ্ঞই প্রজাপতি—ইহাই ব্রাহ্মণের মূলমন্ত্র।

বিভিন্ন যাগযজ্ঞের ইতিকর্তব্যতার ব্যাখ্যানের মাধ্যমে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি নীতিবোধের প্রতি সংকেত। যাগ করিতে উদ্যোগী হইয়া যজমান যে জলে হস্ত প্রক্ষালন করে তাহার উদ্দেশ্য অনৃতবাদী মনুষ্য যেন এইরূপ প্রক্ষালনের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি লাভ করে (শতপথব্রাহ্মণ ১.১.১.১)। পতি পত্নীর পবিত্র একত্বরূপ সম্পর্ক যাহা উত্তরকালে ধর্মশাস্ত্রে প্রশংসিত তাহা এই ব্রাহ্মণে স্পষ্টভাষায় উদ্‌ঘোষিত (শতপথব্রাহ্মণ ৫.২.১.১০)। পত্নীর সতীত্বের জয়গাথাও এই ব্রাহ্মণের একটি বৈশিষ্ট্য (ঐ, ২.৫.২.২০)। পিতা পিতামহের ঋণাপাকরণ (ঋণশোধ) রূপ যে নৈতিক দায়িত্ব যাহা উত্তরকালে ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ কর্তব্যবোধে পর্য্যবসিত, তাহা কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থে একাধিকবার বিশেষ জোরপূর্বকই প্রতিপ্রাদিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ও কিছু কিছু উপনিষদেও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে দার্শনিক ও নীতি বিষয়ক আলোচনায় ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি ব্রাহ্মণেতর, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দের, অংশগ্রহণ। এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কৌষিতকীব্রাহ্মণ (২০.৫), শতপথ-ব্রাহ্মণ (১১) যেখানে বিদেহের জনকের একাধিকবার উল্লেখ পাই, যিনি তাহার অধ্যাত্মবিদ্যা ও যাগযজ্ঞীয় জ্ঞানে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি খ্যাতনামা প্রাজ্ঞ ঋষিকেও পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য স্বয়ং তাঁহার নিকট জ্ঞান আহরণ করিয়াছিলেন (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১.৬.২..)।

ঋষি কবষ ছিলেন অব্রাহ্মণ দাসীপুত্র (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ২.১৯)। যে নারী সম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্রের যুগে সাধারণভাবে অত্যুচ্চ ধারণা পরিলক্ষিত হয় না তাহার কেহ কেহ কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বেদবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য উল্লিখিত ও প্রশংসিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ—'অমৃতস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি'—বাক্যটির প্রতিপাদ্য হইল এই যে, অর্থের দ্বারা কখনই অমরত্ব লাভ করা সম্ভবপর নয়। যাজ্ঞবল্ক্য তাহার পত্নীকে ভরণপোষণের উপযোগী বিত্তদান করিয়া স্বয়ং আত্মতত্ত্ব সন্ধানে তৎপর হইলেন এইরূপ চিন্তা করিয়া যে সংসারে বাস করিতে হইলে পুত্র, ভৃত্য, বিত্তাদির আকাঙ্খায় সকল সময়েই উন্মুখ হইলে পরমার্থ চিন্তার ব্যাঘাত হয়। সুতরাং বিত্ত প্রভৃতি হইল আত্মজ্ঞানবিরোধী। এই কথার উত্তরে মৈত্রেয়ীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। '...যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম...' (২.৪.৩)। মৈত্রেয়ী এই বাক্যের মাধ্যমে যে সত্যটি উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন তাহা হইল এই যে, জাগতিক পুত্র বিত্তাদি রূপ যে সমৃদ্ধি তা কখনোই অমরত্ব দান করিতে তো পারে না, বরং অমৃতত্ববিরোধী। তাহা নিষ্ফল মাত্র। তাহাতে কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির আসক্তি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক দেয় বিত্তাদি দ্বারা তিনি কি লৌকিক উদ্দেশ্য সাধিত করিবেন? গার্গী বাচক্নবী ব্রহ্মবাদীদের সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের মতো ব্রহ্মবাদী ঋষিকে কোণঠাসা করিয়া সগর্বে প্রশ্ন করিলেন—'কস্মিন্ নু খলু ব্রহ্মলোকা ওতাপ্রোতাশ্চেতি?' ব্রহ্ম-বিদুষী গার্গী ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ক প্রশ্নের দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্যকে বিব্রত করিতে অভিলাষী হইয়া প্রশ্ন করিলেন যে ব্রহ্মলোক কাহার মধ্যে ওতোপ্রোত ভাবে জড়াইয়া আছে? যাজ্ঞবল্ক্যকে মোটামুটি বিধ্বস্ত অবস্থায় বলিতে হইল যে ঐরূপ বুদ্ধির অগোচর প্রশ্নের উত্তরদান সম্ভবপর নহে। যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলিলেন যে গার্গীর ঐরূপ ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নহে। বারবার ঐরূপ প্রশ্ন করিলে তাহার মস্তক ভগ্ন হইতে পারে। ব্রাহ্মণদের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সেই গার্গী অতি উদ্ধতভাবে সদর্পে পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, কাশী বা বিদেহ হইতে আগত দুইটি তীরন্দাজ ধনুতে জ্যা সংযোজিত করিয়া শত্রু নিধনের জন্য যেমন সদর্পে উপস্থিত হয়, অনুরূপ ভাবে আমিও দুইটি প্রশ্ন লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি। তাহার উত্তর দান করুন। বৃহদারণ্যকের এই উক্তিতে বেদবিদ্যায় নিষ্ণাত গার্গী নারীশিরোমণিভূতা হইয়া বিদ্বৎ সমাজে উচ্চমানের অধিকারিণী হইয়াছিলেন এই কথা বিশেষভাবে জানিতে পারি। ললনাজনের প্রতি মানদর্শন ও তাহাদের প্রতিভার স্বীকৃতি সমাজে নীতিবোধের অনুকূল পরিবেশের সূচক ও সহায়ক।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দার্শনিক তথ্য ও নীতিবোধের যে সূচনা বা সংকেত পাওয়া যায় তাহার বিশ্লেষণ ও বিশদ রূপায়ণ আমরা পাইয়া থাকি উপনিষদে। এই সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের যে অতিসংক্ষিপ্ত পটভূমিকা প্রদর্শিত হইল তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে যে

নীতিবোধের কথা আলোচ্য বিষয় তাহার উৎস ও ধারাবাহিকতা অন্বেষণ করা। আমরা এই পর্যন্ত দেখিয়াছি যে ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থে অর্থাৎ ঋগ্বেদে প্রধান ও সরাসরি ভাবে নীতিবোধের কথা উদ্‌ঘোষিত না হইলেও যখনই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে তখনই প্রসঙ্গ ক্রমে ধর্ম, সত্য, ব্রত, ঋত প্রভৃতি ধারণা উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে দেবগণের স্তবস্তুতির মাধ্যমে দেবতাদের তুষ্ট করিয়া ঐহিক সুখসম্পদ কামনার পাশাপাশি এই সমস্ত পদের উল্লেখ এইরূপ ধারণাই ব্যক্ত করে যে নীতিবোধের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হইল অধ্যাত্মবিষয়ক ভাবনা, কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে নির্দেশ, সমাজের শ্রেয়সাধন ও অন্যের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার বা অবিচার সম্পর্কে সচেতনতা। তাই অধ্যাপক ভিনটারনিৎজ অবশ্য মনে করেন—'ঋগ্বেদ নীতি বিদ্যার আকর গ্রন্থ মাত্র নহে'।[৯] ঋগ্‌বেদে যাহার সংকেতমাত্র বা স্বল্প আলোচনা, উপনিষদে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মাধ্যমে তাহার পূর্ণ প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি, এবং উত্তরকালে ধর্মশাস্ত্ররূপে সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে সেই বিষয়গুলি নতুন রূপ লাভ করিয়াছে। সংক্ষেপে বৈদিক সাহিত্যে নিহিত এই তথ্য অজ্ঞাত থাকিলে নীতিবোধ বিষয়ক ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবার সম্ভবনা। অধ্যাপক ভিনটারনিৎজ ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের ১১৭নং সূক্তে, যাহা দানসূক্ত বা ধনাস্ত্রদানসূক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করিয়াছেন। নয়টি ঋকের সমন্বয়ে এই নীতিবোধক সূক্তটি দান ও দয়ার মহিমাকীর্তনে সুপ্রযুক্ত।

পঞ্চম মন্ত্রটিতে বলা হইয়াছে যে, উত্তরজীবনে দান ফলপ্রাপ্তির কথা চিন্তা করিয়া বিত্তবান পুরুষ যজমান ব্যক্তিকে ধন দান করুন। মানুষের ঐশ্বর্য রথশ্চক্রের ন্যায় পরিবর্তনশীল এবং ইহা কখন এক ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া বা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে অবলম্বন করে, তাহার চাঞ্চল্য সুবিদিত। দান মহিমায় মুখর ঋষি নৈতিক বাণী উচ্চারণই করিলেন যে কেবল নিজের জন্যই অন্নগ্রহণ করেন, অন্যের প্রতি দানবিমুখ তিনি পাপভাগী হন। 'কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী'—(ঋগ্বেদ ১০.১১৭.৬)। এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই ধর্মশাস্ত্রে — 'অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ।'

যে শব্দটি বিশেষভাবে আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত তাহা হইল 'ধর্ম' এবং আরও বেশী সম্পর্কিত পদ হইল 'ঋত'।

দার্শনিক চিন্তাধারার জগতে 'ধর্ম' পদটি উত্তরকালে মীমাংসাশাস্ত্রে ও বৈশেষিকদর্শনে বিশিষ্টার্থের দ্যোতক হইলেও মূল ঋগ্বেদে মোটামুটি প্রায় বহু ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্রভাবে বা অন্য পদের সহিত সমাসবদ্ধ হইয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্যুৎপত্তিগত ভাবে √ধৃ—ধারণ-পোষনার্থক হইতে যে ইহার উৎপত্তি তাহা স্পষ্টই বটে।[১০]

'ধারণ পোষণ' অর্থে বহুবার ধর্ম শব্দের ব্যবহার ঋগ্বেদে স্পষ্ট (১.১৮৭-১) 'পিতুং ন স্তোষং মহো ধর্মানং তবিষীম্।' সায়ণ—'সর্বস্য ধারকম্' (ধর্ম শব্দের অর্থ ধারক)।

অনুরূপ ১০.৯২.২—'ধর্মানমগ্নিম্'। সায়ণ—'ধর্মানং ধারকম্'; অনুরূপ ১০.২১.৩;। পুণ্যাত্মক অনুষ্ঠান কর্ম রূপেও ধর্মশব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদে স্পষ্ট ১.২২.১৮ ঃ

ত্রীনি পদা বিচক্রমে বিষ্ণোর্গোপা অদাভ্যঃ, অতো ধর্মাণি ধারয়ন্—

(সায়ণ-ধর্মাণি-অগ্নিহোত্রাদীনি) (এক্ষেত্রে অগ্নিহোত্রাদি কর্মকে ধর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে)।

যজ্ঞকর্মকে ধর্মাত্মক বলিয়া স্পষ্ট বর্ণনা করা হইয়াছে ঋগ্বেদে, ১০.৯০.১৬-যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।

অর্থাৎ ধর্মের প্রথম প্রতীক রূপে দেবগণ যজ্ঞকর্মে আত্মনিয়োগ করিলেন। একটি ঋগ্বেদীয় মন্ত্রে সংকেত আছে যে 'ধর্ম' পদ, 'ব্রত' পদ ও 'ঋত' পদ সমপর্য্যায় রূপে পরিকল্পিত—

ধর্মণা মিত্রাবরুণা বিপশ্চিতা ব্রতা রক্ষেয়ে অসুরস্য মায়য়া।
ঋতেন বিশ্বং ভুবনং বিরাজথঃ, সূর্যমা ধত্থো দিবি চিত্র্যাং রথম্।

প্রতিপাদ্য হইল এই যে ধর্মের দ্বারা প্রাজ্ঞ মিত্র ও বরুণ অসুরের মায়ার প্রভাব হইতে ব্রতকে রক্ষা করিলেন। ঋতের (সত্য) দ্বারা সমগ্র ভুবনমন্ডল বিরাজমান। তাদের দ্বারাই স্বর্গে বিচিত্র রথে বিচরণ ও বিরাজ করেন।

এই মন্ত্রটির মধ্যে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে প্রায় সমার্থক রূপে ধর্ম, ব্রত ও ঋত পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'ধর্ম' শব্দের আধ্যাত্মিক শক্তিরূপ অর্থও অসম্ভব নহে। (দ্রষ্টব্য ঋগ্বেদ, ৬.৭০.১)

দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা।
অর্থাৎ প্রভূতবীর্যশালী বরুণের ধর্ম বা তেজের ফলেই জরাহীন হইয়া পৃথিবী ও স্বর্গ বিক্ষোভিত হয়। বরুণের ধর্মের জন্য অন্য একটি ঋগ্বেদীয় মন্ত্র দ্রষ্টব্য (৮.৮৯.৫)।

যে অথর্ববেদকে তাহার আলোচ্য বিষয়ের জন্য বেদপর্যায়ক বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, তাহার মধ্যেও 'ধর্ম' শব্দ একাধিকবার সন্নিবেশিত আছে এবং আশ্চর্যের বিষয় 'ঋত', 'সত্য'; 'তপঃ' ইত্যাদির সাহায্যে 'ধর্ম' শব্দও প্রযুক্ত হইয়াছে। বিশেষ উল্লেখ্য হইল অথর্ববেদের এই মন্ত্রটি —

ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ।
ভূতং ভবিষ্যৎ উচ্ছিষ্টে বীর্য্যাং লক্ষ্মীর্বলং বলে।। ১২.৭.১৭।

ঋগ্বেদীয় প্রয়োগে অনেক স্থলে পাই 'বিধর্মন', 'স্বধর্মন', এবং 'সত্যধর্মন্' ইত্যাদি। শব্দটির ইংরাজীতে বিশ্লেষণ হইতে পারে— 'whose regulations do not fail.

উপনিষদে 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ আরো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদে ধর্মের যে তিনটি স্কন্দের কথা বলা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় এই পদটির প্রতিপাদ্য হইল বর্ণাশ্রম ধর্মের জন্য নির্দেশিত শাস্ত্রবিহিত কর্ম যাহা অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেয়োলাভ সম্ভবপর হইতে পারে—

ত্রয়ো ধর্মস্কন্দা যজ্ঞোহধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এবেতি দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচর্য্যকুলবাসী তৃতীয়োহত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেহবসাদয়ন্ সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি, ব্রহ্মসংস্থোহ-মৃতত্বমেতি।' ২.২৩।

ছান্দোগ্যোপনিষদের বাক্যটির অর্থ হইল এই যে, ধর্মের শাখা তিনটি। তাহার মধ্যে প্রথমটি হইল — যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান (যাহা গৃহস্থের আচরণের জন্য বিহিত হইয়াছে); দ্বিতীয়টি হইল — তপস্যা (যাহা মুনি ও তপস্বীগণের জন্য অনুমোদিত)। আর তৃতীয়টি হইল — ব্রহ্মচর্য্যবরণ ও আচার্য্যের গৃহে বিদ্যাগ্রহণের জন্য গুরু সেবাপূর্বক বাস এবং গুরুর দেহাবসানেও সেখানে আজীবন বাস (মনু সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মচারীর পক্ষে গুরু গৃহ বাসের বিধি নিয়ম অতি বিস্তৃত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে)। এইরূপ আচরণ করিয়া জনগণ পুণ্যলোকে গমন করিতে সমর্থ হয় এবং তাহার ফলে ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে বা অমর হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যোপনিষদের এই বাক্য সাধারণভাবে আশ্রমধর্মে আচরণীয় কর্মকেই সঙ্কেতিত করিতেছে এবং ইহা সাধারণ উক্তিমাত্ররূপেই গ্রাহ্য মনে করিতে হইবে।

এই উপনিষদের বাক্যটির প্রসঙ্গে শংকরাচার্য্যের আলোচনা তো আছেই, অধ্যাপক R.C. Hazra তাহার নিবন্ধে (*Our Heritage*, vol.II, pt.I, p.15-36) যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার সমালোচনা করিয়াছেন অধ্যাপক P.V. Kane (দ্রষ্টব্য *History of Dharmaśāstra*, vol. I, pt.I, p.3)।

মনে রাখিতে হইবে যে উপনিষদাত্মক শ্রুতি অংশমাত্রের বক্তব্য হইতে সকল সময়ে যে ধর্মের রূপটি প্রতিভাত হইবে তাহা নহে। ইহার আধ্যাত্মিক রূপটিও দ্রষ্টব্য। সেই বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদে ২.৫.১১ অংশে উদ্ধৃত পংক্তি প্রণিধানযোগ্য—

> অয়ং ধর্মঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য ধর্মস্য সর্বাণি ভূতানি মধু
> যশ্চায়মস্মিন্ ধর্মে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং
> ধর্মস্তেজোময়োহমৃতময়ো পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্মেদমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্।

মনে করা যাইতে পারে যে ধর্মের এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহা আত্মা বা ব্রহ্ম বা অমৃতত্বের পর্য্যায়াত্মক বলিয়া অভিহিত।

আচার্য্য শংকর ব্রহ্মসূত্রের ৩.৪.১৮-২০ সূত্রের উপর ছান্দোগ্যোপনিষদের এই অংশটির বিশাল আলোচনা করিলেও, তাহার মাধ্যমে 'ধর্ম' শব্দটির বিশিষ্ট অর্থ বিষয়ে

আলোকপাত করেন নাই। তৈত্তিরীয়োপনিষদে (১.১১) যখন স্পষ্টভাবে নির্দেশ আছে 'ধর্মং চর'—তখন তাহা শাস্ত্রানুগ কর্তব্যাত্মক অর্থকেই প্রকাশ করে। (দ্রষ্টব্য-আচার্য্য শংকরের বিশ্লেষণ—ধর্ম ইতি অনুষ্ঠেয়ানাং সামান্যবচনম্) 'ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্'—এই নির্দেশের বিশ্লেষণে শংকরের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—'ধর্মশব্দস্যানুষ্ঠেয়বিষয়ত্বাদননুষ্ঠানং প্রমাদঃ)। ধর্ম শব্দটির ঠিক ঠিক প্রতিপাদ্য অর্থকে বৈদিক দার্শনিকরা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন নাই, মনে হয় তাহা সম্ভবপর নয় বলিয়া।[১১]

বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'ধর্ম' পদটির যে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহাতে তাহার নৈতিক রূপটি প্রকটিত, কারণ স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে 'ধর্ম' ও 'সত্য' সমপর্য্যায়ক এবং আরও বলা হইয়াছে যে সত্যপর্য্যায়ক বা সত্যাত্মক ধর্মের প্রকৃতি হইল শ্রেয়োরূপক অর্থাৎ কল্যাণাত্মক এবং ইহা পরমপুরুষ ব্রহ্মোদ্ভাবিত বলিয়া সর্বাপেক্ষা বলবান্ ও সর্বনিয়ন্ত্রক। উপনিষদের বক্তব্য—

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব ১.৪.১১

স নৈব ব্যভবৎ, তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজৎ ধর্মং তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্ম, তস্মাৎ ধর্মাৎ পরং নাস্ত্যথো অবলীয়ান্, বলীয়াংসমাশ্যাসতে ধর্মেণ যথা রাজ্ঞৈবম্। যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ। তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহুর ধর্মং বদতীতি ধর্মং বা বদন্তং সত্যং বদতীত্যে-তদ্ব্যেবৈতদুভয়ং ভবতি। ১.৪.১৪।

শংকরের সংযোজন—

তস্মাৎ সিদ্ধং ধর্মস্য সর্ববলবত্তরত্বাৎ সর্বনিয়ন্তৃত্বম্।

এই ধর্মের প্রভাব, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদক ঋগ্বেদীয় মন্ত্রটি উপসংহারে উল্লেখযোগ্য

> যতশ্চোদেতি সূর্যোহস্তং যত্র চ গচ্ছতি প্রাণাদ্বা এষ উদেতি।
> প্রাণোহস্তেমেতি, তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্মং স এবাদ্য স উশ্ব ইতি।। ১.৫.২৩।(১১ক)

ইহার অর্থ হইল এই যে ঃ—

ব্রহ্ম পূর্বে একাকী ছিলেন। তিনি তাহাতে প্রীত না হইয়া শ্রেয় স্বরূপ ধর্মকে সৃষ্টি করিলেন। সেই ধর্ম হইল ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্ররূপ। অতএব ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। ধর্মের ফলেই বলহীন বলীয়ান হইয়া থাকে। যেমন—রাজা অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। এই যে ধর্ম তাহা সত্যস্বরূপ। অতএব যে সত্য কথা বলে লোকে তাহার পরিচয় দেয় যে সে ধর্মই বলে। আবার যে ধর্মের কথা বলে তাহাকেও বলা হয় যে সে সত্য বলে। (অতএব) ধর্ম ও সত্য উভয়ই সমপর্য্যায়করূপে পরিগণিত।

শংকরের যে সংযোজন তাহার প্রতিপাদ্য হইল এই ধর্ম সকল বস্তু অপেক্ষা বলবত্তম বলিয়া সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

ঋগ্বেদীয় মন্ত্রটির অভিধেয় এই যে — ধর্ম হইল সেই শক্ত্যাত্মক বস্তু যাহা হইতে (যাহার বলে) সূর্য উদিত ও অস্তমিত হয়। প্রাণের উদয় ও অস্ত ইহারই প্রভাবে হয়। সেই শক্তিকেই দেবগণ ধর্মরূপে সৃষ্টি করিলেন। সেই ধর্ম অদ্য স্বরূপ অর্থাৎ বর্তমান স্বরূপ, আবার ভবিষ্যৎ স্বরূপ।

'ঋত' পদটি ধর্মপর্য্যায়ক অর্থে ব্যবহৃত হইলেও 'ধর্ম' হইতে ইহার কিছু পার্থক্য স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমতঃ ঋত বলিতে কোন একটি অত্যুচ্চকোটিক সর্বশক্তিমান নীতিবোধ বোঝানো হয় যাহার দ্বারা সমগ্র বিশ্ব, এমন কি দেবগণ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত।[১২] ইহা বৈদিক বলিয়া যাগযজ্ঞের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ঋগ্বেদে ৪.২৩; ৮-১০ মন্ত্রগুলির মধ্যে 'ঋত' শব্দের বহুবার প্রয়োগ হইয়াছে। দুই একটি উদাহরণ প্রাসঙ্গিক —

ঋতেন দীর্ঘমিষণন্ত পৃক্ষ ঋতেন গাবঋতমাবিবেশুঃ
ঋতং যেমান ঋতমিৎ বনোতি ঋতস্য শুষ্মস্তুবয়া উ গব্যুঃ
ঋতায় পৃথ্বী বহুলে গভীরে ঋতায় ধেনূ পরম দুহাতি। (৪.২৩ ১০;)

যাস্ক অবশ্য নিরুক্তে (১০.৪১) 'ঋত' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন জল রূপে। 'নীতি' অর্থেও ইহা প্রযুক্ত হয়—

ঋতেন বিশ্বং ভুবনং বিরাজযঃ। (ঋক্ ৫.৬৩.৭)

এই নীত্যর্থক ঋতের জোরেই মিত্র এবং বরুণ সমগ্র বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। তাহারা উভয়ে ঋতের পোষক—ঋগ্বেদ

ঋতস্য গোপাবধি তিষ্ঠয়ো রথং সত্যধর্মানো পরমে ব্যোমনি। ৫.৬৩ ১

এ বিষয়ে বহুশ্রুত ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্রটির অংশ উল্লেখযোগ্য—মধু বাতা ঋতায়তে (১.৯০.৬)। ঋগ্বেদীয় মন্ত্রদৃক্ ঋষি বলিতেছেন যে, তিনি 'ঋত'কে আশ্রয় করিয়াই থাকিতে চাহেন (ঋ. ৫.১২.২)। তিনি অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, যাহারা অমৃতের দ্বারা ঋতের প্রতিবন্ধক, তাহারা যেন পাশবদ্ধ হন (ঋক্ ১০.৮৭.১১)। ঋগ্বেদীয় দশম মন্ডলে যম যমীর প্রণায়োপাখ্যানের উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে 'ঋত' পদের নীতিবোধাত্মক অর্থটি প্রকট। একাধিকবার যম যমীর উগ্র প্রণয়নিবেদন অনৈতিক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ভ্রাতা ও ভগিনীর এই আকর্ষণ ঋত বিরোধী। মনে হয় একটু পরবর্তী সময় 'ঋতের' গুরুত্ব এত বৃদ্ধি পাইল যে 'ঋত' স্বয়ং দেবত্ব পর্য্যায়ে উন্নীত হইল এবং উত্তরকালে মনুস্মৃতিতে ধর্ম যেরূপ দেবতায় পরিণত হইয়াছিল (দ্রষ্টব্য-বৃষো হি ভগবান্ ধর্মঃ মনুসংহিতা ৮/১৬), ঋগ্বেদের দশম মন্ডলে অদিতি, ইন্দ্র ও বিষ্ণুর পাশাপাশি ঋতও স্বতন্ত্র দেবতারূপে স্বীকৃতি লাভ করিল।

(দ্রষ্টব্য-অদিতি দ্যাবাপৃথিবী ঋতং মহদিন্দ্রবিষ্ণু মরুতঃ স্ববৃহৎ। ঋক্ ১০.৬৬৪।)

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঋতের গুরুত্ব আরও প্রকটিত হইল যখন আমরা লক্ষ্য করি যে, বৈদিক সত্যদর্শী ঋষিগণ ঋতের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন। 'ঋত' পদ সত্যার্থক ও সত্যপর্যায়ক বলিয়া এবং সত্য সর্বদা সর্বকালে নীতির সহিত ওতঃপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত বলিয়া বেদে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে —

(দ্রষ্টব্য ঃ ঋক্, ৯.১১৩. ৪ ঃ ঋতং দেন্নৃতদ্যুম্ন সত্যংবদম্ সত্যকর্মান্।)

ইহারা উভয়েই যে তপস-সম্ভূত তাহাও অঙ্গীভূত হইয়াছে ঋগ্বেদে —

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত। (১০.১৯০.১)

এই ঋত প্রসঙ্গে নীতিবোধের সাথে সম্পর্কিত এই ধারণা যে ইন্দো-ইরানীয় কালে পর্যন্ত আর্যদের ছিল তাহা সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন অধ্যাপক Keith তাঁহার *The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishad* গ্রন্থে।[১৩] এ বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতির ইতিহাসে নীতিবোধ সম্পর্কিত আলোচনা করিয়া নতুন তথ্যের পরিবেশনা করিয়াছেন ডঃ রাধাগোবিন্দ পাল তাহার গ্রন্থে (*The History of Hindu Law*, Univ. of Cal, 1958, পৃ. ১০৯)।

বৈদিক নীতিবোধ বিষয়ক আলোচনার পটভূমিকায় ধর্মশাস্ত্রে নীতিবোধের বিষয়টি সংক্ষেপে উপস্থাপিত হইতেছে। ধর্মশাস্ত্র নামক যে শাস্ত্রসমূহ স্মৃতি নামক অপর সংজ্ঞার দ্বারা সংজ্ঞিত হয়[১৪] সেই সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে বিশেষভাবে সংহিতা গ্রন্থের পরবর্তী বা প্রায় সমকালীন গ্রন্থ সকল ধর্মসূত্র[১৫] বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে 'ধর্ম' পদটি যাহা নীতিবোধক বা নির্দেশক বলিয়া যথার্থ ভাবে পরিগণিত হইতে পারে এবং যে পদটি আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে ঋগ্বেদ হইতে শুরু করিয়া উপনিষদ ও আরণ্যকের মধ্যে বহুপ্রকার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা স্মৃতিগ্রন্থে আরো ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করায় ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতির গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধ হইল। আরও বৈশিষ্ট্য লাভ করিল ইহার জন্য যে ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতি আরোপিত দায়িত্ব গ্রহণ করিল সমগ্র সমাজের জীবনটাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার।

মনু স্পষ্টই উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন যে তৎপ্রণীত স্মৃতিগ্রন্থ সমাজের সকল বর্ণের লোকের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ক্রিয়াকলাপ ও কর্তব্যাকর্তব্যের নিয়ন্ত্রণে রচিত —

নিষেকাদিশ্মশানান্ত মন্ত্রৈর্যস্যোদিত্যৌবিধিঃ।

তস্য শাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন্ জ্ঞেয়ঃ নান্যস্য কস্যচিৎ।। ম. সং. ২।১৬

অর্থাৎ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সংস্কার মন্ত্রের দ্বারা যাহাদের জন্য বিহিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিগণই এই (ধর্ম) শাস্ত্র পঠন-পাঠনের অধিকারী, এই অধিকার অন্য কাহারও হইবেনা বলিয়া জানিতে হইবে।

মনু তাঁহার গ্রন্থে প্রতিপাদ্য বিষয়ে যে সূচী নির্দেশিত করিয়াছেন তাহাতে কর্তব্যাত্মক অর্থে ধর্ম শব্দের প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে সমাজের প্রতিটি নাগরিকের অবশ্য ধর্ম বা কর্তব্যবোধের বিভিন্ন অবস্থায় কি কি আদর্শ কর্তব্য তাহার বিস্তৃত তথা সুশৃঙ্খল ভাবে ধর্মশাস্ত্রে নিবেদিত হইয়াছে (আলোচ্য শ্লোকসংখ্যা ১.১১১-১১৭)। বিশেষভাবে এই শ্লোকটি উল্লেখযোগ্য যাহাতে আরও ব্যাপকভাবে তাহার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে—

দেশধর্মান্ জাতিধর্মান্ কুলধর্মাংশ্চ শাশ্বতান্।
পাষন্ডগণধর্মাংশ শাস্ত্রেহস্মিন্নুক্তবান্ মনুঃ।। ম. সং. ১১৮

মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি আবার অন্যান্য স্মৃতি বিবরণকারগণের বিশ্লেষণ অনুধাবন করিয়া ধর্মকে পাঁচ প্রকারের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম ও গুণধর্ম—যাহার বিবরণ আরো বিশদভাবে দেখাইয়াছেন মনুর অপর প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লুকভট্ট, ভবিষ্যপুরাণ হইতে উদ্ধৃতি সহকারে।(দ্রষ্টব্য-মনুসংহিতা, ২।২৫-র উপর মেধাতিথি কৃত ভাষ্য ও কুল্লুকভট্ট কর্তৃক টীকা)।

'ধর্ম' পদের স্মৃতিশাস্ত্রানুগ ব্যাখ্যায় মনু বিশেষ ভাবে অবলম্বন করিয়াছেন শ্রুতি। অন্যান্য ধর্মসূত্রকারগণ ও ধর্মসংহিতা রচয়িতাগণ মনুর বাক্যটিকে দৃঢ়ভাবে উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন যে, ধর্ম জিজ্ঞাসার জন্য শ্রুতি প্রথম ও প্রধান অবলম্বন—'ধর্মং হি জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ,' (ম. সং. ২/১৩)। এ বিষয়ে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য মনুসংহিতার আরো বিবরণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে তিনি 'ধর্ম' শব্দের বিবরণ দান করিয়াছেন। ক্রমে তিনি বলিয়াছেন সমগ্র বেদই ধর্মের মূল (২.৬. বেদোহখিলং ধর্মমূলম্... তুষ্টিরেব চ)। ইহারই দৃঢ়ীকরণের জন্য আবার তিনি বলিয়াছেন '২।১২, বেদঃ স্মৃতিঃ...এবং চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্মস্য লক্ষণম্। দ্রষ্টব্য যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে, ১।৭ — শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ ...ধর্মমূলমিদং স্মৃতম্।

প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার না করিলেও শ্রুতি হইতে গূঢ়ার্থ গ্রহণ করিয়াই মনে হয় মনু যখনই কর্তব্য অর্থে গ্রহণ করিলেন 'ধর্ম' শব্দটি, তখনই স্বীকার করিয়া লইলেন নীতিবোধের মূলমন্ত্রটি। যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় অতি সোচ্চার হইয়া তিনি আধ্যাত্মিক দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি যত না আকৃষ্ট করিয়াছেন তদপেক্ষা অধিক নিবেদিত হইয়াছে লৌকিক নীতি বা কর্তব্য বোধের রূপটি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে পরম ধর্ম হইল যোগের মাধ্যমে আত্মদর্শন—

'অয়ংতু পরমো ধর্মো যদ্যোগেনাত্মদর্শনম্।' (১.৮)

তৈত্তিরীয়োপনিষদে (১ ১১) আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে অনুষ্ঠেয় শাস্ত্রানুমোদিত কর্মের কর্তব্যতা সংকেতিত হইয়াছে 'ধর্মং চর' এই নির্দেশের মধ্যে। অপর যে পদটি অবশ্যকরণীয় রূপে কর্মের দ্যোতক তাহা হইল 'ঋণ'। 'ঋণ' ও 'অবশ্যদেয়ত্ব' এই দুইটি ভাবনাই পর্য্যায়াত্মক বলিয়া শাস্ত্রকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈদিক কাল হইতেই এই ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে জন্ম হইতেই মানুষ ঋণদায়ে জড়িত। অর্থাৎ মনুষ্যজন্মই কর্তব্যের বন্ধনে নিয়ন্ত্রিত—ইহার স্পষ্ট নির্দেশ পাই শতপথব্রাহ্মণে, ১.৭.২.১—

> ঋণং হ বৈ জায়তে যোঽস্তি, স জায়মান এব দেবেভ্যঃ ঋষিভ্যঃ পিতৃভ্যো মনুষ্যেভ্যঃ...

সায়ণ তাহার ভাষ্যে বিষয়ের গুরুত্বটিকে আরও বিস্তৃত করিয়াছেন,'ঋণত্বে জননমেব নিমিত্তম্'।[১৬] এই ঋণ ধর্মশাস্ত্রে একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়া নীতিবোধকে অধিকতরভাবে জীবনচর্য্যার অংশভূত করিয়াছে। প্রায় প্রতিটি ধর্মসূত্রে এবং মনুসংহিতায় পঞ্চমহাযজ্ঞের[১৭] (অর্থাৎ প্রতিটি গৃহস্থের অবশ্য অনুষ্ঠেয় দৈনন্দিন কর্মের) যে জয়গান উদেঘাষিত হইয়াছে তাহা স্পষ্টই প্রতিপাদিত করে যে ঋণকল্প এই নীতি বা কর্তব্যবোধ গৃহস্থের জীবনকে সুন্দর ও সুসমঞ্জস করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে।

গৌতম প্রণীত ধর্মসূত্র ধর্মসূত্রসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া স্বীকৃত হয়। ইহার মধ্যে আমরা সংস্কারের উল্লেখ পাই।[১৮] এই সংস্কারের ধারণা অতি প্রাচীন বৈদিক কাল হইতেই ভারতীয় সমাজে যথোপযুক্ত সমাদরের সহিত স্বীকৃত হইয়াছিল। গৌতমীয় ধর্মসূত্রে যে সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার বৈশিষ্ট্য হইল এই যে এই প্রসঙ্গে তিনি আটটি আত্মগুণের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'দয়া সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরনসূয়া শৌচমনায়াস মঙ্গলমকার্পণ্যং স্পৃহেতি। (গৌতমধর্মসূত্র, ১.৮. ২৩-২৪)। গৌতমোক্ত আত্মগুণের অনুরূপ ধর্মের উল্লেখ পাই অত্রিস্মৃতিতে (৩৪-৪১) এবং বৃহস্পতির সংস্কারকাণ্ডে (৪৮৯-৫০০) আবার দ্রষ্টব্য বায়ুপুরাণ (৫৯. ৪৩-৪৯)। ধর্মসূত্রের উপর হরদত্তকৃত মিতাক্ষরা সংজ্ঞক টীকায় এই সমস্ত গুণসমূহের বিস্তৃত বিশ্লেষণ আছে। এই টীকা সমেত গৌতমধর্মসূত্র আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলিতে, গ্রন্থাভূ ৬১, এ. ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে পুণা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহারই অর্থবাদরূপে বলা হইয়াছে যস্যৈতে চত্বারিংশৎ সংস্কার — ন চাষ্টাবাত্মগুণা ন স ব্রহ্মণঃ সাপূ সালোক্যং গচ্ছতি। (১.৮.২৫) ইহার দ্বারা ধর্মশাস্ত্রকারগণের এই ধারণা স্পষ্ট যে উল্লিখিত গুণসমূহের অর্জনের জন্য চেষ্টা করিলে নৈতিক মান উন্নত হইতে বাধ্য এবং অর্থবাদরূপে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার প্রতিপাদ্য এই যে সংস্কার সকলের পক্ষে অবশ্য অনুষ্ঠেয়, যেহেতু মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে সংস্কারের অনুষ্ঠানের কালে দেহ, মন, আত্মা শুদ্ধি লাভ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায়ক রূপে পরিগণিত হয়।[১৯] অতএব

আত্মগুণের অর্জনের জন্য সকলের প্রয়াসও আবশ্যিককল্প।

'ধর্ম' সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ধর্ম শ্রুতিমূলক। ধর্মশাস্ত্রে বা স্মৃতিগ্রন্থসমূহে শ্রুতির অনুমোদিত রূপেই আবার সাধারণের নীতিজ্ঞানের উদ্বোধক ও বিবর্ধক সামান্য ধর্মের কথা পৃথকভাবে নির্দেশিত হইয়াছে। আমরা 'ঋত' পদের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি যে 'ঋত' পদ সত্যার্থক-ও বটে। সত্যের জয়গাথা ঋগ্বেদীয় যুগ হইতেই উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল। শতপথব্রাহ্মণে দৃঢ়ভাবে বলা হইয়াছে যে অনৃতবাদী যজ্ঞকর্মে অনুপযোগী (অমেধ্যো বৈ পুরুষো যদনৃতং বদতি। শতপথব্রাহ্মণ ১.১.১.১)। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১.১১.১) ধর্মাচরণের পূর্বেই নির্দেশ — 'সত্যং বদ'। ঐ উপনিষদে ১. ৩২৮-এ 'অসতো মা সদ্‌গময়' -যে বলা হইয়াছে তাহাও এই প্রসঙ্গে অনুকূল।

বশিষ্ঠ তাঁহার ধর্মসূত্রে (১০. ৩০) কতকগুলি মনুষ্যকর্তৃক অনুসরণযোগ্য ধর্মের কথা উল্লেখ করিয়া পুনরায় বলেন—'সর্বেষাং সত্যমক্রোধো দানমহিংসা প্রজননত্ব' (৪.৪)। আপস্তম্ব 'ভূতদাহীয়' ধর্মের পরিহারের কথা বলায়, হরদত্ত উজ্জ্বল টীকায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'ভূতানাং দাহো ভূতদাহস্তস্মৈ হিতাঃ ভূতদাহীয়াঃ' (১.৮.২৩.৩)—১.৮. ২৩.৬ দ্রষ্টব্য। সনাতনপন্থী এই ধর্মসূত্রকার সেই সমস্ত গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহার অনুশীলনে মনের শুদ্ধি ঘটার ফলে আত্মোন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

মনু কিন্তু আর একটি উন্নততর পদক্ষেপ করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, যে কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে অন্তরাত্মার পরিতোষ হয় তাহাই অনুষ্ঠেয়, তদ্বিপরীত কর্ম বর্জনীয়—

> যৎ কর্ম কুর্বতোহস্য স্যাৎ পরিতোষোহন্তরাত্মনঃ।
> তৎ প্রযত্নেন কুর্বীত বিপরীতং তু বর্জয়েৎ।। ম সং. ৪. ১৬১।

নীতিবোধবিষয়ক মনুর বিশেষ বচনসমূহ অত্যুচ্চকোটির বলিযা নিঃসন্দেহে পরিগণিত হইতে পারে—

> ধর্মঃ শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্মীকমিব মৃত্তিকাঃ।
> পরলোকসহায়ার্থং সর্বভূতান্যপীড়য়ন্।। ৪ ২৩৮
> নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
> ন পুত্রদারা ন জ্ঞাতিঃ ধর্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ।। ৪ ২৩৯

পরের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের অন্তরাত্মার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার জন্য মনুর বিধান উচ্চ পর্যায়ক নীতিবোধের পরিচায়ক। তিনি বলেন—

> মন্যতে বৈ পাপকৃতো ন কশ্চিৎ পশ্যতীতি নঃ।
> তাংস্তু দেবাঃ প্রপশ্যন্তি স্বস্যৈবান্তরপুরুষঃ। ৮. ৪৫

এই প্রসঙ্গে দেবল নামক স্মৃতিকারের বচন অত্যন্ত উপাদেয় ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক—

শ্রূয়তাং ধর্মসর্বস্বং শ্রুত্বা চৈবাবধার্য্যতাম্।

আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ।। (কৃত্যরত্নাকরে উল্লিখিত। পৃঃ ১৭)

মনু বিভিন্ন প্রসঙ্গে নীতিবোধাত্মক ধর্মের সম্পর্কে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অবিকল ভাবে উদ্ধৃত হইল—

সত্যধর্মার্য্যবৃত্তেষু শৌচে চৈবারমেৎ সদা। ৪. ১৭৫
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্মং চাতুর্বর্ণ্যেহব্রবীন্মনুঃ।। ১০. ৬০

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণ চ।
অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।। ৬।৬০

চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈঃ নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশলক্ষণকো ধর্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ।।
ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।। ৬।৯১-৯২ ঃ

(দ্রষ্টব্য যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, ১.১২২; ৩.৬৬; বিষ্ণুস্মৃতি, ২. ১৬-১৭)

ক্ষুদ্রায়বব এই পরিসরের মধ্যে ধর্মশাস্ত্রে নীতিবোধ সম্পর্কে যাহা আলোচিত হইল তাহার পিণ্ডিতার্থ এই যে শ্রুতিতে যে নীতিবোধ সংকেতে ইতস্ততঃ ভাবে সংরক্ষিত তাহাই সুসংহত আকারের ধর্মশাস্ত্রে পূর্ণতা ও পরিণতি লাভ করিয়াছে।

টীকা ও তথ্যপঞ্জী

১। পূর্ণজ্ঞানলাভের জন্য যে সমস্ত বৈদিক তপস্বীগণ তপস্যায় রত হইয়াছিলেন তাহাদের প্রজ্ঞায় বেদপুরুষ স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করিলেন এবং তাহার ফলেই ঐ তপস্বীবৃন্দ সত্যজ্ঞানদ্রষ্টারূপে ঋষিপদবাচ্য হইলেন। —তৈত্তিরীয় আরণ্যক (২.৯.২)

২। মনুসংহিতার ১।১ শ্লোকের ভাষ্য

৩। যানি মনুরবৃণীতা পিতা নঃ। ২.৩৩.১৩
অর্থাৎ যে মনু আমাদের পিতা, তিনি যাহা বরণ করিয়াছিলেন।

৪। ঋগ্বেদ, ৮.৩০.৩। অর্থাৎ বিশ্বদেব দেবতার নিকট প্রার্থনা তিনি যেন (যজমানকে) পিতৃভূত মানব পথ হইতে আমাদিগকে দূরদেশে প্রচলিত না করেন।

৫। এ বিষয়ে M. Winternitz বিরচিত *A History of Indian Literature* (মূল

জার্মান ভাষায় রচিত গ্রন্থের অনুবাদ V. Srinivas Sarma, vol. I, প্রথম সংস্করণ, দিল্লী ১৯১১) গ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য —'The cultural image which flows towards out of the songs and which Heinrich Zimmer has described in his masterly way in his Altindischen Leben (Berlin, 1878), which is a valuable book even today, shows us the Aryan Indians as an active, vivacious and pugnacious race of simple and partly still of rude customs. The Vedic reciters pray to the gods for help against the enemy, for victory in battle, for fame and rich booty. They pray for wealth, heaps of gold and numberless herds of cattle, for rain, for field, for progeny and long life.' পৃঃ ৬১.

৬। Winternitz-এর মত এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য — 'The great significance of the Atharvavedasaṁhitā lies in this that it is for us an inestimable source of knowledge of the actual popular religion which is not yet influenced by the priestly religion, of the belief in numberless spirits, goblins, ghosts and demons of all kinds and of the practice of magic that is of such great importance to ethnology and history of religion'. ঐ পৃঃ ১১৮

৭। মন্ত্রগুলি স্বপরিচায়ক— আ ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তাম্ আ রাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূর ইষব্যোহতিব্যাধী মহারথো জায়তাং, দোগ্ধ্রী ধেনু র্বোঢ়াহনড্বানাশুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধিঃ যোষা জিষ্ণু রথেষ্টাঃ সভেয়ো যুবাহস্য যজমানস্য বীরো জায়তাং নিকামে নিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু, ফলবত্যো ন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাং যোগক্ষেমো নঃ কল্পতাম্।

৮। দ্রষ্টব্য তৈত্তিরীয়সংহিতা ৬.৩.১০.৫, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ১.৫.৫৬ বিশেষ দ্রষ্টব্য ৫.৪.১০।

৯। 'The Ṛg veda is everything but a texbook of morals.'— *A History of Indian Literature,* vol. I পৃঃ ১১৫

১১। Max Müller যথার্থই বলিয়াছেন—'There is what Leibniz called *Perennis quoedam philosophia*, a search after truth which was not confined to the schools of priests or philosophers. Its language no doubt is less exact than that of Aristotle, its tenets are vague and the light which it sheds on the dark depths of human thought resembles more the strict lightning of a sombre evening, than the bright rays of the cloudless sun-rise Yet there is much to be learnt by the historian and philosopher from these ancient guesses at truth.'

১২। The supreme transcendental law or the cosmic order by which the universe and even the gods are governed.

১৩। 'In the physical world there rules a regular order Ṛta which is observed repeatedly and which is clearly an inheritance from the Indo-Iranian period, since the term Aśa (Urta) is found in Avesta, and has there the same triple sense as in Vedic India, the physical order of the universe, the due order of the sacrifice and the moral law in the world. We are doubtless justified in seeing in the world Urta as it appears in the names recorded in the Tell-el-Amarna Correspondence the same word, and in inferring that the sense was somewhat the same at that early period about 1400 B.C (Von Schroder, Arische Religion 1.348 ff) insists that Ṛta is essentially Varuṇa's possession. Carnov (*JAOS*, XXXVI, 307) suggests Babylonian influence). The identity of the Vedic and Avestan expressions is proved beyond the possibility of doubt by the expression 'spring of Ṛta', which is verbally identical in the Avesta (Yasna X. 4; R.V. II. 28.5) and the Rgveda'. (First edition 1925,

Motilal Banarsidass, Delhi), পৃঃ ৮৩-৮৫

১৪। ভগবান মনুর উক্তি এই ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য—'ধর্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ' (ম. সং, ২।১০)। ভাষ্যকার মেধাতিথি কিন্তু স্ববুদ্ধিবলে শ্রুতিস্মরণাত্মক উপাদানটির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া 'স্মৃতি' পদটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে স্মৃতি হইল সেই সব গ্রন্থ যেখানে ধর্ম কর্তব্যাত্মকরূপে প্রতীয়মান হয় 'যত্র ধর্মঃ শিষ্যতে কর্তব্যতয়া প্রতীয়তে সা স্মৃতিঃ।' (ঐ শ্লোকের ভাষ্য) ইহার ফলে নিবন্ধ, এমন কি

শিষ্টসমাচারও স্মৃতিপদবাচ্য। পরে কিন্তু বাধ্য হইয়াই মনে হয় শ্রুতি উক্ত বাক্যের স্মরণ করিয়া নিবন্ধ গ্রন্থকে স্মৃতিরূপে পরিগণিত করিযাছেন-'যত্র শ্রূয়তে ধর্মানুশাসনশব্দঃ সা শ্রুতিঃ। যত্র চ স্মর্য্যতে সা স্মৃতিঃ।' (ঐ শ্লোকের ভাষ্য)। বেদের ন্যায় স্মৃতিরও ধর্ম বিষয়ে প্রামাণিকতা উক্ত শ্লোকেই (২।১০) মনু স্পষ্টভাবে নির্দেশিত করিয়াছেন--

শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্বার্থেস্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্মো হি নির্বভৌ।।

১৫। এইরূপ ধর্মসূত্রের সংখ্যা ধর্মসংহিতা বা স্মৃতি গ্রন্থ অপেক্ষায় খুবই স্বল্প। স্মৃতি গ্রন্থের সংখ্যার একটা সাধারণ পরিসংখ্যান আমরা পাই মনুর পরবর্তী যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়, ১।৪.৫ —

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোহঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতিঃ।। ১.৫
পরাশর ব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ।। ১.৫

এই সংখ্যা যে স্মৃতিপ্রণেতৃগণের সম্পূর্ণ সংখ্যার পরিচায়ক নহে তাহা অবশ্যই বুঝিতে হইবে। মিতাক্ষরা নামক টীকায় বিজ্ঞানেশ্বর ইহা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন. 'নেয়ং পরিসংখ্যা কিন্তু প্রদর্শনার্থমেতৎ'। অনুরূপভাবে দ্রষ্টব্য দেবণভট্টের স্মৃতিচন্দ্রিকা, সংস্কারকান্ড, পৃঃ ২। সেখানেই উল্লিখিত পৈঠিনসি কৃত স্মৃতি গ্রন্থের সংখ্যা ৩৬ বলিয়া, (পৃঃ ১-২)। হেমাদ্রির চতুর্বর্গচিন্তামণি গ্রন্থে (vol I পৃঃ ৫২৭;) এই সংখ্যা ২১। ইহাদের বিভিন্ন মতের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য H. Chatterjee Sastri সম্পাদিত *Dāyabhāga,* vol. I, Introduction, ch. 8। সূত্রাকারে রচিত ধর্মসূত্রসমূহের রচয়িতা হইলেন গৌতম, বৌধায়ন, আপস্তম্ব, বশিষ্ঠ, হারীত প্রভৃতি যাহাদের গ্রন্থবিষয়ক বিশেষ তথ্যাদির জন্য অনুসন্ধেয় — P. V. Kane, *History of Dharmasastra,* vol. I, pt I.

১৬। ঋণ সম্পর্কে শাস্ত্রীয় তথ্য ও তাহার বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য, H. Chatterjee Sastri, *The Law of Debt in Ancient India,* Calcutta Sanskrit College Research Series No. LXXV, Calcutta পৃঃ ৮৩-৯৫

১৭। পঞ্চমহাযজ্ঞের পান্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টিতে আলোচনার জন্য বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। K.G. Goswami, 'The Philosophy of the Pañcamahāyajñas',

Calcutta Review, LXV. (Nov. 1937) পৃঃ ২০৩-২১০। ঐ সম্পর্কে শাস্ত্রীয় তথ্যের পূর্ণ সমাবেশের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ P.V. Kane, *History of Dharmasastra*, vol. II. I, পৃঃ ৬৯৬...

১৮। গৌতমের ধর্মসূত্র ১৮.১৪.২২। বিস্তৃত বিবরণের জন্য বিশেষভাবে আলোচনীয় গ্রন্থ P.V. Kane, *History of Dharmasastra*, vol. II, pt. I. R. B. Pandeya, *Hindu Saṁskāras*

রামায়ণের নীতি-ধর্ম

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

এক

সংস্কৃত সাহিত্যে 'অর্থগৌরব' বলে একটি শব্দ রসিক-সুজনের মধ্যে প্রচলিত আছে। শব্দটির অর্থ — খুব কম সংখ্যক শব্দ প্রয়োগ কবে বহু এবং গভীর অর্থের দ্যোতনা করা — অল্পীয়সাপি শব্দেন বহ্বর্থদ্যোতনম্। নীতি এবং ধর্ম শব্দদুটিব আভিধানিক অর্থ নিশ্চয়ই আছে এবং তা আমরা জানিও, কিন্তু যে মুহূর্তে বলা হবে রামায়ণে নীতি এবং ধর্মের বিচার করতে হবে, সেই মুহূর্ত থেকেই লেখক সমালোচক অথবা বক্তাকে রীতিমত অবহিত হয়ে বসতে হবে। কারণ লোক-সমাজে নীতি এবং ধর্ম শব্দ উচ্চারণ করলে যা বোঝানো যাবে, রামায়ণের নীতি এবং ধর্ম সেরকম নয়। মহাকাব্যের কবির মনোভূমি এমনই উচ্চাবচ মনন-চিহ্নে চিহ্নিত যে, সেখানে 'নীতি' শব্দের উচ্চারণ মাত্রেই কোন আভিধানিক নৈতিকতা সংকেতিত হয় না, আবার কোথাও বা তা হয়ও। একইভাবে 'ধর্ম' শব্দের উচ্চারণেই যেমন লোক সমাজে ফুল-বেলপাতা, নৈবেদ্য অথবা শাস্ত্রসিদ্ধ ওঁঙ্কার-বষট্কার মনে আসে, রামায়ণের সামাজিক পরিমন্ডলে 'ধর্ম' শব্দের এই অভিধাবৃত্তি পদে পদে বিপর্যস্ত, আবার কোথাও বা তা নয়ও।

নীতি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে 'নী' ধাতু থেকে, যার অর্থ — যা নিয়ে যায়। অথবা আরও একটু বিশদ করে বললে বলা যায় যা টেনে নিয়ে যায়। বিশদর্থ বলার কারণ যিনি টেনে নিয়ে যান, তিনি হলেন 'নেতা', বস্তুত নেতা শব্দটিও এসেছে 'নী' ধাতু থেকেই। এবারে আরও বিশদর্থে 'নীতি' শব্দটা বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় — মানুষের তৈরী যে সমস্ত নিয়ম, শৃঙ্খলা, সদ্‌বৃত্তি, সদাচার নিজেকে এবং পরকে একটা সামান্য অধম স্তর থেকে উত্তম স্তরে উন্নীত করে বা 'টেনে নিয়ে যায়', সেটাই নীতি। 'নীতি' শব্দের আভিধানিক অর্থ অনেকটা এইরকমই হওয়া উচিত।

অন্যদিকে ধাতুগতভাবে 'ধর্ম' শব্দটি আসছে 'ধৃ' ধাতু থেকে, যার অর্থ — যা ধারণ করে। ধর্মই মানুষকে ধারণ করে — ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ। বিশদর্থে যে সমস্ত গুণ মানুষকে ধারণ করে, সেগুলির কথা বলতে গেলে মোটামুটি 'নীতি' শব্দের সাধারণ বিশেষণটাই প্রযুক্ত হবে।[১] ধর্ম শব্দের বিশেষত্ব এইটুকু যে, নীতিশব্দের অন্তর্গত নিয়ম, শৃঙ্খলা, সদ্‌বৃত্তি, সদাচার, যা অনেকটাই ব্যক্তিগত স্তরে থাকে, সেইগুলিই ধর্মশব্দের

প্রয়োগে এক বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে ধরা দেয়। অর্থাৎ ধর্ম ব্যাপারটা অনেকটাই বৃহত্তর সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষায় উপযোগী।

ভগবদ্‌গীতায় অর্জুন যখন বিশ্বরূপ দর্শন করে যুগপৎ মুগ্ধ এবং ভাবিত, সেই ভাবনার দার্শনিকতার মধ্যে একটা অদ্ভুত বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন অর্জুন। তিনি বলেছেন — 'ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা'। শুধু 'ধর্ম' নয়, শাশ্বত ধর্ম। অর্থাৎ সাধারণ অর্থে, ধর্মীয় দৃষ্টিতে কেউ ব্যক্তিগতভাবে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য হতেই পারেন, কিন্তু সেটা শাশ্বত ধর্ম নয়। দেশভেদে, কালভেদে, মনুষ্যভেদে যে ধর্ম বিভিন্ন, সেই ধর্মের কোন শাশ্বতিকতা নেই, কিন্তু দেশ, কাল, মনুষ্যের সমস্ত ভেদ অতিক্রম করে যে ধর্ম সমাজের উপকার সাধন করে, সেই ধর্মই শাশ্বত ধর্ম। অহিংসা, সত্য, ঋজুতা, সত্ত্ব — এই গুণগুলি যেহেতু সর্বকালের সর্বদেশের সকল মানুষই নীতিগতভাবে অতি উত্তম বলে মেনে নেবেন, তাই ধর্ম শব্দের উপলব্ধিতে এই শাশ্বতিকতা একান্তভাবেই ঈপ্সিত। নীতিও তাই ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা ম্যাক্স হেবার 'মর‍্যালিটি' বলতে বুঝেছেন only a strict compartmentalisation of private and social ethics.[২]

কোন আলোচনার আগেই এটা বলে নেওয়া ভাল যে, ধর্মের নামে আজকে নিশ্চয়ই এক গভীর সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেই সংশয় মেটানোর জন্য আজকে অনেকেই স্বক্ষেত্র ছেড়ে জন-সমক্ষে ধর্ম সংস্থাপনের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাতে যন্ত্রণা আরও বাড়ছে; এঁদের স্বকপোল-কল্পিত ধর্মব্যাখ্যায় সরসতা যেমন আছে, তেমনই আছে 'অনুপাসিতগুরু'র অল্পজ্ঞতার যন্ত্রণা। এতে ধর্মও ব্যাখ্যাত হয় না, উপরন্তু অতিচতুরতার জ্বালায় স্বাভাবিক ধর্মচেতনা খণ্ডিত হয়। অন্যদিকে আছেন ধর্মজ্ঞ বলে পরিচিত সাম্প্রদায়িক মহান ব্যক্তিরা। তাঁদের চেতনা এতই দৃঢ়, তাঁদের ভাবনার মধ্যে কূপমণ্ডূকতার আপ্লুতি এতটাই বেশি যে, ধর্মের ব্যাখ্যায় তাঁরাও একই রকম বিকৃত। ঠিক এই রকম একটা দ্বৈরথের মধ্যে সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে রামায়ণের নীতি -ধর্ম নিয়ে খানিকটা আলোচনা নিতান্তই অপেক্ষিত। এতে আর কিছু নয়, রামায়ণের নীতি এবং ধর্মবোধের মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরে যে জনচেতনা অনস্যূত হয়েছে,[৩] সেই চেতনাটুকু উত্তরাধিকারীর কৃতজ্ঞতায় অনুকূলভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে, আর কিছুই নয়।

শুধু ধর্ম শব্দটিই আমাদের শাস্ত্রীয় পরম্পরায় কত বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেটাও আগে একটু বুঝে নিই। প্রথম কথা, বেদ যে অখিল ধর্মের মূল অথবা ব্রাহ্মণ-উপনিষৎ-দর্শন থেকেও যে নানারূপ ধর্মের প্রসার ঘটেছে — এসব আমাদের প্রায় জানা কথা। মানুষ এবং সমাজের কথা যদি প্রথমে ভাবা যায়, তাহলে কিন্তু ভাষা এবং ব্যাকরণের উপমাতেই সমাজ এবং ধর্মকে বুঝে নেওয়া সুবিধে। মানুষ যেমন আগে কথা বলেছে, তারপর মানুষের মুখ থেকে যথেচ্ছ উদগীর্ণ সেই ভাষাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে ব্যাকরণ, তেমনই আমাদের যে বিচলিত প্রাচীন সমাজ, তার মধ্যেও প্রথম শৃঙ্খলা এনেছে ধর্ম।

ধর্ম কেমন করে মনুষ্য-সমাজের সার্বত্রিক শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে, তা উপনিষদে খুব সুন্দর করে বলা আছে। পরম ঈশ্বর অথবা ব্রহ্ম যে নামেই তাঁকে ডাকি না কেন, তিনি নাকি একা একা এই দুনিয়াদারি রক্ষা করতে পারছিলেন না। তিনি সকলের ভালোর জন্য ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করলেন — তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রম্।[৪] ক্ষত্রিয়রা খুব বড়ো মানুষ হলেও, তাঁদের উৎকর্ষ সর্বাধিকার হলেও তাঁরা ব্রাহ্মণের প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিকে আশ্রয় করবেন — এটাই ছিল ঈশ্বরের ঈপ্সিত।[৫] ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় নিয়েও সমাজের ভাল চলছিল না বলেই তাঁকে বৈশ্য সৃষ্টি করতে হল — স নৈব ব্যভবৎ, স বিশমসৃজত, এবং এঁদের সবার পালন-পোষণের জন্য শূদ্রেরও সৃষ্টি করলেন পরিচারকের মতো, ইয়ং বৈ পূষয়েয়ং হীদং সর্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ।

এই যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বর্ণের সৃষ্টি হল, তা কিন্তু দেবতার প্রতিরূপে। যেমন ক্ষত্রিয় দেবতারা হলেন ইন্দ্র, বরুণ, সোম ইত্যাদি। বৈশ্যরা হলেন গণদেবতা কারণ — প্রায়েণ সংহতা হি বিত্তোপার্জনে সমর্থাঃ — যেমন অষ্টবসু, একাদশ, দ্বাদশ আদিত্য। আর শূদ্র দেবতা হলেন পূষা। এই পৃথিবীই পূষা, কারণ পৃথিবীই সমস্ত মানুষকে পোষণ করে।[৬]

এই চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করেও স্রষ্টার কিন্তু কোন তুষ্টি হল না, তাঁর দুশ্চিন্তাও রয়ে গেল যথেষ্টই। সমাজের কাজকর্ম চালানোও ভারী কঠিন হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় স্রষ্টাকে আবারও বসতে হল সৃষ্টির তপস্যায়। সকলের ভালোর জন্য এবার তিনি সৃষ্টি করলেন ধর্ম — শ্রেয়োরূপম্ অত্যসৃজত ধর্মম্। জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে — শাসন-নিয়মনের জন্য তো ক্ষত্রিয় রাজারাই যথেষ্ট ছিলেন, আবার ধর্ম কেন? উপনিষদ বলল — ধর্ম হল ক্ষত্রেরও ক্ষত্র — তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রম্। দ্বিতীয় 'ক্ষত্র' শব্দটার অর্থ হল নিয়ামক। ক্ষত্রিয় রাজাকে ধর্মই নিয়ন্ত্রণ করে। ক্ষত্রিয়ের যে উগ্রতা তার চাইতেও ধর্মের উগ্রতা বেশি।[৭] আর এই উগ্রতা স্বাভাবিক কারণেই মনুষ্য-লোকে ব্যবহৃত 'উগ্র' শব্দটির কোন আক্ষরিক অর্থ বহন করে না। এই উগ্রতার তেজ এমনই যাতে একজন দুর্বল, শক্তহীন মানুষও বলবত্তর মানুষকে জয় করে নিতে পারে -- অবলীয়ান্ বলীয়াংসম্ আশংসতে ধর্মেণ।[৮] অর্থাৎ ধর্মের তেজ এমনই যে, একজন সাধারণ মানুষও শারীরিক এবং রাজনৈতিক শক্তিযুক্ত বলবত্তর মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অন্য ভাষায় এটাই হয়তো 'মর‍্যাল কারেজ'।

লক্ষণীয়, এই শক্তির বলেই মহাভারতে এক সামান্য সারমেয় মহারাজ জনমেজয়ের সভায় নিজের প্রতিবাদ জানাতে পেরেছিল,[৯] এই ধর্মের বলেই রামায়ণে ঈশ্বরের চিহ্নে চিহ্নিত রামচন্দ্রকে তিক্ততম ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন বালির স্ত্রী তারা। বস্তুত এই ধর্মকে সর্বনিয়ামক এক সাংবিধানিক আইন ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। মনু মহারাজ এই ধর্মের নাম দিয়েছেন 'দণ্ড' — দণ্ডং ধর্মং বিদু-র্বুধাঃ।[১০] ধর্মশাস্ত্রকার যাজ্ঞবল্ক্য এই

ধর্মের কথাই আরও পরিষ্কার করে বলেছেন — ঈশ্বর ধর্মকেই দণ্ডের স্বরূপে তৈরী করেছিলেন — ধর্মো হি দণ্ডরূপেন ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।[১১]

উপনিষদ, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি গ্রন্থের মর্মোদ্ধার করলে বোঝা যায়, এই ধর্মের চরিত্র যেহেতু সর্বতোভদ্রের ব্যাপ্তি বহন করে, বিশেষত এই ধর্মের প্রয়োগের ক্ষেত্রও যেহেতু বিশাল, তাই সমস্ত সমাজ এবং রাজনীতির নিয়ামক হিসেবেই এই ধর্মকে চিহ্নিত করা যায়। আমরা সময়মতো রামায়ণের ভিতরেও এই সর্ব-নিয়ামক ধর্মের প্রযুক্তি লক্ষ্য করব। একই সঙ্গে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, এই সাধারণ এক সর্বতো ব্যাপ্ত ধর্ম ছাড়াও আরও এক রকমের সাধারণ ধর্ম আছে — যাকে ধর্মশাস্ত্রকারেরা সাধারণ এবং সামান্য ধর্ম বলেন বলেই আমরাও তাঁকে সাধারণ ধর্ম বলছি। এই ধর্ম সবার ক্ষেত্রে একই রকমভাবে প্রযোজ্য[১২] এবং আমাদের বিচারে অনেকটাই নীতিঘেঁষা। সত্য, অহিংসা, ঋজুতা, পরোপকার, করুণা — ধর্মশাস্ত্রীয় বিচারে এইগুলিই সাধারণ ধর্ম। এর আগে আমরা এগুলিকে গীতার ভাষায় 'শাশ্বত ধর্ম' বলেছি।

এছাড়া যে সমস্ত নীতি এবং ধর্মের কথা রামায়ণের মধ্যে পাব, তার বেশির ভাগটাই নির্ভর করছে বর্ণ-ধর্ম এবং আশ্রম-ধর্মের ওপরে। এর ওপরে আছে অধিকারী-ভেদ, দেশ-ভেদ, কাল-ভেদ এবং যোনি-ভেদ। রাম যেটাকে ধর্ম মনে করছেন, লক্ষ্মণের কাছে সেটা ধর্ম নয়। আর্য-ভূখণ্ডে যেটা ধর্ম, বালি-সুগ্রীবের রাজ্যে সেটা ধর্ম নাও হতে পারে। পরশুরামের কাছে যেটা ধর্ম রামচন্দ্রের কাছে সেটা ধর্ম নয়। আবার যোনিভেদে, সীতার কাছে যেটা ধর্ম, সেটাও রামচন্দ্রের কাছে ধর্ম নয়।

এই স্বল্প-পরিসরে রামায়ণের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা নীতিধর্মের কূটস্থ আলোচনা সম্ভব নয়। তবে উপরি-উক্ত সাধারণ এবং বিশেষ ধর্মের বিচার ছাড়াও আরও কিছু ধর্ম-প্রসঙ্গ আমাদের কথা প্রসঙ্গে উদাহৃত হবে, যা অমূলক তো নয়ই, বরঞ্চ রামায়ণ বলেই তা প্রাসঙ্গিক।

দুই

সাধারণ নীতি-ধর্ম

এই প্রসঙ্গে আগেই জানানো দরকার যে, রামায়ণে উচ্চারিত সত্য, ঋত, বা অহিংসার কথা বলতে গেলে তার অব্যবহিত পূর্বের যুগটি খেয়াল রাখতে হবে। এখানে আমরা অবশ্য রামায়ণের যুগ নিয়ে কোন কথা বলব না। কেননা রামায়ণের পদ্যবন্ধ, সর্গবন্ধ, অধ্যায়কাল, এমনকি কাণ্ডগুলি নিয়েও প্রতিস্তর সমালোচনা যেমনটি চলে আসছে — অথবা যেমনটি শব-ব্যবচ্ছেদের পদ্ধতিতে ব্রকিংটন সাহেব করে দেখিয়েছেন[১৩] — তাতে গবেসকের নব-নবোন্মেষশালিনী প্রাজ্ঞমানিতা তৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু তাতে ক্রৌঞ্চবিরহী কবির সযত্ন-লালিত কাব্যশরীরটি একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে।

এর ওপরে আছে প্রক্ষেপবাদীদের অত্যাচার। এঁরা বিংশ শতাব্দীতে বসে, বিংশ শতাব্দীর রীতি-পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে খ্রিষ্টপূর্ব শতাব্দীর ওপর শবসাধনা করেন। প্রক্ষেপবাদীদের এই প্রক্ষেপ-পঙ্ক একবার জমিয়ে তুললে গোটা রামায়ণটাকেই বেশ একটা বড়ো পাঁক-পুকুর বলে মনে হবে। অপিচ সেই পাঁক খানিকটা খানিকটা হাতে তুলে বিংশ শতাব্দীর শত-সহস্র আকাঙক্ষায় জর্জর, সংস্কৃত এবং সংস্কৃতির বর্ণহীন বালকদের প্রতি নিক্ষেপ করলে অতি মজার কৌতুক উপস্থাপন করা যায়, বালকেরা সেই পঙ্ক উলটো দিকে প্রতিক্ষেপন করে। এতে আর কিছুই নয়, শুধু অযোধ্যার চেয়ে সত্য সেই কবির মনোভূমি, যা থেকে রস আহরণ করে কালিদাস-ভবভূতির 'কবিতা-কল্পনা-লতা' বিবর্ধিত হয়েছে, যার মধ্যে কৃত্তিবাস, তুলসীদাস, কম্বন আলম্বন লাভ করেছেন, সেই মনোভূমি চিরকালের মতো এক পঙ্কোদ্ভেদে রূপান্তরিত হবে।[১৪]

আমরা তাই রামায়ণের প্রতিস্তর আলোচনাতেও যাচ্ছি না, পঙ্কোদ্ধার-প্রক্রিয়াতেও আমরা নেই। বাল্মীকি রামায়ণ যেমনটি আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে সূত-মাগধদের স্থুল-হস্তাবলেপটুকু মেনে নিয়েই আমরা রামায়ণের নীতিধর্ম আলোচনা করব, এই নীতি-ধর্মের পূর্বপরম্পরায় যেহেতু উপনিষদের কথা এসে পড়ে, তাই বলছিলাম — রামায়ণের সাধারণ নীতিধর্ম বুঝতে গেলে তার অব্যবহিত পূর্ব যুগ উপনিষদের কথাও আমাদের একটু শুনতে হবে।

উপনিষদ্ বলতে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যকের মতো বড়ো বড়ো দার্শনিক ভাবযুক্তিতে ভরা কঠিন গ্রন্থগুলির পর্যালোচনার কোন প্রয়োজনই নেই এখানে। রামায়ণের মহাকবির হৃদয় বড়োই সরল, বড়োই সহজ। তমসার টলটলে জল দেখে তাঁর মনে হয় — এতটুকু কাদা নেই — অকর্দমমিদং তীর্থং — সৎ-মানুষের পরিষ্কার মনের মতো নির্মল উদার এই জলরাশি — রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যমনো যথা। বাল্মীকির হৃদয়ও তমসার জলের মতোই নির্মল, উদার, সরল। এখানে সামান্য পক্ষিনী তার সহচর থেকে বিযুক্ত হলে আমাদের মহাকবির মনে তার বিরহছায়া ভেসে ওঠে। রামায়ণের কবি তাই বড়ো বড়ো উপনিষদের 'মহাবাক্য' উচ্চারণের প্রযত্ন বাদ দিয়ে তিত্তিরী-পক্ষীর চঞ্চু-দষ্ট সাধারণ নীতি-ধর্মের অমৃত-ফলগুলি একটি একটি করে আমাদের আস্বাদ করতে দিয়েছেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ আমরা পড়তাম ছোটবেলায়, যখন সুকুমার-মতি বালক-বালিকার নীতিবোধ তৈরী হয়। আমরা পড়তাম — সত্যং বদ, ধর্মং চর।[১৫] অর্থাৎ প্রমাণ-পরীক্ষণের মাধ্যমে যাকে তুমি সত্য বলে জেনেছ, তুমি সেটাই বলবে। শাস্ত্র যে ধর্মাচরণের নির্দেশ দিয়েছে তুমি সেই ধর্ম পালন করবে। স্বাধ্যায় অধ্যয়ন অর্থাৎ বেদপাঠে যেন অনবহিত হয়ো না। সত্যনিষ্ঠায় প্রমত্ত হয়ো না। ধর্মানুষ্ঠানে অনবহিত হয়ো না — স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ।... সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্।[১৬]

রামায়ণের সমাজে যে সাধারণ নীতি-ধর্ম, তার মধ্যে বেদবিহিত কর্মই প্রধান। প্রতিদিনের

অগ্নিহোত্র, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, অথবা সন্ধ্যা-উপাসনার এমন একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল যে, রামচন্দ্র যখন বনবাসে গেছেন, তখনও এই নিয়মের ব্যত্যয় হয়নি।[১৭] মেয়েরাও যে এই বৈদিক নীতি-নিয়ম মেনে চলছেন, তারও প্রমাণ পেয়েছি রামমাতা কৌশল্যার ব্যবহারে। কৈকেয়ীর মুখে বনবাসের প্রস্তাব শুনে রাম যখন জননী কৌশল্যার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, তখন দেখছি, তিনি ক্ষৌম বসন পরে পুত্রের মঙ্গলের জন্য সমন্ত্র অগ্নিহোত্র করছেন — অগ্নিং জুহোতি স্ম তদা মন্ত্রবৎ কৃতমঙ্গলা।[১৮] কে বলে মেয়েদের বেদে অধিকার ছিল না?

মায়েদেরই যখন এই অবস্থা, তখন যথাবিধি ব্রাহ্মণ-সংস্কার লাভ-করা ক্ষত্রিয়দের[১৯] নিত্যক্রিয়াপদ্ধতিতে স্নান, আহ্নিক, অগ্নিহোত্র যে থাকবেই, তাতে আর আশ্চর্য কি? আরও আশ্চর্য হল বৈদিক নীতি-নিয়মের ওপর রামায়ণের সামাজিকদের নিষ্ঠা! কোথায় সেই নদ-নদী পার হয়ে রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের সঙ্গে তাড়কা বধ করতে যাচ্ছেন, সেখানেও সকালের সূর্য উঠতে না উঠতেই বিশ্বামিত্র হাঁক ছেড়ে রামচন্দ্রের ঘুম ভাঙাচ্ছেন — আরে রামচন্দ্র! ওঠ, ওঠ। সকাল হয়ে গেছে — পূর্বা সন্ধ্যা প্রবর্ততে। প্রতিদিনের স্নান-আহ্নিক করতে হবে না? ওঠ, শীগ্‌গীর ওঠ — উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল কর্তব্যং দৈবমাহ্নিকম্।[২০]

উপবীতী ব্রাহ্মণের যদি বয়স কম হয় অথবা তার প্রকৃতি যদি হয় চঞ্চল, তবে খেলার সাথী পেলে, বাড়িতে লোকজন এলে অথবা সে নিজে কোথাও বেড়াতে গেলে, অনেক সময় তাঁর সন্ধ্যা-আহ্নিকের কথা ভুল হয়ে যায়। এরকম ভুল হলে, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও গুরুজনেরা, পিতৃপুরুষেরা বালক ব্রাহ্মণকে সন্ধ্যা-বন্দনার কথা মনে করিয়ে দিতেন। এখানে এই নির্জন বনপথে বিশ্বামিত্র সেই গুরুজনের ভূমিকা পালন করছেন। মহর্ষির কথা শুনে রামচন্দ্র নদীতে স্নান করে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে জল দিলেন। তারপর সন্ধ্যা করার জন্য জল তুলে আনলেন ঘট ভরে। সাবিত্রী মন্ত্র জপ করে, আহ্নিক সেরে সভ্রাতৃক রামচন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনির চরণ বন্দনা করলেন — কৃতাহ্নিকৌ মহাবীর্যৌ বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।[২১]

বলতে পারেন — আজকের সামাজিক বোধে সন্ধ্যা-আহ্নিক অগ্নিহোত্র কোন নীতি-ধর্মের মধ্যেই পড়ে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রামায়ণের যুগে এগুলো নীতি না হলেও সামান্য ধর্মের মধ্যে পড়ে। অযোধ্যা নগরীর সাধারণ বর্ণনাতেই দেখতে পাই — অযোধ্যাতে আহিতাগ্নি ছাড়া ব্রাহ্মণ নেই, যাগযজ্ঞহীন অলসতা সেখানে ভাবাই যায় না,[২২] অথবা ক্ষত্রিয় পুরুষেরা সেখানে সবসময়ই ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা মেনে চলেন,[২৩] এমন একটা জায়গায় মানুষের কাছে, সে তিনি সাধারণ মানুষই হোন, অথবা রামায়ণের নরচন্দ্রমা রামচন্দ্র, তাঁর কাছে এগুলি ধর্ম। বেদের বিধি অনুসারে পঞ্চ-মহাযজ্ঞের যে ইতিকর্তব্যতা আছে, সেগুলি হয়তো দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞের সঠিক অনুক্রমে রামায়ণে পাওয়া যাবে না, কিন্তু খাপছাড়া ভাবে দেবযজ্ঞের নমুনা অগ্নিহোত্র ইত্যাদির

মধ্যে পাওয়া যাবে, পিতৃযজ্ঞের উদাহরণও তেমনই পিতৃপুরুষের তর্পণের মধ্যে পাওয়া যাবে। ব্রহ্মযজ্ঞের স্বাধ্যায় এবং সাবিত্রী মন্ত্র জপও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের জীবনচর্যার প্রধান অঙ্গ হিসেবেই রামায়ণে পেয়েছি — স্নাত্বা কৃতৌদকৌ বীরৌ জেপতুঃ পরমং জপম্। এই শ্লোকে 'পরমং জপম্' বলতে গায়ত্রী জপ ছাড়া যে আর কিছুই বুঝায় না, তা টীকাকারদের ভাষণ থেকেই সুস্পষ্ট বোধ হয়। তাঁরা বলেছেন, সাবিত্রী মন্ত্র ছাড়া পরম জপ বলতে আর কীই বা বোঝাতে পারে — তস্যা এব পরমত্বাৎ, ন সাবিত্র্যাঃ পরং জপ্যমিতি বচনাৎ।[২৪]

নৃযজ্ঞ অথবা নিত্য অতিথিসেবার বন্দোবস্ত রামায়ণের সমাজে গৃহ্যসূত্রের রীতি অনুসারেই করা হত। যিনি দয়া করে গৃহে আসবেন, তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য-মধুপর্ক দিয়ে বসানোটা সাধারণ নীতি ছিল। এমনকি অরণ্য-কান্ডে রাবণ যখন ব্রাহ্মণের বেশে সীতার কাছে এসেছেন, তখনও তাঁর অতিথি-সৎকারের প্রবৃত্তি নষ্ট হয়নি। প্রথম দর্শনেই রাবণের মুখে নিজের শারীরিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে যে সব কথা শুনেছিলেন সীতা, তাতে তাঁর সন্দেহের কারণ ঘটা উচিত ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ অতিথিকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে তিনি অতিথির উপযুক্ত সেবায় মন দিয়েছিলেন — সর্বৈরতিথি-সৎকারৈঃ পূজয়ামাস মৈথিলী।[২৫]

অতিথির যোগ্য অভিনন্দনের সঙ্গে সীতার তরফ থেকে আরও যা ছিল, তা হল — এই আপনার কুশাসন। উপবেশন করুন আর্য। এই আপনার পা-ধোয়ার জল, আপনি গ্রহণ করুন। বনজাত উত্তম অন্নও প্রস্তুত, আপনি ভোজন করুন।[২৬] যেখানে নির্জন অরণ্যকুটীরে বসে, কবে কখন কোন অতিথি এসে পড়েন সেই ভাবনায় সীতাকে পূর্বাহ্নেই সিদ্ধ বনজাত অন্ন প্রস্তুত করে রাখতে হয়েছে, সেখানে সাধারণ গৃহস্থের ঘরে অতিথি-দেবের জন্য কতখানি দুশ্চিন্তা ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। অতিথি মান্যতা এতটা ছিল বলেই হয়তো সেই সুযোগে রাবণ শেষ পর্যন্ত সীতাকে হরণ করতে পেরেছিলেন।

রামায়ণে অতিথি সেবার মূল্য একটাই যে, নৈমিত্তিক প্রয়োজন ঘটলে অতিথি-সেবার দৈনন্দিন আয়োজন বিরাট উৎসবের আকার ধারণ করত। একই ব্যক্তিকে উদাহরণ হিসাবে নিলে এ ব্যাপারটা বেশ ভালো বোঝা যায়। বনবাসের প্রথম দিনগুলিতে রামচন্দ্র যেদিন সস্ত্রীক সভ্রাতৃক মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে এসে উঠলেন, সেদিন মহর্ষির অতিথি-সেবার উপকরণের মধ্যে পা-ধোয়ার জল অথবা অর্ঘ্যোদক, বন্য ফল-মূল এবং নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জনের সঙ্গে একটি দুগ্ধবতী গাভীও ছিল, আর ছিল পরিধানের বস্ত্র।[২৭]

অতিথিকে একটি গরু দেওয়া অথবা তাঁকে একটি পরিধেয় বসন দান করাটা এমন সাংঘাতিক বিশিষ্ট কোন ঘটনা নয়; তখনকার দিনের অতিথি-বাৎসল্যের উপকরণে এটুকু থাকতেই পারে। এমনকি 'অর্ঘ্য' শব্দের অর্থটা বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী খানিকটা বাড়িয়ে নিয়ে পা-ধোয়ার জলের সঙ্গে কিঞ্চিৎ চন্দন-কুঙ্কুমের অনুলেপন এবং তার সঙ্গে একটি ফুলের মালাও ঢুকিয়ে দেওয়া যায়,[২৮] তাতেও সেটা সাধারণ আতিথ্যই থেকে যায়। কিন্তু ওই একই ভরদ্বাজকে আবারও লক্ষ্য করুন, যখন ভরত-শত্রুঘ্ন বনবাসী রামচন্দ্রের আস্তানা খুঁজে বার করার জন্য তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

প্রথমদিকে ভরতের গতিবিধি নিয়ে মহর্ষির কিছু সন্দেহ ছিল। কাজেই তাঁর আতিথেয়তার মধ্যেও ছিল সেই প্রথামাফিক ব্যবহার — অর্ঘ্য, পাদ্য, ফল-মূল।[২৯] কিন্তু যেই না ভরদ্বাজ বুঝলেন যে, ভরতের উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তিনি বড় ভাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন, তখন তিনি সানন্দে বললেন, আরে! এখানে রাত্রিবাস তো তুমি করবেই কিন্তু আমাকে অন্তত অতিথি-সৎকারের সুযোগ দাও একটু। ভরত বললেন, এই বনের মধ্যে যা সম্ভব — পাদ্য, অর্ঘ্য, ফল-মূল, সে সব তো আপনি যথেষ্টই আয়োজন করেছেন, আর কত — পাদ্যমর্ঘ্যমথাতিথ্যং বনে যদুপপদ্যতে। মহর্ষি বললেন, না, না, ভরত! তুমি তোমার সেনাদের দূরে রেখে এসেছ কেন? তুমি ওদের নিয়ে এস। আমি ওদের একটু ভালো করে খাওয়াতে চাই — সেনায়াস্তু তথৈবাস্যাঃ কর্তুমিচ্ছামি ভোজনম্।

মহর্ষির কথা মানতেই হল ভরতকে। ভরত সেনা আনতে গেলেন। মহর্ষি ঢুকলেন অগ্নিশালায়। তপস্যার গৌরবে স্মরণ করলেন বিশ্বকর্মাকে — আতিথ্যস্য ক্রিয়া হেতো- বিশ্বকর্মাণমাহ্বয়ৎ। তিনি লোকপাল ইন্দ্র, বরুণ, কুবেরকেও জানালেন মনের বাসনা। এখনকার দিনে হলে বলতাম দেবতারা মহর্ষির অতিথি-সেবার কাজটি 'স্পনসর' করলেন, কিন্তু রামায়ণ যেহেতু বেদ এবং গৃহ্যসূত্রগুলির পরবর্তী কালের কবিকৃতি, তাই বৈদিক দেবতাদের কাছে মহর্ষির এই আবেদনটুকু বড়োই যথার্থ মনে হয়। সেনাবাহিনীর আতিথ্য মানে মিলিটারি ফোর্সকে তুষ্ট করা। তাদের জন্য ভরদ্বাজের ব্যবস্থাও অন্যরকম। প্রসিদ্ধ মৈরয় মদ্য এবং অন্যান্য সুরার ব্যবস্থার সঙ্গে ঘৃতাচী-বিশ্বাচীর নৃত্য তথা অতি-সুস্বাদু মাংস এবং অন্যান্য খাবাব-দাবার — ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ চুষ্যঞ্চ লেহ্যঞ্চ বিবিধং বহু — এই সব কিছু দিয়ে ভরদ্বাজ এমনই এক সাড়ম্বর আতিথেয়তার ব্যবস্থা করলেন যে, ভবতেব সৈন্যরা মদের ঝোঁকে ফতোয়া জারি করে দিল — ভরতের ভালো হোক, বামেবও ভালো হোক। আমরা অযোধ্যাতেও ফিরে যাব না, দন্ডকারণ্যেও যাব না, আমরা এখানেই থাকব — নৈবাযোধ্যাং গমিষ্যামো ন গমিষ্যাম দন্ডকান।[৩০] সামান্য অতিথি- সৎকার মহোৎসবে পরিণত হল।

পঞ্চ মহাযজ্ঞের চারটিই বলা হল, পঞ্চমটিই বা বাদ যায় কেন? পশুপক্ষীকে কিঞ্চিৎ খাদ্য দেওয়াটা ভূতবলির মধ্যে পরে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতে পশু-পক্ষীদের জন্য কিছু খাদ্য বরাদ্দ থাকত এবং এই অভ্যাস নেমে আসছে রামায়ণের আমল থেকেই। রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্বতেব সানুদেশে একটি অরণ্য গৃহ নির্মাণ করিয়েছিলেন। বস্তুত চিত্রকূটের প্রাকৃতিক পবিবেশ তার বেশ পছন্দ হয়ে গিয়েছিল, লক্ষ্মণকে তিনি বলেছিলেন, এখানেই কিছুদিন থাক যাক, ভাই! জায়গাটা বেশ — অয়ং বাসো ভবেৎ তাত বয়মত্র বসেমহি।

রামচন্দ্রের ইচ্ছা অনুসারে লক্ষ্মণ গাছ কেটে, কাঠ ফেড়ে, পাতার ছাউনি তুলে বেশ সুন্দর একটি পর্ণকুটীর তৈরী করলেন। কিন্তু এই নির্জন পাহাড়ী জায়গায় অস্থায়ী পর্ণশালা

তৈরী করলেও শাস্ত্রের বিধি-নিয়মে রীতিমত বাস্তুপূজা হল, হরিণ কেটে পশুবলি হল, দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ নিবেদিত হল, এমনকি বাড়ির সুরক্ষার জন্য মঙ্গলমন্ত্রও উচ্চারিত হল। এর পরেই দেখছি চৈত্য এবং দেবালয় স্থাপন করে পশুদের জন্যও খাবার দাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৩১] অনুমান করা যায়, বনের মধ্যেও যে ব্যক্তি গার্হস্থ্য ধর্মের এই নীতি-নিয়মগুলি পালন করে যাচ্ছেন, তাঁর আপন সমাজের মানুষেরা সেখানে তাঁদের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা নির্বাহ করার সময় এই সমস্ত নীতিনিয়ম কত যত্ন করে মেনে চলত।

তবু বলি আধুনিক দৃষ্টিতে এগুলি কোন ধর্মও নয়, নীতিও নয়; এগুলি তৎকালীন সমাজের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কর্তব্যমাত্র। তবুও যে এই কর্তব্যরূপ নীতি-নিয়মের কথা বললাম, তার কারণ আমাদের যুগে না হলেও রামায়ণের যুগে অন্তত এগুলি ধর্মের মধ্যেই পড়ত। এটাকে যুগধর্ম বলতেও আমাদের আপত্তি নেই। কারণ এ যুগের মানুষের অন্ন-পানের ব্যস্ততায় যে ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে, আজ থেকে আড়াই/তিন হাজার বছর আগে সেটা ধর্মের সংজ্ঞায় অভিহিত করা অন্যায় নয়। মনু বলেছেন, মহাভারত বলেছে — সত্যযুগে যেটা ধর্ম ত্রেতায় সেটা ধর্ম নয়, আবার দ্বাপরে যা ধর্ম কলিযুগে তা নয়। যুগের পরিবর্তনে মানুষের শক্তি বুঝে ধর্মের পরিবর্তন হতেই পারে — অন্যে কলিযুগে নৃনাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ।[৩২]

সাধারণ ধর্মের মধ্যে রামায়ণে যেটা সবচেয়ে উজ্জ্বল বলে মনে হয়, সেটা হল সত্য। এই 'সত্য' বলতে যেমন সত্য কথা বলা বুঝি, তেমনই রামায়ণে তার থেকেও বেশি বুঝি সত্যরক্ষা। সত্য আর সত্যরক্ষা এক নয়। সত্য বলতে এমন একটা নৈতিকতা বোঝানো যায়, যার ভাই-বোন-বন্ধুরা হল অহিংসা, ক্ষমা, উপকার, শম, দম, শীল ইত্যাদি। কিন্তু সত্যরক্ষার মধ্যে যেন সত্যের সঙ্গে খানিকটা ক্ষত্রিয়ের বর্ণধর্ম মেশানো আছে। কথা দিয়েছি কথা রাখতে হবে, প্রতিজ্ঞা করেছি প্রতিজ্ঞা পালন করতে হবে — তা সে যাই হোক, ধন, মান, প্রাণ যাই যাক, সব কিছুর বিনিময়ে এই যে সত্যরক্ষার ধর্ম — এর মধ্যে স্নিগ্ধ সত্যের চেয়েও অন্য এক দৃঢ়তা আছে এবং এই দৃঢ়তা দিয়েই কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের মতো মহাকাব্যের জমি তৈরী হয়।

সত্য জিনিসটা যদি মনু-মহারাজের বিধি অনুযায়ী মানসিক শুদ্ধতার কোন উপকরণ মাত্র হত,[৩৩] তাহলে রামায়ণ মহাকাব্যের সাড়ম্বর ঐশ্বর্যের মধ্যে সে শুধুই এক নীতিসার উপদেশের প্রয়োজন মেটাত। তেমন উপদেশ অনেক আছে রামায়ণে। অথবা সত্য যদি বিজ্ঞানস্বরূপ অপার আনন্দময় কোন অবিকারী ব্রহ্মস্বরূপকে বোঝাত, তাহলেও এই মহাকাব্যের মধ্যে তার স্থান হত মুনি-ঋষিদের মুখোদ্গীর্ণ কোন দার্শনিক তত্ত্বের মতো, যদিও রামায়ণে ব্রহ্মতত্ত্বের পর্যায় হিসেবে সত্যের উপদেশ প্রায় নেইই। রামায়ণে সত্য অনেকটাই সত্যরক্ষা অথবা প্রতিজ্ঞাপালনের দৃঢ়তায় চিহ্নিত। এ সত্য যেন ঠিক ব্রাহ্মণের

সত্য নয়, এ যেন ক্ষত্রিয়ের সত্য। তবে এই সত্যও মহাকাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হল — ব্যক্তি-চরিত্রের দৃঢ়তা বা শিথিলতা অনুযায়ী প্রতিজ্ঞা ও সত্যপালনের ভিন্নতা দৃষ্ট হলেও, এই সত্যই কিন্তু রামায়ণে ধর্মের পরাকাষ্ঠা বলে স্বীকৃত হয়েছে। বলা হয়েছে এই পৃথিবীতে ধর্মই সবচেয়ে বড়ো কথা এবং সত্যের প্রতিষ্ঠা ধর্মেই — ধর্মো হি পরমো লোকে ধর্মে সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।[৩৪]

ব্যক্তি-চরিত্রের শিথিলতায় এই সত্যরক্ষার ধর্মও কেমন শিথিল হয়ে যায়, তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হলেন দশরথ। একেবারে রামায়ণের আদিকাণ্ডের দিকে তাকান। রাম-লক্ষ্মণ তখন কেবল কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পদার্পণ করছেন। ওদিকে তাড়কার উপদ্রব ঠেকাতে বিশ্বামিত্র অযোধ্যায় উপস্থিত হলেন রাজা দশরথের কাছে। প্রথম দিকে আপ্যায়নের কোন ত্রুটি ছিল না। বিশ্বামিত্র আসছেন শুনেই রাজা দশরথ পাত্র-মিত্র-পুরোহিত সঙ্গে নিয়ে কত দূর পথ এগিয়ে এসে বিশ্বামিত্রকে আবাহন করে নিয়ে এলেন রাজপ্রাসাদে। তাঁকে পাদ্য অর্ঘ দিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে দশরথ বললেন — অমৃত লাভ করলে যেমনটি, খরার পরে বৃষ্টি হলে যেমনটি, পুত্রহীনের পুত্র হলে যেমনটি, হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে পেলে যেমনটি, আমার ঘরে আপনার এই আগমনও সেইরকম — তথৈবাগমনং মন্যে স্বাগতং তে মহামুনে।

স্বাগতভাষণ এবং আপ্যায়নের পরে দশরথ বেশ প্রফুল্ল মনে, বেশ আনুষ্ঠানিকভাবেই বললেন, বলুন মহর্ষি! আপনার কাজটা কি? আমি খুশী হয়েই সে কাজ করব -- কঞ্চ তে পরমং কামং করোমি কিমু হর্ষিতঃ। আজকে আপনি এখানে এসেছেন, আমার জন্ম সার্থক জীবনও সার্থক। আপনাকে চোখে দেখতে পেলাম, আজকের দিন বড়ো শুভ — সুপ্রভাতা নিশা মম।

মুনির আগমনে দশরথ কৃতকৃতার্থ বোধ করছেন, একথা বলাই বাহুল্য। যে মুনি আপন উগ্র তপস্যার প্রভাবে রাজর্ষি থেকে ব্রহ্মর্ষির পদবী লাভ করেছেন, তাঁর তপস্যার উগ্রতা কখনও যদি বা অভিশাপের উগ্রতায় পর্যবসিত হয় — সেই ভয়ও হয়তো একটু তাঁর ছিল। কাজেই আপন স্বভাবের উদ্বেল উচ্ছাসের সঙ্গে ভক্তি এবং অভিশাপের ভয় মিশে যাওয়ায় দশরথ বলেই ফেললেন, বলুন কি চান, কিজন্যই বা আপনি এখানে শুভাগমন করেছেন? আপনার কাজটা করা সম্ভব কি অসম্ভব, সেসব ভাবনা আপনার নয়, মুনিবর! — কার্যস্য ন বিমর্শঞ্চ গন্তুমর্হসি সুব্রত[৩৫] — আপনি যা আদেশ করবেন, তাই করব। আপনি আমার দেবতা, যা বলবেন, তাই করব।

এমন কথা শুনতে কার খারাপ লাগে? বিশ্বামিত্রেরও খুব ভাল লাগল। এই কথা ভেবেই ভাল লাগল যে, তিনি যা চান, তাই পাবেন, অন্তত রাজার কথা শুনে তাই মনে হয়েছে তাঁর — ইতি হৃদয়সুখং নিশম্য বাক্যং / শ্রুতিসুখমাত্মবতা বিনীতমুক্তম্। কিন্তু রাজার এই সাবেগ অঙ্গীকার শুনেছেন বলেই বিশ্বামিত্রের মনে কিছু সন্দেহ আছে।

রাজা দশরথকে তিনি তাই বেশ সতর্ক করে বললেন. আমার কিন্তু সত্যিই একটা প্রার্থনা আছে, মহারাজ ! আপনি কিন্তু প্রতিজ্ঞা করে বলুন, আমার কথা রাখবেন — কুরুষ্ব রাজশার্দূল ভব সত্যপ্রতিশ্রবঃ।[৩৬]

বিশ্বামিত্র তাঁর সমস্যার কথা সবিস্তারে বললেন। বললেন, অনার্য রাক্ষসদের কথা, যাঁরা সব সময় মুনিদের যজ্ঞক্রিয়ায় বিঘ্ন করে। বিশেষত তিনি বললেন, মারীচ এবং সুবাহুর কথা, যারা নিরন্তর বিশ্বামিত্রের যজ্ঞস্থলে রক্ত ফেলে, নোংরা ফেলে অপবিত্র করে দেয়। যজ্ঞক্রিয়ায় ব্রতী হয়ে বিশ্বামিত্র এদের অভিশাপ দিয়েও অভিভূত করতে চান না, কারণ অহিংসা-মণ্ডিত যজ্ঞচর্যার মধ্যে ক্রোধমূলক অভিশাপের উচ্চারণ শমপ্রধান মুনিকে মানায় না — তথাভূতা হি সা চর্যা ন শাপস্তত্র মুচ্যতে।[৩৭]

সমস্ত ঘটনা নিবেদন করে মুনিঋষিদের তপোবিঘ্ন নিবারণের জন্য বিশ্বামিত্র এবার দশরথকে বললেন — মুনি-ঋষিদের যজ্ঞনাশী এই রাক্ষসদের বিতাড়নের জন্য আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবক রামচন্দ্রকে আমার হাতে কিছু দিনের জন্য ছেড়ে দিতে হবে, রাজা — স্বপুত্রং রাজশার্দূল রামং ... মে দাতুমর্হসি।[৩৮] বিশ্বামিত্র অন্বয়-ব্যতিরেকের পদ্ধতিতে আগেই বুঝিয়ে দিলেন রামচন্দ্র ছাড়া অন্য কেউ গেলে তাঁর চলবে না, কারণ রাম ছাড়া অন্য কেউ সেই দুই রাক্ষসকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবেন বলে তিনি মনে করেন না — ন চ তৌ রাঘবাদন্যো হন্তুমুৎসহতে পুমান্। বিশ্বামিত্র তাঁর সময়সীমা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়ে বললেন, দশ দিন ধরে এই যজ্ঞ চলবে, অতএব অন্তত দশ দিনের জন্য রামচন্দ্রের ওপর আপনার স্নেহধারা রুদ্ধ করতে হবে — ন চ পুত্রগতং স্নেহং কর্তুমর্হসি পার্থিব। সবার শেষে বিশ্বামিত্র দশরথকে তাঁর পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞার কথাও প্রকারান্তরে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি যদি এই সংসারে ধর্মলাভ করতে চান অপিচ প্রতিজ্ঞাত সত্যের পালনে যে যশোলাভ হয়, সেই যশেও যদি আপনার লিপ্সা থাকে — যদি তে ধর্মলাভস্তু ফলশ্চ পরমংভুবি[৩৯] — তাহলে রামকে ছেড়ে দিন আমার হাতে।

দশরথের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। মুহূর্তের জন্য তিনি যেন সংজ্ঞা হারালেন। তারপর বিশ্বামিত্রের কাছে অনুনয়-বিনয় আরম্ভ করলেন সপ্রবন্ধে, সনির্বন্ধে। পনেরো বছরের বালক রামচন্দ্র যে কোনমতেই রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না, তার যে কোন অস্ত্রজ্ঞান নেই, কোন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই — ইত্যাদি নঞর্থক বাক্যে রামচন্দ্রের অকর্মণ্যতা প্রমাণ করে দশরথ চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী নিয়ে নিজে যেতে চাইলেন রাক্ষসবধের জন্য। ক্রৌঞ্চ-বিরহী কবি একপাদ শ্লোকাংশমাত্র — ন রামং নেতুমর্হসি — বারবার ব্যবহার করে পুত্রের জন্য দশরথের স্নেহ, প্রীতি, হৃদয়-যন্ত্রণা ফুটিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি যে সত্যরক্ষায় অক্ষম এক ক্ষত্রিয়, স্নেহ-মমতায় আকুল এক জীর্ণ মনুষ্য — সেটাও ফুটিয়ে তুললেন কারুণ্যের ব্যঞ্জনায়।

দশরথের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র মুনি রঘুবংশের সর্বাঙ্গীন মাহাত্ম্য ধুলোয় মিশিয়ে

দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করলেন, আগে প্রতিজ্ঞা করে এখন সেই সত্য থেকে আপনি সরে আসছেন — পূর্বমর্থং প্রতিশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং হাতুমিচ্ছসি?[৪০] এই কি রঘুবংশের কোন জাতকের উপযুক্ত ব্যবহার? রঘুকুলের এ কী বিপর্যয় ঘটল? বিশ্বামিত্র রঘুবংশীয় রাজার প্রতি কোন অভিশাপ উচ্চারণ করলেন না, এমনকি সাংঘাতিক কোন কটু কথাও বললেন না, যেমনটি তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। বরঞ্চ তির্যক ভঙ্গীতে অত্যন্ত দার্শনিকভাবে দশরথকে জানালেন, আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করে প্রতিজ্ঞা না পালন করাটাই শ্রেয় মনে করেন, তাহলে বেশ, আমি চলি। আপনি পূর্বকৃত সত্য থেকে চ্যুত হয়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরমানন্দে কাল যাপন করুন।[৪১]

বিশ্বামিত্র দশরথকে সম্বোধন করেছেন — 'কাকুৎস্থ' বলে যাতে এই মহান বংশের ঊর্ধ্বতন সত্যপ্রতিজ্ঞ ক্ষত্রিয় রাজাদের পূর্ব ব্যবহার তাঁর স্মরণে আসে, যাতে ব্রাহ্মণ মুনিঋষির কারণে ককুৎস্থ থেকে আরম্ভ করে ইক্ষ্বাকু-রঘুদের সবার আত্মত্যাগ তাঁকে লজ্জিত করে। কোন রঘুবংশীয় রাজা যদি পুত্র-পরিবারের মমতায় সঙ্কুচিত হয়ে হীনপ্রতিজ্ঞ বা মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হন, তা যে কত বড়ো অধর্ম এবং অপমানের কথা হবে, সেটা তির্যকভাবে বিশ্বামিত্র বুঝিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু পুত্রস্নেহে অন্ধ দশরথ যে তাতে খুব বিপর্যস্ত বোধ করলেন, তা মোটেই নয়। শেষে বিশ্বামিত্র যখন প্রায় চলে যাচ্ছেন, সেই অবস্থায় তাঁর কুলপুরোহিত মহামুনি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কথার সূত্র ধরেই দশরথকে বললেন — মহারাজ! আপনি না ইক্ষ্বাকুর বংশে জন্মেছেন! লোকে আপনাকে ধর্মের স্বরূপ বলে মনে করে। আপনার মতো ধীর-স্থির এক রাজার পক্ষে ধর্ম ত্যাগ করা কি মানায়?[৪২]

যে দশরথকে ধর্মের স্বরূপ বলা হচ্ছে, ইক্ষ্বাকু-রঘুদের বংশধর্মের যিনি অধস্তন আধার, তাঁরই ধর্মলোপের প্রসঙ্গ আসছে কেন? কোন ধর্মের বিচ্যুতি ঘটছে এখানে? বশিষ্ঠ বিশ্লেষণ করে বলছেন — প্রতিশ্রুত্য করিষ্যেতি উক্তং বাক্যমকুর্বতঃ[৪৩] যে কাজ আপনি করবেন বলে বিশ্বামিত্রের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, সে কাজ এখন না করলে আপনার যে ইষ্টাপূর্তের সমস্ত ফলই নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব এখনই রামকে পাঠান।

'ইষ্টাপূর্ত' শব্দটি পারিভাষিক। 'ইষ্ট' মানে অশ্বমেধাদি যাগ, আর 'পূর্ত' মানে জনকল্যাণমূলক কর্ম, যেমন পুকুর কাটা, কুয়ো খোঁড়া, ব্রিজ বানানো ইত্যাদি।[৪৪] দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অগ্নিষ্টোম থেকে আরম্ভ করে অশ্বমেধ পর্যন্ত যাগের যে অপূর্ব ফল, তথা গুণকীর্তন করা হয়েছে, তার থেকেও ক্ষত্রিয়ের সত্যরক্ষার ধর্ম বড়ো। সেই ধর্ম থেকে চ্যুত হলে বহুপুণ্য অশ্বমেধাদি যজ্ঞের দ্বারা পূর্ব সঞ্চিত অপূর্ব ফলও নষ্ট হয়ে যায়। পুকুর কেটে, বৃক্ষরোপণ করে, কুয়ো খুঁড়ে রাজারা যে প্রজাদের হিতসাধন করতেন, সেই পুণ্যও নষ্ট হয়ে যায় ক্ষত্রিয়ের সত্যপ্রতিজ্ঞা নষ্ট হলে। ইক্ষ্বাকুবংশের অতুল কীর্তি এবং সত্যপ্রতিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ দুজনেই দশরথকে ধর্ম ত্যাগ করতে বারণ করেছেন এবং এই ধর্মের প্রতিষ্ঠা ইক্ষ্বাকুদের সত্যপ্রতিজ্ঞতায়।

অর্থাৎ ধর্ম মানেই এখানে প্রতিজ্ঞা পালন। স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে ইক্ষ্বাকু-বংশের রাজারা কেউ কোনদিন মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ বলে প্রমাণিত হননি, কিন্তু ইক্ষ্বাকু দশরথ যা পূর্বে বলেছেন, এখন তা করছেন না, এতে যে শুধু ক্ষত্রিয়ের সত্যধর্ম নষ্ট হচ্ছে তাই নয়, অত্যন্ত রূঢ় অর্থে যে ক্রিয়াকল্যাণকে আমরা ধর্ম বলি, সেই যাগ-যজ্ঞের পুণ্যফল এবং পরোপকারের পুণ্যধর্মও এখানে বিপন্ন।

আমরা জানি দশরথ বশিষ্ঠের কথা মেনে শেষ পর্যন্ত রাম-লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। অর্থাৎ সে যাত্রায় তাঁর সত্যরক্ষার ধর্ম রক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মানতে হবে যে সত্যপ্রতিজ্ঞতা সম্বন্ধে দশরথ এত সচেতন কখনই ছিলেন না, বরঞ্চ বলা ভাল, এ বিষয়ে তিনি একটু বেশি আবেগপ্রবণই ছিলেন। সোজা কথায়, প্রতিজ্ঞা করতে তাঁর সময় লাগত না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা-পালনের কাল এলে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাঁকে দুর্বল করে তুলত। এই দ্বিধার জন্যই সত্য পালনের ধর্ম তাঁকে বিড়ম্বনায় ফেলেছে একাধিকবার, এবং এই বিড়ম্বনার চরম প্রকাশ ঘটেছে কৈকেয়ীর সামনে।

আপনারা সকলেই জানেন যে, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক-প্রক্রিয়া যখন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, ঠিক তখনই কুব্জা মন্থরার কুপরামর্শে কৈকেয়ী রামকে বনে পাঠিয়ে ভরতকে সিংহাসনে বসাতে চাইলেন। মহারাজ দশরথের ইচ্ছা এবং অযোধ্যার সামগ্রিক জনমতের বিরুদ্ধে কৈকেয়ী যে এমন একটা চরম সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন, তার কারণ একটাই — তাঁর একটা সুযোগ ছিল। পূর্বে রাজা দশরথ তাঁকে দুটি বর দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এই বর কৈকেয়ী সেই সময়ে নেননি, পরে চেয়ে নেবেন বলে রাজাকে জানিয়েছিলেন। রাজাও সেই মতো কথা দিয়েছিলেন।

বরযাচনার পরিস্থিতি তখন যেমন ছিল, তাতে কৈকেয়ীর মনে কোন অসদুদ্দেশ্য ছিল না। দানব শম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় মহারাজ দশরথ দেবপক্ষ সমর্থন করেন এবং দেবতাদের অনুরোধে শম্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে মহারাজ দশরথ ভীষণভাবে ক্ষত-বিক্ষত হলে মহারাণী কৈকেয়ী তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। ক্ষত-বিক্ষত অবস্থাতেও তাঁর দানবদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কৈকেয়ী দ্বিতীয়বার যুদ্ধশ্রান্ত দশরথকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একদিকে যেমন তাঁর সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন, অন্যদিকে তেমনই তাঁকে শুশ্রূষা করে, ক্ষত-মুক্ত করেন।[৪৫] সকৃতজ্ঞ দশরথ কৈকেয়ীকে একসঙ্গে দুটি বর দিতে চাইলেন — তুষ্টেন তে দত্তৌ তে দ্বৌ বরৌ শুভদর্শনে। কৈকেয়ী তখন যে মানসিক অবস্থায় ছিলেন, তাতে তাঁর একান্ত করণীয় সেবা-শুশ্রূষার জন্য এই প্রতিদান নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বর দুটি তিনি পরে চেয়ে নেবেন বলেছিলেন।

আজও সেই মানসিক অবস্থা তাঁর ছিল না। বরের কথা তিনি ভুলেও গিয়েছিলেন। কিন্তু দুষ্টা মন্থরা বরের কথা ভোলেনি। তারই কুপরামর্শে উত্তেজিত হয়ে আজ তিনি বর লাভ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। সেই প্রস্তুতির প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি

ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ হয়ে বিস্রস্তবাসে একা বসেছিলেন, আর তখনই দশরথ এসে তাঁর মান ভাঙানোর চেষ্টা আরম্ভ করেছেন। এতকাল পরে বিস্মৃত দুটি বর চাইবার মতো উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করার জন্য কৈকেয়ীর চেষ্টার অন্ত ছিল না। এমনিতেই রাজা দশরথ কৈকেয়ীর ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন এবং ক্রৌঞ্চবিরহী কবির ভাষায় এটাকে কামোন্মত্ততা বলাই ভাল — তং মন্মথ-শরৈর্বিদ্ধং কামবেগবশানুগম্। অতএব দশরথ যখন বললেন, আমি ধর্ম সাক্ষী করে বলছি — সুকৃতেনাপি তে শপে, আমি আমার ছেলের নামে শপথ করে বলছি — তেন বামেণ কৈকেয়ি শপে চ বচনক্রিয়াম্, তখন কৈকেয়ীও সোচ্চারে বলতে আরম্ভ করলেন, সাক্ষী থাকুন দেবতারা, সূর্য-চন্দ্র সাক্ষী থাকুক, গন্ধর্ব-রাক্ষস এই জীবজগতেব মানুষও সাক্ষী থাকুক, কেননা সত্যসন্ধ, সত্যবাদী ধর্মজ্ঞ দশরথ কথা দিচ্ছেন যে,[৪৬] তিনি আমায় বর দেবেন — বরং মম দদাত্যেষ সর্বে শৃণ্বন্তু দেবতাঃ।

দেবতাদের সবাইকে সাক্ষী মেনে কৈকেয়ী এবার তাঁর স্বামীকে সেই পুরাতন প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। অর্থাৎ এখনকার বর-দানের প্রসঙ্গটা যদি তাঁর কান্নাকাটি এবং বায়নার জন্যই মেনে নিতে হচ্ছে বলে পরে উড়িয়ে দেন দশরথ, অতএব দশরথেরই পূর্ব-প্রতিশ্রুত ববের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন কৈকেয়ী। সঙ্গে সঙ্গে একথাও তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন, তুমি ধর্মানুসারে প্রতিজ্ঞা করেছ, এখন যদি তুমি সেই বর না দাও — তৎ প্রতিশ্রুত্য ধর্মেন চেদ্ দাস্যসি মে বরম্ — তাহলে আজকেই আমি আত্মহত্যা করব।[৪৭] সঙ্গীতমুগ্ধ হরিণ যেমন ব্যাধের মায়াপাশে বাঁধা পড়ে, দশরথও তেমনই কৈকেয়ীর কথার মায়ায় তাঁর জালে ধরা পড়লেন। কৈকেয়ী তাঁর ঈপ্সিত বর-দুটির কথা দশরথকে শোনালেন, রামকে বনবাসে পাঠাতে হবে এবং ভরতকে রাজা করতে হবে। পরিশেষে আবারও একবাব মহারাজার সত্যপ্রতিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেই কৈকেয়ী[৪৮] বললেন, আমি আজই কিন্তু দেখতে চাই যে, রাম বনে চলে গেছে — অদ্য চৈব হি পশ্যেয়ং প্রয়ান্তং রাঘবং বনে।

দশবথ কৈকেয়ীকে অনেক বোঝালেন, রামের অসংখ্য গুণাবলী প্রকাশ করে, কৈকেয়ীর ওপর রামচন্দ্রের শ্রদ্ধার কথা প্রকাশ করে দশরথ অনেক বোঝালেন কৈকেয়ীকে। তিনি পূর্বে বরদানে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, এখন সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে যে বড়ো অধর্ম হবে সে সম্বন্ধেও দশরথের নিশ্চিত ধারণা আছে। এই অধর্ম যাতে না হয়, সেজন্য তিনি কৈকেয়ীর পায়ে ধরে বলেছেন — অঞ্জলিং কুর্মি কৈকেয়ি পাদৌ চাপি স্পৃশামি তে — তুমি এই বর চাওয়া থেকে বিরত হও, তুমি রামের আশ্রয় হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন কর। এই বর-যাচনা প্রত্যাহার করলে আমি হীনপ্রতিজ্ঞতার অধর্ম থেকে বাঁচতে পারি কৈকেয়ী — মাধর্মো মামিহ স্পৃশেৎ।[৪৯]

সত্যি কথা বলতে কি, দশরথকে যতই 'কামমোহিত' বলি, কৈকেয়ীর সামান্য ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তিনি আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারেন[৫০], এ কথাও না হয় বিশ্বাস করে

নিতে পারি, কিন্তু কৈকেয়ীর মুখে তাঁর অদ্ভুত বায়না শোনার পর তিনি মোটেই তাঁকে ছেড়ে কথা বলেননি। তিনি রাগ করেছেন, গালমন্দ করেছেন, অভিশাপ দিয়েছেন, আবার অনুনয়ও করেছেন, ভালবাসার কথাও বলেছেন, পায়েও ধরেছেন। কিন্তু কোন কিছুরই পিছনেই এখন তাঁর কামাতুরতাপ্রমাণ করা যায় না। কেননা কৈকেয়ীর কথা তিনি মেনে নেননি, তিনি নিজেরই প্রতিজ্ঞার ফাঁদে নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন অতর্কিতভাবে। কৈকেয়ীর প্রতি দুর্বলতার থেকেও তাঁর সরল স্বাভাবিক মানসিক দুর্বলতাই তাঁকে আজ বিপদে ফেলেছে।

বিপন্নতার সময় সুরক্ষিত শুশ্রূষিত হয়ে হুটহাট করে দশরথ বরদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছিলেন। তাতে যে খুব অন্যায়ও ছিল তাও তো নয়। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি যে এমন বিপরীতভাবে কোনদিন ফিরে আসবে, কৈকেয়ী যে কোনদিন এমন মৃত্যুর মতো বর চেয়ে বসবেন, দশরথ একথা বোধকবি স্বপ্নেও কখনও ভাবেননি। প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি, সত্য, সত্যরক্ষার বন্ধন যে কোনদিন এমন কঠিন শৃঙ্খলে দশরথকে বেঁধে ফেলবে, তা অতি-আবেগপ্রবণ দশরথের পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিল না। আর ঠিক সেই কারণেই দশরথ আজ বিপদে পড়েছেন। রাগ দেখিয়েই হোক অথবা কৈকেয়ীর পায়ে ধরেই হোক, তিনি এখন কোনও মতে হীনপ্রতিজ্ঞতার দায় থেকে বাঁচতে চাইছেন। কৈকেয়ী আপাতত তাঁর বর চাওয়া থেকে বিরত হলেই দশরথ তাঁর সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন।

কিন্তু কৈকেয়ীর মাথায় তখন মন্থরার কুবুদ্ধি ঢুকেছে। তিনি বিরত হবেন কেন? অতএব সত্যরক্ষার ধর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়েই কৈকেয়ী বললেন — তুমি আগে বরদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন অনুতাপ করছ, তুমি কি মনে কর এর পরেও পৃথিবীর কোন মানুষ তোমাকে ধার্মিক বলে মানবে, নাকি তুমি নিজেও নিজেকে ধার্মিক বলে প্রমাণ করতে পারবে কখনও — ধার্মিকত্বং কথং বীর পৃথিব্যাং কথয়িষ্যসি?[৫১] তোমার কাছে যখন রাজ-রাজড়ারা, রাজর্ষি-মহর্ষিরা এসে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন — তখন কি তুমি বলবে যে, আমি যাঁর জন্য বেঁচে আছি, যিনি আমাকে রক্ষা করেছেন, সেই কৈকেয়ীর কাছে আমি যা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি তা পালন করিনি — তস্যাঃ কৃতা ময়া মিথ্যা কৈকয্যা ইতি বক্ষ্যসি?[৫২]

কৈকেয়ীর মুখে এই সব কথা শুনে দশরথের বিলাপ করা ছাড়া অন্য কোন গতি ছিলনা। অনুনয়, বিনয়, ক্রোধ, গালাগালি — সব কিছুই বিফল হয়ে গেলে মানুষ বিলাপ করা ছাড়া আর কীই বা করতে পারে? দশরথও তাই করছেন। কৈকেয়ী দশরথের সত্যরক্ষার দুর্বল জায়গাটা দৃঢ় করে ধরেছেন। পূর্ব পূর্ব সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজাদের কথা, শিবি-অলর্ক ইত্যাদি সত্যপরায়ণ রাজাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কৈকেয়ী দশরথের প্রতিজ্ঞার সত্যকে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মের অপর পর্যায় বলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কৈকেয়ী

বলেছেন, সত্যকেই ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা পরম ধর্ম বলে জানে, আর আমি সেই সত্যকে আশ্রয় করেই তোমাকে ধর্মের পথে চালিত করার চেষ্টা করেছি, সত্যমাশ্রিত্য চ ময়া ত্বং ধর্মং প্রতি চোদিতঃ।[৫৩]

অর্থাৎ অতিতির্যকভাবে বিচার করলেও রামচন্দ্রকে বনে পাঠানো অথবা ভরতকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করা নিয়ে কৈকেয়ী যেন ততটা চিন্তিত নন, এই ব্যাপারগুলো যেন তেমন বড়ো কিছু নয়, কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেহেতু প্রতিশ্রুত সত্য পালন করার সুযোগ পাচ্ছেন দশরথ, অতএব কৈকেয়ী স্বামীকে সেই সুযোগ দিয়ে তাঁর ধর্মসহায় হবার চেষ্টা করছেন। একজন আদর্শ ধর্মসঙ্গিনীর মত কৈকেয়ী তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন — যদি ধর্মেই তোমার অভিনিবেশ থাকে তবে সত্যকে সম্যকভাবে অনুসরণ কর, সত্যং সমনুবর্তস্ব যদি ধর্মে ধৃতা মতিঃ। কেননা, 'সত্য' নামক একপদেই পরব্রহ্মের প্রকাশ, সত্যের মধ্যেই ধর্মের প্রতিষ্ঠা, সত্যই বেদ, এবং সত্যের দ্বারাই আধ্যাত্মিকতার পরম পদবী লাভ করা যায়।[৫৪]

কৈকেয়ী যে সত্যের কথা বলছেন, সেই সত্যই পর-ব্রহ্ম অথবা বেদ কিনা সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে, কিন্তু এই সত্য যে এখনকার দিনের নীতিতে ধর্ম অবশ্যই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কৈকেয়ী অবশ্য এই সত্যধর্মের উপদেশ দিয়েই বিরত হননি, সঙ্গে বারংবার সেই তাড়না ছিল — রামকে বনে পাঠাতেই হবে, ভরতকে রাজ্য দিতেই হবে, নইলে তোমার নিস্তার নেই। দশরথ সে কথা বুঝেছেন। কৈকেয়ীর প্রতি অতি কামাবেশ নয়, অতি মোহও নয় তিনি নিজেরই জালে নিজে আটকে পড়েছেন। পূর্ব প্রতিজ্ঞা এবং সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার ধর্মই তাঁকে সবচেয়ে বড়ো ফাঁদে ফেলেছে। তিনি নিজেও বলেছেন, ধর্মের ফাঁসে বাঁধা পড়েছি আমি, আমার চেতনাটাই বুঝি নষ্ট হয়ে গেছে — ধর্মবন্ধেন বদ্ধো'স্মি নষ্টা চ মম চেতনা।[৫৫]

আমরা জানি — দশরথের এই সত্যপ্রতিজ্ঞা ঠিক রাখবার জন্যই রামচন্দ্রকে বনে যেতে হয়েছিল। অর্থাৎ পিতার সত্য পালনের দায় রামচন্দ্রের ঘাড়ে বর্তেছিল। রামচন্দ্রকে বনে যাবার কথা দশরথ নিজমুখে বলতে পারেননি। সেটা বলেছেন কৈকেয়ী। কিন্তু রামচন্দ্রের কাছেও নিজের ঈপ্সিত প্রকট করার আগে তাঁর কাছেও ওই একই ধর্মের গান গেয়েছেন কৈকেয়ী। তিনি রামচন্দ্রের কাছে দশরথের নামে মৃদু অনুযোগ করে বলেছেন, রাজা দশরথ আমার কাছে যা শপথ করে বলেছিলেন, এখন সেটা অন্যথা করার চেষ্টা করছেন। জল বেরিয়ে গেলে যেমন বাঁধ বাঁধার মানে হয় না, তেমনই একবার 'দেব' বলে পরে 'দেব না' — অতিসৃজ্য দদামীতি — বলাটাও অর্থহীন এক কপটতা। কেননা, তুমি তো বেশ ভালই জান যে, সত্য হল সমস্ত ধর্মের মূল — ধর্মমূলমিদং রাম বিদ্বিতঞ্চ সত্যমপি।[৫৬] তাছাড়া তোমার বাবা তোমারই জন্য আমার ওপর রাগ করে যাতে অন্তত সত্য পরিত্যাগ না করেন, সেটাও তোমার ভাবা উচিত।

কৈকেয়ীর এই কথা শুনে রামচন্দ্র ধিক্ শব্দ উচ্চারণ করে বলেছিলেন — এমন করে বলবেন না, দেবী! পিতার কথায় আমি অগ্নিতে প্রবেশ করতে পারি, ডুবতে পারি অতল সমুদ্রে। তার ওপরে তিনি শুধু আমার পিতাই নন, তিনি আমার গুরু এবং রাজা। আপনি বলুন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, পিতা যা চান আমি তাই করব, কারণ, রামচন্দ্র কখনও দুরকম কথা বলে না — করিষ্যে প্রতিজানে চ রামো দ্বির্নাভিভাষতে।[৫৭]

'রামো দ্বির্নাভিভাষতে' — এই একটি মাত্র পংক্তির মধ্যেই পূর্ববর্তী সত্যরক্ষার বিষয়ে দশরথের দ্বিচারিতা যেমন বিপ্রতীপভাবে ফুটে ওঠে, তেমনই অন্যদিকে রামচন্দ্রের প্রতিশ্রুতি যে কত অমোঘ, প্রতিজ্ঞাত সত্য রক্ষার জন্য তাঁর দায়বদ্ধতা যে কত প্রসারিত, সে কথাও বড়ো বেশিমাত্রায় প্রকট হয়ে ওঠে। রামচন্দ্র দু-রকম কথা বলেন না, তিনি মিথ্যা কথা বলেন না — এই শব্দগুলি প্রাবাদিক পর্যায়ে পৌঁছলেও দুর্জনেরা রামচন্দ্রের দ্বিচারিতার প্রশ্ন তোলেন শূর্পনখার সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে। তাঁরা বলেন রামচন্দ্র শূর্পনখার সঙ্গে কথা আরম্ভ করেছিলেন সমস্ত সততা এবং ঋজুতার মাত্রা বহন করে। স্বয়ং মহাকাব্যের কবি সেখানে বলেছেন। মিথ্যা ব্যাপারটা রামচন্দ্রের মোটে পছন্দ নয় — অনৃতং ন হি রামস্য কদাচিদপি সম্মতম্। অথচ সেই রামচন্দ্র শূর্পনখার কাছে নিজের ভাই সম্বন্ধে নিপাট মিথ্যে কথা বললেন? তিনি বললেন, আমার ভাই অবিবাহিত। দেখতেও যেমন সুন্দর তেমনই তার চরিত্রগুণ — শ্রীমানকৃতদারশ্চ লক্ষ্মণো নাম বীর্যবান্। তোমার সঙ্গে ভারী ভাল মানাবে।[৫৮]

রামায়ণের টীকাকারেরা রামচন্দ্রের সত্যবাদিতার নীতি-নিষ্ঠা প্রমাণ করার জন্য রামায়ণের কবির স্বেচ্ছাব্যবহৃত শব্দগুলিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যাতে সত্যবাদী রামচন্দ্রের কথা মিথ্যে না হয়ে যায় তাঁরা বলেছেন -- 'অকৃতদার' শব্দের অর্থ করেছেন 'অসহকৃতদারঃ' — অর্থাৎ এর বিয়ে হয়েছে বটে, বউ তাঁর সঙ্গে নেই। টীকাকারেরা রামায়ণের বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্লোক উদ্ধার করে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, রামচন্দ্র পরিহাস করবার সময়েও বিফল মিথ্যে কথা বলেন না — ন বিতথা পরিহাসকথাস্বপি। এই প্রসঙ্গে সুগ্রীবের কাছে রাম যে বলেছিলেন আমি অনেক বিপদে পড়েও কখনও মিথ্যে কথা বলিনি — অনৃতং নোক্তপূর্বং মে বীর কৃচ্ছ্রে'পি তিষ্ঠতা — সেই প্রমাণও টীকাকারেরা উদ্ধার করেছেন।[৫৯]

আমরা যারা রামায়ণের পাঠক, আমরা যারা বাল্মীকির কবিকৃতিকে মহাকাব্যের সম্মান দিয়ে থাকি, তাঁরা কিন্তু মনে মনে জানি যে, রামচন্দ্র যত বড়ো সত্যবাদী, সত্যসন্ধ ব্যক্তিই হোন না কেন তিনিও যেহেতু মানুষ, তাই পরিহাস-বিজল্পনে সামান্য মিথ্যার আশ্রয় নিতেই পারেন। বাল্মীকি রামায়ণে শূর্পনখা-রামচন্দ্র-লক্ষ্মণের সমস্ত কথোপকথনই সেই পরিহাসের মাত্রাতেই ধরা আছে। রাম-লক্ষ্মণের পরিহাস বুঝতে না পেরে, শূর্পনখা যখন লক্ষ্মণ এবং সীতাকে খেয়ে ফেলতে চাইল এবং তাঁদের মরণের মূল্যে রামের

একান্ত সাহচর্য কামনা করল, রামচন্দ্র কিন্তু তখন লক্ষ্মণকে সাবধান করে বলেছেন — অবুঝ অভদ্র লোকের সঙ্গে আর বেশি পরিহাস করতে যেও না লক্ষ্মণ — ক্রুরৈরনার্যৈঃ সৌমিত্রে পরিহাস কথঞ্চন। ন কার্যঃ — আমাদের এই ঠাট্টা তামাশার ফলে সীতার অবস্থাটা কী হয়েছে, দেখ।[৬০]

যেখানে স্বয়ং মহাকাব্যের নায়কের মুখে সম্পূর্ণ ঘটনাটাই পরিহাস হিসেবে বর্ণিত হচ্ছে, সেখানে এটাকে রামচন্দ্রের দ্বিচারিতা মনে করার কোন কারণ নেই। বিশিষ্ট টীকাকার নাগোজী ভট্টও ঘটনার মধ্যে কোন মিথ্যাচরণের দোষ দেখতে পাননি। পূর্ববর্তী টীকাকারদের শব্দার্থ-ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি এবং ব্যাকরণের ব্যায়াম নিরস্ত করে দিয়ে তিনি বলেছেন যে, অন্তত এইভাবে রামচন্দ্রের সত্যবাদিতা সার্থক করে তোলার কোন প্রয়োজন নেই। পরিহাসকে পরিহাস হিসেবে ভাবাই শ্রেয়, তাতে সত্যবাদিতার হানি হয় না।[৬১ক]

বস্তুত সত্যবাদিতা, সত্যরক্ষা অথবা সত্যনিষ্ঠা — এই সমস্ত সাধারণ নীতিধর্মের কথা রামায়ণের মধ্যে রামচন্দ্রকেই আশ্রয় করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিজের সত্যে তিনি সর্বদা প্রতিষ্ঠিত আছেন বা থাকবেন — এটা নিতান্তই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। লক্ষণীয় ব্যাপার হল শুধু নিজের সত্য নয়, তাঁর আপন বংশের ঘনিষ্ঠজনেরাও যাতে সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তার জন্যও তিনি বিব্রত হন। পিতার প্রতি পুত্রের দায়বদ্ধতায় পিতার সত্যরক্ষার দায় নিজের মাথায় নিয়ে তিনি চোদ্দ বছরের জন্য বনে যেতে দ্বিধা করেন না। নিজের নয়, পিতার সত্যরক্ষার ভার বহন করে তিনি হয়তো অতি-বিশদর্থে পিতৃঋণ শোধ করছেন। কৈকেয়ী এমনভাবেই রামচন্দ্রের কাছে তাঁর বনবাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন যাতে মনে হবে রামচন্দ্রের বনবাসে যাওয়াটা কোন বড়ো ঘটনাই নয়, এর জন্য যেন তাঁর তেমন কোন মাথাব্যথাই নেই, কিন্তু নেহাৎ দশরথের সত্যরক্ষার জন্য, তিনি যাতে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে ধর্মচ্যুত না হন,[৬১খ] পাপে নিমজ্জিত না হন, তার জন্যই কৈকেয়ী যেন বেশি চিন্তিত।

রামচন্দ্র বিনা দ্বিধায় কৈকেয়ীর বাক্য পিতা দশরথের অভিপ্রেত মনে করে বনগমনের অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন আরও এক ধর্মের সূচনা করেছেন যার নাম উপনিষদের ভাষায় — পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব — পিতাকে দেবতাজ্ঞানে মান্য কর, মাতাকে দেবতাজ্ঞানে মান্য কর। কৈকেয়ী দশরথের তথাকথিত অভিলাষ রামচন্দ্রকে শোনানোর সঙ্গে সঙ্গেই রামচন্দ্র বলেছেন দেবী! আমি স্বার্থপরের মতো এই জগতে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করি না। আমার প্রাণের বিনিময়েও যদি পিতার প্রিয়কার্য কিছু সম্পন্ন করতে পারি, তবে তাই আমার করা উচিত। তাছাড়া আমার কাছে পিতার শুশ্রূষা এবং তাঁর কথা মেনে চলার থেকে বড়ো ধর্ম কিছু নেই।[৬১গ] কৈকেয়ী ধারণা করতে পারেন না, এমন কথাও রামচন্দ্র বলেছেন শুধু গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধায়, শুধু পিতার কথা শুনে বনগমন নয়, রামচন্দ্র বলেছেন, আমার পূজনীয় পিতা কেন, এমনকি আপনিও

যদি বলেন — অনুক্তো' প্যত্রভবতা ভবত্যা বচনাদহম্ -- তাহলেও আমি চোদ্দ বছর বনে কাটিয়ে আসতে পারি।

আমরা জানি, রামচন্দ্রের সমস্ত জীবনই কেটেছে সত্য রক্ষায়, সত্যের প্রতিষ্ঠায়। অপিচ রামায়ণের নীতি-ধর্মের প্রসঙ্গে রামচন্দ্রের নীতিজ্ঞতা এবং ধর্মজ্ঞতার কথাগুলি এতই বাহুল্যের মতো শোনাবে যে, নিউক্যাসেলে কয়লা টেনে নিয়ে যাবার ঘটনাও সেখানে ম্লান হয়ে যাবে। বাস্তবে রামচন্দ্রের ধর্ম এবং নীতি সম্বন্ধে আলোচনাটা এতটাই বোকা বোকা হবে যে, যে কোন প্রাবন্ধিকের কাছে সেটা মারাত্মক একটা সমস্যা। বাল্মীকি যেহেতু ধর্ম এবং নীতির আধারভূত একটি পূর্ণ মানুষ খুঁজতে গিয়েই রামচন্দ্রের কাহিনী লিখে ফেলেন, তাই — রামঃ সৎপুরুষো লোকে সতঃ সত্যপরায়ণঃ — অথবা ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ শীলবাননসূয়কঃ — এই ধরণের মাহাত্ম্য আখ্যাপন করে রামায়ণে রামচন্দ্রের নীতি-ধর্মজ্ঞতার প্রমাণ দেওয়াটা আমাদের মতে নেহাতই বোকা-বোকা। আমরা তাই রামচন্দ্রের প্রসঙ্গে তাঁর সত্যরক্ষার নিষ্ঠা, তাঁর অজস্র গুণ, প্রজা-সাধারণের দুঃখ-সুখে তাঁর দুঃখ-সুখের বিকার নিয়ে আপাতত একটা কথাও বলব না। বরঞ্চ নীতিধর্মের বিমূর্ত ক্ষেত্রে আমরা যখন রামায়ণের নরচন্দ্রমার ওপর অনীতি-অধর্মের আপাত রাহুচ্ছায়া দেখতে পাব, তার সম্বন্ধে দু-এক ছত্র আলোচনা করতে পারি।

এখানে প্রথম কথাটাই আসবে রামচন্দ্রের বনগমন প্রসঙ্গে। যে রামচন্দ্রকে কৈকেয়ী-দশরথের সামনে একান্ত অনুগত হিসেবে আমরা দেখেছি, বনগমনের পরে আমরা কিন্তু তাঁকে দশরথের ব্যবহারে বিষাদ এবং অনুতাপগ্রস্তও হতে দেখেছি। বনের মধ্যে লক্ষ্মণের সঙ্গে একান্ত আলাপে পিতা দশরথকে 'কামাত্মা' অথবা কৈকেয়ীর আঁচল-ধরা এক অথর্ব পুরুষ বলে তিরস্কার করতে রামচন্দ্রের বাধেনি।[৬১ঘ] চিরকালের বশংবদ পুত্রকে এমন অন্যায়ভাবে বনে পাঠানোর মধ্যে যে বৃদ্ধরাজার মতিভ্রম এবং স্ত্রৈণতাই সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে একথা রামায়ণের পিতৃদেব-পুত্রটির মুখ দিয়েই বেরিয়েছে।[৬১ঙ]

যাঁরা রামচন্দ্রকে নীতিধর্মের চরম কোটিতে প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে ত্রুটিলেশহীন এক অবতার পুরুষে পরিণত করেন, তাঁদের কাছে রামচন্দ্রের এই কথাবার্তাগুলি চরম বিপাকের সূচনা করবে। কিন্তু যাঁরা মানুষ রামচন্দ্রের প্রতি চরম আস্থাবান এবং অবতারকল্প এই পুরুষটিকে যাঁরা মনুষ্যচরিত্রের পরম আদর্শ এবং প্রতিফলন বলে মনে করেন,[৬২] তাঁরা রামচন্দ্রের এই কথাবার্তার মধ্যেও একটা পূর্ণ মানুষকেই খুঁজে পান। পণ্ডিতজনা কেউ কেউ রামচন্দ্রের এই দ্বৈতাচার দেখে একই রামচন্দ্রের মধ্যে 'higher nature' এবং 'lower nature' এর পূর্বপক্ষ তৈরী করেছেন। তারপর সমস্যার সমাধান করে বলেছেন ক্ষণিকের তরে রামচন্দ্রের এই অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেলেও তাঁর এই মলিন চিত্তকে রামচন্দ্র জয় করেছেন অসীম ক্ষমায়, ধৈর্যে, এবং ধর্মদৃষ্টিতে।[৬৩]

আমরা অবশ্য এই সব বিপরীত ক্ষেত্রে রামচন্দ্রের সহজ চরিত্রকে অনর্থকভাবে

জটিল করে তুলি না। কারণ চরম পিতৃভক্ত হওয়া সত্ত্বেও একটি অনুগত পুত্রের ভাগ্যে যদি চরম বঞ্চনা নেমে আসে তাহলে নির্জন অরণ্য ভূমিতে একান্ত আলাপে প্রথম রাত্রিটি কাটানোর সময় এই রকম মনের কথা, মনের দুঃখ বেবিয়ে আসাটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কারণ, মানুষের মনেই এমনটি হয় এবং রামচন্দ্রও মানুষ, অন্তত তিনি নিজেকে মানুষ ভাবতেই ভালবাসতেন। জীবনের শেষ প্রান্তে দেবতারা যখন তাঁকে তাঁর পরম ঈশ্বরত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, তখন রামচন্দ্র বলেছিলেন — অমন করে বলবেন না, মহান দেবতারা। আমি নিজেকে সাধারণ একটি মানুষ বলেই মনে করি। আমি দশরথের রামচন্দ্র — এই আমার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় — আত্মানং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজম্ (রামায়ণ, ৬.১১৯.১১)।

রামচন্দ্রের সার্বিক জীবনযাত্রা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পিতার প্রতি আনুগত্য অথবা ভাইয়ের প্রতি তাঁর স্নেহ, পিতৃভক্তি বা ভ্রাতৃপ্রীতির সমস্ত আদর্শকেই ম্লান করে দেয়। নীতি-ধর্মের বিষয়ে রামচন্দ্রে সার্বিক চরিত্র খেয়াল রাখলেই বোঝা যাবে — প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং সত্যচ্যুতির ভয়েই যে শেষ পর্যন্ত তার পিতা তাঁকে অন্যায়ভাবে বনবাসে পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন, সেটা রামচন্দ্রও যথেষ্টই অনুভব করেন। কথাটা অধ্যাত্ম-রামায়ণে তাই খুব স্পষ্ট করেই রামের মুখে বসানো হয়েছে —

> ন স্ত্রীজিতঃ পিতা ব্রূয়ান্ন কামী নৈব মূঢ়ধীঃ।
> পূর্বং প্রতিশ্রুতং তস্য সত্যবাদী দদৌ ভয়াৎ।। [৬৪]

ভরতের সম্বন্ধেও কিছু সোপহাস বিপরীত শব্দ রামচন্দ্রের মুখে শোনা যাবে। বিশেষত সীতার সামনে তিনি যে কথাটা বলেছিলেন—তুমি ভরতের সামনে আমার প্রশংসা কোর না, কেননা সমৃদ্ধিশালী পুরুষেরা পরের প্রশংসা শুনতে পারেন না[৬৫] — এই কথাটাও রামচন্দ্রের মানসিক অবস্থার নিরিখেই দেখতে হবে। এই কিছুক্ষণ আগেই তিনি কৈকেয়ীর মুখে বনবাসের আদেশ শুনেছেন। তারপরেই তিনি সীতার কাছে সেই দুঃসংবাদ দিয়ে তাঁকে অযোধ্যাতেই থেকে যেতে বলছেন। ঠিক এইরকম একটা মুহূর্তে ভরতের সম্বন্ধে তাঁর সাভিমান কটূক্তি ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ভরতের সম্বন্ধে তাঁর আসল ধারণাটা পাওয়া যাবে একেবারে বনপর্বে গিয়ে।

ভরত রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সদলবলে এসেছিলেন বনে। ভরতের সৈন্যবাহিনী দেখে লক্ষ্মণ ভেবেছিলেন ভরত চিরকালের জন্য নিঃশত্রুক হবার আশায় বনবাসী রামচন্দ্রকে মারতে আসছেন। লক্ষ্মণ রামকে বলেছিলেন, ভরত পূর্বে আমাদের অপকার করেছে, অতএব তাকে হত্যা করাই আমাদের ধর্ম, — পূর্বাপকারী ভরতস্ত্যাগে ধর্মশ্চ রাঘবঃ।[৬৬] রামচন্দ্র হাজার চিন্তা করেও ভরতের কোন দোষ দেখতে পেলেন না। প্রত্যুত্তরে লক্ষ্মণকে তিনি বলেছিলেন—আমি পিতৃসত্য পালন

করার জন্য বনে এসেছি। সেখানে ভরতকে মেরে লোকের অপবাদ কুড়িয়ে যে রাজ্য আমি পাব, সেই রাজ্য দিয়ে আমি কি করব? আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে হারিয়ে কোন বস্তুই আমি চাই না। যদি সব ভাইরা এক জায়গায় থাকতে পারি, যদি সব ভাইদের সুখ হয়, তবেই না আমার রাজ্য নিয়ে লাভ—ভ্রাতৃণাং সংগ্রহার্থঞ্চ—সুখার্থঞ্চাপি লক্ষ্মণ।[৬৭]

ভ্রাতৃপ্রীতির এই পরাকাষ্ঠার মধ্যেই ভরতের প্রসঙ্গ এসেছে। রামচন্দ্র বলেছেন—এমন সুখে ছাই পড়ুক আমার, যে সুখের মধ্যে শত্রুঘ্ন নেই, তুমি নেই অথবা ভরত নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আমাকে বনবাসী জেনে কষ্ট পেয়েই ভরত আমাকে দেখতে এসেছে। মনে মনেও ভরত আমাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ করছে এমন চিন্তা আমি করতেও পারি না। তা ছাড়া কোনদিন কি এমন হয়েছে যে ভরত আমাদের কোন অপ্রিয় আচরণ করেছে—বিপ্রিয়ং কৃতপূর্বং তে ভরতেন কদা নু কিম্? তাহলে আজকেই বা কেন তাকে সন্দেহ করছ, কেনই বা ভয় করছ? কোন বিপদের সময়েও কি কোন পুত্র পিতাকে হত্যা করতে পারে কিংবা ভাই হত্যা করতে পারে প্রাণের সমান ভাইকে? আর তুমি যদি শুধু রাজ্যের জন্য এসব কথা বলে থাক, তবে ভরতকে আমি বলে দেব, রাজ্যটা যেন তোমাকেই দিয়ে দেয় —বক্ষ্যামি ভরতং দৃষ্ট্বা রাজ্যমস্মৈ প্রদীয়তাম্।[৬৮] আমি জানি ভরত তোমাকে রাজ্য দিয়ে দেবে।

পিতা, ভাই বা বন্ধুর প্রতি রামচন্দ্রের এই বিশ্বাস এবং ভালবাসা এতটাই সার্বিক এবং চিরন্তন যে, সেগুলি ভারতবর্ষের সামগ্রিক গার্হস্থ্য নীতির আদর্শ হয়ে গেছে। আমরা যেহেতু রামায়ণে সাধারণ নীতি-ধর্মের কথাটা প্রথমেই বলে নিতে চেয়েছি, তাই পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রীতি বা বন্ধুবাৎসল্যের পরিসরে রামচন্দ্রের ব্যক্তিগত উদাহরণ খানিকটা এসে পড়েছে। একইভাবে লক্ষ্মণের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্টো দিক দিয়ে আসতে পারে, আসতে পারে ভরতের কথাও। ভ্রাতৃপ্রীতির ব্যাপার রামচন্দ্র যত বড়ো উদাহরণ, বিপ্রতীপভাবে লক্ষ্মণ কিংবা ভরত এখানে রামচন্দ্রের চেয়েও বড়ো উদাহরণ। ভ্রাতৃপ্রীতির সঙ্গে জ্যেষ্ঠের প্রতি আনুগত্য এখানে এমনভাবেই মিশে গেছে যে, লক্ষ্মণ কিংবা ভরতের ত্যাগ বিপ্রতীপভাবে রামচন্দ্রের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রামচন্দ্র যদি আগুন বা অরণ্যে প্রবেশ করেন, তবে আমাদের বুঝতে হবে লক্ষ্মণ সেখানে আগে থেকেই আছেন।[৬৯] অন্যদিকে রামচন্দ্রের পাদুকাশ্রয়ী স্বেচ্ছা-সন্ন্যাসী সেই ভরতের সম্বন্ধেই বা কত উদার শব্দরাশি ব্যবহার করা যায়, যাতে তাঁকেই ভ্রাতৃপ্রীতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

আমরা সংসার ধর্মের এই আদর্শভূমির প্রসঙ্গে আর যাচ্ছি না। কেননা এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষের সমস্ত সংসারে পিতৃভক্তি এবং ভ্রাতৃপ্রীতি রামায়ণের আদর্শেই চলে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য অথবা সাধারণভাবে পুত্রস্নেহের জন্য দশরথ যেমন বিখ্যাত, ভ্রাতৃপ্রীতির

জন্য, রামচন্দ্র, ভরত এবং লক্ষ্মণও তেমনই বিখ্যাত। বন্ধু-বাৎসল্যে রামচন্দ্র-সুগ্রীব অথবা রামচন্দ্র-বিভীষণ যেমন উদাহরণ হয়ে গেছেন, ভৃত্যজনোচিত সেবার আদর্শে হনুমানও তেমনই এক উদাহরণ।

সাধারণ নীতি-ধর্মের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের বিষয় আমরা এতক্ষণ উল্লেখ করিনি, কারণ সেখানেও ব্যাপারটা একঘেঁয়েই হয়ে যাবে। স্ত্রীলোকের সাধারণ ধর্ম হিসেবে স্বামীসেবা এবং সতীত্বের যে গুণগান আমরা গোটা রামায়ণ জুড়ে শুনেছি, তাতে বোঝা যায় রামায়ণের সমাজে স্ত্রীধর্মের চরম এবং পরম আদর্শে চারিত্রিক শিথিলতার কোন স্থান নেই। বামায়ণের সীতা এমন উগ্র এবং সোচ্চারভাবে সতীত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন যে, পরপুরুষের সামান্য স্পর্শমাত্রেও যেন ভীষণ এক পতন ঘটে যেতে পারত। সীতা আপন সতীত্বের তেজে রাবণকে কোন দিন কাছে ঘেঁষতে দেননি এবং সেই সতীত্বের মধ্যে এমনই এক অনতিক্রমনীয়তা ছিল যে, সতীত্বের গুণেই যেন তার মধ্যে অলৌকিকতা অনস্যূত হয়েছে। রাবণ তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি নি। সীতাহরণের সময় হরণের প্রক্রিয়ায় যতটুকু অঙ্গস্পর্শ ঘটেছে তারও দায় বহন করেছেন স্বয়ং অগ্নিদেব। সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর রামচন্দ্র স্বয়ং অনুভব করেছেন যে, রাবণ তাঁকে মনে মনেও ধর্ষণ করতে পারেননি।

> ন চ শক্তঃ স দুষ্টাত্মা মনসাপি চ মৈথেলীম্
> প্রধর্ষয়িতুমপ্রাপ্যাং দীপ্তামগ্নি শিখামিব।[৭০]

সতীত্বের এই ভয়ঙ্কর ব্যাপ্তি একটি স্ত্রীলোকের মন এতটাই অধিকার করে থাকত যে, সীতা পুত্রকল্প হনুমানের পিঠে পর্যন্ত ওঠেননি। হনুমান তাঁকে নিয়ে যাবার সামর্থ্য জানিয়েছিলেন, কিন্তু লঙ্কাপুরীর হাজরো বিপন্নতার মধ্যেও সীতা তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যেতে অস্বীকার করেন। তাঁর দিক থেকে যুক্তি-তর্কের অভাব ছিল না, যদিও অন্যান্য পরিণত যুক্তির চেয়েও দ্বিতীয় কোন পুরুষের স্পর্শ তাঁর কাছে মরণের চেয়েও বেশি অপ্রিয় ছিল। রাবণ তাঁর গাত্রস্পর্শ করেছেন, সেখানে তাঁর যুক্তি ছিল — আমার কোন উপায় ছিল না। আমার স্বামী কাছে ছিলেন না, অন্যদিকে রাবণের শক্তির কাছে আমার কোন শক্তিই খাটেনি।[৭১] কিন্তু হনুমান! স্বামীর প্রতি আমার বিশ্বাস এতটাই যে, তিনি ছাড়া অন্য ব্যক্তির দেহ আমি স্পর্শ করতেও পারব না — নাহং স্প্রষ্টুং স্বতো গাত্রমিচ্ছেয়ং বানরোত্তম।[৭২]

কোন সন্দেহ নেই যে, সীতার সতীত্বের এই আদর্শই রামায়ণে স্ত্রীলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মে পরিণত হয়েছে ; কিন্তু একই সঙ্গে ক্রৌঞ্চবিরহী কবির সর্বতোভদ্র দৃষ্টিভঙ্গীটাও এখানে বুঝে নেওয়া দরকার। বাল্মীকি যখন পরগৃহবাসিনী সীতার সতীত্ব পরীক্ষার জন্য অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, তখন সীতাপতি রামচন্দ্রের কথাবার্তার মধ্যে কোন সংবেদনশীলতা কাজ করেনি। প্রিয়তম স্বামী বিরহিনী সীতাকে পরীক্ষা কবার জন্য

যে সব কটুকথা বলেছেন, রামচন্দ্রকে তা মানায় না। দ্বিতীয়বার দুর্মুখ জনগণের অপরাধে রামচন্দ্র সীতাকে নির্বাসিত করেন। সেখানেও সীতার সতীত্বের প্রতি সন্দেহ কাজ করেছে। লক্ষণীয় ক্রৌঞ্চবিরহী কবি স্বয়ং এই সময় অপবাদ-দীর্ণা সীতাকে আশ্রয় দেন। তৃতীয়বার আবারও সীতার সতীত্ব পরীক্ষার প্রশ্ন ওঠে। সীতা রামচন্দ্রের সম্মুখে পাতালে প্রবেশ করেন।

তিন-তিনবার এই সতীত্বের বঞ্চনা দেখিয়ে বাল্মীকি বুঝিয়ে দিয়েছেন সতীত্বের ধর্ম মোটেই স্বামীর একান্ত বিশ্বাসের ওপর স্থাপিত নয়। অপিচ সতীত্ব নিয়ে সাধারণের সন্দেহ এমনই এক অনন্তপার অবিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে অবিশ্বাসের কোন শেষ নেই : বারবার সতীত্বের পরীক্ষা দিয়েও সেই অবিশ্বাস থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। অবিরাম সতীত্বের পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত এক সাধ্বী রমণীকে পাতাল প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু ভারী আশ্চর্য, জনগণ না বুঝলেও, স্বামী নামে মহান পুরুষটি না বুঝলেও, মহাকাব্যের কবি কিন্তু তাঁকে নিজেই আশ্রয় দিয়েছিলেন তপোবনে। সতীত্বের বাহ্যিক পরীক্ষায় তাঁর নিজের বিশ্বাস নেই অথচ সমস্ত মানুষই যে সেই বাহ্যিক পরীক্ষাতেই বিশ্বাসী, মহাকবির ব্যঞ্জনাটা এখানেই।[৭৩]

তিন

সত্যবাদিতা, সত্যরক্ষা, পিতৃভক্তি ভ্রাতৃপ্রীতি অথবা স্ত্রীলোকের সতীত্ব — এই সব সাধারণ নীতি-ধর্ম যদিও অনেকটাই সংসার এবং ব্যক্তিগত নীতিবোধের পরিসর তবুও এগুলিকেই বৃহত্তর সমাজনীতির আরোহ-সোপান বলেই মনে করা যেতে পারে। ভারী আশ্চর্যের কথা হল স্ত্রীর ওপর স্বামীব বিশ্বাস অথবা স্বামীর ওপর স্ত্রীর বিশ্বাসটা সাধারণ নীতি বা ধর্মের মধ্যে পডলেও ভালবাসা বা প্রেম ব্যাপারটাকে কেউ নীতি-ধর্মের মধ্যে উল্লেখও করেন না। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা কখনও বা করুণা, দয়া বা সহৃদয়তার সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু ভালবাসার মত এক অতিসংবেদনশীল বস্তু কখনই ধর্ম বা নীতিশাস্ত্রকারদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। হয়তো বা অতি-গভীর অতিসংবেদনশীল এবং সেই কারণেই অতিকঠিন বলেই ভালবাসা কখনও নীতি-ধর্মের ভৈরব-চক্রের মধ্যে প্রবেশ করেনি। কিন্তু ভালবাসাকে শুধুমাত্র বিশ্বাসের পর্যায়ে নিয়ে এসে রামচন্দ্র কর্তৃক সীতা-পরিত্যাগের ঘটনাটিকে আমরা যদি খুব কষে তিরস্কার করি, যা অনেকেই আজকাল করেন, সেটা কিন্তু মোটেই ঠিক হবে না।

ক্রৌঞ্চবিরহী কবির মনোভূমি ঠিকমতো বিচার করলে দেখা যাবে — সীতা পরিত্যাগের পিছনে দুর্মুখ মানুষের কুৎসা ছাড়াও আরও অন্য কিছু ছিল এবং সে ব্যাপারটা সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের চেয়েও এক বৃহত্তর স্বার্থ। পিতা দশরথ কৈকেয়ীর প্রেমে রাজার ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। লোকরঞ্জন এবং প্রজাপালনের ধর্ম থেকে বিচ্যুত

হয়েছিলেন তিনি। সীতাকে ভালবাসতে গিয়ে প্রজারা রামচন্দ্রকে দশরথের মতোই এক কামমুগ্ধ রাজা ভাবুক, এটা রামচন্দ্র চাননি। বস্তুত পিতা দশরথের অত্যুৎকট প্রেম রামচন্দ্রের মনোজগতে এমনই এক বিপরীত প্রতিক্রিয়া তৈরী করেছিল যে, সীতার একান্ত প্রেমিক সীতাপতি হওয়ার থেকেও রাজা রামচন্দ্র হওয়াকে তিনি বড়ো মনে করেছেন। লঙ্কায় সীতার অগ্নিপরীক্ষা সাঙ্গ হবার পর অগ্নিদেব যখন স্বয়ং সীতার পরিশুদ্ধির ব্যাপারে অভিজ্ঞান দিয়েছিলেন, তখন রামচন্দ্র বলেছিলেন — সীতা যে সর্বতো শুদ্ধ, সেটাতে কোন সন্দেহই নেই, কিন্তু আমি যদি রাবণান্তঃপুরবাসিনী সীতাকে পরীক্ষা করে না নিই — জানকীমবিশোধ্য হি — তাহলে লোকে আমাকে বলত — দশরথের ছেলে এই রামচন্দ্রটাও নিতান্তই কামুক এবং মূর্খ — বালিশো বত কামাত্মা রামো দশরথাত্মজঃ।[৭৪]

এখানে 'দশরথের ছেলে রামচন্দ্র'— এই শব্দটা দশরথের কামপরতন্ত্রতার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে। তাছাড়া দশরথের কামাত্মতা রামচন্দ্রের নিজের মুখ দিয়ে যেমন বেরিয়েছে, তেমনই বেরিয়েছে সুগ্রীব, হনুমান কিংবা অন্যান্যদের মুখেও। তাঁরা রামচন্দ্রের মুখেই এমনটি শুনে থাকবেন। রাজা হিসেবে রামচন্দ্রের জীবনের একটা দায় ছিল তাঁর পিতা দশরথের কামপরতন্ত্রতার উর্ধ্বে ওঠা। সীতা-পরিত্যাগের মধ্যে রামচন্দ্রের এই বিপরীত-মনন বেশ খানিকটা দায়ী। নইলে সীতার প্রতি ভালবাসা তাঁর অন্য অনেকের চেয়েই বেশি ছিল, তার উদাহরণ দিতে পারি ভূরি ভূরি ; আর ঠিক সেই কারণেই অতি বিপ্রতীপভাবে সীতা-পরিত্যাগের ঘটনাটি রামচন্দ্রের প্রেমহীনতার চরম উদাহরণ হিসেবে আমরা মেনে নিতে পারিনা। আমরা জানি, প্রগতিবাদী অনেক নব্য শিক্ষকের সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক বেধে যেতে পারে, তবে তাতে দ্বিধাগ্রস্ত হবার কারণ নেই। কারণ মহাকাব্যের কবি বা নায়কের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি একদেশিনী, কবির মনোভূমির চেয়ে আপন রুক্ষ তর্কের প্রতি তদের আসক্তি বেশি।

বস্তুত সীতার প্রতি রামচন্দ্রের ভালবাসার কথা এবং শেষ পর্যন্ত সীতা পরিত্যাগের বিষয়ে রামচন্দ্রের কঠিন নিরাসক্ত ব্যবহারেয় কথাটাও উল্লেখ করলাম একটি বিশেষ কারণে। সামান্য নীতি-ধর্ম ছাড়াও রামায়ণের মধ্যে যে বিশেষ নীতি-ধর্মের পরিসর আছে, সেটা বোঝানোর জন্যই এই রামচন্দ্রের রাজধর্মের অবতারণা।

রাজধর্ম কথাটা অবশ্য বিশেষেরও বিশেষ। কেননা রাজধর্মের ভিত্তি হল ক্ষত্রিয়-ধর্ম যা আবার বর্ণধর্মের একটা প্রকারমাত্র। পণ্ডিত জনেরা লিখেছেন সাধারণ ধর্ম বা সামান্য ধর্ম ছাড়া আর যা কিছুই আছে, তার ভিত্তিই হল বর্ণধর্ম এবং আশ্রমধর্ম।[৭৫] এই দুটির সঙ্গেই আবার যোগ আছে চতুর্বিধ পুরুষার্থের। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ — এই চারটির কোনটার না কোনটার সঙ্গে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র — এই চতুর্বর্ণও যেমন জড়িয়ে আছে, তেমনই জড়িয়ে আছে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল—ভারতবর্ষের মানুষরা রামায়ণকে যতখানি না মহাকাব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তার চেয়ে বেশি গ্রহণ করেছেন ধর্মগ্রন্থ হিসেবে। অথচ কী আশ্চর্য রামায়ণ মহাকাব্যে মোক্ষাভিসন্ধির কথা বড়ো বেশি নেই। এই দিক দিয়ে ভারতবর্ষের অপর মহাকাব্য মহাভারতের অসংখ্য শ্লোক মোক্ষচিন্তায় আবিষ্ট। একদিকে মহাভারতকে চতুর্বর্গের আধারভূত এক শাস্ত্র হিসেবে মানা হচ্ছে, অন্যদিকে মহাভারতের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে মোক্ষ। অলঙ্কারশাস্ত্রের শেষ কথায় আনন্দবর্ধনের মতো ব্যক্তি মহাভারতের অঙ্গী রসটাকেও বলেছেন শান্ত, অর্থাৎ মোক্ষাভিসন্ধিই এই মহাকাব্যের পরম উদ্দেশ্য।

এই নিরিখে দেখতে গেলে মোক্ষের চিন্তায় ক্রৌঞ্চবিরহী কবির কোন আবেশ নেই। চতুর্বর্গের চরম বর্গ মোক্ষকে বাদ দিয়ে তিনি প্রায়ই ত্রিবর্গের কথা বলেন অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ এবং কাম। মোক্ষ বা জ্ঞানযোগের ইঙ্গিতমাত্রও রামায়ণে নেই — এ কথা নিশ্চয়ই বলা ঠিক হবে না, তবে সে এতই বেশি সূক্ষ্ম, এতই তা গভীর যে, রামায়ণের মধ্যে তার মুখ্য কোন কারকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের অপর মহাকাব্য মহাভারতে অথবা ভগবদগীতায় সুখদুঃখে সমান, লাভালাভ, জয়াজয়ে সমদর্শী স্থিতধী মানুষটির কথা আছে, তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে রামচন্দ্রকেই নিশ্চয় ধরে নেওয়া যায় এমনকি সেই মর্মে রামচন্দ্রকে বিশেষিতও করা হয়েছে। তবু আলাদা করে এই নির্বিঘ্ন, নিত্যসত্ত্বস্থ ব্যক্তির পুরুষার্থই যে মোক্ষ অথবা সেই মোক্ষের সাধন যে জ্ঞান — এ কথা রামায়ণে তেমন করে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তাকে ক্রৌঞ্চবিরহী কবির ভাষায় 'সমাধি' বলা যায় মাত্র, কিন্তু কোনক্রমেই সেটা মোক্ষ নয়।

রামায়ণে রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছেন, তখন রামচন্দ্রের শোকের ইয়ত্তা রইল না। একবার তিনি শোকে বিলাপ করছেন, একবার পাগলের মতো সীতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, একবার নিজের ধনুক-বাণ দৃঢ়ভাবে ধারণ করে সমস্ত জগৎ ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা নিচ্ছেন। রাবণের সঙ্গে পক্ষিরাজ জটায়ুর যে যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধে ব্যবহৃত ধনুক-বাণের খণ্ডাংশ, রথ-ছত্রের অবশিষ্টাংশ দেখে রামচন্দ্র মনে মনে স্থির করলেন যে, সীতার অধিকার নিয়ে দুটি রাক্ষসে বুঝি যুদ্ধ হয়েছিল। কথাটা ভেবে রামচন্দ্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন এবং শরানলে সমস্ত পৃথিবী পুড়িয়ে দেবার শপথ নিলেন — দগ্ধুকামং জগৎ সর্বং যুগান্তে চ যথা হরম্।

রামচন্দ্রের এই ক্রোধমূর্ছিত চেহারা দেখে ছোট ভাই লক্ষ্মণ বলেছিলেন — চিরকাল দেখে আসছি — তোমার স্বভাব হল কোমল, সমস্ত ইন্দ্রিয় তোমার বশীভূত এবং সকলের ভালর জন্য চিরকাল তুমি চিন্তা করেছ — পুরা ভূত্বা মৃদুর্দান্ত সর্বভূতহিতে রতঃ।[৭৬] এখন সেই তুমি শুধু ক্রোধের বশে নিজের স্বভাবটাও ত্যাগ করবে, তা তো হতে পারে না। চন্দ্রের যেমন আহ্লাদকত্ব, সূর্যের যেমন তাপ, বায়ুর যেমন গতি, পৃথিবীর যেমন

ক্ষমা — এইসব স্বাভাবিক গুণের মতো তোমারও স্বভাব হল মৃদু এবং সকলের হিতৈষণায় তুমি নিরত। সেখানে তোমার মতো লোক যদি ক্রোধমূর্ছিত হয়ে স্বভাব নষ্ট করে, তবে তোমার চিরকালের যশটাই নষ্ট হয়ে যাবে — এতচ্চ নিয়তং নিত্যং ত্বয়ি চানুত্তমং যশঃ।[৭৭]

লক্ষ্মণ যে যশের কথা বলেছেন, সে যশ অনেকটাই প্রখ্যাত রাজার গুণ। এই গুণের মধ্যে কোন দার্শনিক প্রতিপত্তি নেই। কিন্তু এর পরেই আরও দুচার কথা বলার পর লক্ষ্মণের বক্তব্য ধীরে ধীরে স্থিতধীর সংজ্ঞা স্পর্শ করছে। লক্ষ্মণ বললেন—তোমার মতো মানুষও যদি এই বর্তমান দুঃখ সহ্য করতে না পারে, তবে সাধারণ লোকেরা কেমন করে দুঃখ সইবে—প্রাকৃতশ্চাল্পসত্ত্বশ্চ ইতরঃ কঃ সহিষ্যাতি![৭৮] বিপদ তো মানুষের আসেই, সে বিপদ আবার চলেও যায়।

লক্ষ্মণ মহারাজ নহুষের উদাহরণ দিলেন। উদাহরণ দিলেন ইক্ষ্বাকু-বংশের কুল পুরোহিত বশিষ্ঠের। তাঁর একশ ছেলে একদিনে মারা গিয়েছিল। লক্ষ্মণের মতে এইসব দৈবকৃত বিপদ দেবতাদেরও আছে। কিন্তু রামচন্দ্র, যিনি সমস্ত সত্ত্বগুণের আধার, তাঁর কি এই শোক সাজে? লক্ষ্মণ বললেন — তুমি সমস্ত বিষয়ে বিজ্ঞ, তোমার মতো শুভদর্শী সমদর্শী ব্যক্তিরা কি ঘোর বিপদেও এমন শোকগ্রস্ত হতে পারেন — তদ্বিধা ন হি শোচন্তি সততং সর্বদর্শনাঃ।[৭৯]

কথাটা অনেকটাই সেই অর্জুনের সামনে উচ্চারিত গীতোক্ত 'ন বিকম্পিতুমর্হসি'-এর মতো। রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করে লক্ষ্মণ এখানে 'সর্বদর্শনাঃ', 'অনির্বিন্নদর্শনাঃ' এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন, উপস্থাপন করেছেন কর্মের কথা। লক্ষ্মণ বলেছেন বুদ্ধি দিয়ে এই বিপৎপাতের তাত্ত্বিক বিচার করতে হবে তোমাকে। কৃতকর্মের গুণদোষেই তো এমনটি ঘটে, নইলে এমন দুর্ঘটনা সম্ভব কি — নান্তরেণ ক্রিয়াং ত্রেয়াং ফলমিষ্টঞ্চ বর্ততে?[৮০] পরিশেষে, আমরা যেমন বলি — 'আই অ্যাপিল টু ইয়োর প্লেজার' ঠিক সেইভাবেই লক্ষণ বললেন, আমি তোমার জ্ঞানের কাছে আবেদন করছি — শোকেনাভিপ্রগুপ্তং তে জ্ঞানং সম্বোধয়াম্যহম — শোকে তোমার জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

তবু জানি — এই জ্ঞানও ঠিক মোক্ষসাধন সেই জ্ঞান নয়, এ জ্ঞান অনেকটাই বুদ্ধির অপর পর্যায়ে। শোকাচ্ছন্ন রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণের তাত্ত্বিক সান্ত্বনা চরম পর্যায়ে ওঠে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে। যখন প্রকৃতির রাজ্যে শরৎ ঋতু তার পূর্ণ শোভা বিকশিত করেছে। ওদিকে সুগ্রীব বালির স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু রামের কাছে তিনি যে শপথ করেছিলেন, সে শপথ ভুলে তিনি আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়েছেন। শরৎকাল মানেই রাজাদের যুদ্ধযাত্রার সময়, অথচ সীতা অন্বেষণের ব্যাপারে সুগ্রীবের কোন উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। রামচন্দ্র আবার শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন। বিশেষত উন্মাদিনী শরৎ প্রকৃতি তাঁকে খানিকটা কামনাচ্ছন্নও করে তুলল।

রামচন্দ্রের মনোবিকারের কথা লক্ষ্মণের কাছে চাপা রইল না। লক্ষ্মণ আবারও শোকক্লিন্ন রামচন্দ্রকে সত্ত্বস্থ করা চেষ্টা করলেন। লক্ষ্মণ বললেন — আর্য! তুমি কামনার বশে নিজের বীরত্ব নষ্ট করছ। কামনার থেকেই তোমার এই শোক উৎপন্ন হয়েছে — যে শোকে মনের সমাধি নষ্ট হয়ে যায় — অয়ং হ্রিয়া সংহ্রিয়তে সমাধিঃ — সুতরাং তুমি যোগ অবলম্বন করে সেই সমাধি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছ না কেন — কিমত্র যোগেন নিবর্ততে ন![৮১] তুমি চিত্তের প্রসাদ ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা কর, শুচি-আচার এবং স্নানাদির মাধ্যমে নিরন্তর কর্মযোগ অনুষ্ঠান কর। দেবতার পূজা ইত্যাদির দ্বারা নিজের পৌরুষবৃদ্ধির চেষ্টা কর।[৮২]

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বক্তব্য সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন — তুমি যা বলেছ ভাই, এক্কেবারে ঠিক বলেছ। সেই কর্মের অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই করতে হবে, যাতে আমার অভিপ্সীত ফল মেলে — নিঃসংশয়ং কার্য্যমবেক্ষিতব্যং/ক্রিয়াবিশেষো'প্যনুবর্তিতব্যঃ।[৮৩]

এই শ্লোকের অন্তিম পংক্তিটি টীকাকারেরা এবং অনুবাদকারী পণ্ডিতজনেরা এমনভাবেই পরিবেশন করেছেন, যাতে মনে হয় — যেন কর্ম এবং জ্ঞানযোগ বাদ দিয়ে কর্মের ফল অনুসন্ধান করাও কঠিন। পরবর্তী কালের দার্শনিক তত্ত্ব বিচার করলে বোঝা যাবে কর্মেব ফলানুসন্ধান জ্ঞানযোগের পরিপন্থী। কাজেই জ্ঞান নয়, কর্মানুষ্ঠানই লক্ষ্মণ এবং রামচন্দ্রের বক্তব্যের সঙ্গে মেলে। বস্তুত বৈদিক যুগে এবং তার অব্যবহিত পরের যুগে যে ফলাকাঙক্ষা নিয়ে বিভিন্ন শৌচাচার, যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং দেবপূজার অনুষ্ঠান করা হত, এখানে সেই কর্মযোগই প্রধান হয়ে উঠেছে। এমনকি লক্ষ্মণ যে 'সমাধি'র কথা বলেছেন, তাও যোগসিদ্ধ চরম কোন সমাধি বলে মনে হয় না। এই সমাধি অনেকটাই মনঃসংযোগের চরম অবস্থা, যাতে অভীষ্ট সিদ্ধি ঘটে। এ সমাধি কর্মের সহায়ক এক পরম স্থিতিশীল মানসাবস্থা, এতে মোক্ষলাভ হয় না বটে, তবে অভীপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তি সম্ভব হয়, শ্লোকের অর্থ[৮৪] সহজভাবে নিলে অন্তত জ্ঞানের চেয়ে কর্মই রামায়ণের মুখ্যগ্রন্থি হয়ে ওঠে।

চতুর্বর্গের চরম পুরুষার্থ মোক্ষ, অতএব রামায়ণের অভিসন্ধিত নয়, যতটা ধর্ম অর্থ এবং কাম। লক্ষণীয় বিষয় মনুসংহিতার রাজধর্মাধ্যায়ে একজন আদর্শ রাজার কাছেও মোক্ষানুসন্ধানের কোন তাৎপর্য নেই। কেননা মোক্ষকামী রাজার রাজ্যপাট চুলোয় যাবে। 'প্রজারঞ্জন' তাঁর কাছে শুধু কর্তব্যের ভার হিসেবে চিহ্নিত হবে। আদর্শ রাজার কাছেও তাই ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ এবং কামই শুধু প্রণিধানযোগ্য, আর রামায়ণের ঠিক এই ধর্মার্থ-কামেরই জয়কার ঘোষিত হয়েছে। মোক্ষসাধন সেখানে নিতান্তই গৌণ ব্যাপার। রামায়ণের এই ত্রিবর্গনিষ্ঠাই সীতাপতি রামচন্দ্রের চেয়ে রঘুপতি-রাঘব-রাজা রামের মাহাত্ম্য বাড়িয়ে তুলেছে, আর এই রাজধর্মের সিদ্ধি লাভ কবতে গিয়েই সীতা পরিত্যাগের মতো ঘটনা যেমন ঘটেছে, তেমনই ঘটেছে শম্বুক-বধ। এ কথায় পরে আবার আসব, আপাতত রামায়ণে ত্রিবর্গের মাহাত্ম্যটা আগে বুঝে নিই।

খবরটা খুব ভাল করে পাওয়া যাবে কাশ্যপ-মধ্যম কুম্ভকর্ণের মুখে। রামচন্দ্রের কাছে যুদ্ধে হেরে রাবণ কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার ব্যবস্থা করেছেন। অকালে ঘুম থেকে উঠে রাবণের প্রয়োজনে যুদ্ধযাত্রা করতে তিনি পিছুপা হননি ; কিন্তু রণসজ্জার আগে তিনি রাবণকে কিছু অযাচিত উপদেশ দিয়ে গেছেন। কুম্ভকর্ণ বলেছেন, রাক্ষসরাজ! তুমি মঙ্গলের কথা আগে শোননি, কাজেই তোমার পাপটা এতদিনে ফলেছে। তুমি এটা ভেব না যে, একটা কাজের পূর্বাপর বিচার না করে শুধুমাত্র নিজের বলদর্পিতার ওপর ভরসা করলেই চলবে — কেবলং বীর্যদর্পেণ নানুবন্ধো বিচারিতঃ।

কুম্ভকর্ণ একেবারে রাজনীতির সারকথা উল্লেখ করে সাম-দান-ভেদ-দণ্ড ইত্যাদি চতুরুপায়, রাষ্ট্রের ক্ষতি, বৃদ্ধি, স্থিতি-নির্ণয় এবং আরম্ভোপায়, পুরুষদ্রব্যসম্পৎ, দেশকাল বিভাগ, বিপত্তি-প্রতীকার এবং কার্যসিদ্ধি ইত্যাদি পাঁচ রকমের রাজনৈতিক মন্ত্রণার উল্লেখ করে শেষে বললেন — লোকেরা কেউ সকাল, দুপুর এবং রাত্রির সময় বুঝে ধর্ম অর্থ এবং কামের সেবা করেন, কেউ বা সেই কালে ধর্ম এবং কাম, কেউ বা একই কালে ধর্ম, অর্থ এবং কাম — এই তিনটির সাধনা করেন।[৮৫] কিন্তু এই ধর্মার্থকামের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কোনটা এটা যে শুনেও বোঝে না, সে রাজাই হোক অথবা রাজপুত্র, তার সমস্ত নীতিজ্ঞানই বিফল —

> ত্রিষু চৈতেষু যচ্ছ্রেষ্ঠং শ্রুত্বা তন্নাববুধ্যতে।
> রাজা বা রাজপুত্রো বা ব্যর্থং তস্য বহুশ্রুতম্।।[৮৬]

কুম্ভকর্ণ রাবণকে আরও বলেছিলেন যে, ধর্ম, অর্থ এবং কাম — এই ত্রিবর্গের মধ্যে কোনটার কখন উপযোগ ঘটবে — সেটা যদি আগে থেকেই মন্ত্রী-অমাত্যদের সঙ্গে আলোচনা কবে ঠিক করে নেওয়া যায় তাহলে জীবনে তার বিপদ ঘটবে না।[৮৭] কুম্ভকর্ণ নিজমুখে স্পষ্ট করে না বললেও পরিষ্কার বোঝা যায় রাবণ ধর্ম বাদ দিয়ে অর্থ এবং প্রধানত কামেরই সাধনা করেছেন। ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্মই যে অর্থ এবং কামের মূলভূত এ কথা রামায়ণের অন্যত্র স্পষ্ট করে বলা আছে এবং আমরা সে কথায় পরে আসছি।

ধর্মার্থকামের এই রামায়ণীয় বিভাজন পরবর্তী কালের অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে মিলে যায়। মিলে যায় মনুসংহিতার বচনের সঙ্গেও। মনু বলেছেন—তেমন অর্থ বা কামের সেবাই করবে না, যার সঙ্গে ধর্মের যোগ নেই — পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্মবর্জিতৌ।[৮৮] সাধারণ লোকাচার এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যেও ধর্মেরই প্রাধান্য সূচিত হয়েছে—সুখস্য মূলং ধর্মঃ — যদিও ধর্মার্থকামের সম-সাধনই একজন আদর্শ রাজার পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল — ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ-যো হ্যেকসক্তঃ জনো জঘন্যঃ।

রামায়ণ মহাকাব্যের ধর্ম-দর্শনের সূত্রগুলি পর্যালোচনা করে বোঝা যায় — মোক্ষ-

সাধনের তেমন কোন প্রাধান্য এখানে তেমন বিবেচ্য না হলেও ত্রিবর্গের প্রথম কল্প ধর্মই কিন্তু রামায়ণের মুখ্যতম নীতি-নির্ধাবক। অবশ্য তার আগে ত্রিবর্গেব সাধারণ মাত্রাটা একটু বুঝে নেওয়া দরকার।

ধর্ম বলতে এখানেও কোন পূজার্চনা দৈব-সাধন বোঝায় না। বোঝায় সেই ধরনের নিয়মশৃঙ্খলাকে যা একটি মানুষের মধ্যে সমস্ত জগতের জন্য শুভৈষণা তৈরী করে। এই শৃঙ্খলা মানুষের অন্তর্জাত না হলে সে স্বার্থপর ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। ঠিক এই অর্থে মানুষ ধার্মিক হয়ে উঠেছে কিনা সেটা বুঝতে হলে কিন্তু সেই চিরন্তন নীতিগুলির দিকেই আমাদের তাকাতে হবে। অর্থাৎ সত্য, অহিংসা, ঋজুতা, প্রিয়বাদিতা, সমদর্শিতা — এই সব শাশ্বত গুণ ঘনীভূত হয়ে যখন এক চরম মহত্ত্বের জন্ম দেয়, তখনই বুঝতে হবে মানুষ ত্রিবর্গের প্রথম বর্গে স্থিত অর্থাৎ মানুষটি ধর্মের পথে আছে। যা যা নিজের ভাল লাগে, তা অন্যেরও হোক অথবা যা নিজের কাছে অপ্রিয় তা যেন অন্যের ভাগ্যেও না ঘটে[৮৯] — এইরকম এক সর্বতোমুখী হিতৈষণা এবং নিজের ওপর সর্বাঙ্গীন নিয়ন্ত্রণই ত্রিবর্গমুখ্য ধর্মের চালিকা শক্তি। রামায়ণে এই ধর্মই মূল সাধন এমনকি সাধ্য হিসেবেও চিহ্নিত এবং তাও সেটা আদর্শ রাজারই সাধ্য-সাধন হিসেবে চিহ্নিত।

ত্রিবর্গের দ্বিতীয়টি হল অর্থ। আভিধানিক অর্থে 'অর্থ' শব্দের অন্যতম অর্থ হল প্রয়োজন। রাজারা রাজ্য বিস্তার করবেন, পুব-রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ঘটাবেন, রাজকোষে পবিপূর্ণতা আসবে. এক কথায় ঐহিক যত সমৃদ্ধি — সবই এই অর্থের পরিসর। অন্যদিকে 'কাম' ব্যাপারটা অনেকটাই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধক। কোন সন্দেহ নেই — অনাদি অনন্ত এই সংসার-চক্রের গতিশীলতা সম্পূর্ণভাবেই কামনির্ভর এবং এতেও কোন সন্দেহ নেই যে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের ইন্দ্রিয়-সাধনই বৃহত্তর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বর্গ অর্থসাধনে রূপান্তরিত হয়।

ত্রিবর্গের অন্তর্গত 'কাম' শব্দটা ব্যবহারের সময় এটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, কাম মানে এখানে শুধুই ভোগ নয় অথবা ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতাও নয়।[৯০] ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে অনন্ত সংসার-চক্রের প্রবর্তনাই কিন্তু ত্রিবর্গীয় কামের উদ্দেশ্য। কামকে এইভাবে নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই কিন্তু ধর্ম শব্দটা এসে পড়ে। ঠিক যেমন ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি, অর্থ-সম্পত্তির উপার্জনের মধ্যেও ন্যায়-নীতির প্রশ্নটা থেকেই যায় এবং সেখানেও ধর্মের অন্তর্গতি ঘটে। আরও পরিষ্কার করে বলা যায় সাধারণ গৃহস্থের ঘরেই হোক অথবা একনায়ক রাজার ঘরেই হোক কামনা-পূর্তি এবং ঐহিক সমৃদ্ধির সমস্ত পর্যায়গুলির মধ্যেই ধর্ম অনুস্যূত থাকবে ত্রিবর্গের বোধটা এই রকমই। কুম্ভকর্ণ এটাকেই বলেছেন — রাজাই হও আর রাজপুত্রই হও, ত্রিবর্গের মধ্যে কোনটি মুখ্য. সেটা না বুঝলে সব কিছুই বিফল।

আমাদের অন্যতর মহাকাব্য মহাভারতের মধ্যে ধর্মার্থকামের ত্রিবর্গস্থিতির মধ্যে ধর্মের মাহাত্ম্যটা অনেক স্পষ্ট করে দেখানো আছে বলে আমরা মনে করি — ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ

স কিমর্থো ন সেব্যতে। কিন্তু রামায়ণে মোক্ষ সাধনের মাত্রাটা একেবারেই ক্ষীণ হওয়ায় ত্রিবর্গস্থিত ধর্মের সাধনই এখানে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রামায়ণের চরিত্রগুলির দিকে তাকালেও ধর্মার্থকামের এই নীতি খানিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রামায়ণের আদি প্রান্ত কৈকেয়ীর বশম্বদ কামাত্মা নৃপতি দশরথের অন্যায় আদেশ দিয়ে আরম্ভ ; রামায়ণের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন অন্য আরেক কামাত্মা পুরুষ, রাক্ষসরাজ রাবণ — দশরথের কামাত্মতার ফল আদিকাণ্ড থেকে রামের বনবাস পর্যন্ত বিস্তৃত, আর রাবণের কামাত্মতার ফল রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড থেকে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। এই কামাত্মতা ধর্মের শৃঙ্খলায় পরিসীমিত নয়। রামানুজ লক্ষ্মণ নিজেই নিজেকে দ্বিতীয় বর্গ অর্থের পক্ষপাতী রূপে স্থাপন করেছেন, যদিও তাঁর এই অর্থাত্মতা নিজের কারণে অভিব্যক্ত হয়নি। অগ্রজ রামচন্দ্রের শুভৈষণায় তাঁর অর্থাত্মতা প্রবর্তিত হয়েছে বলেই লক্ষ্মণকে আমরা তেমন করে চিহ্নিত করতে পারি না। সুগ্রীব অবশ্যই ধর্মাবিরুদ্ধ অর্থৈষণার উদাহরণ, এবং অবশ্যই অগ্রজ বালিও তাই। বিভীষণের মধ্যে ধর্মাত্মতাই বেশি, কিন্তু রাজা হিসেবে তাঁকে তেমন করে যাচাই করা যায় না বলেই তিনি আলোচ্যও নন।

এঁদের মধ্যে সর্বতো ভিন্নভাবে দাঁড়িয়ে আছেন রামচন্দ্র — যাঁর কাছে কামও মিথ্যা বস্তু নয়। অর্থৈষণা বা রাজসমৃদ্ধিও কোন বিরাগের বস্তু নয়। কিন্তু সবার ওপরে আছে তাঁর ধর্ম — যে ধর্ম তাঁর কামনার সঙ্গেও সংপৃক্ত, আবার তাঁর রাজপদবীর সঙ্গেও তা সমানভাবে সংযুক্ত। ক্রৌঞ্চবিরহী কবি যখন একটিও শ্লোক রচনা করেননি, তখন তিনি আপ্লুত ছিলেন শুধু এই চিন্তায় যে, কেমন করে আদর্শ মানুষের দেখা পাবেন। এমন মানুষ যিনি গুণবান, বীর্যবান, ধর্মজ্ঞ এবং কৃতজ্ঞ, যিনি সত্য কথা বলেন এবং কর্তব্য কার্যটি করেন সমস্ত দৃঢ়তা নিয়ে। যিনি অসাধারণ চরিত্রবান এবং সমস্ত প্রাণীর হিতকার্যে রত।[২১]

এমন একটি আদর্শ মানুষকে যেখানে 'আইডিয়াল' কিংবা ইউটোপিয়ার স্তরেই রাখতে হত, ক্রৌঞ্চবিরহী কবি সেখানে সেই আদর্শ চরিত্রের অঙ্কন করেছেন শিল্পিজনোচিত সমব্যথায়। আসলে ত্রিবর্গের বিবেচনায় ধর্ম বলতে বিশদর্থে যা বোঝায়, তার মধ্যে সমস্ত মহদ্গুণগুলিই আছে। অহিংসা, সত্য, ঋজুতা, জিতেন্দ্রিয়তা, সচ্চরিত্রতা --- এগুলি যেমন একটি আদর্শ মানুষের স্বভাবের মধ্যে পড়ে, তেমনই একটি মানুষ সদা-সর্বদা ধর্ম অনুসারে চলেন — একথা বললে বুঝতে হবে যে উপরোক্ত গুণগুলিই সেই মানুষের মধ্যে আছে বলেই তিনি ধর্মজ্ঞ এবং ধর্মানুসারে চলেন। অথচ রামচন্দ্রের ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে অর্থ বা ঐহিক সমৃদ্ধির কোন বিরোধ নেই। কারণ অর্থকে তিনি ন্যায় এবং ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

আপনারা অযোধ্যাকাণ্ডে সেই সভাস্থলটি স্মরণ করুন। রাজ্যের তাবৎ গুণী ব্যক্তিরা দশরথের সভায় মিলিত হয়েছিলেন অযোধ্যানগরীর পরবর্তী রাজার মনোনয়নের জন্য।

সেই মহতী সভায় রামচন্দ্রের নাম প্রস্তাবিত হলে পৌর-জনপদবাসীরা পর্যন্ত সম্মিলিত সুরে বলেছিলেন রামচন্দ্র যেন সাক্ষাৎ ধর্ম এবং অর্থের আধার — সাক্ষাদ্ রামাদ্বিনির্বৃত্তো ধর্মশ্চাপি শ্রিয়া সহ।[৯২] রামের অসংখ্য গুণ এইখানে উচ্চারিত হয়েছে। একটি জ্ঞানী ব্রাহ্মণ থেকে আরম্ভ করে একটি সামান্য প্রজাও তাঁর প্রিয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট — পৌরান্ স্বজনবন্নিত্যং কুশলং পরিপৃচ্ছতি।[৯৩] শাস্তি পাবার যোগ্য মানুষকে যদি বধও করতে হয়, তবে সেখানেও রামচন্দ্র যুদ্ধের নিয়ম-নীতি লঙঘন করেন না। এতটাই তাঁর নীতি-জ্ঞান।

ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং কামনা কখনও তাঁকে পীড়িত করে না বলেই ত্রিবর্গের অধম কামবৃত্তির প্রকাশ তাঁর মধ্যে নেইই — ন রাগোপহতেন্দ্রিয়ঃ। সীতার প্রতি তাঁর অনুরাগের কোন অভাব নেই। চতুর্দশ বৎসরের অরণ্য-বসতিতে সীতার সাহচর্যে তিনি কত সুখে কাল কাটাবেন, তার সম্বন্ধে রীতিমত সোচ্ছ্বাস বর্ণনা আছে রামচন্দ্রের মুখে। সীতার অকারণ আবদার মানতে গিয়ে সোনার হরিণ ধরতে যাওয়াটাও এক প্রেমিক পুরুষের চরমতম নমনীয়তা হিসেবেই আমরা মনে করেছি এবং এই নমনীয়তা আমরা রামচন্দ্রের মধ্যে দেখেছি, কিন্তু তবু সেই নমনীয়তাকে কামাত্মতা বলতে প্রবৃত্তি হবে না কারও। আর যদি এই প্রবৃত্তি হয়, তবে রাবণের বিশেষণ কী হবে?

বস্তুত কাম এবং অর্থ এমনভাবেই ধর্মান্বিত হয়েছে রামচন্দ্রের মধ্যে, যাতে করে ধর্মের মধ্যেই তাঁর অর্থ-কাম গুণীভূত সত্তা পরিগ্রহণ করেছে। তারা আছে, কিন্তু প্রকটভাবে নেই। সর্বাত্মক ধর্ম তাঁর অর্থৈষণা এবং কামকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে — স্মিতপূর্বাভিভাষী চ ধর্মং সর্বাত্মনাশ্রিতঃ।[৯৪]

ধর্মশাস্ত্রকারেরা কিংবা পুরাণ-ইতিহাসও স্পষ্ট করে বলেনি যে, আদর্শ রাজার জীবনে ধর্মার্থকামের ক্রমিক গুরুত্বটা কীভাবে অবরোহের পন্থায় গৌণ হতে থাকে। কিন্তু রামচন্দ্রের জীবনেই এই ক্রমিক গৌণতা টের পাওয়া যায়। অর্থের জন্য কামকে এবং ধর্মের জন্য অর্থকে যে বিসর্জনও দেওয়া যায়, রামায়ণের চরম নীতিধর্মও তাই। পূর্বোক্ত সীতা পরিত্যাগের কথাটাই এখানে আবার আসবে। আমাদের অন্যতর মহাবাক্য বলেছে — কাম, এবং কাম প্রতিহত হলে যে ক্রোধ হয়, সেই ক্রোধ — এই দুটোকেই বাদ দিয়ে ধর্মের অনুসরণ করতে হবে।[৯৫] কারণ, ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য রাজার অস্তিত্ব, কাম-বিলাসের জন্য নয় — ধর্মায় রাজা ভবতি ন কাম-করণায় তু।[৯৬] যে ধর্মের জন্য রাজার অস্তিত্ব, রাজার সার্থকতা, সেই ধর্ম হল প্রজারঞ্জন। রাজা ঠিকমতো প্রজা পালন করছেন মানেই তিনি ধর্ম লাভ করছেন — ধর্মং পুরুষশার্দূল প্রাপ্স্যতে পালনে রতঃ। এ কথাটা ঋগ্‌বেদ থেকে রামায়ণ, মহাভারত থেকে মনুসংহিতা সর্বত্রই একরকম।[৯৭]

প্রজার কাছে রাজার ধর্ম প্রমাণ করার জন্যই রামচন্দ্রকে সীতা পরিত্যাগ করতে হয়েছে, অর্থাৎ প্রজার মুখে রামচন্দ্রের কামাত্মতার প্রশ্ন জেগেছে। রাবণের গৃহবাসিনী

স্ত্রীকেও তিনি গ্রহণ করলেন — এই গ্রহণের মধ্যে রাবণের সম্বন্ধে প্রজাদের সন্দেহ যত আছে, তার চেয়ে বেশি আছে রামচন্দ্রের দুর্বলতা নিয়ে সন্দেহ। তৎকালীন বিশ্বাস অনুযায়ী প্রজারা যেমন শুদ্ধস্বভাবা সীতার চরিত্রে সন্দেহ করেছে, তেমনই সন্দেহ করেছে রামচন্দ্রের দুর্বল মোহগ্রস্ততার প্রতি। রামচন্দ্রকে তাই ধর্মের কারণে, বিশেষত রাজ-ঋদ্ধি 'অর্থে'র কারণে সীতাকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে। রামচন্দ্রকে তথাকথিত ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্য কাটিয়ে উঠতে হয়েছে অর্থ এবং ধর্মের কারণে। নইলে লোকে তাঁর পিতার সম্বন্ধে যে নিন্দামন্দ করত এবং যা তাঁর নিজের মুখ দিয়েও বেরিয়েছে, সেই অর্থ-ধর্মের দ্বারা অসম্পৃক্ত কাম রামচরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াত, ঠিক যে বৈশিষ্ট্য দশরথ-চরিত্রের প্রধান ব্যপদেশ —

> অর্থধর্মৌ পরিত্যজ্য যঃ কামমনুবর্ততে।
> এবমাপদ্যতে ক্ষিপ্রং রাজা দশরথো যথা।।[৯৮]

অতএব রামচন্দ্র পিতা দশরথের বৈপরীত্যে নিজেকে অর্থধর্মের প্রকোষ্ঠে স্থাপন করেছেন এবং সে কারণে প্রাণপ্রিয়া সীতাকেও পরিত্যাগ করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি।

অথচ ওই একই রামচন্দ্রের সামনে যখন রাজ্যলাভের হাতছানি ছিল, 'অর্থ'-সম্পত্তি যখন তাঁর করতলগত বদরীর প্রায়, সে সময় তিনি তাঁর এই অর্থৈষণা পরিত্যাগ করে ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে দ্বিতীয় বর্গ অর্থলাভের মূল উপায় হল উত্থান — অর্থস্য মূলমুত্থানম্।[৯৯] রাজ্যলাভের জন্য সদা-জাগ্রত চেতনা এবং উৎসাহ শক্তির বলেই একজন রাজা অর্থের সার্থকতা প্রতিপন্ন করেন। রাজধর্মের মূল ভিত্তিই হল এই উত্থান শক্তি।[১০০] কিন্তু উত্থান শক্তির মাধ্যমে রাজসমৃদ্ধি লাভ বা অর্থলাভের মধ্যে যদি কোন অন্যায় থাকে, তবে সেটি রাজধর্মের মাহাত্ম্য থেকে চ্যুত হয়, কারণ সেখানে অর্থই শুধু আছে ধর্ম নেই।

এই ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থকেও যে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তারও প্রমাণ পাওয়া যাবে রামায়ণের রামচরিত্রেই। লঙ্কাকাণ্ডে ইন্দ্রজিৎ যখন বানর সৈন্যদের সামনে মায়া-সীতা বধ করে চলে গেলেন, তখন সেই খবর শুনে রামচন্দ্র ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। রামচন্দ্রের দুর্দশা দেখে ক্ষুব্ধ লক্ষ্মণ প্রিয় ভ্রাতার উদ্দেশে বললেন, আর্য! তুমি তো চিরকাল সৎপথে থেকেছ, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিও তোমার বশীভূত, কিন্তু যে ধর্ম রক্ষার জন্য তোমার এত প্রয়াস, সেই ধর্ম কিন্তু তোমাকে কোন বিপদ থেকেই রক্ষা করতে পারল না — অনর্থেভ্যো ন শক্নোতি ত্রাতুং ধর্মো নিরর্থকঃ।[১০১] অতএব তোমার এই ধর্ম মিথ্যা।

ধর্ম পথে থেকেও লোকের সর্বনাশ এবং অধর্ম আচরণ করেও লোকের অনুপম শ্রীবৃদ্ধির উদাহরণ দিয়ে লক্ষ্মণ বেশ বিশাল একটা বক্তৃতা দিলেন।[১০২] একথাও বললেন যে, যাদের অর্থ আছে তাদেরই লোকে পুরুষ বলে, পণ্ডিত বলে, বীর বলে এবং বুদ্ধিমানও

বলে। অর্থসাধন পরিত্যাগ করে ধর্ম করতে যাওয়ার মধ্যে কোন বুদ্ধিই নেই — অর্থস্যোতে পরিত্যাগে দোষাঃ প্রব্যাহৃতা ময়া।[১০৩] তুমি পিতার আদেশে বনবাসী হয়ে এত দুঃখ পেলে তার মধ্যে তোমার স্ত্রীকেও হরণ করে নিয়ে গেল রাক্ষস রাবণ। কাজেই তোমার প্রাপ্য রাজ্য ছেড়ে এসে কোন ধর্মের ফল তুমি পেলে, অথবা কী মহতী বুদ্ধির পরিচয় তুমি দিলে, তা বোঝা গেল না — রাজ্যমুৎসৃজতা বীর যেন বুদ্ধিস্ত্বয়া কৃতা।[১০৪]

লক্ষ্মণের প্রকৃতি অর্থসাধনের অনুকূল। রামচন্দ্র যখন পিতার আদেশে বনযাত্রায় প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন তিনি অর্থশাস্ত্রের নিয়মমতো সদ্যোত্থায়ী উৎসাহযুক্ত রাজার বুদ্ধিতেই কথা বলেছিলেন। তাঁর ধারণা দুর্বল লোকেরাই ধর্ম-ধর্ম করে এবং সেই দুর্বল মর্যাদাহীন ধর্মের সেবা বাদ দিয়ে পৌরুষেরই অনুবর্তন করা উচিত, অর্থাৎ ধর্মের প্রতি তোমার আনুগত্য থাকে থাকুক, কিন্তু একই আনুগত্য থাকা দরকার অর্থের প্রতিও—ধর্মউৎসৃজ্য বর্তস্ব যথা ধর্মে তথা বলে।[১০৫] এই মতের অনুপন্থী হয়েই লক্ষ্মণ তাঁর ধনুকবাণ হাতে তুলে নিয়েছিলেন অযোধ্যাকাণ্ডে। দশরথ অথবা ভরতকে উচিত শিক্ষা দিয়ে রামচন্দ্রকে সিংহাসনে বসানোর কাজটা তিনি করতে চেয়েছিলেন উৎসাহ, উত্থান এবং অর্থের অভিসন্ধিতেই। কিন্তু রামচন্দ্র এই অর্থের অভিসন্ধি পরিত্যাগ করে ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন সর্বাত্মক ভাবে। তিনি পিতার সত্য রক্ষার ধর্ম, তাঁর আদেশ এবং সর্বোপরি যাতে সপুত্রা কৈকেয়ী বঞ্চিত বোধ না করেন, সেই কারণে রাজ্য পরিত্যাগ করে বনবাসী হয়েছিলেন।

কুমার লক্ষ্মণের বৈপরীত্যে ধর্মার্থকামের প্রাধান্য কোনখানে—সে বিষয়ে রামচন্দ্রের দৃষ্টিটাই সর্বতোভাবে রামায়ণের ধর্মনীতি। বনবাসের সংবাদক্লিষ্টা জননী কৌশল্যা এবং সদোত্থায়ী লক্ষ্মণকে শান্ত করে তিনি বলেছিলেন—লক্ষ্মণ! আমার মায়ের মতো তুমিও একইরকম অবুঝ হয়েছ ভাই! তোমরা কেউ আমাকে বোঝার চেষ্টা করছ না — মম ত্বভিপ্রায়মসন্নিরীক্ষ্য। মাত্রা সহাভ্যর্দসি মাং সুদুঃখম্। রাম বললেন, ধর্ম অর্থ এবং কাম — এই তিনটিকেই সমস্ত লৌকিক সুখের কারণ বলে মনে করা হলেও এই তিনটিই একমাত্র ধর্মেরই অন্তর্গত। এই যেমন ধর, একই স্ত্রী আমার বশীভূত হয়ে আমার ধর্মাচরণের সহায় হতে পারে, তেমনই আমাকে রঞ্জিত করে আমার কামনা পূর্তি করতে পারে আবার পুত্রবতী হয়ে আমার অর্থসাধনের সহায় হতে পারে।[১০৬] এই কথাগুলো থেকে বোঝা যায় — ধর্ম, অর্থ এবং কামের ওপরেও আরও এক কঠিন ধর্ম আছে, যা কার্যকালে ধর্মার্থকামের ইতিকর্তব্যতা নির্ণয় করে।

রামচন্দ্র মনে করেন যে সমস্ত কাজের মধ্যে ধর্ম, অর্থ এবং কাম — এই তিনের সমাবেশ নেই, সেই সব কাজের মধ্যে যেখানে শুধু ধর্ম আছে, সেই কাজটাই করা উচিত। কেননা যে সমস্ত কাজে শুধু অর্থের প্রাধান্য, শুধু সেগুলিরই অনুষ্ঠান করলে লোকের বিদ্বেষভাজন হতে হয়। আবার যে সমস্ত কাজের মধ্যে শুধু কাম আছে, সেগুলির অনুষ্ঠানও লোকের প্রশংসাবহ হয় না।[১০৭]

ধর্মার্থকামের এই সংবিভাগের ক্রমিক অন্বয়ে কখন কোনটা গুরুতর হয়ে ওঠার কথা, সেটা যেমন রামচন্দ্রের দৃষ্টান্তে রামায়ণ থেকে স্পষ্ট করে দেখানো যায়, তেমনই এই ধর্মার্থকামের ওপরেও আরও বড়ো এক ধর্ম আছে, যে ধর্ম রামচন্দ্রকে অর্থাভিসন্ধিহীন এক সমদর্শী ঋষির তুল্য করে তুলেছে।[১০৮] যে ধর্মের সাধন ধর্মার্থকামের ওপরেও পিতার সত্য, ভাইদের ভালবাসা, বন্ধুত্বের মান্যতা এবং সবার ওপর শত্রুরও কল্যাণ কামনা করে, সেই ধর্মই রামায়ণের মূল ধর্মনীতি। এই নীতির বলে একটি সাধারণ প্রজাও কষ্ট পেলে রামচন্দ্র কষ্ট পান এবং সে সুখী হলে রাজা রামচন্দ্র সুখী হন[১০৯] — রামায়ণ সবার ওপরে এই ধর্মেরই উপদেশ দিয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় হল রামায়ণে রামচন্দ্রের এই সমদর্শিতার প্রমাণ যেখানে সর্বত্র পাওয়া গেছে, সেখানে পণ্ডিতজনেরা কী করে শূদ্র শম্বুকের হত্যাকাণ্ডে বিশ্বাস করেন, তা আমাদের মাথায় আসে না। আরেক দল পণ্ডিত আছেন যাঁরা একদিকে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডকে সর্বতোভাবে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন অন্যদিকে আবার রামচন্দ্রকে শম্বুক-বধের জন্য যথেষ্ট নিন্দামন্দও করেন। আমরা এঁদের দ্বিচারিতার ভাষা বুঝি না। উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষেপবাদে যদি বিশ্বাস থাকে, তবে শম্বুকবধের ব্যাপারটাকে এক বিরাট ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে মানার কোন দরকার পড়ে না। রামচন্দ্রের ঐতিহাসিকতাতেও যাঁদের বিশ্বাস নেই, তাঁরা হঠাৎ শম্বুকবধের ঘটনায় কেমন করে ঐতিহাসিক হয়ে পড়েন— সেটা ভাবলে এই পণ্ডিতমশাইদের মনস্তত্ত্বে এক বিশেষ অভিসন্ধি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

সমগ্র রামায়ণ জুড়ে যে রামচন্দ্রকে ক্রোধবশে কখনও ধৈর্যচ্যুত হতে দেখিনি, সেই রামচন্দ্র শম্বুকের তপস্যার কথা শোনামাত্র তরবারি কোষমুক্ত করলেন এবং শম্বুকের মস্তক ছেদন করলেন — এ কথা তেমন আদরণীয় নয়। শম্বুকের উপাখ্যান এবং তাঁর হত্যাকাণ্ড এমনই এক সংস্কারের ওপর ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে, যা পড়লেই বোঝা যায় যে, ওই ঘটনাগুলি কতগুলি অক্ষম ব্রাহ্মণের ধর্মবোধহীন প্রচারমাত্র। এই ঘটনার মধ্যে রামচন্দ্রকে জড়িয়ে ভারতবর্ষের অন্যতম আদর্শ পুরুষটিকে তাঁরা কলঙ্কিত করেছেন, হয়তো বা আমাদেব আরাধ্য দেবতাকেও তাঁরা পরমোদার মনুষ্যত্বের মঞ্চ থেকে টেনে নামিয়ে দিয়েছেন। শম্বুকবধের যাথার্থ্য এবং অযাথার্থ্য কোনটাই তাই আমাদের প্রতিপাদ্য নয়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রামায়ণের নীতি-ধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে চিরন্তন রাজধর্মের নিরিখে এটা বলতেই হবে যে, রাজাই হলেন বর্ণ এবং আশ্রমধর্মের রক্ষক। রামায়ণের সমাজ বর্ণধর্মে বিশ্বাস করত এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের তর-তমতেও যথেষ্ট বিশ্বাস করত। কিন্তু বিশ্বাসটা এমন দৃঢ় এবং ক্রূর ছিল না যে, ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য বর্ণের মানুষ তপস্যা আচরণ করলেই তিনি রাজার বধ্য হতেন। একটা উদাহরণ দিলেই

ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে, শম্বুক বধের বিপ্রতিপত্তিও বোঝা যাবে। তবে তার আগে শম্বুক-বধের প্রসঙ্গটিও উল্লেখ করতে হবে। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে এক ব্রাহ্মণ তাঁর প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর জন্য রাজা রামচন্দ্রকে দায়ী করলেন। তিনি বলেছিলেন — নরবর! আপনার রাজ্যে নিশ্চয়ই কোন কুকর্ম সংঘটিত হচ্ছে, আপনি ভাল করে খুঁজে দেখুন এবং সেই কুকর্মের প্রতিবিধান করুন — দুষ্কৃতং যত্র পশ্যেথাস্তত্র যত্নং সমাচর। এইভাবে আপনার ধর্মেরও উন্নতি হবে এই বালকও বেঁচে উঠবে।

ব্রাহ্মণের কথা শুনেই রামচন্দ্র মুনি-ঋষি-মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। মুনি-ঋষিরা সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চতুর্যুগে চতুর্বর্ণের তপস্যার বিধিনিয়ম ব্যাখ্যা করে বললেন, এই ত্রেতাযুগে যাঁরা শুধু ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় আছেন, তাঁরাই শুধু তপস্যা করবেন। আর বৈশ্য এবং শূদ্রেরা শুধু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সেবা করবেন — এটাই তাঁদের স্বধর্ম।[১১০] রামচন্দ্রের তথাকথিত পরামর্শদাতারা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করলেন যে, শূদ্রেরা একমাত্র কলিযুগেই তপস্যাচরণ করতে পারে, কিন্তু এই ত্রেতাযুগে কোথা থেকে এই বিপর্যয় ঘটল? আপনার রাজ্যে নিশ্চয়ই কোন শূদ্র তপস্যা করেছে যার ফলে এই ব্রাহ্মণ বালক মারা গেছে — অদ্য তপতি দুর্বুদ্ধি-যেন বালবধো হ্যয়ম্।

উক্ত পরিচ্ছেদে মনে রাখতে শুধু একটা কথা। ব্রাহ্মণদের মুখে আমরা শুনেছি যে, তাঁদের ত্রেতাযুগে বৈশ্য এবং শূদ্র এই দুই বর্ণই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের সেবায় নিযুক্ত হয়েছে —শুশ্রূষামপরে জনাঃ। অর্থাৎ এঁদের সময়ে তৃতীয় বর্ণ বৈশ্যদেরও মর্যাদাচ্যুতি ঘটেছে, শূদ্রের সঙ্গে তাঁরাও একই শুশ্রূষার হীনকর্মে নিযুক্ত। এইবার আমাদের প্রত্যুদাহরণের কথা বলি।

রাজা দশরথ অন্ধমুনির পুত্রকে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করে বিলাপ করেছিলেন। দশরথ নিজেই তাঁর মৃগয়াব্যসনিতার উচ্চারণ করে বিলাপ করেছিলেন কৌশল্যার কাছে। অন্তত এই অংশটিকে কেউই প্রক্ষিপ্ত মনে করেন না। রামচন্দ্র তখন বনবাসী। দশরথ মৃত্যুপথযাত্রী। এই অবস্থায় তিনি তাঁর পূর্বের অপরাধ স্মরণ করে সকরুণ বিলাপ করেছেন আবার। কৌশল্যাকে তিনি বললেন বাণ নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি একটি মানুষের পতন-শব্দ শুনতে পেলাম। মানুষটি কথা বলছিল — বাগভূত্য তত্র মানুষী। সে বলছিল আমাদের মতো তপস্বীর গায়ে কে এমন করে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারে — কথমস্মদ্‌বিধে শস্ত্রং নিপাতেচ্চ তপস্বিনি।[১১১]

লক্ষণীয়, দশরথ যাঁর গায়ে অস্ত্রনিক্ষেপ করেছেন, তিনি নিজেকে নিজেই তপস্বী বলে চিহ্নিত করেছেন। এর পরেই অন্ধমুনির সেই মরণোন্মুখ পুত্রটি বলেছেন, আমরা বনে বাস করি। বনের ফলমূল খাই। কারও সঙ্গে আমাদের কোন হিংসা-দ্বেষও নেই। সেই আমাদের মতো ঋষিকে অস্ত্রের আঘাতে বিনাশ করাটা কি উচিত হল? আমার মাথায় জটাভার, পরিধানে মৃগচর্ম, বিশেষত আমি কারও কোন অপকারও করিনি, তাহলে

কে, কী কারণে আমাকে এইভাবে অস্ত্রাঘাত করল?[১১২] অর্থাৎ অন্ধমুনির পুত্র নিজেকে শুধু তপস্বী এবং ঋষি বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি যে ঋষিত্বের বাহ্য আচার হিসেবে জটা-চীরও ধারণ করেন, সেটাও রাজা দশরথকে মনে করিয়ে দিয়েছেন।[১১৩]

দশরথ কৌশল্যাকে বলেছেন রাত্রিশেষে সেই ঋষির করুণ বিলাপ শুনে — তস্যাহং করুণং শ্রুত্বা ঋষে র্বিলপতো নিশি — আমি শোকবেগে ত্রস্ত হলাম। পরে সরযূনদীর তীরে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দেখলাম সেই তপস্বী আমার অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত দেহে ধূলোর মধ্যে মাটিতে পড়ে আছেন জটাভার আলুলায়িত করে — অপশ্যমিষুণা তীরে সরয্বাস্তাপসং হতম্।[১১৪]

লক্ষ্য করে থাকবেন যে, আমরা এখানে রামায়ণের সেই শ্লোকগুলিই উদ্ধার করেছি, যেগুলির মধ্যে অন্ধমুনির পুত্র নিজেকে ঋষি, ঋষিপুত্র বা জটা-বল্কলধারী তপস্বী বলে চিহ্নিত করেছেন। ঋষিকুমার এমনও বলেছেন যে, আমার অন্ধ পিতা-মাতা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ছেলে ফিরলেই জল খাব এই আশা নিয়ে বসে আছেন। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে তপস্যা বা বেদ-অধ্যয়নের কোন ফলই নেই, নইলে আমি যে এমন করে অস্ত্রদিগ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে আছি সে কথা আমার পিতা জানতে পারছেন না কেন — ন নূন তপসো বাস্তি ফলযোগঃ শ্রুতস্য বা।[১১৫]

দশরথ যখন পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ অন্ধমুনির কাছে নিবেদন করেছেন, তখনও তাঁদের মুনি বলেই সম্বোধন করেছেন এবং ক্রৌঞ্চবিরহী কবিও নিজের বর্ণনায় এই মৃতপুত্রক অন্ধ পিতা-মাতাকে কখনও মুনি, কখনও ঋষি, কখনও ব্রহ্মবাদী তপস্বী বলতে দ্বিধা করেননি। সাঙ্গ বেদ-অধ্যয়ন এবং তপস্যা এই বনবাসী সংসারের বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই দশরথও অন্ধমুনিকে ব্রাহ্মণ ভেবেই কথা বলেছেন।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল—অন্ধমুনির জাতিবর্ণ সম্বন্ধে যদি কোন ব্রাহ্মণ্যের ধারণা দশরথের তৈরীও হয়ে থাকে, তবে সেই ভ্রান্তি ভেঙে দিয়েছিলেন মরণোন্মুখ মুনিকুমারই। মুনিকুমারের দেহে যে শব্দভেদী বাণটি প্রবেশ করেছিল, সেটিকে বার করে দেবার জন্য তিনি দশরথকে অনুরোধ করেন। তাঁর অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছিল এবং মুনিকুমার ভাবছিলেন যে, বাণটি দেহ থেকে বার করে নিলেই তাঁর যন্ত্রণামুক্তি হবে। কিন্তু দশরথ জানতেন বাণটি বার করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত আরও বাড়বে এবং তাঁর মৃত্যু হবে, এর চেয়ে যন্ত্রণাও হয়তো ভাল — সশল্যঃ ক্লিশ্যতে প্রাণৈর্বিশল্যো বিনশিষ্যতি। অস্ত্রাঘাতে যা ঘটেছে, ঘটেছে। আপাতত নিজের হাতেই অন্তত ব্রহ্মহত্যা না ঘটে, তার জন্য চিন্তান্বিত ছিলেন দশরথ।

দশরথের দ্বৈধীভাব মুনিকুমার সহজেই বুঝতে পারলেন এবং শক্তিহীন অবসন্ন অবস্থাতেও মুনিকুমার দশরথের উদ্দেশে বললেন, আমি আমার ধৈর্য দিয়ে আমার এই দুরন্ত কষ্ট সহ্য করে নিয়েছি। আপনিও আপনার ব্রহ্মহত্যার ভয় মন থেকে দূর করুন।

মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ নই। আমার পিতা একজন বৈশ্য এবং মা শূদ্রাণী। অতএব আপনি নির্ভয়ে আমার শরীর বাণমুক্ত করুন। আপনার ব্রহ্মহত্যার পাপ হবে না —

> ন দ্বিজাতিরহং রাজন্ মা ভূৎ তে মনসো ব্যথা।
> শূদ্রায়ামাস্মি বৈশ্যেন জাতো নরবরাধিপ।।[১১৬]

আমাদের জিজ্ঞাসা, এই অন্ধ মুনি এবং অন্ধ মুনিপত্নী এই দুজনে একজন বৈশ্য এবং শূদ্রানী হওয়া সত্ত্বেও একেবারে ত্রেতাযুগে বসেই তো দিব্যি তপস্যা করছিলেন। বৈশ্য এবং শূদ্রানীর সংকরজন্মা পুত্রটিও তো মুনি-ঋষি এবং তপস্বীর মর্যাদায় সর্বত্র চিহ্নিত। স্বাধ্যায়, অধ্যয়ন, তপশ্চরণ, অগ্নিহোত্র—কোন ব্রাহ্মণ্য আচরণই এঁদের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে ওঠেনি এবং তাঁদের তপশ্চরণের ফলে দশরথের রাজ্যে কারও মৃত্যুও ঘটেনি। যে সংকরজন্মা ঋষি বালকটি দশরথের হাতে মারা গেলেন বৈশ্য পিতা তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন যাঁরা নিয়ত বেদ অধ্যয়ন করেন এবং তপশ্চরণ করেন, যাঁরা নিয়ত অগ্নিহোত্র করেন, তুমি তাঁদের সদ্‌গতি লাভ কর, বাবা — তাং গতিং গচ্ছ পুত্রক।[১১৭]

দশরথের রাজ্যে যখন একটি বৈশ্য-শূদ্রের মিশ্র সন্তানের জন্যও এই শুভাকাঙ্ক্ষা করা যায়, তখন নিশ্চিত বোঝা যায় যে, বৈশ্য-শূদ্রেরা তখনও সেই ঘৃণার পর্যায়ে এসে পৌঁছননি, যতখানি আমরা শম্বুকের উপাখ্যানে দেখতে পাচ্ছি। রামায়ণের সমাজে চতুর্বর্ণের বিভাগ নিশ্চয়ই ছিল, তাঁদের ক্রিয়াকর্মও নিঃসন্দেহে নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু চাতুর্বর্ণ্যের পারস্পরিক সম্পর্কে এমন কোন ক্রূরতা ছিল না,[১১৮] যাতে শম্বুকের উপাখ্যান যুক্তিসহ মনে হয়। ভুলে গেলে চলবে না যে, রামচন্দ্রের পরম বন্ধু ছিলেন নিষাদ গুহ। ভুলে গেলে চলবে না মতঙ্গ মুনির পরিচারিকা ছিলেন এক শবরী এবং তিনি আত্মগুণে তাঁর ঈশ্বরকল্প রামচন্দ্রের দেখা পেয়েছিলেন। তথাকথিত তির্যকযোনি অথবা অনার্যকল্প বানর, ভল্লুক, রাক্ষসেরাও রামচন্দ্রের বন্ধুত্বের সম্মান লাভ করেছিলেন। ঠিক এই নিরিখে দেখতে গেলে শম্বুকবধে শূদ্রবর্ণের প্রতি এই ক্রূঢ়তা স্বার্থাভিলাষীদের চক্রান্ত বলেই মনে হয়। অন্তত রামায়ণের নীতিধর্ম এটা নয়।

রামায়ণের নীতিধর্মে রাজধর্মের নীতি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই আরও একটা কথা না বলে পারছি না। আমরা আগে বলেছি দেশভেদে, কালভেদে, যোনিভেদে নীতিধর্মের ভিন্নতা ঘটে। এই ভিন্নতাটুকু দেখিয়েই আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করব। কালভেদে নীতিধর্মের যে কতটা ভিন্নতা ঘটে, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হয়ে গেছে শম্বুক-বধের উপাখ্যানেই। দেশভেদে নীতিধর্মের ভিন্নতা সবচেয়ে বেশি ধরা পড়বে মরণোন্মুখ বালীর সঙ্গে রামচন্দ্রের কথোপকথনে।

সুগ্রীবের যুদ্ধাহবান শুনে বালী যখন যুদ্ধ করার জন্য পা বাড়ালেন, তখন বালীর স্ত্রী তারা তাঁকে বারণ করেছিলেন। অযোধ্যার রাজপুত্র রামচন্দ্র যে সুগ্রীবকে সাহায্য

করছেন, সে কথাও তিনি বালীকে জানিয়েছিলেন। বালী রামচন্দ্রকে অবিশ্বাস করেননি। রামচন্দ্রের ওপরে তাঁর বিশ্বাস ছিল এতটাই যে তিনি তারাকে ধমকে দিয়ে বলেছিলেন, রামচন্দ্রকে সন্দেহ কোর না, তাঁর কথা ভেবে বিষাদগ্রস্তও হয়ো না। তিনি ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি এবং অন্যেরা তাঁর প্রতি কী ব্যবহার করেছেন বা করেন, সে সম্বন্ধেও তিনি সচেতন। তিনি কখনও কোন পাপকার্য করতে পারেন না—ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ কথং পাপং করিষ্যতি ?[১১৯] কিন্তু আমরা জানি বালীর এই বিশ্বাস সত্য হয়নি। রামচন্দ্র অন্যায়ভাবে বালীকে বধ করেছিলেন। ধর্মার্থকামের যে সব গূঢ় তত্ত্বকথা রামচন্দ্র জানেন, তা বালীরও কিছু কিছু অজানা নয়। রামচন্দ্রের মতে বালীর দোষ ছিল—তিনি সুগ্রীবের স্ত্রী রুমার সঙ্গে সংসর্গ করেছেন। কিন্তু বানর-রাজ্যে এই ব্যবহার কিছু অসঙ্গত নয়।

বালী বলেছিলেন — সাম, দান, ক্ষমা, ধর্ম, সত্য, ধৈর্য এবং পরাক্রম — এগুলি হল রাজার গুণ। তাছাড়া অপকারী ব্যক্তির ওপর দণ্ডবিধান করাটাই তো ঔচিত্যের মধ্যে পড়ে। তা আমি তোমার কী অপকার করেছি? আমরা বনে থাকি, বনের ফল-মূল খাই। আমাদের জমি উর্বর নয়, সোনা রুপোও তেমন কিছু নেই। কাজেই আমাদের সঙ্গে তোমার বিরোধের কারণটা কি? বালী রামচন্দ্রকে চিরন্তন রাজধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন রাজধর্ম ব্যাপারটা এত সংকীর্ণ জিনিস নয়। ন্যায়ের জায়গায় অন্যায় করা অথবা অনুগ্রহের জায়গায় নিগ্রহ করা — এমন সংকীর্ণ ব্যবহার রাজারা করেন না এবং তাঁরা স্বেচ্ছাচারীও হতে পারেন না — রাজবৃত্তিরসংকীর্ণা ন নৃপ কামবৃত্তয়ঃ।[১২০]

বালীর মতে রামচন্দ্র অর্থ-ধর্ম কোনটাই বোঝেন না, তিনি কামপ্রধান এবং লোভী, নইলে এমন অন্যায়ভাবে তিনি বালীকে বধ করবেন কেন? রামচন্দ্র বালীকে তাঁর যুক্তি শুনিয়েছেন। যুক্তিগুলো যে খুব জোরালো ছিল, তা মোটেই নয়। পরবর্তী কালের পণ্ডিত-সজ্জনরাও রামকৃত বালিবধ সমর্থন করতে পারেননি। শুদ্ধশীল রামচন্দ্রের চরিত্রে বালিবধের কলঙ্ক দুরপনেয় এবং তার কারণ একটাই। দেশভেদে যে নীতিভেদ, ধর্মভেদ ঘটে, সে সম্বন্ধে রামচন্দ্রের ধারণা খুব পরিষ্কার ছিল না। একই কথা বলতে হবে অন্য আরও একটি ক্ষেত্রেও কিন্তু সেখানে রামচন্দ্রের নিজস্ব নয়-নীতি তাঁর চিরাভ্যস্ত রাজধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ব্যক্ত হয়েছে।

রামচন্দ্র শরভঙ্গ মুনির আশ্রম ছেড়ে দণ্ডকারণ্যের পথে যাবেন, তখন আশ্রমবাসী মুনি-ঋষিরা বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী তপস্বীরা রামচন্দ্রের কাছে অনুনয় করে বললেন, আপনি ইক্ষ্বাকুবংশের প্রধান পুরুষই শুধু নন, আমাদের কাছে আপনি দেবরাজ ইন্দ্রের মতো — দেবানাং মঘবানিব। অতুল কীর্তি এবং বিক্রমে আপনি সর্বত্র বিখ্যাত। সত্য এবং ধর্ম আপনার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। আপনি নিজে ধর্মজ্ঞ এবং যাঁরা ধর্ম পালন করেন তাঁদের আপনি ভালবাসেন ; আর ঠিক সেইজন্যই আপনার কাছে আমাদের একটি প্রার্থনা আছে।

ঋষিরা রামচন্দ্রকে যতই ভাল-ভাল কথা বলুন, তাঁরা কিন্তু এখনকার গণতন্ত্রের নাগরিকের মতোই সচেতন। তাঁরা রাজার সঙ্গে প্রজার লেন-দেনের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, প্রজারা তাদের রাজাকে তাদের আয়ের একের ছয় ভাগ কর হিসেবে দেন। সেই কর রাজা যদি আত্মসাৎ করেন এবং প্রজারা যদি তাঁর কাছে কর দিয়েও পালনীয় পুত্রের মর্যাদা লাভ না করেন, তবে রাজার ভীষণ অধর্ম হয় —

অধর্মঃ সুমহান্ নাথ ভবেৎ তস্য তু ভূপতেঃ।
যো হরেদ্বলিষড়্ভাগং ন চ রক্ষতি পুত্রবৎ।।[১২১]

আমরা জানি সেকালের রাজারা ব্রাহ্মণ মুনি-ঋষিদের কাছ থেকে কর নিতেন না। সেকালের বিশ্বাস ছিল মুনি-ঋষিদের তপস্যার পুণ্যফল রাজারাও পান কিছুটা এবং তারও ভাগ আছে। রামায়ণের মতে এই তপস্যার ফলের ভাগ এক-চতুর্থাংশ। ঋষিরা সেটাকেও কর হিসেবেই মনে করেন। কারণ তাঁরাও বিশ্বাস করতেন যে আমরা এই বনের ফল-মূল খেয়ে, এত কষ্ট করে যে তপঃসাধন করছি ; তার একের চারভাগ পুণ্যফল রাজারা সিংহাসনে বসেই পাচ্ছেন, এর জন্য তাঁকে তো কোন পরিশ্রমই করতে হচ্ছে না।[১২২] অতএব এর পবিবর্তে মুনি-ঋষিরা রাজার কাছে অন্তত শারীরিক সুরক্ষাটুকু তো আশা করবেন।

ঋষিরা রামচন্দ্রের কাছে অনুনয় করে বললেন, আমাদের মধ্যে বানপ্রস্থী তপস্বীই বেশি এবং তাঁদের মধ্যেও অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। কিন্তু দেখুন, আপনার মতো একজন বীর রক্ষক থাকতেও রাক্ষসেরা আমাদের মেরে ফেলছে — ত্বন্নাথো'নাথবদ্রাম রাক্ষসৈ র্হন্যতে ভৃশম্।[১২৩] ঋষিরা রামচন্দ্রকে রাক্ষসদের আক্রমণের কিছু নমুনা দেখালেন। ঋষি মুনিদের ক্ষত-বিক্ষত দেহ এবং কিছু মৃত মুনির শরীর। রাক্ষসদের আক্রমণের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির সম্বন্ধেও রামচন্দ্রকে একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করলেন আশ্রমবাসী ঋষিরা। বললেন — ওই পম্পা-নদীর তীর, মন্দাকিনীর তটভূমি আর চিত্রকূট পাহাড়ের এপাশ-ওপাশে আর থাকবার জো রইল না — চিত্রকূটালয়ানাঞ্চ ক্রিয়তে কদনং মহৎ। রাক্ষসরা এইভাবে আমাদের মারছে, আর আপনি আমাদের রক্ষা করবেন না? তুমি ছাড়া এই পৃথিবীতে কার কাছে আমরা আশ্রয় ভিক্ষা করব — পরা ত্বত্তো গতি বীর পৃথিব্যাং নোপপদ্যতে।[১২৪]

তপস্বীদের আর্ত কণ্ঠস্বর শুনে রাম তাঁদের কথা দিলেন যে, তিনি তপস্বীদের শত্রু রাক্ষসদের যুদ্ধে হত্যা করবেন — তপস্বিনাং রণে শত্রূন্ হন্তুমিচ্ছামি রাক্ষসান্। রামচন্দ্র শরভঙ্গ মুনির আশ্রম ছেড়ে সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে গেলেন। তার পরের দিনই দণ্ডকারণ্যের পথ ধরলেন রাম, লক্ষ্মণ, সীতা। এদিকে সুতীক্ষ্ণের আশ্রম থেকে যাবার সময় দুই ভাই মুনির কাছ থেকে দুটি তূণ, ধনুক এবং খড়্গের উপহার লাভ করলেন। শরভঙ্গের আশ্রমে বানপ্রস্থী তপস্বীদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন রামচন্দ্র, এই অস্ত্রগুলি যেন সেই প্রতিজ্ঞার

করণস্বরূপ। মুনিদের কাছে রামের প্রতিজ্ঞা, তাঁর অস্ত্র লাভ এই সম্পূর্ণ ঘটনাগুলির ওপর সীতাদেবী তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন। রামচন্দ্র সস্ত্রীক সভ্রাতৃক দণ্ডকারণ্যের পথে চলেছেন সেই সময়ে একদিন সীতাদেবী প্রিয় স্বামীকে তর্কযুক্তির জালে আবদ্ধ করলেন।

সীতা বললেন, আমার মন বলছে তুমি কিন্তু মোটেই ভালকাজ করছ না। যদি খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে দেখ, তাহলে বুঝবে তুমি খুব মহান ব্যক্তি হয়েও অনেক অধর্ম সঞ্চয় করছ। দেখ, রাজাদের কামজ এবং ক্রোধজ দোষ থাকেই, কিন্তু তার মধ্যে তিনটে দোষ বড়ো সাংঘাতিক। প্রথমটা হল মিথ্যে কথা বলা, দ্বিতীয়টা পরস্ত্রীগমন, আর তৃতীয়টা হল বিনা শত্রুতায় প্রাণিহিংসা।[১২৫] সীতা যে কামজ এবং ক্রোধজ ব্যসনের কথা বলেছেন, তা পরবর্তী কালের ধর্মশাস্ত্রগুলিতে এবং মহাভারতেও অনেক সবিস্তারে বলা আছে। সীতা তার মধ্যে তিনটি ধরেছেন নিজের বিশ্বাস এবং ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী।

তিনটি ব্যসনের কথা বললেও রামচন্দ্রের মধ্যে যে তিনটিই আছে, তা নয়, সীতা বললেন, মিথ্যার প্রসঙ্গে বলি তুমি জীবনে মিথ্যা কথা বলনি, ভবিষ্যতেও বলবে না — মিথ্যাবাক্যং ন তে ভূতং ন ভবিষ্যতি রাঘবঃ। অধর্মজনক যে পরস্ত্রীগমন — সেও তুমি কোনদিন করনি, ভবিষ্যতেও করবে না, তা জানি। তুমি চিরকাল নিজের স্ত্রী ছাড়া কাউকে জান না। তুমি ধার্মিক, সত্যবাদী; পিতার আদেশমাত্র তুমি বনে এসেছ। তোমার মতো জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আর কে আছে? কিন্তু একটাই সাংঘাতিক দোষ তোমার ঘটছে। তা হল বিনা কারণে অন্য প্রাণীদের তুমি হিংসা করার কথা ভাবছ। এটা তোমার মোহ ছাড়া কিছু নয় — নির্বৈরং ক্রিয়তে মোহাৎ তচ্চ তে সমুপস্থিতম্।[১২৬]

রামচন্দ্র বলতে পারেন আর্ত ঋষিদের কথা কি ভুলে যেতে হবে? রামচন্দ্রের দিক থেকে এই যুক্তি ধরে নিয়েই সীতা বললেন, আমি জানি ঋষিদের কাছে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ যে, রাক্ষসদের বধ করবে তুমি। এমনকি সেই কারণেই যে তুমি দণ্ডক-বনের দিকে চলেছ তাও আমি জানি — এতন্নিমিত্তঞ্চ বনং দণ্ডকা ইতি বিশ্রুতম্। কিন্তু আমার তো তোমার ইহকাল-পরকাল দুইই চিন্তা করতে হবে। তোমরা দণ্ডকবনে যাও — এটা কিন্তু মোটেই আমি চাই না। তার কারণটাও শোন। তুমি যদি দণ্ডকারণ্যে গিয়ে বনচারীদের ওপর অকারণ অস্ত্রক্ষেপ কর সেটা মোটেই ভাল হবে না। জান তো শুকনো ঘাস অথবা কাঠ আগুনের কাছে থাকলে আগুনের তেজ বৃদ্ধি হয়, তেমনই ক্ষত্রিয়ের কাছে যদি ধনুক আর অস্ত্রশস্ত্র থাকে, তবে তার মেজাজটা বেড়ে যায় — ক্ষত্রিয়াণামিহ ধনুর্হুতাশনস্যেন্ধনানি চ।[১২৭]

সীতা তাঁর প্রিয় স্বামীকে একটি গল্প বললেন। বললেন, এক মুনির কাছে দেবরাজ ইন্দ্র একটি খড়্গ গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন। পরে সেই খড়্গ আর নিতে আসেননি। কালক্রমে সেই খড়্গের ওপর মুনির এমন অভিনিবেশ হল যে, তাঁর জপ-যজ্ঞ, হোম-তপস্যা মাথায় উঠল। পরে তিনি সেই অস্ত্রের সাহায্যে প্রাণিহিংসা আরম্ভ করলেন এবং

নরকে গেলেন। পণ্ডিতেরা তাই বলেন অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে চলা মানেই আগুন নিয়ে চলা, এ হল এক বিকার — অগ্নিসংযোগবদ্ধেতুঃ শস্ত্রসংযোগ উচ্যতে।[১২৮] সীতা বললেন, তুমি আমার ভালবাসার জন, তোমাকে শিক্ষা দিচ্ছি না, তবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, তুমি বিনা শত্রুতায় ধনুর্ধারণ করে দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসদের বিনষ্ট করার চেষ্টা কোর না। বিনা অপরাধে কাউকে বধ করাকে কেউ ভাল বলে না — অপরাধং বিনা হন্তুং লোকো বীর ন মংস্যতে।[১২৯]

অনেকক্ষণ নিয়ন্ত্রিতভাবে কথা বলার পর সীতা একটু কঠিনভাবেই বলার চেষ্টা করলেন। বললেন, ক্ষত্রিয়দের ধনুক হল আর্তদের রক্ষার জন্য। কোথায় তোমার এই অস্ত্র-শস্ত্র আর কোথায় এই বন? কোথায় তোমার ক্ষাত্রতেজ আর কোথায় এই বনবাসীর তপস্যা — ক্ক চ শস্ত্রং ক্ক চ বনং ক্ক চ ক্ষাত্রং তপঃ ক্ক চ[১৩০] — আমাদের অনুষ্ঠেয় কাজগুলো কেমন পরস্পরবিরোধী হয়ে উঠেছে। তুমি যখন আবার অযোধ্যায় ফিরে যাবে, তখন আবার তোমার ক্ষাত্রতেজ প্রদর্শন কোর। এখন তুমি রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হয়েছ। অতএব বনে থেকে তুমি যদি মুনিদের পালনীয় অহিংসা, ব্রত-নিয়ম পালন কর—তবে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি সবাই খুশি হবেন — যদি রাজ্যং হি সন্ন্যস্য ভাবস্ত্বং নিরতো মুনিঃ।[১৩১]

সীতা এবার চিরন্তন ধর্মার্থকামের সুচিন্তিত নীতির কথা বললেন। তিনি জানেন ধর্মার্থকামের মধ্যে ধর্মের ওপরেই রামচন্দ্রের দুর্বলতা। অতএব সুযোগ বুঝেই তিনি বলেন ধর্মের থেকেই অর্থ আর ধর্মের থেকেই মানুষের সুখ, ধর্মের মাধ্যমেই এই পৃথিবীতে সমস্ত অলভ্য লাভ করা যায় এবং এ জগতে ধর্মই সব।[১৩২] অতএব এই তপোবনে এসে তপোবনের অনুষ্ঠেয় যে আচরণ, তুমি সেই আচরণ কর। তুমি বৃথা হিংসা কোর না — নিত্যং শুচিমতিঃ সৌম্য চর ধর্মং তপোবনে।[১৩২ক]

রামচন্দ্র সীতার শুভৈষণা, স্বামীর জন্য তার চিন্তা, সব মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কথাটা শোনেননি। নানা কথার ফাঁকে সীতা বলেছিলেন ক্ষত্রিয়ের ধনুকের কাজ হল আর্তদের রক্ষা করা — ধনুষা কার্যমেতাবদার্তানামভিরক্ষণম্। রামচন্দ্র সেই কথাটাই ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন তুমি তো নিজেই একথা বলেছ — ত্বয়ৈবোক্তম্ ইদং বচঃ। তা তুমি কি দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিদের আর্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পাওনি? রাক্ষসরা তাঁদের মেরে ফেলছে, আর আমি ক্ষত্রিয় হয়ে তাঁদের চিৎকার শুনব? মুনিরা তপস্যার বলেই রাক্ষস-নিধন করতে পারেন, কিন্তু এই হিংসার কাজে তাঁরা তাঁদের সুচিরলব্ধ তপস্যার শক্তি ব্যয় করতে চান না। তাঁরা বলেছেন — চিরার্জিতং ন চেচ্ছামস্তপঃ খণ্ডয়িতুং বরম্।[১৩৩]

রামচন্দ্র এবার ক্ষত্রিয়ের ধর্ম উল্লেখ করে বলেছেন আমি ক্ষত্রিয় হয়ে মুনিদের সামনে প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে এখন সত্যচ্যুত হতে পারি না। রামচন্দ্রের কথা শুনে বোঝা যায় একজন ক্ষত্রিয় জটাচীর ধারণ করে বনবাসী হলেও তাঁর মূল বর্ণধর্ম ধর্মের মাহাত্ম্য

বহন করেই তার অনুষঙ্গী হয়ে থাকে। রামচন্দ্র বনবাসী হয়েছেন সকারণে, বনবাসীর ধর্ম তাঁর নিশ্চয় পালনীয় কিন্তু তা মূল বর্ণধর্মকে অতিক্রম করে নয়। সীতাকে তিনি বলেছেন, ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আমি তোমাকে, লক্ষ্মণকে এমনকি নিজের প্রাণও বিসর্জন দিতে পারি, বিশেষ আমি আর্ত ব্রাহ্মণদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, কোনমতেই তার অন্যথা করতে পারি না — ন তু প্রতিজ্ঞাং সংশ্রুত্য ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ।[১৩৪]

রামায়ণের সমাজে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রাধান্যের কথা এখান থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। রামচন্দ্র বলেছেন, যদি আমি প্রতিজ্ঞা নাও করতাম, তবুও ঋষিদের রক্ষা করাই আমার কর্তব্য। বোঝা যাচ্ছে, বনবাসে এসে বনবাসীর অনুষ্ঠেয় কর্ম এবং ক্ষত্রিয়ের ধর্মে যে বিরোধ হচ্ছে, যে বিরোধের কথা সীতা উল্লেখ করেছেন, তার চেয়েও এখানে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম বড়ো হয়ে উঠছে। পরবর্তী কালে রামায়ণের অনুবর্তী মহাকাব্য রঘুবংশেও ক্ষত থেকে ত্রাণ করেন বলেই ক্ষত্রিয় নামের সার্থকতা প্রতিপাদিত হয়েছে। কিন্তু বর্ণধর্মের প্রতি এই আবেশ রামায়ণের সমাজেই সোচ্চারে বলা হয়েছে বলেই বুঝতে পারি বর্ণধর্মের ন্যায়-নীতিটাই রামায়ণের নীতি-ধর্মের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। অন্যান্য সমস্ত ধর্মনীতি, সে সাধারণ ধর্মনীতিই হোক আর বিশেষ ধর্মনীতিই হোক, স্ত্রী-ধর্মই হোক অথবা যুগধর্ম, কোনটাই বর্ণধর্মকে অতিক্রম করে নয়। আবার অন্যদিকে এটাও ঠিক যে, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম — এইগুলিই সমস্ত নীতি-ধর্মের আধার হলেও রামায়ণের সমাজে বর্ণাশ্রমধর্মের নীতি এত কঠোর-কঠিন ছিল না, যাতে হীনবর্ণ, অন্ত্যজ বা অনার্য পুরুষেরাও নিজেদের মর্যাদা থেকে চ্যুত বোধ করেছেন।

বাস্তবিকপক্ষে রামায়ণের নীতি-ধর্ম যদি খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করা যায়, তবে বৃহৎ এক দর্শন অথবা মহান কোন তন্ত্র-মন্ত্রগত ধর্মের বিচার এর মধ্যে খুঁজতে না যাওয়াই ভাল। এমনকি রাষ্ট্রের মতো বিরাট, সমাজের মতো বিশাল কোন বস্তুও রামায়ণের মধ্যে যদি খুঁজতে যাই, তবে তার আগে একটি আদর্শ পরিবারকে আমাদের মাথায় রাখা উচিত। রামায়ণের সেই পরিবার ভারতবর্ষে শত শত আদর্শ পরিবারের জন্ম দিয়েছে। শত শত সেই রকম পরিবার ভারতবর্ষের সামাজিক গঠন এবং রাষ্ট্রকেও অনুপ্রাণিত করেছে। রামায়ণের সহজবোধ্য ধর্মনীতি মেনে ভারতবর্ষের একটি স্ত্রী রামের মতো পতি লাভ করতে চেয়েছে, আর নিজে সীতার মতো সতী হতে চেয়েছে। রামায়ণের আদর্শ মেনে একটি কৈশোরগন্ধী বালকও বনে যেতে ভয় পায় না, তবে তার শর্ত হল, 'লক্ষ্মণভাই যদি আমার থাকত সাথে সাথে'। আর আজ থেকে অন্তত দেড় হাজার বছর আগেও যদি কোন প্রাকৃত মানুষ তার বউদিদির দিকে অন্য নজরে তাকাত, তবে স্নেহময়ী বউদিদি তাকে লক্ষ্মণের চরিত্র স্মরণ করিয়ে দিতেন — অন্তত 'গাহাসত্তসই'র কবি হাল তাই জানিয়েছেন।

দিঅরস্‌স অসুদ্ধ-মণস্‌স কুল-বহূ নিঅঅ-কুড্ড লিহিআইং।
দিঅহং কহেই রামাণুলগ্ন-সোমিত্তি-চরিআইং।।[১৩৫]

রামায়ণের নীতি-ধর্মের প্রধান ব্যপদেশ অতএব সেইটাই, যাকে আমরা আক্ষরিক অর্থে নীতি বলি, সত্য বলি, শাশ্বত ধর্ম বলি অথবা এককথায় আদর্শ বলি।

টীকা ও তথ্যপঞ্জী

১। 'It is true, however, that morality is not an Indian term and its Sanskrit equivalent is not easy to find. The nearest that you can get is to use the rather ubiquitous and enigmatic term *dharma*.' Bimal Krishna Matilal, 'Moral Dilemmas : Insights from Indian Epics', in B K. Matilal, *Moral Dilemmas in the Mahabharata,* Motilal Banarsidass, Delhi,

২। Max Weber, *Wirtschaft and Gesellschaft,* cologne and Berlin,

৩। 'The Ramayana gives us the picture of an entirely moralised civilisation, containing indeed vast material development and immense intellectual power, but both moralised and subordinated to the needs of purity of temperament and delicate ideality of action.' Aurobindo, *Kalidasa,* Arya Sahitya Bhawana, Calcutta, 1929, pp. 6-7.

৪। বৃহদারণ্যক-উপনিষদ, দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, সন ১৩৪০, ১.৪.১১।

৫। যদ্যপি রাজা পরমতাং গচ্ছতি ব্রহ্মৈবান্তত উপনিশ্রয়তি স্বাং যোনিম্‌...। তদেব ১.৪.১১।

৬। পূষশব্দস্য অর্থান্তরে প্রসিদ্ধত্বাৎ কথং পৃথিব্যাং বৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বয়মেব নির্বচনমাহ — ইয়ং পৃথিবী পূষা। ইয়ং হি ইদং সর্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ। শঙ্করভাষ্যের সঙ্গে আনন্দগিরির টীকা মিশ্রিত করা হয়েছে। দ্রঃ বৃহদারণ্যক, ১.৪.১৩।

৭। ধর্মম্‌। তদেতৎ শ্রেয়োরূপং সৃষ্টং ক্ষত্রং ক্ষত্রস্যাপি নিয়ন্তৃ, উগ্রাদপ্যুগ্রং ... তস্মাৎ ক্ষত্রস্যাপি নিয়ন্তৃত্বাৎ ধর্মাৎ পরং নাস্তি, তেন হি নিয়ম্যন্তে সর্বে। শঙ্করভাষ্য। দ্র. বৃহদারণ্যক, ১.৪.১৪।

৮। বৃহদারণ্যক (দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত), ১.৪.১৪।

৯। মহাভারত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, আদিপর্ব, ৩য় অধ্যায়।

১০। *Manusmriti,* ed. Ganganatha Jha, Asiatic Society, B. I Series, 1934, 7 18

১১। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, স্মৃতি-সন্দর্ভ, ৩য় ভাগ, মনসুখরায় মোর সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৫২, ১.৩৫৪, পৃঃ ১২৬৭।

১২। P. V. Kane, *History of Dharmasastra,* Vol. II, Pt. I, pp. 388.

১৩। J. L. Brockington, *Righteous Rama,* Oxford University Press, Bombay,

১৪। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, বাল্মীকির রাম ও রামায়ণ, কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স,

১৫। তৈত্তিরীয় উপনিষদ, দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ, দেব-সাহিত্য কুটীর, ১৩৪৬ সন, শিক্ষাবল্লী, পৃঃ ৫৭।

১৬। তদেব, পঃ ৫৭।

১৭। সন্ধ্যাবেলায় 'উপাস্য তু শিবাং সন্ধ্যাং দৃষ্ট্বা রাত্রিমুপস্থিতাম্।' রামায়ণ ২.৪৬.১৮ আবার সকালে 'উপাস্য তু শিবাং সন্ধ্যাং বিষয়ান্তং ব্যগাহত।' ঐ, ২.৪৯.২।

১৮। রামায়ণ ২.২০.১৫ (সর্বত্রই বঙ্গবাসী সংস্করণ ব্যবহৃত)

১৯। দ্রঃ *Manusmriti,* Asiatic Society, B. I. Series, 7. 2.

২০। রামায়ণম্, শাস্ত্রী শ্রীনিবাস কট্টি মুধোলকর, দ্য নিউজ প্রিন্টিং প্রেস ঃ বম্বে, no date, ১.২৩.২

২১। রামায়ণ, তদেব ১.২৩.৪

২২। নানাহিতাগ্নির্নাযজ্বা ... কশ্চিদাসীদযোধ্যায়াং...।

২৩। ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখং চাসীৎ ...। রামায়ণ, ১.৬.১২

২৪। রামায়ণম্, শাস্ত্রী শ্রীনিবাস কট্টি মুধোলকর, ১.২৩.৩
তিলকটীকা—বলছে পরমং জপং সাবিত্রীম্। রামায়ণ শিরোমণিতে আছে—পরমং সর্বশ্রেষ্ঠং জপং জপনীয় গায়ত্র্যাদি জেপতুঃ। গোবিন্দরাজ ভূষণটীকায় লিখছেন—জপ্যতে ইতি জপঃ। গায়ত্রীমিতি যাবৎ।
তস্য এব পরমত্বাৎ 'ন সাবিত্রাঃ পরং জপ্যমিতি বচনাৎ।

২৫। রামায়ণ, ৩.৪৬.৩৩

২৬। ইয়ং বৃষী ব্রাহ্মণ কামমাস্যতা/মিদঞ্চ পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতামিতি।
ইদঞ্চ সিদ্ধং বনজাতমুত্তমং/ত্বদর্থমব্যগ্রমিহোপভুজ্যতাম্।। রামায়ণ, ৩.৪৬.৩৬

২৭। উপানয়ত ধর্মাত্মা গামর্ঘ্যমুদকং ততঃ।।
নানাবিধানন্নরসান্ বন্যমূলফলাশ্রয়ান্।
তেভ্যো দদৌ তপ্ততপা বাসঞ্চৈবাভ্যকল্পয়ৎ।। রামায়ণ, ২.৫৪.১৭-১৮

২৮। 'গন্ধমাল্যাদিসংযুক্তম্ উদকম্ অর্ঘ্যমুচ্যতে'—
স্মৃতিকার নারায়ণকৃত শ্লোক। দ্রঃ P V. Kane, *History of Dharmasastra,* vol. II, pt. I. f.n. 1259, p. 543

২৯। তাভ্যামর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যঞ্চ দত্বা পশ্চাৎ ফলানি চ।
আনুপূর্ব্যাচ্চ ধর্মজ্ঞঃ প্রপ্রচ্ছ কুশলং কুলে।। রামায়ণ, ২.৯০.৬.

৩০। রামায়ণ, ২.৯১.৫৯.

৩১। রামায়ণ, ২.৫৬.২০-৩৩.

৩২। মনুসংহিতা ১.৮৫
দ্রঃ মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৬০.৮

৩৩। মনঃ সত্যেন শুধ্যাতি। মনুসংহিতা, ৫.১০৯

৩৪। রামায়ণ, ২.২১.৪১

৩৫। রামায়ণ, ১.১৮.৫৭

৩৬। রামায়ণ, ১.১৯.৩

৩৭। রামায়ণ, ১.১৯.৮

৩৮। রামায়ণ, ১.১৯.৮-৯

৩৯। রামায়ণ, ১.১৯.১৬

৪০। রামায়ণ, ১.২১.২

৪১। যদীদং তে ক্ষমং রাজন্ গমিষ্যামি যথাগতম্।
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থ সুখী ভব সুহৃদ্‌বৃতঃ।। রামায়ণ, ১.২১.৩

৪২। ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাদ্ধর্ম ইবাপরঃ।
ধৃতিমান্ সুব্রতঃ শ্রীমান্ ন ধর্মং হাতুমর্হসি।। রামায়ণ, ১.২১.৬

৪৩। রামায়ণ, ১.২১.৮

৪৪। রামায়ণ, ১.২১.৮. শাস্ত্রী শ্রীনিবাস কট্টি মুধোলকার, বম্বে, গোবিন্দরাজকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৫। রামায়ণ, ২.৯.১১-১৬

৪৬। যথা ক্রমেণ শপসি বরং মম দদাসি চ।
তচ্ছৃণ্বন্তু ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবা সেন্দ্রপুরোগমাঃ।।
নিশাচরাণি ভূতানি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ।
যানি চান্যানি ভূতানি জানীয়ুর্বচনং তব।।
সত্যসন্ধো মহাতেজা ধর্মজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।
বরং মম দদাত্যেষ সর্বে শৃণ্বন্তু দেবতাঃ।। রামায়ণ, ২.১১.১৩-১৬

৪৭। রামায়ণ, ২.১১.২১

৪৮। স রাজরাজো ভব সত্যসঙ্গরঃ
কুলঞ্চ শীলঞ্চ হি জন্ম রক্ষ চ। রামায়ণ, ২.১১.২৯

৪৯। রামায়ণ, ২.১২.৩৬

৫০। ত্বৎকৃতে চ মহারাজো বিশেদপি হুতাশনম্।
ন ত্বাং ক্রোধয়িতুং শক্তো ন ক্রুদ্ধাং প্রত্যুদীক্ষিতুম্।। রামায়ণ, ২.৯.২৪-২৫

৫১। রামায়ণ, ২.১২.৩৯

৫২। রামায়ণ, ২.১২.৪১

৫৩। রামায়ণ, ২.১৪.৩

৫৪। সত্যমেকপদং ব্রহ্ম সত্যে ধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
সত্যমেবাক্ষয়া বেদাঃ সত্যেনাবাপ্যতে পদম্।। রামায়ণ, ২.১৪.৭

৫৫। রামায়ণ, ২.১৪.২৪

৫৬। রামায়ণ, ২.১৮.২৪

৫৭। রামায়ণ, ২.১৮.৩০

৫৮। রামায়ণ, ৩.১৮.৩

৫৯। অকৃতদারঃ অসহকৃতদার ইত্যর্থঃ। 'ন বিতথা পরিহাসকথাস্বপি' ইত্যুক্তঃ। 'অনৃতং নোক্তপূর্বং মে ন চ বক্ষ্যে কদাচন' ইত্যুক্তেশ্চ অকৃতদার ইতি নার্থঃ। রামায়ণ, ৩.১৮.৩ শ্লোকের উপর গোবিন্দরাজ কৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

৬০। রামায়ণ, ৩.১৮.১৯

৬১ক। অকৃতদারো' কৃতপরদারপরিগ্রহ ইতি, ধাতূনামনেকার্থত্বাদসন্নিহিতদার ইতি বা হৃদিস্থো'র্থঃ। ন হি রামো মিথ্যা ব্রূতে। পরিহাসাদৌ মিথ্যাভাষণে ন দোষ ইত্যনেন সূচ্যতে ইতি বয়ম্। এবমুত্তরত্রাপি।। রামায়ণ, ৩.১৮.৩ শ্লোকের ওপর তিলক টীকা।

৬১খ। সত্যেন মহতা রাম তারয়স্ব নরেশ্বরম্। রামায়ণ, ২.১৮.৪০

৬১গ। নাহমর্থপরো দেবি লোকমাবস্তুমুৎসহে।
ন-হ্যতো ধর্মচরণং কিঞ্চিদস্তি মহত্তরম্।
যথা পিতরি শুশ্রূষা তস্য বা বচনক্রিয়া।। রামায়ণ, ২.১৯.২০-২২

৬১ঘ। কিং করিষ্যতি কামাত্মা কৈকেয্যা বশমাগতঃ। রামায়ণ, ২.৫৩.৮

৬১ঙ। রামায়ণ, ২.৫৩.৯-১৩

৬২। '... In the story of Rama, the youth, marriage, renunciation, sufferings and triumph all make a human picture, the details of which are cherished by millions.' E. G. Parrindar, *Avatara and Incarnation*, Faber and Faber : London,

৬৩। V. S Srinivas Sastri. *Lectures on the Ramayana*, Madras Sanskrit Academy,

৬৪। অধ্যাত্ম-রামায়ণ, ২.৯.

৬৫। রামায়ণ, ২.২৬.২৫

৬৬। রামায়ণ, ২.৯৬.২২-৩১

৬৭। রামায়ণ, ২.৯৭.৩-৬

৬৮। রামায়ণ, ২.৯৭.৭-১৮

৬৯। দীপ্তমগ্নিমরণ্যং বা যদি রামঃ প্রবেক্ষ্যতি।
প্রবিষ্টং তত্র মাং দেবী ত্বং পুর্বমবধারয়।। রামায়ণ, ২.২১.১৭

৭০। রামায়ণ, ৬.১২০.১৭

৭১। যদহং গাত্রসংস্পর্শং রাবণস্য গতা বলাৎ।
অনাথা কিং করিষ্যামি বিনাথা বিবশা সতী।। রামায়ণ, ৫.৩৭.৬৩

৭২। রামায়ণ, ৫.৩৭.৬২

৭৩। সীতার প্রতি মহাকাব্যের কবি তাঁর প্রাণের সমর্থন জানিয়েছেন এবং সেই সমর্থনের মধ্যেই রামচন্দ্রের পরোক্ষ সমালোচনা আছে। তিনি বলেছেন, কোন অন্যায় না করা সত্ত্বেও এর স্বামী একে ত্যাগ করেছে — অপাপা পতিনা ত্যক্তা পরিপাল্যা ময়া সদা (রামায়ণ, ৭.৫৯.১৭)। তিনি নিজে শুধু এই অসহায়া রমণীর প্রতিপালনের ভারই নেননি, তাঁর আশ্রমে কেউ যে সীতাকে কোনদিন নিন্দামন্দ করবে — এ সম্বন্ধে তিনি যেমন সীতাকে আশ্বস্ত করেছেন, তেমনই আশ্রমের প্রতিটি তাপসীকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে সীতার কোন অযত্ন না হয়। একদিকে সীতাকে বাল্মীকি বলেছেন, তুমি আমার আশ্রমে এসেছ বৈদেহি, এখানে তুমি নিশ্চিন্তে থাক — বিশ্রদ্ধা ভব বৈদেহি সাম্প্রতং ময়ি বর্তসে — অন্যদিকে তাপসীদের তিনি বলেছেন, তোমরা আমার গৌরবে এবং আমার আদেশে সীতাকে পরম স্নেহে দেখবে, তাঁকে সম্মানও করবে বিশেষ করে —

ইমাং ভবত্যঃ পশ্যন্তু স্নেহেন পরমেণ হি।
গৌরবান্মম বাক্যাচ্চ পূজ্যা বো'স্তু বিশেষতঃ।। রামায়ণ, ৭.৫৯.১৮

৭৪। অবশ্যঞ্চাপি লোকেষু সীতা পাবনমর্হতি।
দীর্ঘকালোষিতা চেয়ং রাবণান্তঃপুরে শুভা।।
বালিশো বত কামাত্মা রামো দশরথাত্মজঃ।
ইতি বক্ষ্যাতি মাং লোকো জানকীমবিশোধ্য হি।। রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ১২০.১৩-১৪

৭৫। P. V. Kane, *History of Dharmasastra,* Vol. II, pt. I, p. 3.

৭৬। রামায়ণ, ৩.৬৫.৪

৭৭। রামায়ণ, ৩.৬৫.৫

৭৮। রামায়ণ, ৩.৬৬.৫

৭৯। রামায়ণ, ৩.৬৬.১৪

৮০। রামায়ণ, ৩.৬৬.১৬

৮১। রামায়ণ, ৪.৩০.১৬

৮২। ক্রিয়াভিযোগং মনসঃ প্রসাদম্ সমাধিযোগানুগতঞ্চ কালম্।
সহায়-সামর্থ্যমদীনসত্ত্বঃ স্বকর্মহেতুঞ্চ কুরুষ্ব তাত।। রামায়ণ, ৪.৩০.১৭

৮৩। রামায়ণ, ৪.৩০.২০; পঞ্চানন তর্করত্নের বঙ্গানুবাদ এবং অন্যান্য টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৪। রামায়ণ, ৪.৩০.১৭

৮৫। ধর্মমর্থঞ্চ কামং বা সর্বান্ বা রক্ষসাম্পতে।
ভজতে পুরুষঃ কালে ত্রীনি দ্বন্দ্বানি বা পুনঃ।। রামায়ণ, ৬.৬৩.৯

৮৬। রামায়ণ, ৬.৬৩.১০

৮৭। কালে ধর্মার্থকামান্ যঃ সংমন্ত্র্য সচিবৈঃ সহ।
নিষেবেতাত্মবান্ লোকে ন স ব্যসনমাপ্নুয়াৎ।। রামায়ণ, ৬.৬৩.১২

৮৮। মনুসংহিতা, ৪.১৭৬

৮৯। কথাটা ভগবদ্-গীতাতেও আছে এবং আছে মহাভারতের দার্শনিক তত্ত্বসংকলনে। উদাহরণ গীতা: আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, প্রসন্নকুমার শর্মা সম্পাদিত, কলকাতা; শকাব্দ ১৮২৯, ৬.৩২

৯০। Y. Krishan, "The Meaning of the Purusarthas in the Mahabharata", in *Moral Dilemmas in the Mahabharata,* ed. Bimal Krishna Matilal, Delhi,

৯১। রামায়ণ, ১.১.২-৪

৯২। রামায়ণ, ২.২.২৯

৯৩। রামায়ণ, ২.২.৩৮

৯৪। রামায়ণ, ২.২.৪২

৯৫। কামক্রোধাবনাদৃত্য ধর্মমেবানুপালয়।
ধর্মঃ শ্রেয়স্করতমো রাজাং ভরতসত্তম।। মহাভারত, শান্তি, ৯০.২০.

৯৬। মহাভারত, শান্তি, ৯০.৩

৯৭। গোপা জনস্য / ঋগ্বেদ ৩.৪৩.৫
প্রজানাং পালনং ধর্মো রাজ্ঞাং রাজীবলোচন। মহাভারত, শান্তি, ৩২.২
ক্ষত্রিয়স্য পরো ধর্মঃ প্রজানামেব পালনম্। মনুসংহিতা ৭.১৪৪
নৃপস্য পরমো ধর্মঃ প্রজানাং পরিপালনম্।। শুক্রনীতিসার ১.১৪.

৯৮। রামায়ণ, ২.৫৩.১৩ / স্ত্রীবশীভূত দশরথের ক্রিয়াকাণ্ড দেখে স্বয়ং রামচন্দ্রেরও সাময়িকভাবে মনে হয়েছিল যে, অর্থ এবং ধর্মের চেয়ে কামই তাঁর পিতার জীবনের প্রধান অভীষ্ট — ইদং ব্যসনমালোক্য রাজ্ঞশ্চ মতিবিভ্রমম্। কাম এবার্থধর্মাভ্যাং গরীয়ানিতি মে মতিঃ।। (২.৫৩.৯)

৯৯। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ১.১৯.৩৫

১০০। উত্থানং হি নরেন্দ্রানাং রাজধর্মস্য মূলম্। মহাভারত, ১২.৫৮.১৩

১০১। রামায়ণ, ৬.৮৩.১৪

১০২। রামায়ণ, ৬.৮৩.১৪-৪৩

১০৩। রামায়ণ, ৬.৮৩.৩৭

১০৪। রামায়ণ, ৬.৮৩.৩৭

১০৫। রামায়ণ, ৬.৮৩.২৭

১০৬। ধর্মার্থকামাঃ খলু জীবলোকে/সমীক্ষিতা ধর্মফলোদয়েষু।
যে তত্র সর্বে স্যুরশংসয়ং মে/ভার্য্যেব বশ্যাভিমতা সপুত্রা। রামায়ণ, ২.২১.৫৭

১০৭। যস্মিংস্তু সর্বে স্যুরসন্নিবিষ্টা/ধর্মো যতঃ স্যাত্তদুপক্রমেত।
দ্বেষ্যো ভবত্যর্থপরো হি লোকে/কামাত্মতা খল্বপি ন প্রশস্তা।। রামায়ণ, ২.২১.৫৮

১০৮। নাহমর্থপরো দেবি লোকমাবস্তুমুৎসহে।
বিদ্ধি মাং ঋষিভিস্তুল্যং বিমলং ধর্মমাস্থিতম্।। রামায়ণ, ২.১৯.২০

১০৯। ধর্মপরতন্ত্রতা বোঝাতে অপর মহাকাব্যে এইরকম এক আদর্শ মনোবৃত্তির কথা বলেছে যাতে সমাজের সকলের প্রতি এক সমদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, যাতে সমাজের সকলের উন্নতি হয় এবং সকলের সুখ হয়। মহাভারত বলেছে, যাতে তোমার নিজের কষ্ট হয়, তেমন কষ্টকর কোন শাস্তি পরের প্রতি নিক্ষেপ কোর না — ন তৎ পরেষু কুর্বীত জানন্নপ্রিয়মাত্মনঃ। (২১২.২৫১.১৯) আবার নিজের জন্য যেমনটি তুমি পেতে চাইবে, তেমনটি যাতে অন্যেরাও পায়, সেইরকম ভাবনা করবে — যদ্ যদাত্মনীচ্ছেত তৎ পরস্যাপি চিন্তয়েৎ। মহাভারত, ১২.২৫১.২১ রামায়ণের অনুরূপ ধর্মনীতির প্রকাশ ঘটেছে রামচরিত্রের মধ্যে। মানুষের কষ্ট হলে তিনি পরম দুঃখিত হন। আর মানুষের সুখে তিনি সুখী হন পিতার মতো, যেন এ সুখ তাঁর পুত্রের —

ব্যসনেষু মনুষ্যাণাং ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ।
উৎসবেষু চ সর্বেষু পিতেব পরিতুষ্যতি।। রামায়ণ, ২.৩.৩০

১১০। ত্রেতাযুগে চ বর্তন্তে ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ যে।
তপো'তপ্যন্ত তে সর্বে শুশ্রূষামপরে জনাঃ।।
স্বধর্মঃ পরমস্তেষাং বৈশ্যশূদ্রং তদাগমৎ।
পূজাঞ্চ সর্ববর্ণানাং শূদ্রাশ্চক্রুর্বিশেষতঃ।। রামায়ণ, ৭.৮৭.২০-২১

১১১। রামায়ণ, ২.৬৩.২৬

১১২। ইষুণাভিহতঃ কেন কস্য বাপকৃতং ময়া।
ঋষের্হি ন্যস্তদণ্ডস্য বনে বন্যেন জীবতঃ।। রামায়ণ, ২.৬৩.২৭

১১৩। কথং নু শস্ত্রেণ বধো মদ্বিধস্য বিধীয়তে।
জটাভারধরস্যৈব বল্কলাজিনবাসসঃ।। রামায়ণ, ২.৬৩.২৮

১১৪। রামায়ণ, ২.৬৩.৩৬

১১৫। রামায়ণ, ২.৬৩.৪২

১১৬। রামায়ণ, ২.৬৩.৫১

১১৭। যা গতিঃ সর্বভূতানাং স্বাধ্যায়াৎ তপসশ্চ যা।
ভূমিদস্যাহিতাগ্নেশ্চ ... তাং গতিং গচ্ছ পুত্রক।। রামায়ণ, ২.৬৪.৪৩-৪৪

১১৮। J. L. Brockington, *Righteous Rama,* Oxford University Press : Bombay,

১১৯। রামায়ণ, ৪.১৬.৫

১২০। রামায়ণ, ৪.১৭.৩২

১২১। রামায়ণ, ৩.৬.১১

১২২। যৎ করোতি পরং ধর্মং মুনির্মূলফলাশনঃ।
তত্র রাজ্ঞশ্চতুর্ভাগঃ প্রজা ধর্মেণ রক্ষতঃ।। রামায়ণ, ৩.৬.১৪

১২৩। রামায়ণ, ৩.৬.১৫

১২৪। রামায়ণ, ৩.৬.২০

১২৫। মিথ্যাবাক্যন্তু পরমং তস্মাদ্‌গুরুতরাবুভৌ।।
পরদারাভিগমনং বিনা বৈরঞ্চ রৌদ্রতা। রামায়ণ, ৩.৯.৩-৪

১২৬। রামায়ণ, ৩.৯.৯

১২৭। রামায়ণ, ৩.৯.১৫

১২৮। রামায়ণ, ৩.৯.২৩

১২৯। রামায়ণ, ৩.৯.২৫

১৩০। রামায়ণ, ৩.৯.২৭

১৩১। রামায়ণ, ৩.৯.২৯

১৩২। রামায়ণ, ৩.৯.৩২

১৩৩। রামায়ণ, ৩.১০.১৩

১৩৪। রামায়ণ, ৩.১০.১৮

১৩৫। হাল, গাথাসপ্তশতী, রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত, কলিকাতা ঃ জেনাবেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১.৩৫. পৃঃ ১৪

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি

ভূপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

মানব সভ্যতার ইতিহাসে কখনও কখনও আবির্ভাব ঘটেছে এমন কিছু মানবের যাঁরা সমগ্র মানবসমাজ তথা সকলের কল্যাণের জন্য নিজেকে নিঃশেষে কেবল দান (বাক্যের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, অর্থের দ্বারা, প্রয়োজনে প্রাণত্যাগের দ্বারা[১]) করেছেন তা নয়, পরবর্তীকালেও তাঁদের জীবন, কার্যপ্রণালী এবং উপদেশাবলী হয়েছে সকলকালের, সকলভাবের মানবের সর্বাবস্থায় আশ্রয়ণীয় দিশারী। জীবনের চরম সঙ্কটে এঁদের সাহচর্য কিংবা এঁদের জীবন ও বাণীর অনুধ্যান পথ দেখায় মানবকে, অগ্রসর হতে সহায়তা করে যথার্থ লক্ষ্যের দিকে।

এমনই একজন পুরুষ হলেন শ্রীকৃষ্ণ। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত বিপরীত বুদ্ধিধারী অর্জুনের চরম সঙ্কটের দিনে যথার্থ সারথিরূপে রথী অর্জুনকে তাঁর প্রকৃত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে তিনি যে সকল উপদেশ প্রদান করেছিলেন তা যে কেবলমাত্র অর্জুনকেই সঞ্জীবিত করেছিল তা নয় ; জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত অথচ সৎস্বভাবসম্পন্ন মানুষকে তা যুগ যুগ ধরে নব নব আলোকে উদ্ভাসিত করে নিয়ে চলেছে তার প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে।

শ্রীকৃষ্ণের গীতোপদেশের কারণ নির্ণয়

বহু প্রাচীনকালে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রাক্কালে সশস্ত্র আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে বীরত্বের ভঙ্গীতে অথচ দম্ভভরে[২] যুদ্ধের সাজে সুসজ্জিত রথ স্থাপন করে উপস্থিত যোদ্ধৃবর্গকে দেখে শত্রুসন্তাপকারী, মহাতেজা, ধনুর্বিদ্যায় অদ্বিতীয়রূপে প্রথিতযশা কৃষ্ণসখা অর্জুন হঠাৎই কম্পিত কলেবরে বলে উঠেছিলেন — হে কৃষ্ণ! আমার শরীর অবসন্ন হচ্ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, সর্বাঙ্গে কম্পন ও রোমাঞ্চ হচ্ছে, হাত থেকে গাণ্ডীব ধনু স্খলিত হচ্ছে, সর্বাঙ্গে জ্বালা অনুভব করছি, আমি স্থির থাকতে পারছি না, আমার মনও ঘুরছে।[৩]

এই রকম পরিস্থিতিতে তাঁর কি করা কর্তব্য সে কথা কিন্তু অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন না, বরং পূর্ব থেকেই যুদ্ধোদ্যমী ও একদিনে সমস্ত শত্রুনিধন করবেন - এরূপ অঙ্গীকারকারী অর্জুন নিজের দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতাকে অস্বীকার করাতে, কোনও এক অলীক ভালোবাসার কুহকে পড়েই যুদ্ধ করতে এসে তাঁর এরূপ বিষম অবস্থা

হয়েছে - তা যাতে কেউ বলতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মিথ্যা বীরত্বের দম্ভকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর এই দৈহিক ও মানসিক বৈকল্যের সঙ্গে আরও কিছু দুর্লক্ষণের ইঙ্গিত দিয়ে যথার্থ পরিণামদর্শী ব্যক্তির ন্যায় যেন তিনি অনুভব করলেন এই স্বজন বধরূপ যুদ্ধের পরিণতিতে কোনও শ্রেয় বা কল্যাণ[৪] হবে না। তাই তিনি যুদ্ধ করবেন না এটা তাঁর দুর্বলতা নয়। আসলে শ্রেয় বা যথার্থ কল্যাণের ধারণাই আজ তাঁকে স্বজন-বধরূপ যুদ্ধ থেকে বিরত হতে বাধ্য করছে। তাই তিনি সিদ্ধান্তরূপে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন —

'ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।'[৫]

অর্থাৎ, হে কৃষ্ণ, আমি জয়লাভ, রাজ্যলাভ বা বিবিধ সুখভোগ, কিছুই চাই না।

পৃথিবীতে আমাদের সকলেরই জীবন এক বিরামহীন সংগ্রাম। অনেক সময় আমরা আমাদের দুর্বলতা ও কাপুরুষতাকে ক্ষমা ও ত্যাগ বলে ব্যাখ্যা করতে চাই। কিন্তু ভিক্ষুকের ত্যাগে কোনও কৃতিত্ব নেই। আঘাত করতে সমর্থ কোনও মানুষ যদি সহ্য করে যায়, তবে তাতে কৃতিত্ব আছে; যার কিছু আছে, সে যদি ত্যাগ করে তবে তাতে মহত্ত্ব আছে। আলস্য ও ভীরুতার জন্য আমরা জীবনে বহুবার সংগ্রাম পরিত্যাগ করি। অথচ আমরা সাহসী — এই মিথ্যা বিশ্বাসে নিজেদের মনকে সম্মোহিত করার চেষ্টা করি।[৬] অর্জুনের ঠিক এইরকম অবস্থাই হয়েছিল। অর্জুন যেন আমাদেরই প্রতিনিধি। তাই অর্জুন নিজেকে মহানুভবরূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কেবল বিজয় বা রাজ্যসুখ উপেক্ষা করতে চান নি তা নয়; বরং যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়ে তিনি যে অন্যায় আচরণ করেছেন, অধর্মাচরণ করেছেন এমনকি নিজেরাই (পাণ্ডবগণ) আততায়ীতে[৭] পরিণত হতে চলেছেন, সেকথা বলতে কসুর করেন নি। সেই সঙ্গে আরও বলেছেন, এই যুদ্ধ সংঘটিত হলে বংশনাশ হবে, ফলে কুলধর্ম বিনষ্ট হবে, ক্রমে বর্ণসঙ্কর[৮] উৎপন্ন হবে এবং এই সকলের পরিণতিতে পিণ্ডোদকাদি ক্রিয়া লুপ্ত হবে; ফলে আপন পুণ্যবলে উর্ধ্বলোকগামী পূর্বপুরুষগণও পতিত হবেন।[৯] কাজেই লোভের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় ক্ষুদ্রচেতা, পাপী দুর্যোধনাদি এই যুদ্ধের বিষময় ফল দেখতে না পেলেও কুলক্ষয়জনিত দোষ দর্শনকারী আমাদের এই পাপ থেকে নিবৃত্ত হবার অর্থাৎ সরে থাকবার জ্ঞান বা মনোবৃত্তি কেন হবে না?[১০] অর্থাৎ যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হবার বুদ্ধিই আমাদের কর্তব্য। তাই রাজ্য পাবার লোভে স্বজনবর্গকে হত্যা করতে উদ্যত হয়ে তিনি যে পাপ কর্মে লিপ্ত হতে চলেছেন তা থেকে প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ পাপস্খালন করার জন্যই অর্জুন সর্বশেষ সিদ্ধান্তরূপে বললেন — নিজ প্রাণরক্ষায় উদাসীন ও অস্ত্রবিহীন আমাকে যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ এই যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করে তাহলে সেটাই আমার পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর হবে।[১১] ভাবটা যেন এইরকম — স্বজনবধরূপ পাপকর্মে উদ্যত হয়ে জীবনধারণের চেয়ে অর্জুনের নিকট মৃত্যুই অধিক হিতকর।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অর্জুন যেভাবে একটার পর একটা যুক্তির অবতারণা করেছেন সেগুলি যেন এমন — অর্জুনকে যেন কেউ আততায়ী, বর্ণসঙ্কর ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে প্রশ্ন করছেন এবং তিনি যেন সেগুলোর উত্তর দেবার ছলে নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করছেন। অথচ তাঁর এতক্ষণ ধরে আলোচিত সমস্ত যুক্তি-তর্কের একমাত্র সাক্ষাৎ শ্রোতা শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু নীরব। সখা কৃষ্ণের নীরবতাই যেন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অর্জুনকে প্রগল্ভ করে তুলেছিল। শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেহাত্মবুদ্ধি, মমত্ববোধ ও স্বজনাসক্তিজনিত কাতরতাই আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অর্জুনকে অবিমৃষ্যকারীর ন্যায় আচরণ করতে বাধ্য করছে। তাই তিনি উত্তম শ্রোতার ন্যায় নীরব থেকে অর্জুনের সমস্ত মনোগত দুর্বলতাকে যেন বের করে আনতে চেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই নীরবতা অপ্রতিরোধ্য রবরূপে অর্জুনকে যেন আঘাত করেছিল। তাই আত্মপক্ষ সমর্থনে যথেষ্ট যুক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান, নীতিপরায়ণতা ইত্যাদি বোধের পরিচয় দিয়েও অর্জুন কিন্তু যথার্থ শ্রেয়োমার্গীর ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ কবতে পারেন নি। বরং সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুর্বাণ ফেলে দিয়ে বিষণ্ণচিত্তে রথের উপর বসে পড়ে অশ্রুমোচন করছিলেন। তাঁর এইরকম আচরণ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা অহঙ্কার, অজ্ঞানতা ইত্যাদির বশীভূত হয়েই নানা প্রকার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করলেও কোনটিই তাঁর আন্তরিক ছিল না। বিবেক-বিচারহীন কর্মই শোকে পরিণত হয়। তাই অর্জুনের অবস্থা অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করতে সঞ্জয় "শোক সংবিগ্নমানসঃ"[১২] এই বিশেষণের অবতারণা করেছেন। অর্থাৎ এক অদ্ভুত মোহময় মনঃপীড়ায় বিচলিত অর্জুন নিজেকে আর স্থির রাখতে না পেরে অবশেষে রথের উপরিভাগে উপস্থাপিত করলেন। রবি রাহুগ্রস্ত হলে যেমন প্রভাহীন হয় অথবা তপস্বী যেমন মহাসিদ্ধি প্রাপ্তির মোহে ভ্রমে পতিত হয়, তেমনি কামনা-বাসনা পাশে বদ্ধ হয়ে ধনুর্ধারী অর্জুন যখন ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথে উপবেশন করলেন, তখন তাঁকে অত্যন্ত দুঃখে জর্জরিত দেখাতে লাগলো — এরকম একটি ছবি এঁকেছেন জ্ঞানেশ্বরীকার।

শরীর ঘেরা "আমি" ও তা থেকে উদ্ভূত "আমার" বোধের দ্বারা চালিত হলে দারা-পুত্র-স্বজনাদিতে অত্যন্ত আপনার বোধ জন্মে। ফলে সেগুলি বিয়োগে বা বিয়োগের সম্ভাবনা দেখা দিলে মানব মন হাহাকার করে ওঠে। সে চায় জগতের সবকিছুকে তার এই মধুর "আমি"র দিকে কেন্দ্রীভূত করতে। ফলে এগুলির বিনাশকেই সে আত্মনাশ বলে মনে করে। আবার এগুলির প্রাপ্তিতে সুখ ইত্যাদি লাভ হয় বলে সেগুলিকে শ্রেয়োপ্রাপ্তি বলে মনে করে। তাই অর্জুন-কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল —

'স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।'[১৩]

অর্থাৎ, হে মাধব, স্বজনদিগকে বধ করে আমরা কি প্রকারে সুখী হব?

বস্তুতপক্ষে, পার্থিব ও পারলৌকিক ভোগসুখাদি প্রাপ্তি ও তার উপায়কে শাস্ত্রদৃষ্টিতে

প্রেয়ই বলা হয়েছে, শ্রেয় বলা হয় নি। আত্মজ্ঞান ও তৎপ্রাপ্তির উপায়কেই শ্রেয় বলা হয়েছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তিই হল জীবের সকল প্রকার চাওয়া-পাওয়া, দ্বন্দ্বভাবের বিশ্রান্তি। তাই জীবমাত্রের নিকট এটা হল পরমকাম্য। কিন্তু এই পরম প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়। অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রকার মলিনতা ধৌত করে শুদ্ধ চিত্তে এই আত্মজ্ঞান বা শ্রেয়োবস্তু লাভ করা যায়। যতক্ষণ বিষয় বাসনা বা স্বজনাসক্তি থাকে ততক্ষণ এই শ্রেয়ের ধারণা করা সম্ভব হয় না। তাই যা দুঃখ-কষ্টের[১৪] মধ্যে দিয়ে বরণীয় সেই শ্রেয়োপথে মানুষ চলতে চায় না। জীবমাত্রেই সুখার্থী। দুঃখকে পরিহার করে সে চায় সুখকে গ্রহণ করতে। তাই যা কিছু সুখকররূপে সম্মুখে আবির্ভূত হয় তাকেই সে শ্রেয় বলে বরণ করে নেয়। কিন্তু সুখকর বস্তু হলেও সে পরিণামে দুঃখ প্রদান করবে কি না — এরূপ বিচার করে বিষয় গ্রহণ করবার জ্ঞান তখন তার থাকে না। একমাত্র বিবেকী ব্যক্তিই বস্তুর পরিণাম দর্শন করে বিষয় গ্রহণে সমর্থ হন বলে যথার্থ শ্রেয় প্রাপ্ত হন।[১৫]

একটি আপত্তি হতে পারে, জীব যেহেতু সর্বতোভাবে দুঃখকে পরিহার করতে চায় সেহেতু কেন মানুষ যা পরিণামে দুঃখ দেয় সেই প্রেয়কে পরিত্যাগ করে শ্রেয়কে বরণ করে না? উত্তরে বলা যায় মানুষ যেহেতু সুখার্থী এবং সর্বতোভাবে দুঃখকে পরিত্যাগ করতে চায় সেহেতু যা পরিণামে দুঃখ দেয় সেই প্রেয়কে 'প্রেয়' রূপে বুঝলে কখনই তা গ্রহণ করে না। যেমন, মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্নের জ্ঞান হলে সেই অন্ন গ্রহণে কারোরই প্রবৃত্তি হয় না; কারণ তার পরিণতি অত্যন্ত অনিষ্টকর। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির নিকট প্রেয় প্রেয়রূপে উপস্থিত হয় না। তাই দুঃখকে পরিহার করার জন্য যা কিছু সুখকর বলে অনুভূত হয় তা শ্রেয়স্কর এই ভেবে মানুষ প্রেয়কে শ্রেয়রূপে বরণ করে। শ্রুতির অভিমত হল, শ্রেয় ও প্রেয় পৃথক পৃথক ভাবে পুরুষের নিকট উপস্থিত হয় না, 'যেন মিশ্রিত' হয়ে উপস্থিত হয়। বিবেকরহিত অর্থাৎ বস্তুর ভেদজ্ঞান রহিত হওয়ায় সাধারণ মানুষ 'যেন মিশ্রিত' শ্রেয়-প্রেয় থেকে শ্রেয়কে আলাদা করতে পারে না। এই কারণে তারা প্রেয়কে শ্রেয় বলে বরণ করে অশেষ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য বলেছেন, জলমিশ্রিত দুধ থেকে দুধকে যেমন হংস আলাদা করে গ্রহণ করতে পারে অনুরূপভাবে একমাত্র ধীর ব্যক্তিই 'যেন মিশ্রিত' শ্রেয় প্রেয় থেকে শ্রেয়কে আলাদা করতে পারে।[১৬]

দীর্ঘকাল ধরে নির্যাতিত, নানাভাবে বঞ্চিত এবং যাযাবরের ন্যায় জীবনযাপন করে সুখ থেকে বঞ্চিত অর্জুন সংযতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানবান হওয়া সত্ত্বেও সম্মুখ সমরে আত্মীয়-স্বজনবধে সুখ একেবারে নির্মূল হবে — এরূপ চিন্তাবিষ্ট হওয়ায় যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য এবং ক্ষত্রিয় হিসাবে তাঁর কর্তব্য ভুলে গিয়েছিলেন বলেই প্রেয়কে শ্রেয় বলে বরণ করে তন্নাশের আশঙ্কায় হাহাকার করে উঠেছিলেন। কামনার দ্বারা পরিচালিত মন প্রজ্ঞাবানেরও

প্রজ্ঞাকে হরণ করে। কঠশ্রুতিতে প্রারম্ভেই এর উদাহরণ আছে। স্বর্গফলের কামনা করে নচিকেতার পিতা যে বিশ্বজিৎ যাগ করেছিলেন, সেই যাগে উপযুক্ত বস্ত্রদান না করে ফল কামনার দ্বারা এতই পরিব্যাপ্ত হয়েছিলেন যে জরাজীর্ণ গো-সকলকে তিনি দান করেছিলেন। এই সকল দানের পরিণতি স্বর্গ প্রাপ্তি নয় অনন্দা নামক দুঃখময় লোক প্রাপ্তি — এই সকল কথা নচিকেতার পিতা ঋষিবরেব অজ্ঞাত ছিল না অথচ ফল কামনাই তাঁকে কর্তব্যাকর্তব্য বোধচ্যুত করেছিল।

ইহলোক ও পরলোকে সুখভোগের আকাঙ্খাই অর্জুনকে ক্ষত্রিয়ের আদর্শচ্যুত করে ক্লীবে পরিণত করেছিল। তাঁর মুখে যে শ্রেয় বা কল্যাণের কথা উচ্চারিত হয়েছিল সেগুলি সবই ছিল শ্রোয়োরূপী প্রেয়। তাই যথার্থ বান্ধবের ন্যায় ভ্রমে পতিত বান্ধব তথা রথীকে পথ প্রদর্শন করার জন্যই সারথি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ক্লীবতাজনিত সকল প্রকার যুক্তিই অপনোদন করার জন্য তিরস্কার করে বললেন —

> ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
> ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।।[১৭]

অর্থাৎ, হে অর্জুন, তুমি বীর্যহীন ক্লীবের ন্যায় কাতরভাবাপন্ন হয়ো না। তা তোমার মতো ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের উপযুক্ত নয়। হে পরন্তপ, তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ করে যুদ্ধের নিমিত্ত উত্থান কর।

সখা সাধারণত সখার মতের অনুবর্তন করে। কিন্তু অর্জুনসখা কৃষ্ণ পরিণামদর্শী,[১৮] অচ্যুত ভগবানরূপে[১৯] আদৃত। তাই তিনি সখার দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলেন না। শতচেষ্টা করেও অর্জুন সখাকে স্বপক্ষে আনতে পারলেন না বরং সখার কাছে থেকে অর্জুন শুনলেন, এই ঘোর সঙ্কটকালে তোমার মনে কোথা থেকে পাপ চিন্তা ইত্যাদি উপস্থিত হল? এতো তোমার (ক্ষত্রিয়ের) স্বভাব নয়। অর্থাৎ যথার্থ শৌর্য-বীর্য প্রদর্শনকালে বীর্যবানের তা প্রদর্শন না করা কেবল অজ্ঞানেরই পরিচয় নয় তা তাঁর পক্ষে অযশস্কর এবং স্বর্গের অর্থাৎ স্বর্গসুখভোগের অযোগ্য। কাজেই যে সুখ হারাবার ভয়ে অর্জুন আজ যুদ্ধ করতে চাইছেন না সেই সুখ এবং তার তুলনায় আপেক্ষিক অমৃতত্ব লাভরূপ স্বর্গসুখ থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন, যদি যুদ্ধ না করেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সকল উক্তি অর্জুনকে কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে আরও বিচলিত করে তুললো। প্রকৃতপক্ষে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হলেন। তাই আর্ত ভক্তের ন্যায় প্রকৃত বান্ধব শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন বললেন —

> 'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে'[২১]

অর্জুন স্বীকার করলেন, এক বিষম দুর্বলতায় আমার স্বভাব আচ্ছন্ন এবং ধর্ম বিষয়ে অর্থাৎ ব্যক্তি ও পরিস্থিতি অনুযায়ী উচিত কর্ম সম্পাদন বিষয়ে আমার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়েছে। যেভাবে ধর্ম অর্থাৎ কর্ম সম্পাদন করলে তা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হবে তা

আমাকে উপদেশ করুন। আমি আপনার শিষ্য অর্থাৎ আপনি আমাকে এই বিষয়ে যথাযথভাবে শাসন করে যা নিশ্চিত কল্যাণকর সেদিকে নিয়ে যেতে সক্ষম উপদেষ্টা। আর সেই কারণেই আজ এই সঙ্কটে আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।[২২]

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, পূর্বে (১/৩১-গীতা) দেহাত্মবুদ্ধি সঞ্জাত অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ় হয়ে অর্জুন নিজেকে শ্রেয় ইত্যাদি বিচারের যোগ্য বলে মনে করেছেন তাই তিনি বলেছেন, আমি বিচার করে এই যুদ্ধে কোনও শ্রেয় দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আলোচ্য স্থলে (গীতা-২/৭) ব্যক্তি ও পরিস্থিতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের নীরব ও সরব আচরণের দ্বারা অর্জুনের সেই অহঙ্কার যেন এখানে প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হল। আর তাতেই অর্জুন অনুভব করলেন, ব্যক্তি ও পরিস্থিতি অনুসারে ধর্ম অর্থাৎ কর্ম আচরণ করা দেহাত্মবোধ, স্বজনাসক্তি ইত্যাদিকে অতিক্রম করতে না পারলে কখনই সম্ভব হবে না, আর তা না হলে নিশ্চিত শ্রেয়োপ্রাপ্তি হবে না। পূর্বে অর্জুন (গীতা-১/৩১) 'শ্রেয়' পদটির উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু এখানে (গীতা-২/৭) 'নিশ্চিত শ্রেয়' পদের উল্লেখ করেছেন। এই পূর্বাপর পদ প্রয়োগের দ্বারাও বোঝা যায় যে, উপযুক্ত উপদেষ্টার সাহচর্য, যথার্থ জিজ্ঞাসু মনোবৃত্তির পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হয়। তাই অর্জুনের শ্রেয়বিষয়ের চিন্তা বা জিজ্ঞাসা রূপ নিল নিশ্চিত বিষয়ের জিজ্ঞাসাতে। অর্জুনের এইরকম জিজ্ঞাসার রূপান্তর স্মরণ করিয়ে দেয় চৈতন্য চরিতামৃতের সেই অপূর্ব জিজ্ঞাসাকে —

'শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?' (১২০)

পরবর্তীকালে অবশ্য অর্জুন শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার তৃতীয় ও পঞ্চম অধ্যায়ে আরও দু'বার নিশ্চিত শ্রেয়কে জানতে চেয়েছেন। ঐ স্থল দুটিতে মুখ্যত দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনটি তাঁর পক্ষে নিশ্চিত শ্রেয় প্রদান করবে সে বিষয়ে তিনি জানতে চেয়েছেন। তবে প্রথম স্থলে তাঁর যে নিশ্চিত শ্রেয়ের জিজ্ঞাসা তা ঘোর সঙ্কটে পতিত আর্তব্যক্তির পরিত্রাণ পাবার চেষ্টার ন্যায় হৃদয় মথিত ব্যাকুলতা থেকে ব্যক্ত হয়েছে। আর সেই কারণেই অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে অষ্টাদশ অধ্যায় যুক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা উপদিষ্ট হয়েছে সকল জীবের কল্যাণের জন্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে আরও লক্ষণীয় যে পঞ্চম অধ্যায়ের পর বাকি ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অর্জুন আর নিশ্চিত কল্যাণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন নি কারণ ততক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ কৌশলে অর্জুন বুঝতে পেরেছেন, সংসারে এমন কোনও পরিস্থিতি নেই যেখান থেকে শ্রেয়োলাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। যেহেতু তিনি হলেন মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। সকল অবস্থাতেই তাঁকে লাভ করার অধিকারী সে। পরম তত্ত্ব, বা যথার্থ শ্রেয় প্রত্যেক পরিস্থিতিতে সমভাবে বিদ্যমান। তাই কৃষ্ণ তাঁকে বলেছেন, যাঁরা সর্বত্র সমত্ব বুদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁরা ইহলোকে থেকেই সংসারকে জয় করেন। যেহেতু ব্রহ্ম সম ও দোষ স্পর্শহীন। সেইকারণে সমদর্শী পুরুষগণ ব্রহ্মেই অবস্থিত বলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।[২৩]

যা হোক, অর্জুনের নিশ্চিত শ্রেয় বিষয়ে জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্রকরে সমগ্র উপনিষদের সার মন্থন করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত যোদ্ধৃবর্গের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সার্থক ভাবে উপদিষ্ট যে বেদান্ত তাই হল শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা অর্থাৎ এটি হল মানবের জীবন যুদ্ধে সর্বস্তরে প্রয়োগের উপযোগি-ভাবে সর্বাবস্থায় আশ্রয়ণীয় রূপে উপদিষ্ট বেদান্ত।

বেদান্ত দর্শনে তিনটি প্রস্থান — শ্রুতি প্রস্থান, স্মৃতি প্রস্থান ও ন্যায় প্রস্থান। প্রস্থান শব্দে মার্গভেদ বা উপদেশোপায়কে বোঝায়।[২৪] বেদান্তে 'শ্রুতি প্রস্থান' শব্দে শ্রুতির মার্গ বা শ্রুতির উপদেশ উপনিষদকেই বোঝায়। 'স্মৃতি প্রস্থান' শব্দে ভগবদ্‌গীতার বিভিন্ন মার্গের উপদেশ এবং 'ন্যায় প্রস্থান' শব্দে ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রকে বোঝায়। এই প্রস্থান ত্রয়ের মধ্যে শ্রুতি প্রস্থানই প্রধান। অপৌরুষেয়[২৫] শ্রুতিকে অনুসরণ করেই পৌরুষেয় স্মৃতি[২৬] ও ন্যায় প্রস্থান স্বমহিমায় বিকশিত হয়েছে। শ্রুতি প্রস্থানে বলা হয়েছে, আত্মাকে উপাসনা করবে। কারণ অন্য যে কোনও বস্তু অপেক্ষা আত্মাই জীবের অধিকতর প্রিয়।[২৭] কিন্তু এই আত্মোপাসনা কেন জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য বা অধিকতর প্রিয়? তা ব্যক্ত করতে শ্রুতি স্পষ্টই বলেছেন, এই আত্মাই সকল জীবের একমাত্র পদনীয় বা গন্তব্যস্থল বা জ্ঞাতব্য বস্তু, কারণ আত্মাকে জানলে সকল বস্তু লাভ করা বা জানা যায়।[২৮] অতঃপর আত্মাকে কেন উপাসনা করা উচিত সে বিষয়ে চরম কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রুতি বলেছেন, আত্মা ভিন্ন বস্তুকে অধিকতর প্রিয় বলে গ্রহণ করলে তোমার অভিপ্রেত প্রিয় বস্তু 'রোৎস্যতি'[২৯] অর্থাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হবে অথবা তোমায় কাঁদাবে। 'প্রিয়ং ত্বাং রোৎস্যতি' মূলের এই অংশের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য 'রোৎস্যতি' পদটি 'রুধ্' ধাতু নিষ্পন্ন অর্থে গ্রহণ করে 'নিরোধম্ প্রাপ্স্যতি বিনশ্যতি' এরূপ অর্থ করেছেন। তাতে অর্থ দাঁড়ায় 'তোমার অভিমত প্রিয় পুত্রাদিনিরোধ প্রাপ্ত হলে বিনষ্ট হবে।' কিন্তু 'পঞ্চদশী'র টীকাকার রামকৃষ্ণ 'রোৎস্যতি' পদটিতে 'রুদ্' ধাতুর (ছান্দস) প্রয়োগ করে অর্থ করেছেন 'রোদয়িষ্যতি'। তাতে অর্থ দাঁড়ায় 'তোমার অভিপ্রেত পুত্রাদি রূপ প্রিয় (বস্তু) নিজ বিনাশ দ্বারা তোমাকে কাঁদাবে।'[৩০]

আরও বলা যায় যে, 'আমি যেন না থাকি' — এরূপ ইচ্ছা কারও হয় না। বরং 'আমি যেন চিরদিন থাকি' এরূপ ইচ্ছা সকলেরই হয়। কাজেই আত্মা সম্বন্ধে এরূপ প্রেম দেখতে পাওয়া যায়[৩১] বলেই এই আত্মা পরমানন্দস্বরূপ এবং পরমপ্রেমাধার।[৩২]

পরমপ্রেমাধার, পরমানন্দস্বরূপ এই আত্মাকে জানলে সকল অনর্থ নাশ হয় বলে আত্মজ্ঞান লাভই জীবের পরম কাম্য বা যথার্থ নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তিরূপে কথিত হয়ে থাকে। শ্রুতিতে আরও বলা হয়েছে, এরূপ সত্যকে (ব্রহ্মকে) এই জীবনেই জানতে পারলে অমৃতত্ব লাভ হয় নতুবা মহতী বিনষ্টি বা সর্বনাশ হয়ে থাকে।[৩৩] এই মহতী বিনাশ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে শ্রুতিতে যে ব্রহ্মাত্মাকে জানবার কথা বলা হয়েছে তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে না, যদি না আমরা অবিদ্যার পারে যেতে পারি। অপরোক্ষানুভূতির

দ্বারাই এই অবিদ্যার বিনাশ সম্ভব হয়। কারণ আমাদের যে ব্রহ্মাত্মার অজ্ঞান — ব্রহ্মার জগৎ দর্শন বা আত্মাতে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি নানা ধর্ম দর্শন — তা প্রত্যক্ষাত্মক ভ্রম। প্রত্যক্ষ ভ্রম দূর করতে হলে প্রত্যক্ষ প্রমা বা প্রত্যক্ষ দর্শন প্রয়োজন। তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য'।[৩৪] কিন্তু কিভাবে প্রত্যক্ষ করতে হবে তা বলতে গিয়ে দর্শনের সাধনরূপে 'শ্রোতব্যোমন্তব্যো-নিদিধ্যাসিতব্যঃ'-এর উপদেশ করেছেন।

শ্রুতি বাক্য অথবা গুরুর মুখ থেকে ব্রহ্মাত্মা বিষয়ে শ্রবণ করতে হয়। তদনন্তর সেই বিষয়ে অসম্ভাবনাবুদ্ধি (এটি সম্ভব নয় — এরূপ বুদ্ধি) দূর করার জন্য যুক্তি তর্কের দ্বারা মনন করতে হয়। মননের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব ও তার ব্রহ্মত্ব সম্ভব মনে হলে, তখন বিপরীত সংস্কার বা ধারণা দূর করার জন্য সতত তাদৃশ শুদ্ধ, মুক্ত ব্রহ্মাত্মার ধ্যান করতে হয়। এগুলি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের হেতু।[৩৫]

আবার এই ব্রহ্মাত্মা দর্শন বা পরমাত্মা দর্শনরূপ অপরোক্ষানুভূতি হল একটি প্রমা বা যথার্থানুভব। কাজেই এই প্রমার করণ কে হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে 'মনসৈব'[৩৬] 'বুদ্ধ্যা'[৩৭] ইত্যাদি শ্রুতির শব্দে কোনও কোনও আচার্য তৃতীয়া বিভক্তি উল্লেখ করে 'করণে তৃতীয়া' এই নিয়ম অনুসারে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা সংস্কৃত মন বা বুদ্ধি হল করণ বা প্রমাণ — এরূপ বলেছেন। আবার অপর আচার্যগণের মতে, 'মনসা', 'বুদ্ধ্যা' ইত্যাদির স্থলে কর্মবাচ্যের কর্তাতেই তৃতীয়া বিভক্তি প্রয়োগ হয়েছে, করণে তৃতীয়া নয়। সুতরাং বুদ্ধি দর্শনের কর্তা, করণ বা প্রমাণ নয়। শ্রুতি প্রস্থানের এইরূপ সিদ্ধান্ত সকলকে নিয়ে ন্যায় প্রস্থানাদিতে বিস্তর বিচার দৃষ্ট হয়। শ্রুতি প্রস্থান উপনিষদে অপৌরুষেয় চিরন্তন সত্যসকল উপদিষ্ট হয়েছে। পক্ষান্তবে স্মৃতি প্রস্থান ভগবদ্গীতাতে শ্রুতির মূল সিদ্ধান্তকে (আত্মভিন্ন বস্তুকে অধিকতর প্রিয় বলে গ্রহণ করলে তোমার অভিপ্রেত প্রিয়বস্তু বিনাশপ্রাপ্ত হবে অথবা তোমায় কাঁদাবে) সকল স্তরের মানুষের আশ্রয়ণীয়রূপে উপদেশ করার সময় উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞানের উত্তুঙ্গ উচ্চতা থেকে বাস্তবভূমিতে নেমে আসতে হয়েছে শ্রোতা, শিষ্যের অধিকার ও অধিকাংশ মানুষের সামর্থ্য বিবেচনা করে।

যদিও গীতাকে মুমুক্ষুগণের মোক্ষশাস্ত্র বলে সিদ্ধান্ত করা হয়ে থাকে তাহলেও এটি নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ভগবৎ গীতায় কল্যাণার্থী সকল স্তরের মানবের জন্যই কল্যাণ পথে অগ্রসর হবার উপায় উপদিষ্ট হয়েছে। তা না হলে 'ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম যুদ্ধ অপেক্ষা ভাল (শ্রেয়ঃ) অন্য কিছু নেই' (গীতা-২/৩১), 'যে ভক্তির সঙ্গে পত্র, পুষ্প, ফল, জল আমাকে প্রদান করে, ভক্তির সঙ্গে উপহার প্রদত্ত সেই সকল আমি গ্রহণ করি' (গীতা-৯/২৬), অথবা 'তুমি যা করো, যা ভোজন করো, যা আহুতি দাও, যা দান করো, সবকিছু আমাতে অর্পণ করো' (গীতা-৯/২৭) 'দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভাবে ভজনা করে, তবে তাকে সাধু বলেই জানবে' (গীতা-৯/৩০), 'অতএব তুমি পূর্বপুরুষগণের ন্যায় কর্মই অনুষ্ঠান কর' (গীতা-৪/১৫) — এই সকল উপদেশ গীতায়

স্থান পেত না। অবশ্য এই সকলই সেই চরম তত্ত্বে, সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায়রূপে, সোপানরূপে উপদিষ্ট হয়েছে, যাতে সর্বস্তরের মানুষই যদি কল্যাণার্থী হন তাহলে ধরবার ও করবার কিছু পায়। সেই জন্য নিঃসন্দেহে বলা যায় ভগবৎ গীতাই বেদান্তকে সকলের উপযোগী, সকল কল্যাণার্থীর উপযোগী করেছে। আরও বলা যায় যে, গীতা বেদান্তের উচ্চতম আদর্শকে জীবনে পরিণত করবার, কার্যে পরিণত করবার উপায়সমূহ নিরূপণ করেছে। সেই জন্যই গীতামৃত জীবনপ্রদ, দুগ্ধতুল্য।[৩৮] আর এই বাস্তব সত্যটিকে অতি সংক্ষেপে অথচ বলিষ্ঠরূপে ব্যক্ত করতে গিয়ে গীতার ধ্যানে বলা হয়েছে —

> "সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
> পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।। ৪ ।।

গীতাতে আত্মজ্ঞান লাভেব বিভিন্ন মার্গ প্রদর্শন করবার পূর্বে প্রথমেই উপনিষদের অবিনাশী-সর্বব্যাপী-নির্বিকার-আত্মতত্ত্বের উপদেশ করা হয়েছে, পরে কর্মযোগ, অভ্যাসযোগ বা রাজযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগের উপদেশ করা হয়েছে। যদিও অষ্টাদশ অধ্যায়যুক্ত গীতার প্রতিটি অধ্যায়কে যোগ বলে অভিহিত করা হয়েছে তথাপি আচার্য মধুসূদন সরস্বতী এই অষ্টাদশ অধ্যায়কে তিনভাগে বিভক্ত[৩৯] করে প্রথম ছয়টি অধ্যায়কে কর্মযোগ প্রধান,মাঝের ছয়টিকে ভক্তিযোগ প্রধান এবং শেষের ছয়টিকে জ্ঞানযোগ প্রধান বলে অভিহিত করেছেন।[৪০] তবে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের অন্তরালে আরেকটি যোগের কথা গীতাতে সুস্পষ্টভাবে উপদেশ করা হয়েছে, যাকে অভ্যাসযোগ বা রাজযোগ বলা হয়ে থাকে। 'কঠ' ও 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' যেরূপ স্পষ্টভাবে ধ্যান, আসন প্রভৃতি বিদ্যমান তদ্রূপ গীতাতে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান ও সমাধির উপদেশ অধিকতর বিস্তৃতরূপে করা হয়েছে। এই রাজযোগ অবলম্বন করে 'যোগবিন্দু' প্রভৃতি বহু উপনিষদও থাকায় উপনিষদদুক্ত রাজযোগের ব্যাখ্যা গীতাতে স্থান পেয়েছে। কারণ, গীতা হল 'সর্বোপনিষদো গাবো'।

গীতোক্ত কর্ম, যোগ ও কর্মযোগের ধারণা

কুরুক্ষেত্ররূপ যুদ্ধক্ষেত্রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুনের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় বিষয়ে জিজ্ঞাসাকে অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে কর্মরহস্য উদ্‌ঘাটন করে সেই কর্ম কিভাবে যোগে অর্থাৎ পরমাত্মাব সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উপায়রূপে পরিগণিত হয় তা ব্যক্ত করেছেন। এবং এই কর্মযোগের অবতারণার মধ্য দিয়ে রাজযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগেরও অবতারণা করেছেন। কারণ সুপ্রাচীনকাল থেকে নিশ্চিত শ্রেয় বা আত্মজ্ঞানলাভ বা মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত যতপ্রকার উপায় শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে সে সকলের মধ্যে এই চারটিই বহুল

আলোচিত হয়েছে। আবার, এই চারটির কোনটিই মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়, পরস্পর বিরোধীও নয়, তা যেমন দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, অপরদিকে তেমনি সাংখ্য দর্শনোক্ত গুণপ্রধানভাব বা অঙ্গাঙ্গীভাবরূপে এই যোগগুলি স্বতন্ত্রভাবে ও একত্রিতভাবে মোক্ষলাভের সহায়ক হতে পারে তাও প্রদর্শন করা হয়েছে। অলোচ্য প্রবন্ধে সেই ধারাকে অবলম্বন করে প্রথমেই কর্মযোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন —

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ।।[৪১]

কর্ম কি আর কি কর্ম নয়-এ বিচারে পণ্ডিতদের ভ্রম হয়, তাই কর্ম কি তোমাকে বলব, যা জানলে সংসারের অশুভ থেকে মুক্ত হতে পারবে। বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর গীতা গ্রন্থ 'কর্মরহস্যে' পুরাণের একটি অপ্রচলিত শ্লোক উদ্ধার করেছেন ঃ

অপহায় নিজং কর্ম কৃষ্ণকৃষ্ণেতিবাদিনঃ।
তে হরের্দ্বেষিণঃ পাপা ধর্মার্থং জন্ম যদ্‌হরেঃ।।

যারা নিজের কর্মে অহবেলা করে মুখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করে, তারা হরির বিদ্বেষী, যে হরি ধর্মের জন্যই (মানুষ রূপে) জন্মগ্রহণ করেন।

ধর্মের জন্য মানে কি? ধর্মের প্রথম ও প্রধান অর্থ যথার্থ কর্ম। ব্যক্তি ও পরিস্থিতি অনুযায়ী উচিত কর্মকেই ধর্ম বলে। তা মানুষকে শেখাতেই কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে গীতার অবতারণা করেছিলেন।[৪২] মানুষ কায়-মন ও বাক্যের দ্বারা যা কিছু করে তাই কর্ম বলে কথিত হয়, কাজেই কর্ম থেকে জীবের নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। পরন্তু 'কর্মহীন হলে শরীর যাত্রাও নির্বাহিত হয় না'।[৪৩] 'কর্ম না করে কেউ ক্ষণকালও থাকতে পারে না, প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণ সকল মনুষ্যগণকে অবশ্য ভাবে কর্ম করিয়ে থাকে'।[৪৪] 'নিঃশষে সকল কর্ম ত্যাগ করা কোন জীবের পক্ষেই সম্ভব নয়'[৪৫] এই প্রকার বাক্য থাকায় অনুমিত হয় যে মোক্ষলাভের উপায়সকলের মধ্যে কর্মের প্রাধান্য বিদ্যমান। কাজেই কর্মের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে বিচার করা আবশ্যক।

'কর্ম কস্মাৎ ক্রিয়তে ইতি সতঃ'।[৪৬] অর্থাৎ 'কর্ম' এই নাম কোথা থেকে হল — এই প্রকারে নিরুক্তকার মহামুনি যাস্ক নিজেই প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন 'ক্রিয়তে' — করা হয়। করণার্থক কৃ-ধাতুর উত্তর কর্ম বাচ্যে মনিন্ প্রত্যয় যোগে 'কর্ম' শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় যা কৃত হয়, তাই কর্মরূপে বিবেচিত হয়।

কাতন্ত্রে সর্ব্ববর্মাচার্য্য বলেছেন 'যৎ ক্রিয়তে তৎ কর্ম।' এইস্থলে 'কৃ' ধাতুর অর্থ 'করা' নয়। এটি সামান্য ক্রিয়া। 'ক্রিয়তে' পদস্থিত কর্মবাচ্যে 'তে' বিভক্তির অর্থ হল

'ক্রিয়াজন্য ফলভাগিত্বম্'। অর্থাৎ কর্তার কার্যে যে ফল জন্মে তার আশ্রয়কে কর্ম বলে। এই স্থলে ক্রিয়া ব্যাপ্যকে যে কর্ম বলা হয়েছে তা হল 'কর্মকারক'। প্রস্তাবিত স্থলে লক্ষণীয় এই যে, নিরুক্ত ও ব্যাকরণে কর্মের যেরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সেই সেই অর্থে 'কর্ম' শব্দটিকে গ্রহণ করলে সেই 'কর্ম' 'কর্মযোগের' অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কারণ উক্ত লক্ষণদ্বয় আত্মজ্ঞান বা মোক্ষলাভের উপায় অর্থাৎ সোপানরূপে নিরূপিত হয় নি। কাজেই 'কর্মযোগের' অন্তর্গত 'কর্ম' শব্দটিকে একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করতে হবে।

শ্রুতি স্মৃতির অভিমত হল কায়িক-বাচিক-মানসিক যে কোন ক্রিয়া কর্ম হলেও সকল 'কর্ম' পরমাত্মার সঙ্গে যোগরূপ মোক্ষের সাধন হয় না। ফলাকাঙ্খা বর্জিত হয়ে মোক্ষ লাভের জন্য অনুষ্ঠেয় কর্ম ব্যতিরেকে তাবৎ সকল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক স্বর্গসুখাদি লাভ হলেও কালে তা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় মানুষকে আবদ্ধ করে বলে সেই সকল কর্ম জন্য সুখাদি প্রভৃতি অনিত্য, দুঃখময় — অতএব ত্যাজ্য।[৪৭]

মোক্ষোপযোগী কর্মের অবতারণা করতে গিয়ে ছান্দোগ্য শ্রুতিতে প্রথমেই বলা হয়েছে ব্রহ্মের অতিশয় প্রীতিজনক নাম 'ওম্' এই অক্ষরটিকে কর্মাঙ্গ উদ্গীথ[৪৮] রূপে উপাসনা করবে অর্থাৎ ওম্-কারেই দৃঢ়ভাবে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপনপূর্বক একাগ্রচিত্তে উপাসনা করবে।[৪৯] উক্ত শ্রুতিতে আরও বলা হয়েছে এই ওম্-কারাত্মক অক্ষরের দ্বারা ত্রয়ীবিদ্যা অর্থাৎ বেদত্রয় বিহিত কর্ম প্রবর্তিত হয়েছে। সোমযাগে 'ওম্' এই অক্ষর উচ্চারণ করে স্তব করা হয়, ওম্ উচ্চারণ করেই উদ্গীত হয়, পরমাত্মা সদৃশকেই ওম্-কারাত্মক অক্ষরের পূজার নিমিত্তই তাঁরই মহিমা ও রস অর্থাৎ হবি দ্বারা সমস্ত কার্য সম্পাদিত হয়।[৫০]

'তাঁরই মহিমা ও রস অর্থাৎ হবি দ্বারা সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হয়' — শ্রুতির এই প্রকার বাক্যের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য্য বলেছেন ওম্-কারাত্মক অক্ষর উচ্চারণ করেই যাগ-হোম ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেই আহুত দ্রব্যসমূহ আদিত্য মণ্ডলে গমন করে, সেই আদিত্য মণ্ডল থেকে বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির দ্বারা শস্যাদি উৎপন্ন হয়, ঋত্বিক, যজমানগণ সেই শস্য ভক্ষণে প্রাণবান হন ও গবাদি পশুসমূহ সেই শস্যভক্ষণে প্রভূত দুগ্ধ উৎপাদন করে, সেই দুগ্ধ হতে হোমীয় ঘৃত উৎপন্ন হয়, ঋত্বিক, যজমানগণ শক্তি সম্পন্ন হয়ে সেই ঘৃত দ্বারা যাগ-হোমাদি ক্রিয়া করেন। এই জন্যই বলা হয়েছে যে, সেই ওম্কারেরই মহিমা ও রস দ্বারা পরমাত্মা রূপ ওম্কারের পূজা সম্পাদিত হয়।[৫১]

কঠোপনিষদেও বলা হয়েছে, এই অক্ষরই হল ব্রহ্ম, তাই হল পরম। এই অক্ষরকে জেনে যে যা ইচ্ছা করে সে তাই লাভ করে।[৫২] জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে বলা হয়েছে, ওম্-কার থেকে চতুর্দশ বিদ্যা, মন্ত্র, পূজা, তপস্যা, ধ্যান, কর্ম ও অকর্ম এই সমুদায়

সমুদ্ভূত হয়েছে।[৫৩] গীতাতেও উক্ত হয়েছে 'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।'[৫৪] অর্থাৎ স্বীয় কর্ম দ্বারা পূজা করে মানব সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতএব শ্রুতি এবং স্মৃতিতে পূর্বোক্ত প্রকারে কর্মের ব্যাখ্যা থাকায় স্পষ্টত লক্ষিত হয় যে, যজ্ঞার্থে কৃত কর্মই প্রকৃত 'কর্ম' এবং তদ্দ্বারা যজ্ঞকারী সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন, তদ্‌ব্যতিরিক্ত কর্ম বন্ধনের কারণ।[৫৫]

ব্যাপক অর্থে যজ্ঞ বলতে পরার্থে ত্যাগ বোঝায়। আর পরার্থে ত্যাগ না হলে সমাজজীবন অচল হয়ে পড়ে। বোধ হয় এই কারণেই মহাভারতের শান্তি পর্বে (৩/৪০) বলা হয়েছে, ভগবান লোক সকলের জীবনযাত্র. নির্বাহের জন্য যজ্ঞচক্র উৎপাদন করলেন এবং দেবতা-মানুষ উভয়কেই বললেন, এই চক্র ব্যবহার করে একে অপরকে রক্ষা কর। কিংবা গীতাতে উক্ত হয়েছে — 'সহ যজ্ঞাঃ প্রজা সৃষ্ট্বা' (৩/১০)। সেখানে আরও বলা হয়েছে যে, এই প্রকার পরমেশ্বর কর্তৃক প্রবর্তিত যজ্ঞচক্রের যে ব্যক্তি অনুবর্তন না করে, তার জীবন পাপময়। সে ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি কামী, অতএব, তাঁর বেঁচে থাকা নিষ্ফল (৩/১৬)। গীতার এরূপ উক্তির তাৎপর্য হল, যদি প্রত্যেক মানুষ তার স্বাধীনতার কোন অংশেরও যজ্ঞ না করে অর্থাৎ পরার্থে ত্যাগ না করে তাহলে লোকসমাজ অচল হয়ে পড়বে।[৫৬]

যদিও 'যজ্ঞ' শব্দের মূল অর্থ দ্রব্য যজ্ঞ, তাকে লক্ষণার দ্বারা বিস্তৃত ও ব্যাপক করে গীতাকার তপস্যা, ইন্দ্রিয় সংযম, মনঃসংযম, সমাধি, বেদপাঠ, প্রাণায়াম প্রভৃতি ভগবৎ প্রাপ্তির সর্বপ্রকার সাধনকে 'যজ্ঞ' শিরোনামায় সমাবেশ করেছেন। গীতার লক্ষ্য, মানবের সমগ্র জীবনটিকে যজ্ঞময় করে তোলা।

এই কারণে কর্ম কি?[৫৭] — অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে গীতাকার বলেছেন, 'ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ'[৫৮] অর্থাৎ প্রাণীসমূহের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির হেতুভূত ত্যাগাত্মক যে কার্য তাই কর্ম নামে অভিহিত। এই শ্লোকের 'বিসর্গঃ' শব্দের বিসর্জন অর্থ করে দেবতার উদ্দেশ্যে হবি (ঘৃত), পুরোডাশ (পিষ্টক) ইত্যাদি দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ এরূপ অর্থ গ্রহণ করে ভাষ্যকার টীকাকারগণ সিদ্ধান্ত করেছেন — যজ্ঞে দেবোদ্দেশ্যে হবি, পুরোডাশ ইত্যাদি অর্পণ ভূতভাবের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি কারক। এবং এটাই কর্ম সংজ্ঞায় আখ্যায়িত শাস্ত্র বিহিত অর্থই প্রকৃষ্ট কর্ম।[৫৯] তথাপি গীতাতে কেবল সেই অর্থেই 'কর্ম' শব্দটি ব্যবহৃত না হয়ে, আরও ব্যাপক অর্থে জীবসকলের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ বিসর্জন বা বিনাশ পর্যন্ত তাদের প্রতিটি ক্রিয়াকেই কর্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৬০]

গীতাতে প্রতিটি ক্রিয়াকেই 'কর্ম' রূপে যে গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রমাণ স্বরূপ 'শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ' (গীতা-৩/৮) ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা থাকলেও কর্মমাত্রই যে মোক্ষের কারণ নয় তাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে গীতাকার

বলেছেন, 'হে অর্জুন, যা অর্থাৎ যে কর্ম জানলে তুমি সংসার হতে মুক্ত হবে সেই কর্ম সম্বন্ধে তোমাকে বলব।'[৬১] আর কোন কর্ম বন্ধনের কারণ নয় তা জেনে কিভাবে তা আচরণ করতে হবে সে বিষয়েও গীতাকার বলেছেন, যজ্ঞরূপে যে কর্ম করা হয় তদ্ব্যতীত অন্য কর্ম দ্বারা মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয়। সুতরাং 'হে অর্জুন, তুমি অনাসক্ত হয়ে যজ্ঞার্থ কর্মসকল সম্পাদন কর।'[৬২] বোধ হয় এটিই হল কর্মের কুশলতার ন্যায় যজ্ঞেরও কুশলতা। একই কর্ম সাধন করবার কৌশল জানলে তাব যজ্ঞত্বও সিদ্ধ হবে, না জানলে হবে না। আর এই প্রকারে অনুষ্ঠিত হলে (লোকদৃষ্টিতে) ছোট-বড সকল প্রকার কর্মই যজ্ঞে পরিণত হতে পারে।

এখন কর্মের ন্যায় 'যোগ' শব্দটিরও বিচার আবশ্যক। কারণ যোগ শব্দটিও সংযোগ, মিলন, উপায়, বর্মাদি ধারণ, ধ্যান, যুক্তি, সর্ব বিষয় থেকে অন্তঃকরণ বৃত্তিরোধ, জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্য, অলব্ধ বস্তুলাভের চিন্তা, দেহ, স্থৈর্য্য প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৬৩] তন্মধ্যে 'সংযোগ', 'মিলন', 'উপায়', 'ধ্যান', 'অন্তঃকবণ বৃত্তি রোধ', 'দেহ স্থৈর্য্য', 'জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্য', 'অলব্ধ বস্তু লাভের চিন্তা' রূপ যোগের এই অর্থগুলি সাক্ষাৎভাবে বা পরম্পরাভাবে মোক্ষের সহায়ক হয় বলে 'যোগ' শব্দেব উপরিউক্ত অর্থগুলিরই বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

অভিপ্রায় এই যে, 'যোগ' শব্দের ভিন্ন প্রকার অর্থ থাকলেও সবগুলির মুখ্য অর্থ হল 'মিলন'। এই মিলন আংশিক বা পূর্ণ হতে পারে এবং বিভিন্ন উপায়ে তা সাধিত হতে পারে। সেই মিলনের নিমিত্ত প্রত্যেকটি উপাযও 'যোগ' নামে অভিহিত হয়। আব যিনি যে প্রকারে তাঁব সঙ্গে মিলনে সচেষ্ট হন তিনিই সেই প্রকার যোগী বলে অভিহিত হন। কিন্তু যিনি সমস্ত অন্তরাত্মা তাঁতে সমর্পণ করতে পারেন একমাত্র তিনি সম্যক্‌ভাবে বুঝতে পারেন রুচির বৈচিত্র্যবশত মানুষ বিভিন্ন পথে তাঁরই সঙ্গে মিলনের অভিযাত্রী। ফলত বিভিন্ন পথের আপাত দ্বন্দ্বের চিব অবসান ঘটে — এটিই হল সমন্বয়। তাই গীতাকার বলেছেন যে সাধক অন্য বিষয়ে চিত্ত অবহিত না কবে সারাজীবন আমাকেই স্মরণ কবেন, সেই নিত্য সমাহিত চিত্ত ব্যক্তির নিকট আমি অতি সুলভ অর্থাৎ তিনি অনায়াসেই আমাকে লাভ করতে পারেন, কিন্তু অন্যের পক্ষে আমাকে লাভ করা সহজ নয়।[৬৪] এই নিত্য যুক্ততার জন্য তিনি হলেন 'যুক্ততমঃ'। অর্থাৎ যুক্তগণেব মধ্যে অতিশয় যুক্ত। আর 'যুক্ততমঃ' হওয়ার জন্যই তাঁর কাছে পরমাত্মাব মিলন 'সুলভ'।

এই প্রকারে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার নিত্য যোগ অর্থাৎ নিত্য মিলন গীতাকারের অভিপ্রেত হলে 'ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি', 'স্বারাজ্যপ্রাপ্ত হন' ইত্যাদি শ্রুতি বলে যোগীও ব্রহ্ম হওয়ায় তাঁরও জগৎ উৎপত্তির সামর্থ্যের শঙ্কা হয়।

এই প্রকার শঙ্কার উত্তরে "জগদ্ব্যাপারবর্জম্"[৬৫] ব্রহ্মসূত্রেব অবতাবণা করে সূত্রকার, ভাষ্যকাব প্রভৃতি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আকাশাদি জগতের সৃষ্টি প্রতিপাদক প্রকরণ সকলে

সর্বত্রই পরমাত্মাই স্রষ্টৃরূপে বিজ্ঞাত হয়েছেন, যোগিগণ কোন স্থলে তদ্রূপে বিজ্ঞাত হন না। সেহেতু জগৎ সৃষ্টিতে যোগিগণের স্রষ্টৃতা নেই। অন্যথা তাদের জগৎ স্রষ্টৃত্ব অঙ্গীকৃত হলে ঈশ্বর অনেক হওয়ায় কেউ সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করবেন, কেউ সংহার করতে ইচ্ছা করবেন। ফলত জগৎ ব্যবস্থা সিদ্ধ হবে না। ঈশ্বরের অধীনভাবে যোগিগণের স্বারাজ্য প্রাপ্তি হয় বলে নিত্যসিদ্ধ এক ঈশ্বরই জগৎ কর্তা হন। তবে জগৎ সৃষ্টিতে যোগিগণের স্বাধীনতা না থাকলেও ভোগ ও ত্যাগ সকলে তা থাকে — এই হল 'স্বারাজ্য প্রাপ্তি' প্রভৃতি শ্রুতির অর্থ।[৬৬]

গীতাকারও বলেছেন, যাঁরা সর্বত্র সমত্ব বুদ্ধি লাভ করেছেন তাঁরা ইহলোকে থেকেই সংসারকে জয় করেন। যেহেতু ব্রহ্ম সম ও দোষ-স্পর্শহীন। সেই কারণে সমদর্শী পুরুষগণ ব্রহ্মেই অবস্থিত হন বলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।[৬৭] তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন বলে যোগিগণ প্রকৃতির চঞ্চলতা ও বিকার দ্বারা প্রভাবিত হন না, তিনি জগৎ সংসারে জয় লাভ করেন কিন্তু জগৎস্রষ্টৃত্ব তাঁদের থাকে না। অতএব সর্বত্র সমত্ব বুদ্ধি অর্জনপূর্বক ইহলোকে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হল গীতোক্ত যোগের মুখ্য অর্থ।[৬৮] আর তৎপ্রাপ্তির নিমিত্তই গীতাতে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাছাড়া যজ্ঞ, দান, তপ, ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতি সাধনেরও যে বর্ণনা গীতাতে করা হয়েছে তার মূল কারণ হল অর্জুনের নিশ্চিত কল্যাণ কিসে হয় সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা। এই কারণে শাস্ত্রে কল্যাণকারক যতপ্রকার সাধনের কথা বলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা গীতাতে উক্ত হয়েছে। এগুলিও অধিকারী ভেদে কল্যাণকর এবং ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের হেতু হওয়ায় গীতা মধ্যে 'যোগ' আখ্যায় ভূষিত হয়েছে।

পাতঞ্জলে 'বিয়োগ'[৬৯] অর্থে 'যোগ' শব্দ গৃহীত হলেও পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থে 'যোগ' শব্দে সংযোগ অর্থই কিন্তু বিবক্ষিত। বিষ্ণু-পুরাণে কথিত হয়েছে, আত্মার চেষ্টা সাপেক্ষ যে অসাধারণ মনোবৃত্তি, তার ভগবানে সংযোগকেই যোগ বলে।[৭০] গীতাতে এই মতই অনুমোদিত হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ গীতা যোগীকে মনঃসংযম করে চিত্ত ঈশ্বরে নিহিত করতে উপদেশ দিয়েছেন।[৭১] গীতাকার আরও বলেছেন, যোগের ফলে যে শান্তি লাভ করা যায় তা ভগবানে স্থিতির ফল।[৭২]

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে 'কর্মযোগে'র অন্তর্গত 'কর্ম' ও 'যোগ' শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে মুখ্যত 'যজ্ঞার্থে' ও 'সমত্ব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যজ্ঞার্থে অনুষ্ঠিত কর্মই কর্ম পদবাচ্য এবং তা যথোপযুক্তভাবে অর্থাৎ সমত্ববুদ্ধিতে যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন তা 'কর্মযোগে' পরিণত হয়। এটিই হল গীতোক্ত কর্মযোগের রহস্য।

কর্মযোগের সার কথা হল কর্মফল স্পৃহা ত্যাগপূর্বক কর্ম করবার কুশলতা অর্জন।[৭৩] তজ্জন্য প্রয়োজন হয় নিজেকে অকর্তারূপে জানবার। কর্মযোগ শিক্ষা দেয় কর্ম ব্যতীত

যখন কারো জীবন ধারণের উপায় নেই তখন এরূপভাবে কর্ম করা উচিত যাতে কর্ম বন্ধনের কারণ না হয়ে মোক্ষের কারণ হয়। এই কারণে বলা হয়েছে - 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' (গীতা-২/৫০)।

আর নিজেকে অকর্তারূপে জানবার উপায় হিসেবে কর্মযোগের শিক্ষা হল, মানুষের কায়িক, বাচিক, মানসিক সকল ক্রিয়া বা পরিবর্তনের অবলম্বনরূপে তৎপশ্চাতে নিষ্ক্রিয়, অপরিবর্তনশীল, অনড়, অমর, সাক্ষী স্বরূপ আত্মা আছেন। তাঁর অধিষ্ঠানের জন্যই ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য করেন, কিন্তু তিনি তাঁদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি শরীর-মন-ইন্দ্রিয়-সমূহের সকল কার্য থেকে একেবারে স্বাধীন। যেমন সর্বব্যাপী আকাশ অতি সূক্ষ্ম বলে সকল বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত থেকে কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না তদ্রূপ এই আত্মা সকল জীবে অবস্থান করেও দেহধর্ম দ্বারা লিপ্ত হন না। (গীতা -১৩/৩৩)। তখন তিনি বোঝেন প্রকৃতির দ্বারা সকল কার্য সম্পন্ন হয়, যার বুদ্ধি অহঙ্কারে আচ্ছন্ন তিনি 'আমিই কর্তা' — এইরূপ মনে করেন। (গীতা-৩/২৭) প্রকৃতপক্ষে, কায়িক, বাচিক ও মানসিক সকল কর্মই প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত হয় —

'প্রকৃত্যৈব চ কর্মানি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ' (গীতা-১৩/৩০)

আর এই প্রকারে দেহ-মন-শরীরাদি ও তৎকর্ম থেকে আত্মাকে পৃথকভাবে জানলে সাধকের তখন শরীরাদি ও তৎকর্মে স্পৃহা থাকেনা। কারণ আত্মা তখন তাঁর কাছে একমাত্র প্রাপ্তব্য বস্তু হয়। আর এই আত্মপ্রাপ্তির নিমিত্তই তিনি ইন্দ্রিয়াদির স্ব স্ব কার্যে প্রভাবিত হন না কিংবা সেই কর্মগুলিকে নিরুদ্ধও করেন না। কারণ তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে আত্মা কোন কর্ম করেন না, শরীর-ইন্দ্রিয়-মনই কার্য করে। তাই গীতাকার বলেছেন, যিনি আত্মার যথার্থ তত্ত্ব জানেন তিনি কর্মযোগে যুক্ত থাকলেও মনে করেন যে, তিনি কিছুই করেন না। তিনি যখন চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করেন, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করেন, জিহ্বার দ্বারা আহার করেন, নাসিকার দ্বারা ঘ্রাণ নেন, পদ দ্বারা গমন করেন, নিদ্রা যান, প্রাণবায়ুর দ্বারা পুরীষাদি ত্যাগ করেন, হস্ত দ্বারা গ্রহণ করেন, চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলন করেন, তখন তিনি ধারণা করেন যে ইন্দ্রিয়গণই তাদের বিষয়ের উপর কাজ করছে।[৭৪]

সাধারণ লোক ও কর্মযোগীর পার্থক্য এই যে, সাধারণ লোক এই সকল ইন্দ্রিয়াদির কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেকে ঐগুলির সঙ্গে এক করে ফেলে কিন্তু কর্মযোগী ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, ঐগুলি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক রেখে ঐ গুলির মোড় ফিরিয়ে দেন মাত্র। অর্থাৎ শরীর ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা তাকেও যখন কর্ম করতে হয় তখন ঐ সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃত কর্ম তৎপ্রীত্যর্থেই করে থাকেন, আত্মতৃপ্তির জন্য নয়।[৭৫] ফলত সাধকের সকল কর্মই হয়ে ওঠে 'পরাপূজা' বা 'আত্মপূজা'। তাই আচার্য শঙ্কর 'পরাপূজা' বা 'আত্মপূজা' গ্রন্থে বলেছেন —

'হে শম্ভো! তুমি আত্মা, গিরিকন্যামাতা, পঞ্চপ্রাণ সহচর, শরীর গৃহ, বিবিধ উপভোগের রচনা তোমার পূজা এবং নিদ্রা হচ্ছে সমাধিতে অবস্থিতি, পদদ্বয়ের সঞ্চরণ প্রদক্ষিণ বিধি এবং সমস্ত বাক্য হচ্ছে স্তোত্র। আমি যে কর্ম করি সে সমুদায় তোমার আরাধনা।[৭৬] এইভাবে সাধকের সর্বত্র আত্মপ্রতীতি হওয়ায় সাধক বলে ওঠেন, আমি কি করব, কোথায় যাব, কি গ্রহণ করব, কি ত্যাগ করব। যেমন মহাপ্রলয়ের দ্বারা সমস্ত পূর্ণ থাকে তেমনি আত্মা কর্তৃক সমস্ত পূর্ণ।'[৭৭]

বোধকরি, সাধকের এরূপ অবস্থা প্রাপ্তি হল, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' প্রাপ্তি। গীতাকারও বলেছেন 'কর্মে ব্রহ্মবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির প্রাপ্তব্য ফলও ব্রহ্ম।'[৭৮]

এই প্রকার কর্মযোগী সকল প্রকার নরনারীকে নিজেরই আত্মার অভিন্নরূপ জ্ঞানে সেবা করার ফলে সমদর্শনে উপনীত হন। গীতাকার বলেছেন, সমাহিত চিত্ত ব্যক্তি সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শী হয়ে স্বীয় আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে স্বীয় আত্মায় দর্শন করেন।[৭৯] এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে তিনি কাউকেও ঘৃণা করতে পারেন না।[৮০]

কিন্তু এই প্রকার অভিন্ন জ্ঞানে কর্মযোগের অনুষ্ঠান সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। সকলে যাতে ক্রমে ক্রমে ঐ অবস্থা লাভ করতে পাবে তজ্জন্য গীতাকার বলেছেন —

> 'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
> সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।' [৮১]

এইস্থলে 'যোগস্থ' শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা হয়ে থাকে ঃ (১) কেবল ঈশ্বরার্থে অর্থাৎ 'ঈশ্বর তুষ্ট হোন' এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বরকে আশ্রয় করে কর্ম কর। (২) নিষ্কাম কর্মযোগে স্থিত হয়ে কর্ম কর। (৩) সমত্ব বুদ্ধি যুক্ত হয়ে কর্ম কর।[৮২] এই তিনটি অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বরং এগুলি প্রত্যেকটি যেমন ভিন্ন ভিন্ন অধিকারী ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আবার একই ব্যক্তির ক্রমশঃ উত্তরণের পন্থারূপেও নির্দেশিত হয়েছে।

'যোগস্থ' শব্দের প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে অর্থ দাঁড়ায় 'যোগস্থ' অর্থাৎ পরমেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বুদ্ধিকে পরমেশ্বরে নিহিত করে কর্ম করার কালে সাধক ভাববেন তিনি ভগবানের কর্ম করছেন। ভগবদিচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা এবং ভগবদিচ্ছা সম্পাদন করার জন্যই তিনি কর্মে প্রবর্তিত হয়েছেন। এখানে তাঁর নিজের কোন ইচ্ছা বা ফলাকাঙ্খা থাকবে না। তাই গীতাকার বলেছেন —

> 'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
> যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।'[৮৩]

এই প্রকারে কর্মানুষ্ঠানকালে যদিও সাধক দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় উন্নীত হতে পারেন না এবং ঈশ্বরে সমত্ব বা নিত্যযুক্তত্ব সিদ্ধি হয় না, তথাপি ক্রমে ক্রমে তা হয়ে থাকে বলে তা কর্মযোগীর সাধনের প্রথম সোপান বলে মনে হয়।

'যোগস্থ' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে অর্থ দাঁড়ায় 'যোগস্থ' অর্থাৎ পরমেশ্বরের সঙ্গে পূর্বোক্ত প্রকারে বুদ্ধিকে যুক্ত করলে ক্রমে ক্রমে কর্মফলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান আপনা থেকে চলে যায়। এটি হল, কর্মযোগীর কর্মযোগ সাধনের দ্বিতীয় সোপান। প্রথম সোপানের সঙ্গে পার্থক্য হল, প্রথম স্তরে সাধক কর্মফলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করার জন্য ভগবদিচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা বলে মনে করে তদিচ্ছা সম্পাদনে নিজেকে কর্মেতে প্রবর্তিত করে। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে তাঁকে আর চেষ্টা করে এ সকল কর্ম করতে হয় না। তিনি আপনা-আপনি 'নিমিত্তমাত্র' বোধে কর্মানুষ্ঠান করেন।

আর 'যোগস্থ' শব্দের তৃতীয় অর্থ গ্রহণ করলে অর্থ দাঁড়ায় পূর্বোক্ত প্রকারে ভগবানের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন হলে সাধক তখন 'যোগস্থ' অর্থাৎ 'সমত্ব বুদ্ধি' অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হওয়ায় সকল প্রকার দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা লাভ করে দ্বন্দ্ব ভূমিতেই (সংসারে) ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, যেহেতু ব্রহ্ম সম ও দোষ-স্পর্শহীন। এটি গীতোক্ত কর্মযোগের চরম স্তর। এই কারণেই গীতাকার বলেছেন 'যা লাভ করলে যোগী অপর কোন লাভকে তদপেক্ষা শ্রেয় বলে মনে করেন না অর্থাৎ যে লাভ অপর সকল লাভ অপেক্ষা বড়, যা প্রাপ্ত হলে দারুণ দুঃসহ শোকও আর যোগীকে বিচলিত করতে পারে না তাই 'যোগ' বলে জানবে।[৮৪]

এই স্থলে একটি আশঙ্কা হতে পারে কর্ম মাত্রই অল্পাধিক সদসৎ মিশ্রিত বলে কেবল সৎ বা কেবল অসৎ রূপে কোন কর্ম না থাকায় এবং সকল কর্মই অল্পাধিক দোষযুক্ত, অগ্নি যেমন সর্বদাই ধূমাচ্ছন্ন থাকে[৮৫] এও তদ্রূপ — গীতাকার কর্তৃক তা স্বীকৃত হলে যজ্ঞার্থে অনুষ্ঠিত কর্ম কি প্রকারে নির্দোষযুক্ত হয়ে মোক্ষের কারণ হবে? মোক্ষাবস্থা বা ব্রাহ্মীস্থিতি[৮৬] তো সকল প্রকার দোষশূন্য অবস্থা।

এই প্রশ্নের উত্তর অতি নিপুণতার সঙ্গে গীতাকার গীতামধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি প্রথমে 'সৎ কর্ম', 'অসৎ কর্ম' কাকে বলে তা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন নিষ্ঠা সহকারে যজ্ঞ, তপস্যা, দান ও ভগবৎ প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম হ'ল 'সৎ কর্ম'। আর অশ্রদ্ধা সহকারে সেইসকল কর্ম ও অন্যান্য যা কিছু করা হয় তা 'অসৎ কর্ম'।[৮৭] গীতোক্ত এই প্রকার সৎ ও অসৎ কর্মের লক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে, কর্মের প্রকার ভেদে সৎ, অসৎ কর্ম নির্নীত হয় না বরং কর্ম করবার মানসিকতার তারতম্যই কর্মকে সৎ অথবা অসৎ করে।

গীতাকার এইস্থলে আরও বলতে চেয়েছেন যে, যদিও কর্ম করার মানসিকতার তারতম্যে কর্ম সৎ বা অসৎ বলে আখ্যাত হয়, তথাপি শ্রদ্ধা সহকারে প্রাগুক্ত সৎ কর্ম সকল অনুষ্ঠিত হলেও তা কখনও একান্ত সৎ হতে পারে না। জীবের অনিষ্ট সাধন না করে শ্বাস ও প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করা সম্ভব নয়। কাজেই দেশ-কালে সীমাবদ্ধ এই জগতে এমন কোন কার্য করা সম্ভব নয় যার ফল সম্পূর্ণ ভাল বা সকল প্রাণীর পক্ষে শুভ। পক্ষান্তরে কোন কর্মও কোন না কোন আকারে কোন স্থান বা পাত্রের পক্ষে

উপকারজনক না হয়ে সকল স্থানে বা পাত্রের পক্ষে সম্পূর্ণ অপকারজনক হয় না। যেমন, যার দ্রব্য অপহৃত হয় সে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অপহারক ধরা না পড়লে সে অভাব পূরণের দিক থেকে লাভবানই হয়ে থাকে।[৮৮]

গীতাকার বলেছেন — সকল কর্মই সদসদ্ মিশ্রিত। তাহলেও যে সকল কর্মে সৎ-এর আধিক্য অর্থাৎ ফলাকাঙ্খা বর্জিত কর্মের আধিক্য আছে সেই সকল কর্মই অনুষ্ঠেয়[৮৯] এবং সেই সকল কর্মকেই সৎ কর্ম বলে বুঝতে হবে। প্রাগুক্ত ফলাকাঙ্খাবর্জিত যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদিতে সৎ এর আধিক্য আছে বলে ঐগুলি সৎ কর্ম নামে অভিহিত। পক্ষান্তরে যে সকল কর্মে অসৎ-এর আধিক্য আছে সেগুলিকে অসৎ কর্ম বলে বুঝতে হবে। অতএব এই স্থলে সৎ-অসৎ-এর আধিক্য ও অনাধিক্যই আমাদের সৎ অসৎ কর্ম নির্ণয়ের মানদন্ড।[৯০]

এই প্রকারে সৎ-অসৎ কর্ম নির্ণয়ের পর গীতাকার সৎ কর্মানুষ্ঠান কেন আবশ্যক তার দুটি কারণ নির্দেশ করেছেন। (১) সৎ কর্মসমূহ মনীষিগণেরও চিত্ত শুদ্ধিকারক।[৯১] অতএব অন্যে পরে কা কথা! (২) পূর্বকালে মুমুক্ষুগণও কর্ম (সৎ) করেছেন। অতএব তুমি কর্ম কর।[৯২] পূর্বকালে মুমুক্ষুগণও কর্ম করেছেন বলে অর্জুনকে তদনুবর্তন করার উপদেশ দেওয়ায় অনুমিত হয় যে, 'মহাজন যেন গত স পন্থাঃ' এই নীতি যে সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত হিতকারী সে দিকেই গীতাকার ইঙ্গিত করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলতে চেয়েছেন, চিত্তশুদ্ধির সহায়করূপে পূর্বপূর্ব মুমুক্ষুগণ নিজ নিজ আশ্রমধর্মোচিত কর্মের অনুষ্ঠান করেছেন বলেই যে তদনুবর্তন করতে হবে, অন্য কোন প্রকারে তার অনুষ্ঠান করা উচিত নয় — এরূপ সিদ্ধান্তও যথার্থ নয়, এরকম ভেবে যদি কেউ (কল্যাণার্থী) মুমুক্ষুগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত কর্মের বিপরীত অনুষ্ঠান করেন তা মিথ্যাই হবে। তা ব্যক্ত করতে অর্জুনকে লক্ষ্য করে সমস্ত মুমুক্ষুগণকে শ্রীকৃষ্ণ সাবধানবাণী শুনিয়েছেন — হে অর্জুন! তুমি 'অহংকারবশতঃ মনে করছ 'আমি যুদ্ধ করব না।' তোমার এই সঙ্কল্প মিথ্যা, কারণ তোমার ক্ষত্রিয় প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করবে অর্থাৎ তুমিই তোমার প্রকৃতির অধীন হয়ে বিপরীত সংকল্প সত্ত্বেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে।[৯৩] কাজেই এই ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ হল — 'সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।'[৯৪]

এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় হল, নিজ নিজ বর্ণাশ্রমাদি কর্ম কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত বলে প্রতিভাত হলেও প্রকৃতির প্রাধান্যবশত তা যেহেতু ত্যাগ করার চেষ্টা করেও সফল হওয়া সম্ভব নয় সেহেতু তৎ ত্যাগে যত্নবান না হয়ে বরং বর্ণাশ্রমাদি কর্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হলে চিত্তশুদ্ধিবশত মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে।[৯৫] এই স্থলে লক্ষণীয় এই যে, বর্ণের কোন বৃত্তি সিদ্ধিলাভের প্রতিবন্ধক নয় বরং তাঁকে আশ্রয় করলে অসৎ কুল জাত সেই সকল স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্রগণও পরাগতি লাভ করবেন।

পূর্বোক্ত প্রকারে বর্ণাশ্রমাদি অনুষ্ঠিত হলে মানুষ তখন বুঝতে পারে যে, একমাত্র আত্মাকেই উপাসনা করতে হবে কারণ তাকে জানলে সর্ববস্তু লাভ করা বা জানা যায়।[৯৬] অতএব আত্মাকে লাভ করার জন্য উপাসনাই তখন তার কাছে একমাত্র স্বধর্ম হয়। অন্যান্য ধর্ম সকল তখন তাঁর কাছে আধ্যাসিকরূপেই প্রকটিত হবে। আর, তা হলে সাধকের তখন কর্ম সন্ন্যাস অর্থাৎ সমস্ত কর্ম ফলের ত্যাগ হবে।[৯৭] এটি অনুভব করতে পারলে কর্মযোগীর ইন্দ্রিয়সকল বিষয়াসক্ত হয় না ববং তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত তিনি শরীর-মন বুদ্ধি এবং আসক্তি-বিহীন ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম করে থাকেন।[৯৮]

সিদ্ধান্ত রূপে শ্রীকৃষ্ণ বলতে চেয়েছেন যে, আসক্তিহীন দেহ-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় দ্বারা যিনি কর্মযোগে যুক্ত, বিশুদ্ধ চিত্ত, সংযত দেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বভূতেব আত্মাই তার আত্মা — সেরূপ ব্যক্তি কর্ম করেও কর্মবন্ধন প্রাপ্ত হন না।[৯৯] কিংবা ব্রহ্মে সমর্পণ করে ফলাকাঙ্খা বর্জন পূর্বক যিনি কর্মানুষ্ঠান করেন, পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় তিনি (পুণ্যপাপাত্মক) কর্মে লিপ্ত হন না।[১০০] বরং কর্মযোগযুক্ত ব্যক্তি ক্রমশ তত্ত্ববিদ্ হয়ে দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, আহার, শয়ন, শ্বাস গ্রহণ, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ,উন্মেষ ও নিমেষ করেও 'ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্তিত আছে, আমি কিছু করি না'—[১০১] এরকম অনুভব করে থাকেন। এইকারণে শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান হল, হে জীব! আধ্যাত্মিক ধর্ম (কর্ম) সকলকে ত্যাগ কবে একমাত্র আমারই (পরমাত্মার) স্মরণ নাও, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব, অতএব শোক কোরো না।[১০২] তাৎপর্য এই যে, ফলাসক্ত হয়ে কর্ম করলে দেহেন্দ্রিয়াদির কর্মকে নিজের বলে মনে করে তজ্জন্য দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু এই মানুষই যখন ফলাসক্তি বর্জন করে দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম করে তখন তার মধ্যে স্বভাব (জীবাত্মা থেকে পরমাত্মার ভাব) পরিস্ফুট হয়ে উঠে, ফলে আধ্যাত্মিক কর্ম সকল তাকে শোকগ্রস্ত করতে পারে না।

প্রস্তাবিত স্থলে পুনরায় জিজ্ঞাসা হয়, এই কর্ম কি মোক্ষেব প্রতি সাক্ষাৎ কারণ? এই প্রশ্নের উত্তবে বলা যায় যে, আচার্যগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান। এই মতপার্থক্যকে সাধারণত তিনভাগ ভাগ করা চলে —

(১) কর্মই মোক্ষের প্রতি সাক্ষাৎ কারণ। জ্ঞান বা জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয় মোক্ষেব প্রতি সাক্ষাৎ কারণ নয়।

(২) জ্ঞানই মোক্ষের প্রতি সাক্ষাৎ কারণ, কর্ম কিংবা জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয় মোক্ষেব প্রতি সাক্ষাৎ কারণ নয়।

(৩) জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয়ই মোক্ষর প্রতি সাক্ষাৎ কারণ, জ্ঞান কিংবা কর্ম এককভাবে মোক্ষের প্রতি সাক্ষাৎ কারণ নয়।

শেষোক্ত মতটিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায় · (ক) কর্ম প্রধান জ্ঞান (খ) জ্ঞান প্রধান কর্ম (গ) সম-প্রধান জ্ঞান-কর্ম।[১০৩]

গীতাতে সমভাবে চতুর্যোগের উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে

পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন দার্শনিকগণের মধ্যে মত পার্থক্য থাকায় এ বিষয়ে সর্বজনগ্রাহ্য একটি সিদ্ধান্ত গঠন করা সহজসাধ্য না হলেও গীতাকার কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর অতি নিপুণভাবে প্রদান করেছেন। তিনি একদিকে যেমন পূর্বোক্ত কোন মতকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেন নি। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত হ'ল —

'যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।'[১০৪]

অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞাননিষ্ঠ কর্মত্যাগী, সন্ন্যাসিগণ জ্ঞানের সাধন দ্বারা যে মোক্ষ লাভ করেন, কর্মযোগিগণও সেই মোক্ষই লাভ করেন। সুতরাং উভয়ের ফল এক। এই প্রকাবে উভয় মার্গকে যাঁরা সমফলদায়ক বলে জানেন তাঁরাই সম্যক্‌দর্শী। পক্ষান্তরে, যাঁরা বলেন যে, কর্মানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তি মুক্তি লাভ করতে পারেন না অথবা মোক্ষলাভের জন্য কর্মত্যাগ একান্ত আবশ্যক তাঁবা সম্যক্‌দর্শী নন।[১০৫]
গীতাকার আরও বলেছেন —

'একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্।'[১০৬]

অর্থাৎ একতরের (জ্ঞান অথবা কর্ম) অনুষ্ঠানকারী উভয়েই (নিঃশ্রেয়স স্বরূপ) ফল লাভ করে থাকেন। উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী বলেছেন, কর্মযোগ ও কর্মসন্ন্যাস (জ্ঞান যোগ) এই উভয়েব মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্ন অজ্ঞেরই পক্ষে উচিত, বিবেকী (জ্ঞানী) জনের পক্ষে অনুচিত। কারণ, যিনি উভয়ের একটিতে সম্যক্ আশ্রিত হন তিনি উভয়েরই ফল কৈবল্য প্রাপ্ত হন।[১০৭]

অতএব, গীতোক্ত সিদ্ধান্ত হল কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের দ্বারা প্রাপ্ত ফল নিঃশ্রেয়স যেহেতু ভিন্ন নয়, সেহেতু পরমার্থত এরা ভিন্ন নয়। পরমার্থ লাভের নিমিত্ত ভিন্ন পথ মাত্র। তাই গীতাকাব বললেন —

'সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ'।[১০৮]

পরমার্থ লাভের যে বিভিন্ন পথ আছে এবং অপর সকল পথের মতো কর্মযোগের দ্বারাও যে আত্মজ্ঞান বা মোক্ষ হয় সে বিষয়ে গীতাকার স্পষ্টতই বলেছেন —

'ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে।।' (গীতা-১৩/২৪)

অর্থাৎ, ধ্যানের দ্বারা, বা আত্মাকার প্রত্যয় আবৃত্তি দ্বারা, আত্মাতে মনন শক্তি দ্বারা কোন

কোন সাধক আত্মসাক্ষাৎকার করেন। অন্য কোন সাধক সাংখ্য-যোগ অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের প্রভেদ আলোচনা করে অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা আত্ম-দর্শন করেন। আবার ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে ফলত্যাগ সঙ্কল্পসহ স্ব স্ব বর্ণাশ্রম বিহিত বেদনির্দেশিত কর্মসকলের অনুষ্ঠান দ্বারা কোন কোন সাধক আত্মদর্শন করেন।[১০৯] কাজেই গীতাকার, কোন একটি মতকে প্রতিষ্ঠা দেননি। সকল মত ও পথের কথা বলেছেন।

ফলাসক্তি বর্জন পূর্বক বা ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে ফলার্পণ করে কর্ম করলে যে তদ্দ্বারা মুক্তি হয় তা ব্যক্ত করতে গীতাকার বলেছেন, 'অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ।'[১১০] শাস্ত্রান্তরেও কথিত হয়েছে, গৃহে থেকেও যারা অনিন্দিত কর্ম ভিন্ন অন্য কর্ম করে না, আমার কথা কীর্তন করে কাল যাপন করে, গৃহ তাদের বন্ধনের কারণ হয় না, এই হল আমার মত।[১১১]

এই প্রকারে গীতামধ্যে আত্মজ্ঞান লাভের বিভিন্ন পথের যথার্থতা এবং কর্মযোগও ঐ সকল বিভিন্ন পথের মধ্যে একটি পথ তা প্রদর্শিত হলেও আপত্তি হতে পারে যে, গীতামধ্যে কোন মতের যদি ন্যূনাধিক্যের অবতারণা করা না হয়ে থাকে তবে কেন জ্ঞানযোগের পূর্বে কর্মযোগের অবতারণা করা হয়েছে?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রস্তাবিত স্থলে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদির যে উপদেশ গীতাকার করেছেন তা সবই এসেছে কর্তব্যাকর্তব্যভারে ন্যুব্জ, মূঢ়চেতা অর্জুনকে উপদেশ দান করতে গিয়ে। ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে যে ভীষণ কর্ম অনুষ্ঠিত হচ্ছিল এবং যে কর্মের বাহ্যরূপ দেখে মহাপরাক্রমশালী অর্জুন যুদ্ধ না করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, সেই অর্জুনকে প্রথমেই কর্মের প্রকৃত স্বরূপ কি তা বোঝানোর আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। কারণ, তৎকালে তাঁর কাছে (অর্জুনের) কর্মই ছিল লক্ষ্য। সেই কারণেই তিনি কর্মযোগের অবতারণা করেছিলেন। কাজেই, ন্যূনাধিক্যের আশঙ্কা নেই।

আরও কথা এই যে, সর্বজনীন ক্ষেত্রে কর্ম করতে গেলে কর্ম বিষয়ক জ্ঞান আবশ্যক। এই কর্মজ্ঞান অর্থাৎ যজ্ঞার্থে অনুষ্ঠিত কর্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না, যদি না কর্মকর্তার স্বজনাসক্তি এবং দেহাত্মবোধ দূর হয়। এই কারণেই গীতাকার যজ্ঞার্থে কর্ম করার জন্য অর্জুনকে কর্মযোগের পূর্বে বুদ্ধিযোগের উপদেশ করেছিলেন, যে বুদ্ধির দ্বারা দেহের অনিত্যত্ব, আত্মার নিত্যত্ব, কর্ম, কর্মফল, কর্ম করার কৌশল প্রভৃতি বিষয়ে ধারণা জন্মায় সেই বুদ্ধি (জ্ঞান) তিনি প্রদান করেছিলেন। এই সকলই কিন্তু তিনি করেছিলেন কর্মকে উপলক্ষ্য করে। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেই গীতাকার বলেছেন — হে অর্জুন! তুমি বীর্যহীন ক্লীবের ন্যায় কাতর ভাবাপন্ন হয়ো না। তা তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয় বীর পুরুষের সাজে না। হে পরন্তপ! (শত্রু দমন করা যার কার্য) তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ করে যুদ্ধের নিমিত্ত উত্থান কর।

গীতাকারের এই প্রকারে অর্জুনকে উপদেশ করার গূঢ় অভিপ্রায় হল — মানুষের

জীবন একটা বিরামহীন সংগ্রাম। এখানে প্রতি পদে পদে বিপদ। কখনই নিরবচ্ছিন্ন সুখ নেই। সর্বদাই যুদ্ধ করে তাকে তার লক্ষ্যে পৌঁছোতে হয়।

এই যুদ্ধ অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি — উভয়েরই বিরুদ্ধে। যিনি এই যুদ্ধে পরান্মুখ হন তিনি জীবিতকালেই মৃততুল্য হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁরাই জীবন যুদ্ধে জয়ী হন যাঁরা লক্ষ্য ঠিক রেখে নির্ভয়ে এগুলিকে অতিক্রম করতে পারেন। বহিঃ-প্রকৃতি ও অন্তর-প্রকৃতির বিরুদ্ধে সাধককে যে সংগ্রাম করতে হয় সেই সংগ্রামকে সাধক এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই তাঁকে জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে হলে এগুলিকে মাড়িয়ে যেতে হয়। আর, সাধক তখনই এগুলিকে মাড়িয়ে যেতে পাবেন, যখন তাঁর মন, বুদ্ধি সর্বদা ভগবানে অর্পিত থাকে। তাই গীতাকার বলেছেন, অতএব, আমাকে সর্বদা স্মরণ কর ও যুদ্ধ কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করলে তুমি নিঃসংশয়ে আমাকেই পাবে।[১১২]

মানুষ সাধারণত কর্ম করতে গেলে, কর্ম করতে করতে লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখতে পারে না। ফলে কর্ম হয়ে পড়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট। আবার লক্ষ্যের দিকে নজর দিতে গিয়ে হয়ে পড়ে কর্মচ্যুত। অর্থাৎ কর্ম করতে গিয়ে আমরা সাধারণত একদিকে যেমন লক্ষ্য থেকে সরে যাই, অপর দিকে তেমনি জ্ঞানের দিকে নজর দিতে গিয়ে কর্ম থেকে বিচ্যুত হই। কিন্তু গীতাকারের বক্তব্য হল কর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে অর্থাৎ কর্মত্যাগ করে থাকা যেহেতু সম্ভব নয় এবং লক্ষ্য অর্থাৎ জ্ঞান ব্যতিরেকে কর্ম করাও সম্ভব নয়, সেহেতু লক্ষ্য ঠিক রেখে কর্ম করতে হবে। এ দুটির যে কোন একটিকে ধরতে গিয়ে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আর তা করতে পারলে কখনই তার কর্মে উদাসীনতা বা জ্ঞানে উদাসীনতা আসবে না। কাজেই সাধককে সাধন যুদ্ধে জয়ী হতে হলে সর্বদা তাঁকে লক্ষ্যকে (ঈশ্বর বা মোক্ষ) সামনে রেখে যুদ্ধ করতে হবে। কোন একটিকে বাদ দিলে মোক্ষ লাভ হবে না। আর এই রকমভাবে কর্ম করবার কৌশল অর্জন না করে কর্মে অবতীর্ণ হলে সেই কর্ম বিষাদ ও বন্ধনের কারণ হয়। শাস্ত্রান্তরেও উক্ত হয়েছে বিক্রম দেখানোর কালে বিষাদ দ্বারা অভিভূত পুরুষের কোন পুরুষার্থ থাকে না।[১১৩] তাই, কর্মোদ্যমী অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে গীতাকার জ্ঞানযোগের পূর্বে যে কর্মযোগের অবতারণা করেছেন তাতে ন্যূনাধিক্যের আশঙ্কা নেই।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমরা যে জগতে অবস্থান করি, সেই জগতে ক্ষণকালও কর্ম থেকে মুক্ত হই না। কাজেই কর্ম থেকে মুক্ত হবার অর্থাৎ নিঃশেষে কর্ম ত্যাগ করবার প্রচেষ্টা যথার্থ নয়। যাঁরা মনে করেন কর্ম করলে কর্মপাশে বদ্ধ হয়ে যেহেতু ব্রহ্মানন্দ লাভ করা সম্ভব হবে না, সেহেতু কর্মত্যাগ বাঞ্ছনীয়, তাদের বিরুদ্ধে গীতাকারের বক্তব্য হল তাদের মনোনিগ্রহ অদ্যাপি যথোপযুক্তভাবে হয় নি। তাই, বাহ্য কর্ম ত্যাগের দিকে তাদের প্রচেষ্টা বলবত্তর। যে ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়সমূহ সংযত করে, মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় স্মরণ পূর্বক অবস্থান করেন সে মিথ্যাচারী।[১১৪] আসল কথা হল—মন বিষয়াসক্ত কি না? মন যদি বিষয়াসক্ত হয় তাহলে বাহ্য

কর্ম ত্যাগের দ্বারা বন্ধ নিবৃত্তি হবে না। পক্ষান্তরে মন যদি বিষয়-বাসনাহীন হয় তাহলে বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করেও বন্ধ নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ প্রাপ্তি হবে। এই কারণে শ্রুতি বলেছেন —

> 'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ।
> বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্।।'[১১৫]

এই প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাসের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন —

> 'বিকারহেতৌসতি বিক্রিয়ন্তে
> যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।'[১১৬]

অর্থাৎ যে সকল কারণে বিকার উৎপন্ন হয় সেই সব কারণ কিংবা বিষয় চোখের সামনে থাকলেও যাঁদের অন্তঃকরণ মোহের বিকারে পতিত হয় না, সেই সকল পুরুষই হলেন ধৈর্য্যশীল। কালিদাসের এই উক্তি থেকে আরও বোঝা যায় যে, মনোনিগ্রহকে কর্মের কষ্ঠিপাথরে পরখ করে তা পূর্ণ হয়েছে কিনা অর্থাৎ তা নির্বিষয় হয়েছে কি না তার সাক্ষ্য যেমন অন্যের কাছে পাওয়া যায়, তেমনি নিজের কাছেও পাওয়া যায়।

আসক্তিহীনতাই সকল যোগের মূল ভিত্তি এবং প্রকারান্তরে জ্ঞানযোগাদিও কর্মযোগ সাপেক্ষ

মোক্ষলাভের জন্য যতপ্রকার উপায় আছে সেই উপায়গুলি অধিকারী ভেদে যথোপযুক্ত ভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কি না তা বোঝার উপায় হল সেই সেই পথ অনুসরণ কালে মন বিষয়াসক্ত হচ্ছে কি না তা বিচার করে দেখা। বিষয়াসক্ত না হয়ে কর্ম করাই হল 'যজ্ঞার্থে কর্ম' করা। বিষয়াসক্ত হয়ে যেহেতু যজ্ঞার্থে কর্ম অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয় সেহেতু বোঝা যায় যে, মোক্ষলাভের নিমিত্ত জ্ঞান-ভক্তি ইত্যাদি ভেদে যিনি যে পথই অবলম্বন করুন না কেন তাঁকে বিষয়ে অনাসক্ত হয়েই অর্থাৎ যজ্ঞার্থে কর্ম করতে হবে। এই অর্থে অন্যান্য যোগও কর্মসাপেক্ষ। তাৎপর্য হল, জ্ঞানযোগের বৈশিষ্ট্য হল বিচার। কিন্তু বিচারকে পূর্বোক্ত প্রকার বিষয়কেন্দ্রিক করলে চলবে না। তাকে সর্বদা আত্মবিষয়ক হতে হবে। আত্মবিষয়ক চিন্তা বা বিচার যেহেতু অনাত্মবিষয়ক নয়[১১৭] সেহেতু তা কামনা-বাসনার অন্তর্গত না হওয়ায় সেই চিন্তা বা বিচার 'ব্রহ্মযজ্ঞার্থে'ই অনুষ্ঠিত হওয়ায় তা কর্মসাপেক্ষই হল।

গীতামধ্যে ব্রহ্মকে বলা হয়েছে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি (ব্রহ্মাগ্নৌ)। ব্রহ্মাগ্নিতে অহঙ্কাররূপ হবিঃ-র অর্পণই হল ব্রহ্মযজ্ঞ।[১১৮] গর্ব বা অভিমানাত্মক বৃত্তি বিশিষ্ট অন্তঃকরণকে অহঙ্কার বলা হয়। এই গর্ব বা অভিমান অনাত্মবিষয়কেই কেন্দ্র করে হয়ে থাকে এবং 'অহমর্থ' ইচ্ছাদিবিশিষ্ট রূপেই প্রতীয়মান হয়। এই অহঙ্কারের বিষয় শুদ্ধচৈতন্য হয়

না।[১১৯] ফলত দেহাদি বা ইন্দ্রিয়াদি অনাত্মাতে আত্মাধ্যাসরূপ অহঙ্কার দৃষ্ট হয়। অতএব, অনাত্ম বিষয়ক বাসনা দূর না হলে অর্থাৎ যজ্ঞার্থে কর্ম অনুষ্ঠিত না হলে জ্ঞানীরও ব্রহ্মযজ্ঞ বা জ্ঞানযজ্ঞ হবে না।

জ্ঞানযোগীরা ব্রহ্মকে 'তৎ' এবং আত্মাকে 'ত্বং' বলেন।[১২০] এই 'ত্বং' বস্তুকে 'তৎ' বস্তুতে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির তুল্য সমর্পণই ব্রহ্মযজ্ঞ। ঘৃত যেমন বহ্নিতে দগ্ধ হয়ে যায়, কিছুই থাকে না, তদ্রূপ 'ত্বং' বস্তু তৎ বস্তুতে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু এই বিলীন হবার প্রতিবন্ধক হল 'বিষয়াসক্তি'। কাজেই বিষয়াসক্তি দূর না হলে অর্থাৎ যজ্ঞার্থে কর্ম অনুষ্ঠিত না হলে 'ত্বং'-এর 'তৎ'-এ বিলীন হওয়া যেহেতু সম্ভব নয় সেহেতু প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞানযোগও কর্ম সাপেক্ষ।

রাজযোগের মূল বক্তব্য হল চিত্তের অর্থাৎ মনের ভাবাত্মক বৃত্তি[১২১] সকলের নিরোধ করা। আর এই বৃত্তিনিরোধের চরম অবস্থায় দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয়।[১২২] কাজেই, এই মতে যে চিত্তবৃত্তি নিরোধটি দ্রষ্টার (আত্মার) স্বরূপে অবস্থানের কারণ হয়, তাকে যোগ বলে। ক্ষিপ্তাদি অবস্থায় চিত্তবৃত্তি নিরোধগুলি ঐরূপ নয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয় না। সম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় (একাগ্রভূমিতে) সাত্ত্বিক বৃত্তি থাকে বলে ঐ অবস্থায় আত্মার স্বরূপে অবস্থান না হলেও অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় (নিরুদ্ধভূমিতে) হয়ে থাকে। সম্প্রজ্ঞাত থেকে অসম্প্রজ্ঞাতের উৎপত্তি হয়। সুতরাং সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আত্মার স্বরূপাবস্থানের হেতু। কিন্তু এই স্বরূপাবস্থানে স্থিতি তখনই সম্ভব হবে যখন চিত্ত বা মন থেকে সম্পূর্ণরূপে পূর্বোক্ত প্রকার বিষয়-বাসনা তিরোহিত হবে। বোধ হয় এই কারণেই ভাষ্যকার ব্যাস অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ (যোগসূত্র—১/১২) এই সূত্রের ব্যাখ্যার পূর্বেই স্বয়ংই প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন 'অথা-সাং নিরোধেকঃ উপায়ঃ?' অর্থাৎ পূর্বোক্ত চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধ কিরূপে হবে? উত্তরে সূত্রে বলা হয়েছে অভ্যাস (বারংবার অনুষ্ঠান) ও বৈরাগ্য (ভোগ্য পদার্থে আসক্তি না থাকা) দ্বারা তাদের নিরোধ করবে।

অতঃপর উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষ্যকার বলেছেন, উভয় দিকে প্রবহমান চিত্ত নামে একটি নদী আছে, সেটি কল্যাণের নিমিত্ত এবং পাপের নিমিত্ত প্রবাহিত হয়। যে প্রবাহটি কৈবল্যের (মুক্তির) অভিমুখ, বিবেক বিষয় যার নিম্ন পথ তাকে কল্যাণবহ বলে। যে প্রবাহটি সংসারের অভিমুখ, অবিবেক বিষয় যার নিম্ন পথ তাকে পাপবহ বলে। বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয় দিকের প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ হয়, এবং বিবেক দর্শনানুশীলনের দ্বারা বিবেক পথের স্রোত উদ্‌ঘাটিত হয়। অতএব এই উভয়ের সাহায্যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে থাকে।[১২৩] অতএব, রাজযোগে সিদ্ধিলাভ করতে হলেও যোগীকে সংসারের ভোগ্য বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে অর্থাৎ যজ্ঞার্থেই কর্ম করতে হবে। এই প্রকারে বৃত্তি নিরোধই যাঁদের যজ্ঞ তাঁদের গীতাকার 'যোগযজ্ঞাঃ'[১২৪] শিরোনামায় ভূষিত করেছেন।

ভক্তিযোগের বক্তব্য হল ঈশ্বর বা পরমাত্মাতে অত্যন্ত অনুরাগ। শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে — 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' (১/১/২) বিষয়াসক্তি নিবৃত্ত না হলে ঈশ্বর বা পরমাত্মাতে ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মে না। এই কারণে নারদকৃত ভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে —

'ওঁ তত্তু বিষয় ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাশ্চ' (পঞ্চম অনুবাক, ৩৫)

অর্থাৎ ঐ ভক্তিসাধন বিষয়-ত্যাগ ও সঙ্গ-ত্যাগের দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে। অভিপ্রায় এই যে, ইন্দ্রিয়বর্গ বিষয়স্বাদে বিব্রত থাকলে মন তাতে মগ্ন হয়ে থাকে। বিষয়রুচি মনকে সর্বদা বিষয় থেকে বিষায়ন্তরে আসক্ত করে। এইরূপে বিষয়সঙ্গ, লোকসঙ্গ সর্বদা মনকে বিহ্বল করে রাখলে মন বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল ও দুর্বল হয়ে পড়ে। সম্পূর্ণ একাগ্র না হলে ভক্তির আবেশের সম্ভাবনা নেই। এই কারণে ভক্তি সাধনা করতে হলে প্রথমেই বৈরাগ্যবান ও নিঃসঙ্গ হওয়া আবশ্যক।[১২৪]

অতএব, পরমেশ্বরে অত্যন্ত অনুরক্তি রূপ ভক্তিলাভের জন্যও বিষয়বাসনা ত্যাগ অর্থাৎ যজ্ঞার্থেই কর্ম করতে হয় বলে ভক্তি যোগও কর্ম সাপেক্ষ। এই স্থলে মহাভারতের মোক্ষধর্ম পর্বাধ্যায়ে উক্ত ভগবান সনৎকুমারের উপদেশ প্রণিধান যোগ্য —

"নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্।"

পূর্বোক্ত প্রকারে বিষয়াসক্তি ত্যাগ হওয়ার অর্থ যদি যজ্ঞার্থে কর্ম করা হয় এবং সেই অর্থে ভগবৎ লাভের সকল পন্থা কর্মযোগ সাপেক্ষ হয়, তাহলে পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ — এগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ না করে সবগুলিকেই কর্মযোগের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি কেন? কেনই বা এগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে মোক্ষলাভের উপায় বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে?

তদুত্তরে বলা যায় যে, রুচির ভিন্নতাবশতঃ মানুষ তথা মোক্ষার্থী ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হয়। নদীসকল যেমন ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পরিশেষে সমুদ্রে মিলিত হয়[১২৬] এবং সমুদ্রে মিলনের পর তাদের আর যেমন ভিন্নতা থাকে না, তদ্রূপ মুমুক্ষুগণ স্বীয় প্রকৃতির প্রভাবে স্ব স্ব পথ অবলম্বন করে লক্ষ্য মোক্ষে উপনীত হলে তখন আর ভিন্নতা থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ না মোক্ষে অভিন্নতা প্রাপ্ত হচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত ভেদ স্বীকার্য। তাই জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতিকে কর্মযোগ শিরোনামায় অভিহিত করা হয় নি।

এইস্থলে আরও বক্তব্য এই যে, যতক্ষণ না প্রাণিসকল তার লক্ষ্য অর্থাৎ মোক্ষে পৌঁছাতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় প্রকৃতি অনুসারেই কাজ করতে হয়। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করেও কোন ফল হয় না। তাই, গীতাকার বলেছেন, জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজ

প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করে থাকেন। সমস্ত জীবই স্বীয় প্রকৃতি অনুসরণ করে। এমনকি পৃথিবীতে, স্বর্গে অথবা স্বর্গস্থ দেবগণের মধ্যেও এমন কোন বস্তু বা প্রাণী নেই যা প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি ত্রিগুণ থেকে মুক্ত, অর্থাৎ যার মধ্যে এই সকল গুণের ক্রিয়া দেখা যায় না।[১২৭]

তাৎপর্য এই যে, মানুষ মাত্রই একটি বিশেষ প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পূর্ব-পূর্ব জন্মার্জিত এবং পূর্ব-পূর্ব পুরুষ থেকে প্রাপ্ত সংস্কার ও প্রবৃত্তির দ্বারা এই প্রকৃতি গঠিত হয়। জন্মের পর শিক্ষা এবং সংসর্গও এই প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রকৃতি হল সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মিকা। এই ত্রিগুণের বৈষম্যে মানুষের প্রকৃতি ভেদ হয়ে থাকে। যা হোক, মানুষের প্রকৃতির দ্বারাই সাধারণত তার জীবনের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। এমনকি, যে ব্যক্তি বিবেকবান, গুণ-দোষজ্ঞ, শাস্ত্রানুযায়ী যিনি কর্তব্যাকর্তব্য অবগত আছেন — এরূপ ব্যক্তিও প্রকৃতির প্রভাবসমূহকে অতিক্রম করতে পারেন না। তাঁর চেষ্টা ও কর্ম স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। এই প্রভাব এত প্রবল যে, রাজদণ্ড, শাস্ত্রোক্ত নিষেধবাক্য প্রভৃতির দ্বারাও কেউ জোর করে স্বীয় প্রকৃতিকে দমিয়ে রাখতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় কোন সৃষ্টি হয় না। গুণপ্রধান ভাব হলেই সৃষ্টি ক্রিয়া হতে থাকে। তারপর এই সকল গুণের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বিশ্বসৃষ্টির পরিণতি হতে থাকে। অতএব, স্বর্গে বা পৃথিবীতে এই সৃষ্ট বিশ্বের কোথাও এমন কোন প্রাণী নেই যে এই ত্রিগুণের ক্রিয়া থেকে মুক্ত। আমরা যাদের জড়বস্তু বলি তাদের মধ্যেও এই ত্রিগুণ বর্তমান। কিন্তু জড়বস্তুতে তমোগুণের প্রাবল্যবশত অপর গুণ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। যতদিন মানুষ সংসারে আবদ্ধ থাকে ততদিন সে এই ত্রিগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিবিধ কর্মের অনুষ্ঠান করে। দেবতাগণও এই ত্রিগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত নন।[১২৮]

কাজেই, ত্রিগুণের প্রভাববশত মুমুক্ষুর নিকট পুরুষার্থরূপে ঈপ্সিত মোক্ষ কামনাই মুখ্য থাকে এবং তার উপায়ভূত ক্রিয়া ও ক্রিয়ার সাধন সকলকে অপরিহার্যরূপে কামনা করে থাকে। তজ্জন্যই সাধককে ভিন্ন ভিন্ন পথ বা উপায় অবলম্বন করতে হয়। বোধহয় এই কারণেই টুপ্‌টীকাতে কুমারিল ভট্ট বলেছেন, পুরুষার্থরূপে যা ঈপ্সিত হয় তার কামনাই মুখ্য। তার উপায় ভূত ক্রিয়াকে এবং ক্রিয়ার সাধনসকলকে নান্তরীয়করূপে অর্থাৎ অপরিহার্য উপায়রূপে কামনা করা হয়ে থাকে। সেই মুখ্যসাধ্য সম্পাদনের জন্যই সকলে প্রবৃত্ত হয, কর্মকে সিদ্ধ করার জন্য নয়।[১২৯] অতএব, মোক্ষলাভের উপায়রূপেই জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদির পৃথক পৃথক উল্লেখ করা হয়েছে, সবগুলিকে কেবল কর্মযোগের অন্তর্গত করা হয় নি। আর তা যদি করা হোত, তা হলে ন্যূনাধিক্যেরই আশঙ্কা হতো।

জ্ঞানযোগাদি স্বতন্ত্রভাবে মোক্ষ সম্পাদনে সমর্থ

আলোচ্যস্থলে লক্ষণীয় যে, মোক্ষলাভের উপায় হিসেবে জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগের পৃথক উল্লেখ থাকায় বোঝা যায় যে, এগুলি স্বতন্ত্রভাবেই মোক্ষ সম্পাদক এবং নামের ভিন্নতা হেতু এগুলির মধ্যেও ভিন্নতা বর্তমান। তা না হলে এগুলি ভিন্ন শিরোনাম যুক্ত হোত না। জ্ঞানযোগাদি যে পৃথক পৃথক ভাবে মোক্ষ সম্পাদনে সমর্থ তা গীতা মধ্যে দৃষ্ট হয়। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে জ্ঞানযোগের দ্বারাই যে মোক্ষ লাভ হয় তা ব্যক্ত করতে বলা হয়েছে, যাঁরা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করে অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন এবং সর্বত্র সমবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে সকল জীবের হিত সাধনে রত থাকেন, তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন।

আলোচ্য শ্লোকদ্বয়ে গীতাকার অতি নিপুণ ভাবে জ্ঞানযোগীর উপাস্য অব্যক্ত, অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি তৎ উপাসকগণ তাঁকে কিভাবে লাভ করেন তারও নির্দেশ দিয়েছেন। যার ক্ষয় বা ক্ষরণ নেই তাই অক্ষর। ব্রহ্মের কোনও ক্ষয় বা ক্ষরণ নেই তাই তিনি অক্ষর, এই অক্ষর ব্রহ্মের কথা শ্রুতিতেও কথিত আছে। 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ-৩/৮/৯) ইত্যাদি। এই অক্ষর ব্রহ্মকে 'ইনি এরূপ' বা 'এঁর এই নাম' — এরকম কোন সম্বন্ধের দ্বারা বিশেষিত করা যায় না বলে জাতি, গুণ, ক্রিয়ারহিত ব্রহ্ম হলেন অনির্দেশ্য। এই অনির্দেশ্য ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত বলেই অব্যক্ত। আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী, সকল বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট। তিনি অচিন্ত্য। যা দেশ কাল ইত্যাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন তা চিন্তার বিষয় হতে পারে কিন্তু তিনি ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ রহিত তাই তিনি অচিন্ত্য। এই অচিন্ত্য ব্রহ্ম আবার জগৎ প্রপঞ্চের নির্বিকার অধ্যক্ষ। তাই তিনি কূটস্থ। তিনি অচল। তার কোন চলন বা স্পন্দন নেই এবং তিনি চিরস্থায়ী সত্তা। এই কারণে তিনি অচল, ধ্রুব। এরূপ নির্গুণ ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্তে, শ্রবণ মননাদির মাধ্যমে সাধক লাভ করে থাকেন। এই রকম সাধকের সর্বত্র সমবুদ্ধি হয়ে থাকে। তাঁর নিকট ছোট, বড়, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, জ্ঞানী, অজ্ঞানী প্রভেদ থাকে না। স্বর্ণ, মৃত্তিকা, প্রস্তর তাঁর নিকট সমতুল্য। তিনি সর্বত্র এক আত্মাকে দেখতে পান। কাজেই তিনি সর্বভূতে এক আত্মাকে দেখে সর্বভূতের হিতসাধনে রত থাকেন।[১৩০]

রাজযোগের দ্বারাও যে মোক্ষলাভ হয় তা ব্যক্ত করতে গীতায় বলা হয়েছে — বাহ্যবস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সকলপ্রকার স্পর্শ দূরীভূত করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন বিষয় ভোগ না করে, চক্ষুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে ন্যস্ত রেখে ও নাসিকার ভিতর সঞ্চরণশীল প্রাণ ও অপানবায়ুকে স্থির করে, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করে যে মুনি মোক্ষ সাধন করেন এবং যাঁর চিত্ত থেকে কামনা, ভয় ও ক্রোধ দূর হয়েছে তিনি সদা মুক্ত।[১৩১]

এই শ্লোকদ্বয়ে রাজযোগের অঙ্গ যম, নিয়ম, প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলা হয়েছে। এই যোগে মনকে বাহ্যবিষয় থেকে প্রত্যাহৃত করে ধ্যেয় বিষয়ে সমাহিত করতে হয়। এই অষ্টাঙ্গ যোগ চিত্তকে সংযত করবার একটি প্রধান উপায়। এই কারণে গীতাতে এই যোগের বিষয়ে বহুবার উপদেশ করা হয়েছে।

আবার ভক্তিযোগও যে মোক্ষলাভের স্বতন্ত্র পন্থা তা নির্দেশ করতে গীতায় বলা হয়েছে — অনন্যাভক্তিই ভগবদ্দর্শনের উপায়। হে অর্জুন! একমাত্র ঈশ্বরেই যা পর্যবসিত হয়েছে তাদৃশী যে ভক্তি নিরতিশয় প্রীতি কেবলমাত্র তার সাহায্যেই এরূপ দিব্যরূপধারী আমাকে শাস্ত্র অনুসারে জানতে পারা যায়। শাস্ত্রবলে অনন্যাভক্তির প্রভাবেই আমাকে কেবল জানতে পারা যায় তা নয়, তিনি আমাকে তত্ত্বত দর্শন করতে অর্থাৎ আমার সাক্ষাৎ লাভও করতে পারেন। আর আত্ম-স্বরূপ সাক্ষাৎকার হওয়ায় তিনি আমার স্বরূপতাও প্রাপ্ত হতে পারেন।[১৩২] আর এই অনন্যাভক্তিলাভের উপায় হিসাবে গীতায় বলা হয়েছে — 'মৎকর্মকৃৎ', 'মৎপর', 'মৎ ভক্ত', 'সঙ্গ বর্জিত' ও 'নির্বৈর' হতে হবে।[১৩৩]

আবার কর্মযোগের দ্বারাও যে স্বতন্ত্রভাবে মোক্ষ লাভ হয় তা ব্যক্ত করতে গীতায় বলা হয়েছে — অনাসক্ত হয়ে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করলে পুরুষ পরমপদ (মোক্ষ) অথবা পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।[১৩৪]

চতুর্যোগের কোনটিই স্বতন্ত্রও নয় পরস্পর-বিরোধীও নয়; "গুণপ্রধান ভাব"-এর ন্যায় এই যোগগুলি স্বতন্ত্রভাবে ও একত্রিতভাবে মোক্ষলাভে সমর্থ

জ্ঞানযোগাদিকে মোক্ষলাভের স্বতন্ত্র পন্থা হিসাবে ব্যক্ত করলেও এগুলি যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয় তা অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করলে বোঝা যায়। কারণ আমাদের জীবনের বিভিন্ন কর্মকে সম্পূর্ণরূপে একটিকে আরেকটি থেকে আলাদা করা সম্ভব হয় না। প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সঙ্গে সংযুক্ত। ভারতীয় দার্শনিকগণও মনে করেন জীবন ও দর্শন সম্পূর্ণ পৃথক নয়, একটি অপরটির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

অনুরূপভাবে জ্ঞানযোগ বা রাজযোগাদির দ্বারা মোক্ষলাভ হয় এরূপ বলা হলেও দেখা যাবে যে সেই সেই স্থলেও অর্থাৎ জ্ঞান যোগাদি সাধনকালে অন্যান্য যোগের আবশ্যকতা থাকে। যেমন, জ্ঞানযোগের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয় বলে গীতা (১২/৩-৪)-র যে শ্লোকদ্বয়ের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে সেই স্থলে জ্ঞানযোগ সাধন প্রধান হলেও 'ইন্দ্রিয়কে সংযত করে', 'ব্রহ্মের উপাসনা করেন' এবং 'সর্বজীবের হিতসাধনে রত থাকেন' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের সাধনেরও নির্দেশ রয়েছে।

রাজযোগের দ্বারা মুক্তির কথা গীতার (৫/২৭-২৮) যে স্থলে বলা হয়েছে, সেই স্থলেও রাজযোগ সাধনের প্রাধান্য থাকলেও জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সাধনের নির্দেশও দৃষ্ট হয়। 'মন ও বুদ্ধিকে সংযত করে যে মুনি মোক্ষ সাধন করেন' — এই বাক্য জ্ঞানযোগেরই সাধন। কারণ জ্ঞান বা বিচার ছাড়া মন বুদ্ধিকে সংযত করা যায় না। 'ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন বিষয় ভোগ না করে' — এই বাক্য কর্মযোগেরই সাধন এবং 'যাঁর চিত্ত থেকে কামনা, ভয় ও ক্রোধ দূর হয়ে গেছে' — এইবাক্য ভক্তিযোগেরই সাধন। কারণ তাঁতে ভক্তি না হলে কামনা দূর হয় না। ঐকান্তিক ভক্তি ভগবানের ভালোবাসা আনয়ন করে, তা থেকে আকর্ষণ; ভগবানে আকর্ষণ মনকে সংসার থেকে অর্থাৎ বিষয়কামনা থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় আর তা হলে ভয়-ক্রোধ সব দূর হয়ে যায়, তখন ভগবানের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি হয় ফলে সাধকের সংসার থেকে মুক্তি হয়।

আবার ভক্তিযোগস্থলেও (গীতা-১১/৫৫) পূর্বের ন্যায় ভক্তি সাধনের প্রাধান্য থাকলেও সেইস্থলে অন্যান্য যোগের সাধনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'মৎপরমঃ' অর্থাৎ আমিই পরম প্রাপ্তব্য এরূপ নিশ্চিত বুদ্ধি — এটি জ্ঞানযোগের সাধন। 'নির্বৈরঃ' অর্থাৎ সকল জীবে বৈর ভাব শূন্য — এটি রাজযোগের সাধন। রাজযোগে বর্ণিত অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত প্রথম সাধন হল 'যম', এই যম আবার অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ ভেদে পাঁচটি।[১৩৫] তন্মধ্যে কোন প্রকারে কোন কালে কোন প্রাণীর অভিদ্রোহ না করাকে ভাষ্যকার অহিংসা বলেছেন। সত্যাদি অপর সকল যম অহিংসামূলক।[১৩৬] এরূপে অহিংসা বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলে অর্থাৎ নির্বৈর হলে পাতঞ্জল মতে, তাদৃশ যোগীর নিকট সকল প্রাণীর হিংসাবৃত্তি ত্যাগ হয়ে যায়। এমনকি অহিনকুলাদির স্বাভাবিক হিংসাও দূর হয়ে যায়।[১৩৭]

'মৎকর্মকৃৎ', 'সঙ্গবর্জিত' — হল কর্মযোগের সাধন। সঙ্গ বা আসক্তি বর্জিত না হলে 'মৎকর্মকৃৎ' অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কাজ করা যায় না।

অনুরূপভাবে, কর্মযোগ সাধনের মধ্যে কর্ম প্রধানভাবে থাকলেও অন্যান্য যোগের সাধনও সেইস্থলে থাকে। কর্মযোগ সাধনের পন্থা হিসাবে বলা হয়েছে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আসক্ত হয়ে কর্ম করলে যেহেতু বন্ধন হয় সেহেতু বিচারের দ্বারা সাধক মুক্তির জন্য অনাসক্ত হয়ে কর্ম করেন। কাজেই এইস্থলে জ্ঞান বা বিচারের প্রয়োজন হওয়ায় জ্ঞানযোগের সাধন আবশ্যক হয়ে পড়ে। অনাসক্ত হতে গেলে যম-নিয়মাদি বা শম-দমাদি আবশ্যক। ফলে রাজযোগের সাধন করতে হয়। আর তৎপরায়ণ না হলে যেহেতু অনাসক্তি আসে না, সেহেতু তৎপরায়ণ হয়ে বা ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করতে হয়, ফলে ভক্তিযোগের সাধন এসে পড়ে। এইভাবে প্রত্যেকটি যোগের সঙ্গে প্রত্যেকটি যোগ যুক্ত থাকে।

আবার ভারতীয় দার্শনিকগণ যেমন মনে করেন, দর্শন ও জীবনকে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে ব্যাখ্যা করা না গেলেও জীবনের বিভিন্ন সম্ভাব্য দৃষ্টিকোণ থেকে তর্কবিদ্যা, অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা প্রভৃতি ভেদে দর্শনকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে; অনুরূপভাবে জ্ঞানযোগাদিকে একটিকে অপরটির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক না করা গেলেও সেই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মোক্ষলাভের উপায় হিসাবে ঐগুলির পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা সম্ভব। তবে এইস্থলে মনে রাখতে হবে যে, যখন তর্কবিদ্যা, অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন ও দর্শনের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তখন সেই সেই ব্যাখ্যাতে সেই সেই দৃষ্টিকোণগুলির প্রাধান্য থাকে কিন্তু অন্যান্য দৃষ্টিকোণগুলি সেই স্থলে গৌণভাবে থাকে। অনুরূপভাবে যখন কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে ঐগুলিকে মোক্ষলাভের পন্থা হিসাবে আলোচনা করা হয় তখন সেই সেই বিষয়গুলির প্রাধান্য থাকে আর অন্যগুলি তখন গৌণ ভাবে থাকে।

অন্যদৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায়, জ্ঞান-কর্ম-এগুলি সম্পূর্ণ পৃথক নয় এবং পরস্পর বিরোধীও নয় বরং এগুলির মধ্যে সমন্বয় অর্থাৎ অবিরোধই বর্তমান। তবে নামগুলি যখন আলাদাভাবে বলা হয় তখন তার দ্বারা সেই সেই গুলির প্রাধান্যই প্রকটিত হয়। কিন্তু অপরগুলি নেই, তা বোঝানো হয় না। যখন বলা হয়, কর্মের দ্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয় তখন তার অর্থ এই হয় না যে, কর্ম আছে বা জ্ঞান আছে, অপরগুলি নেই। বরং ঐ বাক্যের দ্বারা কর্ম বা জ্ঞানাদিতে প্রাধান্যই প্রকাশ করা হয় — এই মাত্র।

এইভাবটিকে সাংখ্য বা গীতোক্ত 'গুণপ্রধান ভাবে'র সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গুণপ্রধান ভাব কথাটির অর্থ হল, সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের মধ্যে যখন একটি গুণ প্রধান হয় তখন অপর দুটি গুণ অপ্রধান ভাবে থাকে। অর্থাৎ যখন সত্ত্বগুণ প্রধান হয় তখন অপর দুটি গুণ, রজ ও তম অপ্রধানভাবে থাকে। অনুরূপভাবে, রজ ও তমের প্রাধান্যের ক্ষেত্রে একই নিযম চলে। পক্ষান্তরে, সত্ত্বগুণ প্রধান বললে অন্যগুণ নেই একথা যেমন বোঝায় না আলোচ্য স্থলেও তেমনি কর্মযোগ যখন প্রধান আলোচ্য বিষয় হয় তখন অপর তিনটি যোগ সেখানে অপ্রধান ভাবে থাকে। অপ্রধান ভাবে থাকে বলার অর্থ হল, অপর তিনটি যোগ তখন স্বমহিমায় প্রকটিত হয় না। কিন্তু সেগুলি সিদ্ধই থাকে, না থাকলে কর্মযোগও যথার্থরূপে প্রকটিত হতে পারবে না। যেমন, সত্ত্বগুণ তখনই যথার্থভাবে প্রকটিত হতে পারে যখন তার সঙ্গে রজ ও তম গুণ সিদ্ধই থাকে, নচেৎ নয়। অতএব, বলা যেতে পারে, কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগ বা রাজযোগ বা ভক্তিযোগের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় — এরূপ যখন বলা হয় তখন বুঝতে হবে যে, সেই সেই যোগ প্রধানভাবে এবং অপরাপর যোগগুলি অপ্রধানভাবে থাকে।

বিভিন্ন পথে পরমাত্মার উপাসনা বস্তুতপক্ষে যে পরস্পর বিরোধী নয় এবং কোনটিই কোনটির থেকে উৎকৃষ্টও নয়, নিকৃষ্টও নয় তা ব্যক্ত করতে গীতায় বলা হয়েছে,

হে অর্জুন! যারা যেভাবে আমার শরণাপন্ন হয় আমি তাদের সেই ভাবেই গ্রহণ করি, মনুষ্যগণ সকল প্রকারেই আমার পথ অনুসরণ করে থাকে।[১৩৮]

বিভিন্ন পথের দ্বারা যে তাঁর উপাসনা করা যায় এবং তদ্দ্বারা যে সিদ্ধিও লাভ করা যায় তা ব্যক্ত করতে গীতায় অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করে ধ্যানযোগে তাঁকে প্রাপ্তির কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি সমস্ত কর্ম পরমেশ্বরে সমর্পণ করে মৃত্যুসাগর থেকে উদ্ধারের কথা, 'অভ্যাস যোগের' দ্বারা তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনার কথা এবং তৎপ্রীত্যর্থে কর্ম করার কথা, অনন্য চিত্তে তাঁর স্মরণের কথাও বলা হয়েছে।[১৩৯]

আবার একত্রিত ভাবেও অর্থাৎ পূর্বোক্ত যোগ চতুষ্টয়ের একত্রানুষ্ঠানের দ্বারাও সেই পরমাত্মার উপাসনা সম্ভব। তাই গীতায় বলা হয়েছে — আমাতেই (পরমেশ্বরে) তোমার মন স্থাপন কর। অর্থাৎ তোমার মন যেন চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত না হয়ে আমাতেই স্থির থাকে। তোমার সদসৎ বিবেকবুদ্ধি আমাতেই নিবিষ্ট কর। অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা আমাকে একমাত্র সৎপদার্থরূপে স্থির করে আমাতেই নিবিষ্ট হও। তা হলে এই মরজগতের ঊর্ধ্বে আমাতেই বাস (স্থিতিলাভ) করবে, তাতে সন্দেহ নেই।[১৪০]

আলোচ্য শ্লোকে 'আমাতেই তোমার মন স্থাপন কর' — এটি রাজযোগের, 'তোমার সদসৎ বিবেকবুদ্ধি আমাতেই নিবিষ্ট কর' — এটি জ্ঞানযোগের, 'আমাতেই বাস অর্থাৎ স্থিতি করবে' — এটি ভক্তিযোগের দ্যোতক। আর ভগবানে স্থিতি করতে হলে যেহেতু বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করতে হয়, সেহেতু ভগবানের স্থিতি লাভের কথার দ্বারাই কর্মযোগও গৃহীত হয়েছে। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে বিষয়াসক্ত না হয়ে কর্ম করাই হল যজ্ঞার্থে কর্ম বা কর্মযোগ। কাজেই, এই চতুর্যোগের সমন্বয়েও সেই পরমাত্মার উপাসনা সম্ভব। এইস্থলে আরও স্মরণীয় যে, পূর্বোক্তরূপে চতুর্যোগের একত্রানুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য যেহেতু তাঁতে নিবিষ্ট হওয়া সেহেতু তাদের একত্রানুষ্ঠানের দ্বারাও কোন বিরোধ দেখা দিতে পারে না।

চতুর্যোগের একত্রানুষ্ঠানই আদর্শ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারও তা অভিপ্রেত

এই চতুর্যোগের একত্রানুষ্ঠানে যে বিরোধ হয় না বরং এককভাবে উক্ত যোগগুলির চর্চা অপেক্ষা একত্রিতভাবে চর্চা করাই যে আদর্শ তা একটি সহজ দৃষ্টান্তের দ্বারা বোঝা যেতে পারে। আমি হৃদয়বান, মানুষকে ভালোবাসতে পারি (এটি ভক্তিযোগের দ্যোতক) কিন্তু যদি কর্মে পারদর্শী না হই তা হলে যখন প্রয়োজন হবে তখন আমার মানুষের দুঃখ মোচনের চেষ্টা ফলবতী হবে না (কর্মযোগের দ্যোতক)। আবার মন যদি অশান্ত হয়, স্বচ্ছচিন্তা করতে না পারি তাহলে আর্তমানুষের সাহায্য ঠিকমত করতে পারব না (রাজযোগের দ্যোতক)। তাই মনকে সংযত করবার, মনের শক্তি দিয়ে সমস্ত জিনিষকে

ঠিক বিচার করে দেখবার শক্তি বাড়ানো প্রয়োজন (জ্ঞানযোগের দ্যোতক)। তাহলেই আমার মানুষের দুঃখলাঘব করবার প্রয়াস সার্থকতর হবে।[১৪১]

আমাদের সমাজে বেশিরভাগ একবগ্‌গা লোকই দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের ঝোঁক যেদিকে সেই পথটিকেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। অন্য পথাবলম্বীদের সম্পর্কে তাঁদের ভালো ধারণা থাকে না। স্বনির্বাচিত মার্গটিই তাঁদের একমাত্র অবলম্বনীয় ও ধ্রুব। কখনও কখনও তাঁরা এমন দাবীও করেন যে, অন্য মার্গগামীরা ভ্রান্ত। আর এরূপ ধারণা হলে তখন তাঁদের অন্য পথে ও মতে অবজ্ঞা, ঘৃণা প্রভৃতি উৎপন্ন হবে। যা কিনা ভগবৎ জ্ঞানলাভের বিরোধী। কাজেই পূর্বোক্ত প্রকারে চতুর্যোগের সমন্বয়ে সাধক যদি পরমাত্মার উপাসনা বা ভগবৎ উপাসনা করেন তাহলে একদিকে যেমন তিনি একবগ্‌গা ভাব থেকে নিষ্কৃতি পাবেন অপর দিকে তেমনি সমস্ত পথেরই বিশেষ গুণ তিনি সমভাবে অর্জন করতে পারবেন। আবার সকল পথের ধারণা তাঁর কাছে সুস্পষ্ট থাকায় বিভিন্ন পথ যে সত্য, এটি তাঁর কাছে যেমন সুস্পষ্ট থাকে তেমনি তিনি যে কোন পথের পথিককেও স্ব স্ব পথে উৎসাহ প্রদান করে সাধককে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সহায়তা করতে পারেন। এরূপ ব্যক্তিই আদর্শ পুরুষ হন। বোধ হয় এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, এই চারটি যোগের যা শ্রেষ্ঠভাব তা পরিপূর্ণভাবে ও সমানভাবে যার মধ্যে বিকাশলাভ করে তিনিই হবেন আদর্শ মানুষ।[১৪২]

সাধকের যাতে এই একত্বের উপর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষিত হয় সেইজন্য গীতাতেও বলা হয়েছে — আমি সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং সকল যজ্ঞের ফলদাতা। যাজ্ঞিকগণ আমার এই তত্ত্ব জানে না বলেই তারা মোক্ষ পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।[১৪৩]

এইস্থলে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় — (১) গীতার মতানুসারে সকল কর্মই যখন যজ্ঞার্থে অনুষ্ঠিত হয় তখন তা মোক্ষের কারণ হয় সত্য কিন্তু এই তত্ত্ব ভুলে গিয়ে যদি সাধক তাঁর ঈপ্সিত কর্মকেই যজ্ঞ বলে মনে করেন তাহলে তা যজ্ঞের অন্তর্গত হতে পারবে না। তাই গীতাকার বলেছেন, 'তাঁরা মোক্ষ পথ থেকে বিচ্যুত হন'। কেবল স্বীয় পথকেই একমাত্র পথ বললে তা যে মোক্ষের অনুকূল হয় না তা পূর্বেই উক্ত হয়েছে। (২) সমস্ত প্রকার যজ্ঞ যে তাঁর উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এবং সমস্ত প্রকার যজ্ঞের ভোক্তাও তিনি, ফলদাতাও তিনি — এরূপ ভাবে যিনি সমস্ত প্রকার কর্মই ভগবৎ কর্মরূপে দেখেন তখন তাঁর মধ্যে ন্যূনাধিক্যের ভাব একেবারেই তিরোহিত হয়ে যায়। তিনি তখন সকল মতের, সকল পথের মধ্যে তাঁকেই দেখতে পান। মত ও পথ তখন তাঁর নিকট গৌণ হয়ে যায়। সর্বত্রই তখন তাঁর ঈশ্বরবোধ অনুভূত হতে থাকে। এই কারণেই গীতায় বলা হয়েছে — বহু জন্মের পর জ্ঞানী অর্থাৎ সর্বত্র বাসুদেবদর্শী আমাকে প্রাপ্ত হন। যা কিছু আছে সবই সর্বব্যাপী বাসুদেব — এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট আত্মা অতি দুর্লভ।[১৪৪]

এই প্রকার যোগী মৌমাছির সঙ্গে তুলনীয়। মৌমাছি যেমন মধুর জন্যই ফুলে বসে অন্য কিছুর জন্য নয়, তদ্রূপ যিনি অন্য বিষয়ে চিত্ত অবহিত না করে সারাজীবন সর্বদা তাঁকেই স্মরণ করেন, তাঁর (পরমেশ্বর) স্মরণের জন্যই মৌমাছির বিভিন্ন ফুলে গমনের ন্যায় বিভিন্ন পথে গমন করেন, তাঁর নিকটই একমাত্র সমস্ত যজ্ঞের মূল যে আত্মা তা সুলভ হয়।[১৪৫] তাই গীতার নির্দেশ হল — 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন।'[১৪৬] আর এই প্রকার যোগী গীতাকারের মতে হলেন — 'যোগীনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা', জ্ঞানেশ্বরী এর ব্যাখ্যায় বলেছেন — এরূপ যোগী দেবতারও দেবতা জানবে. তিনি আমার সুখসর্বস্ব, তিনিই আমার চৈতন্য (জীবন)।[১৪৭]

গীতাকার অন্যত্র বলেছেন, যিনি এজগতের সকল পদার্থের মধ্যে আমাকে দেখতে পান এবং সমস্ত জীবকে আমার মধ্যে দেখতে পান তিনি আমাকে কখনও হারান না, আমিও কখনও তাঁকে হারাই না।[১৪৮] গীতাকার আরও বলেছেন, যিনি একত্বে প্রতিষ্ঠিত থেকে, সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে ভজনা করেন তিনি যেখানেই থাকুন, যাই করুন তিনি আমার মধ্যে অবস্থান করেন।[১৪৯]

অতএব পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এককভাবে কিংবা একত্রিত ভাবে, যেভাবেই হোক না কেন সর্বতোভাবে তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকাটাই অভীষ্ট এবং সেটাই সাধকের নিশ্চিত শ্রেয়। কারণ সব পথেরই শেষ সীমা হলেন তিনি। নিঃস্বার্থকর্মে আত্মনিয়োগ করে কর্মী সেই সত্যই উপলব্ধি করেন, যে সত্যের আস্বাদন করেন প্রেমী ভগবদ্‌প্রেমের পথে। বিচারশীল সাধক জ্ঞান বিচারের পথে সেই সত্যেই উপনীত হন। যোগী মনঃসংযম প্রক্রিয়া অবলম্বন করে হৃদয়কন্দরে সেই সত্য স্বরূপকেই আবিষ্কার করেন।

আর এই সত্যের দিকে দৃষ্টি রেখে জীবনযুদ্ধে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ ও ভক্তিযোগের একত্রানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলে তা কখনও যোদ্ধার বাধাস্বরূপ হয় না কিংবা তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে না। কারণ পথের ভিন্নতা ক্ষণিকের জন্যও তাঁকে আত্মচিন্তা থেকে সরিয়ে নিতে পারে না। এরূপ ব্যক্তিই হলেন প্রকৃত আদর্শ। তাই গীতায় বলা হয়েছে — 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মাসুদুর্লভঃ।'[১৫০] ভগবান মনুও বলেছেন, যিনি সর্বভূতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন (গীতা যাকে 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি' বলেছেন) তিনি সর্বসমতা প্রাপ্ত হয়ে পরমপদ ব্রহ্মকে লাভ করেন।[১৫১] বোধকরি, সকল সময়, সকল স্থানে সূর্যের ন্যায় সদা প্রকাশমান এই ব্রহ্মবস্তুর বোধ সভ্যতার ঊষাকালে আপন ধ্যানবলে উপনিষদের ঋষি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন --

'হৃদাকাশে চিদাদিত্য সদা ভাসতি ভাসতি।
নোস্তমিতি ন চোদেতি।।'

শ্রুতির এই সিদ্ধান্তই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা সংসারযুদ্ধে ভীত কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুনের নিশ্চিত শ্রেয়োলাভের জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে সকলের উপযোগী করে এমনভাবে পরিবেশন করেছেন যে, যুগ যুগ ধরে সকলেই (সম্প্রদায় নির্বিশেষে) গীতারত্নাকর মন্থন করে চলেছেন জীবনের সর্বাবস্থায় আদিত্যের ন্যায় ভাসমান সেই ব্রহ্মবস্তুকে উপলব্ধি করার জন্য। উপলব্ধমান সেই সত্যকে জগতের হিতের জন্য জীবনের সর্বাবস্থায় প্রয়োগ করতে পারলেই প্রকৃতপক্ষে তা জগতের উন্নতির আকরস্বরূপ হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন হল 'যোগ' বুদ্ধির সঙ্গে শক্তির সমন্বয়। তাই গীতার সর্বশেষ শ্লোকে বলা হয়েছে —

> 'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
> তত্র শ্রীর্ব্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম।।'

টীকা ও তথ্যপঞ্জী

১। ভাগবতে বলা হয়েছে — বাক্যের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, অর্থের দ্বারা, প্রয়োজনে প্রাণত্যাগের দ্বারা সদা শ্রেয় আচরণ করাই হল দেহীর দেহ ধারণের সার্থকতা :

> এতাবৎ জন্ম সাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
> প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়ঃ আচরণং সদা।। (ভাগবৎ—১০/২২/৩৫)

২। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা — ১/২২

৩। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা — ১/২৮-৩০

৪। তদেব — ১/৩১

৫। তদেব — ১/৩২

৬। গীতাসারসংগ্রহঃ — গ্রন্থের 'গীতা ও গীতা-প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে' স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্যের সংকলন দ্রষ্টব্য।

৭। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা — ১/৩৫, বশিষ্ঠ সংহিতায় (৩/১৯) আততায়ী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে —

> অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
> ক্ষেত্র-দারা-হরশ্চৈবষড়েতে আততায়িনঃ।।

৮। তদেব — ১/৪০। নারদ সংহিতায় (১২/১০২) বলা হয়েছে —

> অনুলোম্যেন বর্ণানাং যৎ জন্ম সঃ বিধিঃ স্মৃতঃ।
> প্রতিলোম্যেন যৎ জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ।।

৯। তদেব — ১/৪১

১০। তদেব — ১/৩৮-৩৯
১১। তদেব — ১/৪৫-৪৬
১২। তদেব — ১/৪৭
১৩। তদেব — ১/৩৭
১৪। কঠোপনিষদ — ১/২/১২
১৫। তদেব — ১/২/২
১৬। তদেব — ১/২/২. শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।
১৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ২/৩
১৮। যিনি সর্বকালে বিদ্যমান। নিত্য কল্যাণস্বরূপ এবং অচঞ্চল — মহানারায়ণ উপনিষদ।
১৯। সমগ্র (পূর্ণ) ঐশ্বর্য (সর্বপদার্থে প্রভুত্ব) সমগ্রধর্ম, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী এবং সমগ্র মোক্ষ অর্থাৎ মোক্ষের কারণ — এই ছয়টির নাম ভগ। এই ছয়টি যাতে সকল সময়ে অপ্রতিহতভাবে বিদ্যমান থাকে তিনিই ভগবান। অথবা যিনি প্রাণিগণের উৎপত্তি, বিনাশ, ভবিষ্যৎ, সম্পৎ ও বিপৎ, বিদ্যা ও অবিদ্যা বিষয় অবগত আছেন তাকে ভগবান বলা হয়। (মধুসূদন সরস্বতীকৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ২/২ টীকা দ্রষ্টব্য)
২০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ২/২
২১। তদেব — ২/৭
২২। তদেব — ২/৭
২৩। তদেব — ৫/১৯
২৪। বাচস্পত্যভিধান — ষষ্ঠভাগঃ দ্রষ্টব্য
২৫। বেদানুগ সম্প্রদায়ের মতে বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষবিশেষ কর্তৃক রচিত নয় বলেই তা পুরুষোচিত ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সাবর্জিত।
২৬। স্মৃতি শাস্ত্র পৌরুষেয় এবং জ্ঞাতার্থ জ্ঞাপক। কাজেই ভ্রান্তি প্রভৃতির আশঙ্কা হতে পারে। কিন্তু এই আশঙ্কার উত্তরে মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে — 'স্মৃতিশীলে চ তৎ বিদাম্' অর্থাৎ বেদবিদ্‌গণের স্মৃতি এবং শীল ধর্মের জ্ঞাপক প্রমাণ। মহর্ষি জৈমিনিও স্মৃতির প্রামাণ্য স্থাপনার্থে বলেছেন, 'কর্তৃসামান্যাহেতুঃ'। অর্থাৎ বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান কর্তা এবং স্মৃতিকর্তা যেহেতু অভিন্ন সেহেতু অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি (শিষ্ট পরিগৃহীত মন্বাদি) শ্রুতির 'প্রতি' অর্থাৎ 'প্রতিনিধি' অর্থাৎ 'অনুমাপক' হবে। (মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য ভূতনাথ সপ্ততীর্থ, কলিকাতা, ১৩৬১ — প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮২-৮৫)
২৭। বৃহদারণ্যক উপনিষদ — ১/৪/৭-৮

২৮। তদেব — ১/৪/৮
২৯। তদেব — ১/৪/৮
৩০। পঞ্চদশী, ভাবতী তীর্থ বিদ্যারণ্য, শ্রী দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত, কাশী, ১৩৪৮ — ১২/৬৩-৬৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা ও পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
৩১। তদেব — ১/৮
৩২। তদেব — ১/৮
৩৩। কেনোপনিষদ — ২/৫
৩৪। বৃহদারণ্যক উপনিষদ — ২/৪/৫
৩৫। বিবেকানন্দের বেদান্তচিন্তা — পৃঃ-২২ দ্রষ্টব্য
৩৬। মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্ — বৃহদারণ্যক উপনিষদ — ৪/৪/১৯
৩৭। দৃশ্যতে ত্বগ্রয়াবুদ্ধ্যা — কঠোপনিষদ — ১/৩/১২
৩৮। বিবেকানন্দের বেদান্তচিন্তা, শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৯৭৩ — পৃঃ-৪২ দ্রষ্টব্য
৩৯। এইস্থলে স্মরণীয় যে, আচার্য রামানুজও গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়কে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে, প্রথম ছয়টিতে পরম প্রাপ্য পরব্রহ্ম ভগবান বাসুদেবকে প্রাপ্তির উপায়ভূত ভক্তিরূপ ভগবদুপাসনার অঙ্গভূত প্রাপক জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপের সাক্ষাৎকার জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ নামক নিষ্ঠাদ্বয় দ্বারা সাধ্য বলা হয়েছে। মাঝের ছয়টিতে পরম প্রাপ্যভূত ভগবানের যথার্থ স্বরূপ এবং তার মাহাত্ম্য জ্ঞানপূর্বক ভক্তিযোগ নিষ্ঠা প্রতিপাদিত হয়েছে। অতিশয় ঐশ্বর্য দর্শন অভিলাষী তথা আত্মকৈবল্যমাত্র প্রাপ্তি অভিলাষীর জন্য ভক্তিযোগই ঐ অভীষ্টের সাধন বলা হয়েছে। শেষের ছয়টিতে প্রকৃতি, পুরুষ তাদের সংসর্গরূপ প্রপঞ্চ, ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ এবং তাদের বিভিন্ন প্রকার উপাদনসমূহ ও প্রথম দুটিতে (ষট্‌কে) যাদের প্রতিপাদন হয়েছে এই সকলের সংশোধন হয়েছে। (রামানুজভাষ্য ১৩শ অধ্যায়ের প্রারম্ভ দ্রষ্টব্য) আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা মধুসূদন সরস্বতীকৃত বিভাগকেই আলোচনার সুবিধার জন্য গ্রহণ করেছি।
৪০। মধুসূদন সরস্বতীকৃত গীতার গূঢ়ার্থ দীপিকার মঙ্গলাচরণ অংশ দ্রষ্টব্য।
৪১। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা --- ৪/১৬
৪২। বিবেকজীবন — সম্পাদকীয় — কর্মরহস্য, এপ্রিল সংখ্যা, ১৯৯৬
৪৩। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা — ৩/৮
৪৪। তদেব — ৩/৪
৪৫। তদেব — ১৮/১১
৪৬। নিরুক্ত — ৩/১/২

৪৭। ছান্দোগ্য উপনিষদ — ৮/১/৬, গীতা — ৯/২১ দ্রষ্টব্য

৪৮। 'ওম্' — এই অক্ষর প্রথমে উচ্চারণপূর্বক উদ্‌গান অর্থাৎ উচ্চৈস্বরে গান করে; এইজন্য ওম্-কার হল উদ্‌গীথ।

৪৯। ছান্দোগ্য উপনিষদ — ১/১/১

৫০। তদেব — ১/১/১০

৫১। তদেব — শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য

৫২। কঠোপনিষদ — ১/২/১৬

৫৩। ষট্‌চক্রনিরূপণ, শ্রী মাণিকলাল ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩৫৫ — দ্রষ্টব্য

৫৪। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা — ১৮/৪৬

৫৫। তদেব — ৩/৯

৫৬। গীতা-ধ্যান, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, নদীয়া ১৯৫৩ প্রথম খণ্ড

৫৭। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা — ৮/১

৫৮। তদেব — ৮/৩

৫৯। বেদান্ত প্রবেশ — পৃঃ ৭৩ দ্রষ্টব্য

৬০। জনমানসের দৃষ্টিতে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, শ্রী হরিচরণ ঘোষ, কলিকাতা, ১৯৭২ — পৃঃ ১৫৩ দ্রষ্টব্য

৬১। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা — ৪/১৬

৬২। তদেব — ৩/৯

৬৩। A tri-lingual Dictionary — P. 360

৬৪। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা — ৮/১৪

৬৫। বেদান্ত দর্শনম্ — ৪/৪/১৭, স্বামী বিশ্বরূপানন্দ, কলিকাতা, ১৩৫৬

৬৬। তদেব — চতুর্থ খণ্ড পৃঃ ২৪৭

৬৭। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা — দ্বিতীয় সংস্করণ, অতুলচন্দ্র সেন, পৃঃ - ২৯৯ দ্রষ্টব্য

৬৮। যোগ প্রসঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্র ও গীতার বক্তব্য বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে প্রবন্ধকার কর্তৃক লিখিত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের যান্মাসিক পত্রিকার (JJP) সপ্তম খণ্ডের ২য় সংখ্যা (vol. VII, no. 2) ১৯৯৫তে প্রকাশিত 'যোগ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা' দ্রষ্টব্য।

৬৯। যোগসূত্র - ২/১৭, এই প্রসঙ্গে ভোজবৃত্তি ও চন্দ্রিকা টীকা দ্রষ্টব্য।

৭০। বিষ্ণু পুরাণ — ৬/৩/৩১ দ্রষ্টব্য

৭১। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা — ৬/১৪

৭২। তদেব — ৬/১৫

৭৩। তদেব — ৩/১৯

৭৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৫/৮-৯

৭৫। বৈষ্ণবশাস্ত্রে কথিত আছে — আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।।

৭৬। আত্মপূজা — ১৪

৭৭। তদেব — ১৩

৭৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ৪/২৪

৭৯। তদেব — ৬/৩৯

৮০। ঈশোপনিষদ — ৬

৮১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ২/৪৮

৮২। তদেব — অতুলচন্দ্র সেন, পৃঃ ১১২ দ্রষ্টব্য

৮৩। তদেব — ৯/২৭

৮৪। তদেব — ৬/২২

৮৫। তদেব — ১৮/৪৮

৮৬। তদেব — ২/৭২

৮৭। তদেব — ১৭/২৭-২৮

৮৮। যোগ চতুষ্টয় পৃঃ ৭৫-৭৬ দ্রষ্টব্য

৮৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ১৮/৬

৯০। যোগচতুষ্টয় স্বামী সুন্দরানন্দ, কলিকাতা, ১৩৯২ পৃঃ ৭৬

৯১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ১৮/৫

৯২। তদেব — ৪/১৫

৯৩। তদেব — ১৮/৫৯

৯৪। তদেব — ১৮/৪৮

৯৫। তদেব — ১৮/৪৬

৯৬। বৃহদারণ্যক উপনিষদ — ১/৪/৭

৯৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ১৮/২

৯৮। তদেব — ৫/১১

৯৯। তদেব — ৫/৭

১০০। তদেব — ৫/১০

১০১। তদেব — ৫/৮/৯

১০২। তদেব — ১৮/৬৬

১০৩। এই সকল বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রবন্ধকার কর্তৃক লিখিত এবং পি. এইচ. ডি. উপাধি নিমিত্ত প্রদত্ত প্রবন্ধ 'কর্ম-কর্মযোগ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'তে করা হয়েছে। প্রবন্ধটি অপ্রকাশিত।

১০৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ৫/৫

১০৫। তদেব — ৫/৪, শ্রী অতুল চন্দ্র সেন

১০৬। তদেব — ৫/৪

১০৭। তদেব — (শ্রীধর স্বামীকৃত সুবোধনী টীকাসহ), স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত পৃঃ ২১৪-২১৫

১০৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ৫/৪

১০৯। গীতার বাণী, তৃতীয় খণ্ড, সাধনাপুরী কর্তৃক সঙ্কলিত পৃঃ ১৩৯-১৪০

১১০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ৩/১৯

১১১। শ্রীমদ্ভাগবত — ৪/৩০/১৯

১১২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ৮/৭

১১৩। ব্যাধগীতা — ৭/৮২

১১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ৩/৬

১১৫। ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদ — ২

১১৬। কুমারসম্ভব — ১/৫৯

১১৭। 'মোক্ষেচ্ছায়াস্তু আত্মবিষয়তয়া অকামত্বাৎ ...' (বেদান্তসারঃ বিদ্বন্মনোরঞ্জনী টীকা দ্রষ্টব্য)

১১৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ৪/২৪

১১৯। ভারতীয় দর্শন কোষ, তৃতীয় খণ্ড লঘু চন্দ্রিকা থেকে গৃহীত।

১২০। গীতা-ধ্যান, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৮

১২১। যোগ দর্শনে প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি -- চিত্তের এই পাঁচ প্রকাব পরিণাম বিশেষকে বৃত্তি বলা হয়েছে। যদিও চিত্তে সুখ দুঃখাদি আরও নানা প্রকার বৃত্তি বর্তমান। তবে পাতঞ্জলে এই পাঁচটি ভাবাত্মক বা জ্ঞানাত্মক বৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হলে অপরাপর বৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হয়ে যায় বলে পাতঞ্জলে এই পাঁচটি বৃত্তিই উল্লেখ করা হয়েছে।

১২২। পাতঞ্জল দর্শন — ১/৩, শ্রী পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু, কলিকাতা, ১৯৮৩

১২৩। পাতঞ্জল দর্শন, পৃঃ ৩৪-৩৫

১২৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ৪/২৮

১২৫। ভক্তি ও ভক্ত, শ্রী কৃষ্ণানন্দস্বামী, কাশী, ১৮১৩ শকাব্দ পৃঃ ৩২

১২৬। শিবমহিম্নস্তবঃ

১২৭। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা — ১৮/৪০
১২৮। তদেব — অতুলচন্দ্র সেন, পৃঃ ২১০-২১১, ৭২৮-৭২৯ দ্রষ্টব্য
১২৯। টুপ্‌টীকা — ৬/১/২
১৩০। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা — অতুলচন্দ্র সেন, পৃঃ ৪১৫-৪১৬
১৩১। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা — ৫/২৭-২৮
১৩২। তদেব — (মধুসূদন সরস্বতীর টীকা সম্বলিত) ১১/৫৪, পৃঃ ৮৪৮
১৩৩। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা — ১১/৫৫
১৩৪। তদেব — ৩/১৯
১৩৫। পাতঞ্জল দর্শন — ২/৩০
১৩৬। তদেব — পৃঃ ১৬৪
১৩৭। তদেব — ২/৩৫
১৩৮। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা — ৪/১১
১৩৯। তদেব — ১২/৬-১০, ১/৫৪ এবং ১৩/২৪-২৫ দ্রষ্টব্য
১৪০। তদেব, অতুলচন্দ্র সেন, ১২/৮ পৃঃ ৪১৮
১৪১। স্বামী বিবেকানন্দ ও আমাদের সম্ভাবনা, শ্রী নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৮৪ পৃঃ ২০২
১৪২। তদেব, পৃঃ ২০০
১৪৩। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা — ৯/২৪
১৪৪। তদেব — ৭/১৯
১৪৫। তদেব — ৮/১৪
১৪৬। তদেব — ৮/২৭
১৪৭। জ্ঞানেশ্বরী — ৬/৪৭
১৪৮। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা — ৬/৩০
১৪৯। তদেব — ৬/৩১
১৫০। তদেব — ৭/১৯
১৫১। মনুসংহিতা — ১২/১২৫

অদ্বৈতবেদান্তে নীতি ও ধর্ম

পিয়ালী পালিত

ভারতীয় দর্শন-সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্বৈতবেদান্ত সম্প্রদায় একটি বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে মূল ও একমাত্র যথার্থ তত্ত্বরূপে স্বীকার করা এবং ছয়টি প্রমাণের মধ্যে শব্দপ্রমাণ বা শ্রুতিকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে বিবেচনা করা এই দর্শনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব বেদের উপনিষদভাগের উপজীব্য হওয়ায় অদ্বৈতবেদান্তীদের 'ঔপনিষদ' নামেও ভূষিত করা হয়। একটি প্রচলিত ধারণা হল এই যে, সমগ্র মীমাংসাশাস্ত্র ষোড়শলক্ষণী তথা ষোলটি অধ্যায়ে বিভক্ত; তার মধ্যে প্রথম বারোটি দ্বাদশলক্ষণী পূর্বমীমাংসা রূপে পরিচিত; দ্বাদশলক্ষণী পূর্বমীমাংসা বা জৈমিনীয়সূত্রের সঙ্গে অত্যন্ত গূঢ় সম্বন্ধযুক্ত পরবর্তী চারটি অধ্যায় বাদরায়ণ ব্যাস কর্তৃক রচিত হয়, যা 'ব্রহ্মসূত্র' নামে খ্যাত। ব্রহ্মসূত্র অবলম্বনে পরবর্তীকালে আচার্য শঙ্কর শারীরকভাষ্য রচনা করেন, যার ফলে অদ্বৈতবেদান্তদর্শন সবিশেষ বিস্তার লাভ করে। অদ্বৈতবেদান্তের এই পরম্পরা লক্ষ্য করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এই দর্শনসম্প্রদায়

(১) শব্দ বা শ্রুতিকে প্রধান বা শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে স্বীকার করে;
(২) শ্রৌতসমাজে প্রচলিত ধর্ম ও নীতির অবিরোধী;
(৩) শ্রৌতসমাজে প্রচলিত ধর্ম ও নীতি অনুসরণকারী;
(৪) কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জ্ঞানকাণ্ডের বিশেষ সম্বন্ধ স্বীকার করে;
(৫) শ্রুতি ও স্মৃতি অনুযায়ী জ্ঞানমার্গেও অবশ্য পালনীয় ধর্ম বা নীতির পরিপোষক।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির বিচারপরিকল্পে আমরা প্রথমে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার উপোদ্‌ঘাত অংশে বিবৃত আচার্য শঙ্করের উক্তি উল্লেখ করব। সেখানে বলা হয়েছে 'সেই জ্ঞানৈশ্বর্যবল-বীর্যতেজঃসম্পন্ন ভগবান এই জগৎসৃষ্টির অনন্তর তার স্থিতির উদ্দেশ্যে মরীচি প্রভৃতি ঋষির সৃষ্টি করলেন এবং বেদোক্ত প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মকে সেই উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য ধারণ করলেন। পরে অন্যান্য সনক-সনন্দনাদিকে উৎপন্ন করলেন এবং জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণক নিবৃত্তিধর্মকে ধারণ করলেন। বেদোক্ত ধর্ম দ্বিবিধ — প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ। তার মধ্যে একটি জগতের স্থিতির কারণ, প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের প্রতি সাক্ষাৎ হেতুভূত ধর্মস্বরূপ; সেই ধর্ম শ্রেয় অভিলাষী বর্ণাশ্রমসেবী ব্রাহ্মণাদির দ্বারা অনুষ্ঠিত

হত। দীর্ঘকাল এরূপ অনুষ্ঠানের ফলে (কালপ্রভাবে) অনুষ্ঠাতৃগণের চিত্তে কামনার উদ্ভববশত বিবেক ও বিজ্ঞানের হানিকর অধর্মের দ্বারা ধর্ম অভিভূত হল এবং অধর্ম ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠল; সেইসময়ে জগতের স্থিতি পরিপালন করার ইচ্ছায় সেই আদিকর্তা নারায়ণরূপী বিষ্ণু ভৌম ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে দেবকীর গর্ভে বসুদেবের অংশে কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণত্বের রক্ষার দ্বারাই বৈদিকধর্ম রক্ষিত হয়, কারণ বর্ণাশ্রম ভেদ সেই ব্রাহ্মণরক্ষিত ধর্মের অধীন।'[১]

উপরোক্ত বিবৃতি অনুযায়ী বেদোক্ত ধর্ম দুইপ্রকার — প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ। তার মধ্যে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম জগতের স্থিতির প্রতি কারণ এবং প্রাণিগণের অভ্যুদয়রূপ নিঃশ্রেয়সের সাক্ষাৎ হেতু। জগৎকে যা ধারণ করে থাকে, তাই ধর্ম ('ধর্ম অস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা' — তৈ. আ. ১০/৬৩/৭)। সেই ধর্মের অন্যতম বিশিষ্ট রূপ হল প্রবৃত্তিলক্ষণতা। এই প্রবৃত্তি কার এবং কি বিষয়ে প্রবৃত্তি? প্রবৃত্তি ভোক্তা জীবের এবং ভোগ্য বিষয়ে তথা ভোগে প্রবৃত্তি। এই ভোগ্য-ভোক্তৃ-সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে যে কর্মপ্রবৃত্তি জীবে উৎপন্ন হয়, তারও দুটি প্রবিভাগ আছে; একটি জীবের স্বারস্য বা স্বভাববশত উৎপন্ন — যাকে বলা হয় স্বারসিক, রাগতঃপ্রাপ্ত বা 'জীবধর্ম'; যথা শরীররক্ষণার্থে ক্ষুধা-পিপাসার উদয় হলে ভোজনপানে প্রবৃত্তি, অথবা, বংশরক্ষার্থে সন্তানোৎপাদনে প্রবৃত্তি ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি হল, শ্রুতি বা বেদে নির্দিষ্ট ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় বিহিতকর্মে প্রবৃত্তি এবং নিষিদ্ধ কর্মে নিবৃত্তি — যাকে বলা হয় শ্রৌতধর্ম। পাপ বা অনিষ্ট পরিহারের উদ্দেশ্যে সাধারণত জীবধর্ম শ্রৌতধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যথা — মাসংভক্ষণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 'পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা সীমিত হয়েছে; অথবা, জীবের স্বাভাবিক কামপ্রবৃত্তি বিবাহনুষ্ঠান দ্বারা নির্দিষ্ট জায়া ভিন্ন অন্যত্র পরিচরিত হলে অনিষ্টাশঙ্কা করা হয়েছে, ইত্যাদি। জৈমিনীয়-মীমাংসাসূত্রে ধর্মের যে লক্ষণ প্রদত্ত হয়েছে, তারও তাৎপর্য একই। সূত্রে বলা হয়েছে — 'চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ'। এই স্থলেও 'চোদনা'-শব্দের অর্থ 'পুরুষপ্রবর্তক বাক্যবিশেষ'। চতুর্বর্ণভুক্ত পুরুষ বেদবাক্য অনুসরণ করে স্বীয় কর্তব্য পালন করবে; বিশেষত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিবর্ণিক, ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ (নিঃশ্রেয়স অথবা অভ্যুদয়), এই চারটি পুরুষার্থ লাভের উদ্দেশ্যে বেদবিহিত কর্ম করবে। শূদ্রবর্ণ ত্রৈবর্ণিকের সেবা দ্বারাই উক্ত ফল তথা ত্রিবর্গ লাভ করবে। ব্রাহ্মণ যেহেতু অধ্যয়ন-অধ্যাপনা দ্বারা বেদকে ধারণ করে থাকেন, সেইহেতু এই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, যা বেদবিহিত এবং যা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, সেটি ব্রাহ্মণের দ্বারাই রক্ষিত হবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই ব্রাহ্মণকেন্দ্রিকতায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, ব্রাহ্মণের যেমন ধর্মকে রক্ষা করা কর্তব্য, তেমনই ব্রাহ্মণ দুষ্ট তথা দোষযুক্ত হওয়ার ফলে ধর্মে গ্লানি উপস্থিত হবে — এরূপ আশঙ্কা অযৌক্তিক নয়; সেই কারণে ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণকুলের

আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত ও নির্দিষ্ট হয়েছে। ধর্ম গ্লানিযুক্ত হলে সমগ্র সমাজ কলুষিত ও ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে, এ তথ্য ইতিহাস-পুরাণাদিতে অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগ্রন্থসমূহে বিস্তৃতভাবে দেখান হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে ধর্মরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণকূলের সামাজিক দায়বদ্ধতাও একটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অপর যে বৈদিক ধর্ম, যেটিকে বলা হয়েছে নিবৃত্তিলক্ষণ, সেটি কি প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের বিরোধী অথবা, সমান্তরালভাবে পালনীয়? যদি বলা হয় বিরোধী, তা হলে, (১) বেদবাক্য স্ববিরোধদোষে দুষ্ট হবে, এবং (২) এই দুইপ্রকার ধর্ম পরস্পরের ব্যাঘাতক হবে, ফলতঃ বেদের প্রামাণ্য ক্ষুণ্ণ হবে। অদ্বৈতবেদান্তে ধর্মনীতি চর্চার প্রসঙ্গে এই দুটি প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছে; কারণ, তাঁদের মতে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান মোক্ষ বা পরম নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির কারণ; বিহিত কর্ম কেবলমাত্র অভীষ্ট পশু-সম্পদ-প্রজা-স্বর্গাদি ফল এবং অভ্যুদয় পর্যন্ত ফল উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু বন্ধনিবৃত্তিরূপ মোক্ষফল দান করতে পারে না। সুতরাং, বন্ধনিবৃত্তি বা আত্মজ্ঞান লাভ যাঁর উদ্দেশ্য, তাঁর কাছে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম নিরর্থক বা নিষ্প্রয়োজনীয়। বিশেষত, অদ্বৈতচিন্তায় যখন ভোগ্যভোক্তৃ-ভাবের উচ্ছেদই কাম্য, তখন সেই ভোগ্যভোক্তৃ-ভাবকে অবলম্বন করে বিস্তৃত কর্মসমূহের কোনো উপযোগিতাই অদ্বৈতপন্থীর কাছে থাকতে পারেনা। অতএব, প্রবৃত্তিমূলক বাক্যসমূহ তাঁর কাছে অথবা মোক্ষফলপ্রাপ্তির প্রতি অপ্রমাণ; শ্রুতির একাংশ, অপ্রমাণ হলে অন্যান্য বাক্যগুলিতেও অপ্রামাণ্যের আশঙ্কা উপস্থিত হবে। অর্থাৎ, উপনিষদ-বাক্য, যেখানে অদ্বৈত-ব্রহ্মতত্ত্ব স্থাপিত, সেগুলিও অপ্রমাণ হয়ে পড়বে। এছাড়া বর্ণাশ্রমীর চতুর্বর্গ বা পুরুষার্থলাভের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বাক্য এবং তন্নিষ্ঠ ধর্ম অপ্রমাণ হলে বৈদিকসমাজ সমূলে উচ্ছিন্ন হবে; ফলতঃ, চতুর্থ আশ্রম বা সন্ন্যাসকে যেখানে অদ্বৈতভাবনার ভূমিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে সন্ন্যাসাশ্রমেরও উচ্ছেদ ঘটায় অদ্বৈততত্ত্ব পরিপোষণ সম্ভব হবে না। পুনরায়, শ্রৌতবাক্য অপ্রমাণ হয়ে পড়লে ঔপনিষদ মহাবাক্য—যা অভেদজ্ঞানের তথা মোক্ষের প্রযোজক, সেগুলিকেও অপ্রমাণ বলতে হবে। এইভাবে বিভিন্ন বিরোধ ও ব্যাঘাতবশত অপ্রামাণ্যের আশঙ্কা দূরীকরণের জন্য অদ্বৈতবেদান্তী সদাসতর্ক। কঠোপনিষদ্ভাষ্যোপক্রমণিকায় আত্মতত্ত্ব-লাভের অধিকারিনির্ণয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'যে মুমুক্ষবো দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্ত উপনিষচ্ছব্দবাচ্যাং বক্ষ্যমাণলক্ষণাং বিদ্যামুপসদ্যোপগম্য তন্নিষ্ঠতয়া নিশ্চয়েন শীলয়ন্তি...' অর্থাৎ দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক বিষয়ে যাঁর বিরাগবশতঃ মুক্তিলাভের ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে, তিনিই আত্মতত্ত্বলাভের অধিকারী। কোনো বিষয়ে বা বিষয়ভোগে কার বিরাগ উৎপন্ন হতে পারে? কেবলমাত্র বিষয়ভোগ যার সন্তোষ উৎপাদন করতে পারছে না, তারই সেইসমস্ত দৃষ্ট তথা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়

এবং বেদবিহিত অদৃষ্টবিষয়ে বিরাগ উৎপন্ন হবে। 'প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ততে' (কুমারিল ভট্ট) — নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুভূত না হলে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিও কখনো কর্মে প্রবৃত্ত হয়না; সুতরাং যে কর্ম চিরায়ত সন্তোষ বা আনন্দ উৎপন্ন করতে পারবে না, সেই কর্মানুষ্ঠানে স্বভাবত জীবের প্রবৃত্তিও উৎপন্ন হবে না। আপাতমনোরম কর্মে আপাতপ্রবৃত্তি লক্ষিত হলেও তার অসারতা, তথা নিত্যসুখোৎপত্তিতে ব্যর্থতা অনুভূত হলে তবেই জীব কর্মে বিরাগযুক্ত হয়ে উঠবে। বস্তুত বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীর কণ্ঠে যে প্রশ্ন শ্রুত হয়— 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্, তেনাহং কিং কুর্যাম?'—যার দ্বারা নিত্য, অমৃত সুখলাভ হবে না, তা নিয়ে আমি কি করব? — এই প্রশ্ন চিরন্তন মানবহৃদয়ের, যে চরম সুখলাভের আশায় নিজেকে শতসহস্র বিধিনিষেধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, আবার একসময় 'ভূমৈব সুখম্' এই উপলব্ধির দ্বারা নিবৃত্তির পথে, ত্যাগের পথে পরিচালিত হয়। জীবের এই দ্বিধাবিভক্ত কাতরতা লক্ষ্য করেই সর্বানুগ্রাহিনী শ্রুতি কর্মকে শ্রেয় ও প্রেয় — এই দুটি প্রকারে প্রদর্শিত করেছেন। শ্রেয় কর্ম আপাতমনোরম না হলেও তার দ্বারাই জীবের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হয় এবং প্রেয় কর্ম অধিকমাত্রায় মনোরম হলেও পরিণামে জীবের বন্ধন বা দুঃখের প্রতি কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কর্মের প্রকৃতিকে এইভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার ফলে দেখা যাচ্ছে যে, বিশেষ ধরণের কর্ম জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের প্রতি কারণ হতে পারে। এই ধরণের কর্মের বৈশিষ্ট্য কি? গীতাভাষ্যের উপোদঘাতে আচার্য শঙ্কর বলছেন — প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম অভ্যুদয়লাভের জন্য বর্ণাশ্রমকে উদ্দেশ করে বিহিত হয়েছে; সেই ধর্ম দেবাদিস্থান প্রাপ্তির প্রতি হেতু হলেও যদি ঈশ্বরে অর্পণ বুদ্ধিসহকারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে সেটি ফলাভিসন্ধিবর্জিত হওয়ায় সত্ত্বশুদ্ধির প্রতি কারণ হয়। শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তির জ্ঞাননিষ্ঠারূপ যোগ্যতাপ্রাপ্তি পথে সেই ধর্ম জ্ঞানোৎপত্তি তথা নিঃশ্রেয়সের প্রতিও হেতুরূপে বিবেচিত হতে পারে। এইরূপ অর্থসন্ধান করেই বলা হয়েছে — 'ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি যতচিত্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ। যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাঽঽত্মশুদ্ধয়ে।।' (গীতা: ৫অ. ১০/১১ শ্লোক) [বিষয়সঙ্গ পরিত্যাগ করে সংযতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় যোগিপুরুষ ব্রহ্মে সমস্ত কর্ম আধানপূর্বক কর্ম করে থাকেন।] এই দুই প্রকার ধর্ম, যেটি পরমার্থতত্ত্বস্বরূপ এবং নিঃশ্রেয়সের প্রযোজক, সেটিই গীতাশাস্ত্রে বিশেষত অভিব্যক্ত হয়েছে; এই ধর্মার্থবিজ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত পুরুষার্থ[২] সিদ্ধি হয়ে থাকে এবং সেই কারণে গীতার তাৎপর্যবিবৃতি যত্নসহকারে করা হচ্ছে।' উক্তপ্রকার ধর্মের প্রকৃতি ও লক্ষণ প্রাচীনতম বৈশেষিক সূত্রেও একইভাবে বর্ণিত হয়েছে — 'যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ' (বৈ. সূ. ১/১/২)।। এই সূত্রের উপস্কারটীকায় বলা হয়েছে — 'অভ্যুদয় তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ এবং নিঃশ্রেয়স আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিস্বরূপ — এই দুটি যার থেকে উৎপন্ন হয়, সেটিই ধর্ম। 'অভ্যুদয়দ্বারক নিঃশ্রেয়স' -- এরূপে মধ্যপদলোপী সমাস, অথবা, পঞ্চমীতৎপুরুষ সমাস দ্বারা উক্ত তাৎপর্য ব্যক্ত হয়েছে।

সেই ধর্মকে নিবৃত্তিলক্ষণ বলা হয়, যখন নিদিধ্যাসনাদি-যোগসাধ্য হয়েও ধর্ম অদৃষ্টরূপে কল্পিত হয় এবং তখন তার বিধিরূপতাও স্বীকার করতে হয়। অতএব, পরবর্তী সূত্রে বলা হল — 'তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্' (বৈ. সূ. ১/১/৩)—'ধর্ম' বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে বাক্যের দ্বারা, সেই বাক্যের প্রামাণ্য উক্তপ্রকারে গ্রহণীয়।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আস্তিক সম্প্রদায়রূপে অদ্বৈতবেদান্তে কথিত ধর্মের স্বরূপ ও লক্ষণ অপরাপর আস্তিক সম্প্রদায়বিরোধী নয়।

অদ্বৈতবেদান্তীকে এবার এরূপ প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সরূপ ধর্ম, যা প্রবৃত্তিনিবৃত্তি উভয়লক্ষণ তথা শ্রুতিবিধৃত, সেই শ্রুতি ক্রিয়াকারকলক্ষণক, অতএব সেই ধর্মও ক্রিয়াকারকলক্ষণক হবে। এখন, (১) এই ধর্ম ও ব্রহ্মবিজ্ঞান কি স্বরূপত এক? অথবা, (২) এই ধর্মই কি অদ্বৈতবেদান্তের একমাত্র ও চরম পুরুষার্থ? উত্তরে বলা যেতে পারে, অদ্বৈতবেদান্তোক্ত চরমপুরুষার্থ সমস্ত দুঃখের অত্যন্ত উপরমলক্ষণক মোক্ষ, যা কেবলমাত্র আত্মজ্ঞান তথা জীবব্রহ্মের অভেদজ্ঞানস্বরূপ, এবং বেদে বিস্তৃত প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ক্রিয়া-কারক-ফল এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চতুর্বর্ণাশ্রমব্যবস্থাধিগৃহীত সমাজকে ধারণ করে রেখেছে। অপরদিকে, নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মকে জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণকরূপে চিহ্নিত করায় বৈরাগ্য এবং জ্ঞান, এই দুটিকে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের স্বরূপ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। কিন্তু এই জ্ঞান কি আত্মজ্ঞান, অথবা তদ্‌ভিন্ন অপর কোন জ্ঞান? আচার্য শঙ্কর বলছেন — 'গীতাশাস্ত্রের প্রয়োজন সহেতুক (অবিদ্যাসহিত)সংসারের উপরমলক্ষণ নিঃশ্রেয়স। এই সংসারোপরমের প্রতি হেতু সর্বকর্ম-সংন্যাসপূর্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপ ধর্ম। স্বয়ং ভগবানও বলেছেন — 'স হি ধর্মঃ সুপর্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে' (অনুগীতা) — ব্রহ্মপদবেদনে সেই ধর্মই সুপর্যাপ্ত; সেই স্থলে আরও বলা হয়েছে — যিনি একাসনে লীন, মৌনতা অবলম্বনকারী, এবং বিষয়চিন্তা যাঁর নাই, তাঁর ধর্ম, অধর্ম, শুভ, অশুভ, কোন ফলভোগও নাই। 'জ্ঞানং সংন্যাসলক্ষণম্' — জ্ঞানের লক্ষণ সংন্যাস। শেষ অংশে অর্জুনের প্রতি বলছেন — 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' — সমস্ত ধর্মকে পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার আশ্রয় গ্রহণ কর।'[৮] সুতরাং, সর্বত্রই দেখা যোচ্ছে যে, আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠারূপ ধর্ম মোক্ষের প্রতি হেতু হলেও যেহেতু সেটি সংন্যাসলক্ষণ, সেহেতু অভেদজ্ঞান বা মোক্ষ থেকে সেটি ভিন্ন। তাহলে 'আত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপ ধর্ম' এই বিবৃতির অর্থ কি? 'আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা' (বিষয়াধিকরণার্থে সপ্তমী তৎপুরুষ); অথবা 'আত্মজ্ঞান নিষ্ঠাই রূপ যার (যে ধর্মের) (কর্মধারয় সমাস) — যে প্রকারেই পদনির্বচন করা হোক না কেন, দেখা যাবে যে, আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতিলাভ করে যে ধর্ম, সেই ধর্মই মোক্ষের প্রতি হেতু। এই বিচারের তাৎপর্য হল এই যে, উভয়ের আধার-আধেয়ভাবের প্রতি লক্ষ্য করলে এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হবে যে, সিদ্ধ আত্মজ্ঞান ও সাধ্য ধর্ম, দুটি পরস্পরভিন্ন ব্যাপার।

কিন্তু এই ধর্ম কি জ্ঞানমূলক, না কর্মমূলক, অথবা, উভয়মূলক? 'সর্বাপেক্ষা চ ফলাদিশ্রুতেরশ্ববৎ' (ব্র. সূ. ৩/৪/২৬) সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে বলা হয়েছে — 'বিদ্যা সকলপ্রকার আশ্রমকর্মের অপেক্ষা রাখে, এ বিষয়ে তার আত্যন্তিক নিরপেক্ষা বা অনপেক্ষা, লক্ষিত হয় না।' সংশয় হতে পারে যে, বিদ্যা আশ্রমকর্মের অপেক্ষা রাখে, আবার অপেক্ষা রাখেও না — একই সঙ্গে এই দুটি উক্তি করলে, পরস্পরবিরোধ দেখা দিচ্ছে, সেস্থলে কোন পক্ষটি গ্রহণীয়? বস্তুত এস্থলে কোন বিরোধ নাই। বিদ্যার উৎপত্তিতে ধর্মাদির অপেক্ষা থাকলেও উৎপন্না স্বয়ংসিদ্ধা বিদ্যা ফলসিদ্ধিতে কারও অপেক্ষা রাখে না। এই বিষয়ে প্রমাণ 'যজ্ঞাদি শ্রুতি' — 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন' (বৃহদারণ্যক. ৪/৪/২২) — এই শ্রুতিবাক্যে যজ্ঞাদির বিদ্যাসাধনভাবে তথা বিদ্যার উৎপত্তিতে নিমিত্তকারণতা প্রদর্শিত হয়েছে। বিবিদিষারূপ ফলসংযোগের সাথে সাথেই যজ্ঞাদির বিদ্যোৎপত্তিতে সাধনভাবের অবসান হয়। 'অথ যৎ যজ্ঞঃ ইতি আচক্ষতে ব্রহ্মচর্যম্ এব তৎ' (ছান্দোগ্য ৮/৫/১) এই শ্রুতিবাক্যেও বিদ্যাসাধনভূত ব্রহ্মচর্য যজ্ঞরূপে সংস্তুত হয়েছে, ফলত যজ্ঞাদিরও বিদ্যাসাধনভাব সূচিত হয়েছে। 'সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি।' (কঠ ১/২/১৫) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমকর্মের বিদ্যাসাধনভাব গ্রহণ করেছে। 'কষায়পক্তিঃ কর্মাণি জ্ঞানং তু পরমা গতিঃ। কষায়ে কর্মভিঃ পক্কে ততো জ্ঞানং প্রবর্ততে' — ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও বলা হয়েছে, কর্মের দ্বারা চিত্ত কষায়প্রাপ্ত তথা বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হয় এবং বৈরাগ্যকষায়চিত্তেই জ্ঞানের উদয় হয়। সূত্রে 'অশ্ববৎ' পদটি যোগ্যতার দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যোগ্যতাবশতঃ যেমন অশ্ব লাঙ্গলকর্মে নিযুক্ত না হয়ে রথচর্যায় নিযুক্ত হয়, সেইরূপ আশ্রমকর্মসমূহও বিদ্যার ফলসিদ্ধিতে অপেক্ষিত নয়, উৎপত্তিতে অপেক্ষিত। কেউ কেউ এরূপ মনে করতে পারেন যে, যজ্ঞাদির বিদ্যাসাধনভাব বিষয়ে যেহেতু কোন বিধি নাই, সেহেতু এরূপ ভাবনা অপ্রমাণ। 'যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি' (বৃহদারণ্যক ৪/৪/২২) জাতীয় শ্রুতিবাক্য বিদ্যার প্রশংসাকল্পে প্রযোজ্য। এর দ্বারা যজ্ঞাদির বিধিপরত্ব বোঝায় না; এই বিদ্যা এইরূপই মহাভাগা যে যজ্ঞাদির দ্বারা তাকে লাভ করার ইচ্ছামাত্র জন্মায়। তবুও, যেহেতু বিদ্যার্থী ব্যক্তি শমদমাদিগুণযুক্ত অবশ্যই হবেন, সেহেতু শমদমাদি বিদ্যাসাধনরূপে বিহিত হয়েছে। এ বিষয়ে 'অতঃ এবংবিৎ শান্তঃ দান্তঃ উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানং পশ্যতি' (বৃহদারণ্যক, ৪/৪/২৩) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য প্রমাণ। বিহিত বিষয় অবশ্য অনুষ্ঠেয়। অতএব, যজ্ঞাদি ও শমদমাদি এবং আশ্রম অনুযায়ী বিহিত যাবতীয় আশ্রমকর্মই বিদ্যার উৎপত্তিতে অবশ্য অপেক্ষিতব্য। উদ্ধৃত বাক্যে বিদ্যারূপ ফলসংযোগে শমাদি প্রত্যাসন্ন কারণরূপে এবং বিদ্যোৎপত্তির অনুকূল বিবিদিষারূপ ফলসংযোগের প্রতি যজ্ঞাদি কারণ হওয়ায় বিদ্যোৎপত্তিতে যজ্ঞাদি বাহ্যতর কারণরূপে বিবেচিত হবে।'[৪] ফলত ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা বা বিবিদিষার মূলে যজ্ঞাদি (দ্রব্যযজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ উভয়ই) বহিরঙ্গ

সাধনরূপে, এবং শমদমাদি অন্তরঙ্গসাধনরূপে বিবেচিত হয়। (দ্রঃ বৃহদারণ্যকভাষ্য, চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণ)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগপ্রকল্পে এই বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। 'শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।।' (গীতা ৪/৩৩) শ্লোকের শাঙ্করভাষ্যে বলা হয়েছে — 'ব্রহ্মার্পণম্'ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞানের যজ্ঞরূপতা সম্পাদিত হয়েছে। যজ্ঞেরও অনেক প্রকার প্রদর্শিত হয়েছে; সকল যজ্ঞের সিদ্ধপুরুষার্থের প্রতি প্রয়োজন নির্দেশ করার পরে জ্ঞানের স্তুতি করা হচ্ছে। 'দ্রব্যময়' অর্থাৎ দ্রব্যরূপ সাধনের দ্বারা সাধ্য যে যজ্ঞ, তার থেকে জ্ঞানরূপ যজ্ঞ শ্রেয়, কারণ দ্রব্যময় যজ্ঞ অনিত্য ফলের উৎপাদক, জ্ঞানময় যজ্ঞ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় ফলোৎপাদক নয়। যেহেতু সকল সাধনের সহিত সম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত সকল কর্মই সর্বত সংপ্লুতোদকবৎ (মহাসমুদ্রবৎ) অনন্তফল (মোক্ষ) হেতু জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয়। ছান্দোগ্যশ্রুতিতেও এইরূপ দৃষ্টান্তসহযোগে কথিত হয়েছে যে — দ্যূতক্রীড়াতে চতুরঙ্গ দান যার আয়ত্ত হয়েছে তৃতীয় ও দ্বিতীয় অংকদানের ফলও তার আয়ত্ত।'[৫] আচার্য শঙ্করকৃত বিবেকচূড়ামণিগ্রন্থেও আত্মজ্ঞানাধিকারীর যোগ্যতা নিরূপণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সাধু তথা বিহিতকর্মানুষ্ঠান দ্বারা ক্ষয়িতকল্মষ ব্যক্তি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহ-অমুত্র (পারলৌকিক)-ফলভোগবিরাগ, শমদমাদি ষট্সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্বরূপ সাধনসম্পত্তি লাভ করলে তবেই তিনি ব্রহ্মবিদ্যালাভের যোগ্য অধিকারীরূপে বিবেচিত হবেন। সুতরাং বিদ্যার উৎপত্তিতে সকল আশ্রমকর্মের অপেক্ষাই থাকে; অত্যন্ত কর্ম-অনপেক্ষতা দ্বাবা, অথবা কর্মহীন অলস চিন্তা বা তর্কের দ্বারা কখনই বিদ্যা লব্ধ হয় না। যজ্ঞাদির ফল বিবিদিষা, বিবিদিষার ফল শমদমাদি-সাধনসম্পত্তি, শমদমাদিসাধনের ফল চিত্তের অত্যন্ত সংস্কার, মলরাহিত্য ও বিদ্যোপযোগিত্বলাভ; এইপ্রকারে উপক্ষীণ চিত্তে স্বয়ংপ্রকাশ বিদ্যার উদয় হয়ে থাকে। এইরূপে যে কারণপরম্পরা স্বীকার করা হয়েছে, তথায় যজ্ঞাদি কর্মের স্থান বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। পুনরায়, এই কারণ-পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটিরই উৎপত্তিমত্ত্ব, ফলোপধায়কত্ব ও বিদ্যাসাধনভাব অদ্বৈতবেদান্তে বিশেষভাবে স্বীকৃত। কিন্তু এই বিষয়ে পূর্বে আরও একটি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল যে, যজ্ঞাদির বিদ্যাসাধনভাব বিধির অভাববশত গ্রাহ্য করা যায় না। বিশেষত 'যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি' — জাতীয়ক শ্রুতিতে গুণানুবাদ করা হয়েছে; অর্থাৎ কেবলমাত্র বিদ্যা দ্বারাই সংসারের বীজভূত অবিদ্যার ধ্বংস হবে, অন্যথা নয় — এইরূপ মতের দ্বারা বিদ্যার স্তুতিমাত্র করা হয়েছে; 'তস্মাৎ এবংবিৎ' প্রভৃতি বাক্যে বিদ্যার সাধনরূপে শমদমাদির উল্লেখ থাকলেও সেগুলি গুণমাত্র রূপেই বর্ণিত হয়েছে এবং এই বিষয়ে প্রবর্তকবাক্য তথা বিধির কোন উল্লেখ নাই। অতএব, বিধির অভাববশত অদ্বৈতবেদান্তীর পক্ষে যজ্ঞাদি কর্মের কর্তব্যতা এবং শমদমাদির অভ্যাস নিরর্থক হয়ে পড়বে। অথবা, শমদমাদি যোগসাধন যিনি অবলম্বন করেছেন, তাঁর পক্ষে বিহিত নিত্যকর্মের অনুষ্ঠানের

প্রয়োজন থাকবে না। এর উত্তরে আচার্য শঙ্কর শারীরক-সূত্রভাষ্যে বলেছেন —'অপূর্বত্বাৎ সংযোগস্য বিধিঃ পরিকল্প্যতে' (দ্রঃ ব্র. সূ. ৩/৪/২৭) — বিবিদিষার সঙ্গে যজ্ঞাদিকর্মের সংযোগ পূর্বে বিহিত না হওয়ায় এই বিষয়ে অপূর্ববিধি পরিকল্পিত হয়। যে বিষয়টি অপূর্ব বা অদৃষ্ট, তথা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগোচর নয়, সেই বিষয়ে যে প্রবর্তক বাক্য শ্রুতিতে কল্পিত হয়েছে, তাকে বলা হয় অপূর্ববিধি। যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল বিবিদিষা; কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের যে বিবিদিষারূপ বিশিষ্ট ফলসংযোগ সেটি পূর্বে কোন বিধির দ্বারা বিহিত হয়নি, অন্য প্রমাণের দ্বারাও সেটি প্রাপ্য নয়। এ বিষয়ে সূত্র উল্লেখ করে তিনি বলছেন — "তথা চ উক্তং 'বিধির্বা ধারণবৎ' (ব্র. সূ. ৩/৪/২০) ইতি"। এই সূত্রেরই ভাষ্যে বলছেন — "তথা চ উক্তং শেষলক্ষণে 'বিধিস্তু ধারণে অপূর্বত্বাৎ' (জৈ. সূ. ৩/৪/৬) ইতি। তদ্বৎ ইহাপি আশ্রমপরামর্শশ্রুতিঃ বিধিঃ এব ইতি কল্প্যতে।" মীমাংসাসূত্রে বলা হচ্ছে যে, যদিও লৌকিক আচার অনুসারে সমস্ত যজ্ঞীয় উৎসর্গবস্তু ভালভাবে আচ্ছাদন করে রাখাই হয়, সেহেতু অগ্নিহোত্রহোমকালে 'সমিধ্' আচ্ছাদন পূর্বপ্রাপ্ত, অতএব উক্ত বাক্যটি ('অধস্তাৎ সমিধং ধারয়েন্নুদ্রবেৎ। উপরি হি দেবেভ্যঃ') অনুবাদমাত্র (পূর্ব জ্ঞাত বিষয়ের কথনমাত্র), বিধি নয়; এর উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—'বিধিস্তু ধারণে সমিধ্ ধারণে বিধিই হবে; যেহেতু এটি অপূর্ব — পূর্ব থেকে অপ্রাপ্ত; যেহেতু অভ্যর্হিত দ্রব্য হবিঃ আচ্ছাদনযোগ্য, সেহেতু সেটির আচ্ছাদন যে সমিধ দ্বারাই করতে হবে এটি পূর্বে কোন বাক্যের দ্বারা বিহিত হয়নি, অপর কোন প্রমাণের দ্বারাও অবগত হওয়া যায় না। সেইরূপ, এই স্থলেও (সন্ন্যাস) আশ্রমপরামর্শমূলক শ্রুতিবাক্যটি বিধিই হবে, অনুবাদ নয়। বিশেষত 'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ' (ছান্দোগ্য ২/২৩/১) ইত্যাদি শ্রুতিতে চারটি আশ্রমেই বিধি অঙ্গীকৃত হওয়ায় সন্ন্যাসাশ্রমেও বিধি অঙ্গীকৃত হয়। মাধ্যন্দিন শাখায় পঠিত 'তস্মাৎ' (৪/৪/২৩) 'পশ্যেৎ' (৪/৪/২২) প্রভৃতি বাক্যে বিধিবাচক বিভক্তির প্রয়োগ থাকায় যজ্ঞাদির বিহিতত্ব প্রমাণিত হয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদের ভাষ্যে বলা হয়েছে 'বেদানুবচন, যজ্ঞ, দান ও তপঃ শব্দের দ্বারা সর্বপ্রকারে নিত্যকর্মই উপলক্ষিত হয়েছে; এইপ্রকারে সকলপ্রকার কাম্যবর্জিত যাবতীয় নিত্যকর্মের ফল আত্মজ্ঞানোৎপত্তিতে দ্বাররূপে তথা মোক্ষসাধন বা মোক্ষের উপায়রূপে প্রতিপদ্যমান হয়। এইরূপে কর্মকাণ্ডের সঙ্গে উক্ত বাক্যটিও একবাক্যতা লাভ করে।'[৬] সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, অদ্বৈতাচার্য শঙ্করের মতে, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত সকলপ্রকারবিহিত নিত্যকর্ম মোক্ষের সাধনরূপে বিবেচিত এবং এইভাবেই জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে একবাক্যতা রক্ষা করা হয়। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে শঙ্করাচার্য জ্ঞানের সাধনরূপে কর্মকে মর্যাদা দান করলেও, অথবা, জ্ঞানকাণ্ড-কর্মকাণ্ডের একবাক্যতা অঙ্গীকার করলেও জ্ঞান-কর্মসমুচ্চয় কখনও স্বীকার করেননি, কারণ সেটি সর্বথা শাস্ত্র-অসিদ্ধ এবং জ্ঞান ও কর্ম, উভয়ের স্বরূপ ও ফল সর্বদা ও সর্বপ্রকারে পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত।

জ্ঞানমার্গে যোগ্যতাপ্রযোজক শম-দমাদি বলতে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান — এই ছয়টি মানসবৃত্তিকে বোঝান হয়েছে। এই ছয়টিকে 'সম্পত্তি' অর্থাৎ সম্যক্ স্থিতিও (চিত্তের) বলা হয়। 'শম'-সম্পত্তির তাৎপর্য — বিষয়ের দুঃখজনকত্বাদি দোষ বারংবার দেখার ফলে উৎপন্ন বৈরাগ্য মনের শাস্ত্রোক্ত আত্মস্বরূপে নিশ্চল অবস্থান;[৭] 'দম'-এর তাৎপর্য জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়সমূহকে ভোগ্য-বিষয়-বিমুখ করে স্বস্থানে নিশ্চলভাবে ধারণ করে রাখা;[৮] 'উপরতি'-র অর্থ বাহ্যবিষয়কে আলম্বন না করে কেবল ধ্যেয়াকার চিত্তবৃত্তির ধারণ,[৯] 'তিতিক্ষা'র অর্থ — আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তিনপ্রকার দুঃখের প্রতিকার না করে, তদ্বিষয়ক চিন্তা ও বিলাপ পর্যন্ত ত্যাগপূর্বক দুঃখ সহ্য করা;[১০] 'শ্রদ্ধা'-র অর্থ — গুরুর উপদেশ ও শাস্ত্রবাক্যকে সত্যরূপে জেনে দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করা;[১১] 'সমাধান'-এর অর্থ — সকল সময়ে সকল প্রকারে বুদ্ধিকে শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপে স্থাপনা করা, কৌতূহলবশত তত্ত্বালোচনার দ্বারা চিত্তের লালন বা কর্মবিহীন আত্মসন্তোষ লাভ করা নয়;[১২] এতদ্ব্যতীত, অদ্বৈতবেদান্তচর্চায় অনুবন্ধচতুষ্টয়ের প্রথমে উল্লিখিত হয় 'নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক'। এই বিবেকবুদ্ধি বা বিবেকখ্যাতি গাঢ় বা পক্ক হয় যোগসাধনার পথে। পাতঞ্জলসূত্র-ব্যাসভাষ্যের বিবরণ-টীকায় আচার্য শঙ্কর বলছেন — 'যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেক-খ্যাতেঃ', 'নির্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ', 'ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা' প্রভৃতি। ... বিবেকখ্যাতির তাৎপর্য হল ভূতার্থাবগতি (বস্তুস্বরূপনিশ্চয়)' (পা. সূ. ১/১) বিবেকখ্যাতির উপায় যোগ। যোগের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ক্লেশনিবৃত্তি হয় এবং সমাধিভাবনামুখে বিবেকখ্যাতির উদয় হয়। 'ক্লেশ'-এর স্বরূপ এবং তার নিবৃত্তি প্রসঙ্গে যোগশাস্ত্রে যে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে, সম্প্রদায়-নির্বিশেষে তার প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়ে এসেছে। অদ্বৈতবেদান্ত সম্প্রদায়েও শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনকে তত্ত্বোপলব্ধির সাধন বা উপায়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং নিদিধ্যাসনের প্রক্রিয়া অংশে যোগাভ্যাস অত্যাবশ্যকরূপে কল্পিত হয়েছে। পাতঞ্জলযোগের সাধনপাদে যে পাঁচটি ক্লেশ — অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশের কথা বলা হয়েছে, তা সর্বজীবসাধারণ। ক্লেশসমূহ ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হলে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়প্রকার ফলভোগের হেতু কর্মাশয় বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ক্লেশগুলির উচ্ছেদ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কর্মাশয়ের বিপাকরূপে জাতি, আয়ু ও ভোগ উৎপন্ন হয়ে থাকে। সুখ ও দুঃখ — এই দুইপ্রকার ভোগের উৎপাদকরূপে পুণ্য ও অপুণ্য, এই দুটি কর্মাশয় এবং উক্ত কর্মাশয়দ্বয়ের প্রতি লোভ-ক্রোধ-মোহ এবং মূলতঃ অবিদ্যা কারণ। যেহেতু সমস্ত প্রকার ভোগই অপরের দুঃখের প্রতি কারণ হয়ে থাকে, তথা লোভ-ক্রোধ-মোহজন্য হয়, সেহেতু আকাঙ্ক্ষিত ভোগমাত্রেই স্বরূপত পাপজনক এবং পরিণামে দুঃখই প্রদান করে। দুঃখতা ('দুঃখ' + 'তা' সমূহার্থে) তিন প্রকার — পরিণামদুঃখতা, তাপদুঃখতা এবং সংস্কারদুঃখতা। পরিণামদুঃখতা বলতে — ভোগাভ্যাস সুখের উপায় নয় জেনেও বিষয়ানুবাসিত অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে দৃঢ়বন্ধনযুক্ত হওয়ার

ফলে জীব যে দুঃখভোগ করে, তাকে বোঝান হয়। তাপদুঃখতার স্বরূপ যে ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে আমরা বিশেষভাবে নৈতিকতাদৃষ্টিপ্রসূত বলতে পারি। বলা হয়েছে — যেগুলি সুখের সাধন বা উপায়, সেগুলির পরিস্পন্দন বা পাওয়ার প্রচেষ্টা সর্বদাই অপরের প্রতি অনুগ্রহ বা পীড়ন সৃষ্টি করে, যার ফলে লোভ-মোহাত্মক কর্মাশয় উৎপন্ন হয়। এই কর্মাশয়ই ধর্ম অথবা অধর্ম আখ্যায় ভূষিত হয়। যাঁর ইষ্ট ও অনিষ্ট বুদ্ধি উৎপন্ন হয়েছে, অর্থাৎ যিনি বিবেকবান্, তিনি এইভাবে ভোগের তথা ভোগের উদ্দেশ্যে করণীয় যাবতীয় কর্মের দুঃখস্বরূপতা উপলব্ধি করে অনাদি দুঃখস্রোতের থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করে থাকেন।

ভারতীয় নৈতিকতার ঐতিহ্য বা পরিকাঠামোকে যদি এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা হয়, তবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, চতুর্বর্গ পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম — এই তিনটি যেহেতু কর্মজন্য এবং কর্মজন্য যাবতীয় ফল যেহেতু দুঃখরূপতাবশত প্রবর্তনযোগ্য নয়, সেহেতু জীবের যাবতীয় কর্মই নীতিগত দিক থেকে গ্রাহ্য হওয়া উচিত নয়, অথবা এক্ষেত্রে নৈতিকতার দুটি স্তর স্বীকার করতে হয়। ফলত, যা একের পক্ষে নৈতিক তা অপরেব পক্ষে অনৈতিক অথবা নৈতিকতা-প্রশ্ন-বিবর্জিত (a-moral) রূপে চিহ্নিত হবে এবং সেই নৈতিকতার বিধান সর্বজীবের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য হবে কি না —এই প্রশ্ন সর্বদাই থেকে যাবে। এই দ্বি-স্তর নৈতিকতার প্রশ্ন একই ভাবে 'ব্যক্তিগত নৈতিকতা' (private morality) এবং 'সার্বজনীন নৈতিকতা' (universal morality)-র ক্ষেত্রেও উঠতে পারে। 'ব্যক্তিগত নৈতিকতা' নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির অভীষ্ট রূপে বর্ণিত বিষয়গুলিকে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থ বা চতুর্বর্গে ভাগ করা যেতে পারে। তার মধ্যে ত্রিবর্গ বা ধর্ম-অর্থ-কাম প্রবৃত্তিমার্গে এবং চতুর্থ, মোক্ষ, নিবৃত্তিমার্গে সার্থকতা লাভ করে। অর্থ-কামের পুরুষার্থত্ব ততক্ষণই প্রামাণিক যতক্ষণ সেগুলি ধর্মকে আশ্রয় করে আচরিত হয়ে থাকে। দেহ-মনের প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ জীবের পক্ষে অর্থ-কামের আকাঙ্ক্ষা ও লাভ করার চেষ্টা অত্যন্ত স্বাভাবিক; এই সত্যটিকে অস্বীকার করলে অথবা জোর করে অস্বাভাবিক নিবৃত্তির চেষ্টা করলে তা জীবের অস্তিত্বের মূলে আঘাত করে, ফলে অস্বাভাবিক অর্থ-কাম-প্রবৃত্তি অথবা মিথ্যাচার বা আত্ম-প্রবঞ্চনার উৎপত্তি ঘটে, যা জীবের সুস্থ বিকাশের পরিপন্থী। সেইকারণে, অর্থ-কামের পুরুষার্থত্বকে যেমন কখনও হীন দৃষ্টিতে দেখা হয়নি, তেমনই ধর্মের হাত ধরে অর্থ-কাম জীবের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে এবং বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। ফলস্বরূপ, বৈদিক ভোগবাদ, যা ভোগ্যভোক্তৃসম্বন্ধ নিরূপণের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তা ব্যক্তিকে অতিক্রম করে সার্বজনীনতার পথে অগ্রসর হতে পেরেছে, এবং ধর্ম স্বয়ং একটি সার্বিক, শ্রুতিযুক্তিসিদ্ধ নীতিরূপে, অথবা, নীতির প্রযোজকরূপে উপস্থাপিত হওয়ায় ধর্ম ও নীতির সুষম মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছে। ধর্ম-নীতি নিরূপণের প্রশ্নে অদ্বৈতবেদান্ত ঐতিহ্যানুসারী মতকে অবলম্বন

করে থাকে। সাধারণ বদ্ধ জীব, যাদের বুদ্ধি ভোগের আকাঙক্ষার দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা শ্রুতি ও স্মৃতির নির্দেশ অনুসারে নিজস্ব বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্ম করবে। যাঁরা মুমুক্ষু, তাঁরা ভোগ ও ভোগতৃষ্ণার পরিণামদুঃখতা অনুধাবন করে ভোগের দ্বারা সুখলাভের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন এবং আত্মজ্ঞান সর্বসুখের আকর, এ কথা নিশ্চিত রূপে জেনে বাহ্য বিভিন্নপ্রকার কষ্ট স্বীকার করেও যোগাভ্যাস ও শ্রবণমননাদির দ্বারা আত্মতত্ত্বলাভে প্রয়াসী হন। ভোগমার্গ এবং যোগমার্গ — দুটি ক্ষেত্রেই প্রতিটি ব্যক্তির সংস্কার অনুযায়ী অধিকারভেদ স্বীকার করা হয়েছে। ফল কথা, প্রতিটি জীব বা ব্যক্তি তার বুদ্ধি ও সংস্কার অনুযায়ী যেগুলিকে আকাঙক্ষণীয় বলে মনে করে, সেগুলিকে প্রাপ্তির পক্ষে যথানির্দিষ্ট উপায় অবলম্বনের স্বাতন্ত্র্য তার আছে; কিন্তু সেই স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। স্বেচ্ছাচারিতারই অপর নাম অধর্ম বা ধর্মবিরোধিতা, যা আধ্যাত্মিক (personal), আধিদৈবিক (Natural) ও আধিভৌতিক (sociometric) বৈষম্য সৃষ্টি করে জীবের অস্তিত্বের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় — মোক্ষকামী ব্যক্তি নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করে সন্ন্যাসগ্রহণ করতে পারেন, সেই স্বাতন্ত্র্য তাঁর আছে; কিন্তু যদি তিনি গৃহস্থ হন, তাহলে তাঁর উপরে নির্ভরশীল পরিবারকে ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ সর্বথা অধর্ম; পুনরায়, তিনি যদি গৃহস্থাশ্রমে থেকেই শম-দমাদিসম্পত্তির পরিচর্যা করতে পারেন এবং সংসারের যন্ত্রণাদায়কতা লক্ষ্য করে নিজেকে মানসিক দিক থেকে বিষয়ভোগ নিবৃত্ত করতে পারেন, তবে সেটাই হবে তাঁর পক্ষে পরম ধর্ম। ব্যক্তি ধর্মাচরণের নামে কখনই এমন কোন কার্য করবে না, যা তার পারিপার্শ্বিককে বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং পরিণামে আত্মবিনাশের হেতু হয়। সেইকারণে পাতঞ্জলসূত্রে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনার দ্বারা চিত্তকে সমভাবাপন্ন বা প্রসন্ন করে তোলার যে পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে, তা বস্তুত সমস্ত জীবের পক্ষেই বিভিন্ন মাত্রায় পরিচর্যণীয়। পাতঞ্জলসূত্রভাষ্যের টীকায় শঙ্করাচার্য বলছেন — 'উৎপত্তি, স্থিতি, অভিব্যক্তি, বিকার, প্রত্যয়, আপ্তি, বিয়োগ, অন্যত্ব ও ধৃতি এই নয়টি চিত্তের ধারণার প্রতি কারণ। ইন্দ্রিয়সমূহের ধৃতি বা ধারণাতে শরীর কারণ। শরীরকে প্রাপ্ত না হলে ইন্দ্রিয়সমূহের ধৃতি সম্ভব নয়। এই ইন্দ্রিয়গুলি পুনরায় শরীরধারণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারেই শারীরবৃত্তি লব্ধ হয়ে থাকে। তথা আকাশাদি মহাভূত শরীরধারণের কারণরূপে কল্পিত হয়। মহাভূতের দ্বারা আরব্ধ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত বিভিন্ন জীবশরীর পরস্পরের উপকার্য-উপকারকভাবে ভোগ্য-ভোক্তৃমূলক সংসারের তথা স্বকীয় শরীর রক্ষার কারণরূপে উপস্থিত হয়। এইরূপেই সমস্ত পদার্থের, তির্যগ্‌যোনিতে উৎপন্ন পশুপক্ষীর, মানুষের, এমন কি দেবতাদেরও ধৃতি পারস্পরিকভাবে রক্ষিত হয়। এমন তত্ত্বকল্পনার হেতু কি? — যেহেতু, এদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব অপরের সুস্থ অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল এবং ভোগ্য-ভোক্তৃসম্বন্ধ বিশিষ্ট সংসারের অস্তিত্ব এই পারস্পরিক নির্ভরতার উপরেই স্থিতিশীল। একইভাবে চতুর্বর্ণাশ্রম

ব্যবস্থাধিগৃহীত মানুষ পরস্পরকে আশ্রয় করে, একে অন্যের উপকারকরূপে সমগ্র (সমাজ/রাষ্ট্র তথা ধর্ম) ব্যবস্থার ধৃতির (equilibrium) প্রতি কারণ হয়ে থাকে। 'পরস্পরোপাশ্রয়েণ হি জগদখিলম অপি ধ্রিয়তে' — পরস্পরের উপাশ্রিত হয়েই এই অখিল জগৎ বিধৃত হয়ে আছে।'[১৩] সুতরাং, আস্তিক্যভাবনা-চিন্তার দ্বারা দৃঢ়মূল অদ্বৈতবেদান্ত মায়াবাদ বা অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদের প্রবক্তা হলেও মিথ্যাভূত জগতের অঙ্গরূপে গ্রাহ্য সমস্ত জীবকুলের মধ্যে এমন একটি পারস্পরিক স্থিতিনিষ্ঠ সত্যকে প্রতিস্থাপনা করেছে, যা অদ্বৈত সিদ্ধান্তকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে, হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অপরিহার্য।

অদ্বৈতভাবনাকে যাঁরা আশ্রয় করেছেন, তাঁদের সাধারণভাবে চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা — (১) অদ্বৈতবেদান্তের চর্চা যিনি আরম্ভ করেছেন, (২) যিনি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে রত, কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকার হয়নি, (৩) যাঁর সবিকল্প সমাধিবলে আত্মসাক্ষাৎকার হলেও অবিদ্যাসংস্কার দগ্ধপটবৎ থেকে যাওয়ার ব্রহ্মৈক্য লাভ হয়নি এবং (৪) যিনি ব্রহ্মৈক্যলাভ করেছেন। অদ্বৈতসাধনার এই চারটি স্তরকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রথম তিনটি স্তরে কঠোর নীতি-নিয়ম পালনের নির্দেশ রয়েছে, যা সমস্ত জগতের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে অবশ্য পালনীয়। অদ্বৈতবেদান্তের অনুশীলন যিনি করেন, তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য অবিদ্যা বা বিপর্যয়বুদ্ধির বিনাশ; অবিদ্যানাশের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অভ্যাস বা পুন পুন অনুষ্ঠান কর্তব্য; বিশেষত নিদিধ্যাসনের একমাত্র উপায় যোগাঙ্গের অনুশীলন। ব্রহ্মসূত্রের শারীরকভাষ্যে তত্ত্বসিদ্ধির উপায়রূপে যোগাঙ্গ অনুশীলনের প্রামাণ্য বর্ণিত হয়েছে (দ্রঃ ব্র. সূ. শা. ভা. ২/১/৪)। পাতঞ্জল যোগসূত্র-ভাষ্যের বিবরণে শঙ্করাচার্য বলেছেন — 'যথাকামচারীর যোগে অধিকার নাই।' ...যম ও নিয়ম, এই যোগাঙ্গদ্বয়ের মধ্যে প্রাধান্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে 'যমে'র উল্লেখ প্রথমে করা হয়েছে। 'যমে'র প্রাধান্য সর্বত্রই সিদ্ধ। যমনিয়মযুক্ত যথার্থ অধিকারপ্রাপ্ত যোগী পূর্ব পূর্ব অঙ্গে স্থিরতা লাভ করলে আসনাদি অঙ্গের উত্তরোত্তর অনুষ্ঠান কর্তব্য। প্রথম সোপানটিতে আরোহণ না করলে পরেরটিতে আরোহণ করা যায় না। অন্যত্র এরূপ বলা হয়েছে — 'স্থান-আসন-বিধানাদি যোগের বিধিসমূহ ব্যাক্ষেপজনক, যোগের হেতু নয়। সর্বদোষপরিত্যাগ এবং সমাধি — এই দুটি যোগের হেতু বা জনক'।[১৪] যম ও নিয়ম, এই দুটি যোগাঙ্গের প্রাধান্য এইজন্যই কীর্তিত হয়েছে যে, এই দুটিই সমাধি পর্যন্ত অন্য যোগাঙ্গগুলির সোপানস্বরূপ। 'যম' বহিরঙ্গ সাধন, তথা অন্যান্য জীবের প্রতি সাধকের বিশিষ্ট ব্যবহারের নীতি নির্ণায়ক এবং 'নিয়ম' অন্তরঙ্গ সাধন তথা সাধকের স্বীয় শরীর-ইন্দ্রিয়-মনঃ-সম্পর্কিত ব্যবহার। 'অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য-অপরিগ্রহাঃ যমাঃ'। (পা. সূ. ২/৩০) সর্বথা সর্বদা সমস্ত জীবের প্রতি অনভিদ্রোহ অর্থাৎ ক্ষতি করার মনোবৃত্তির পরিত্যাগই অহিংসা; যথা-দৃষ্ট, যথা-অনুমিত, বাক্যব্যবহার বা চিন্তা সত্য; এইরূপ বাক্যব্যবহার সর্বভূতের উপকারের উদ্দেশ্যে কর্তব্য, কোন জীবের উপঘাত বা অপকারের জন্য নয়। যথাদৃষ্ট, যথানুমিত বাক্ যদি কখনও

জীবের উপঘাতক হয়, তবে তা সত্যত্বগুণসম্পন্ন হবে না এবং পাপরূপে পরিগণিত হবে। এইরূপ বাক্-কে পুণ্যাভাস বা পুণ্যপ্রতিরূপক বলা হয় এবং এইরূপ বাক্যপ্রয়োগকারী কষ্টলাভ করেন, অন্ধকারে আপ্লুত হন। আচার্য শঙ্কর এই প্রসঙ্গে বলছেন — এই হেতু সর্বপ্রকারে হিত কিনা তা পরীক্ষা করে তবেই সত্য বলা উচিত। বলা হয়েছে — 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।।'[১৫] বস্তুপ্রাপ্তিতে স্পৃহা বা লোভ স্তেয়-র মূল, অথবা, অশাস্ত্রীয় উপায়ে অপরের দ্রব্যের স্বীকরণই স্তেয়; অতএব অস্তেয় বলতে বস্তুত অস্পৃহাকেই বোঝান হয়েছে। ব্রহ্মচর্যের অর্থ কায়মনোবাক্যে কামেন্দ্রিয়ের সংযম বা কামবৃত্তি শূন্যতা। ভোগ্য বিষয়ের অর্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ, তজ্জন্য হিংসা প্রভৃতি দোষদর্শনবশত বিষয়ের অনুপাদান বা তৎসংগ্রহ থেকে বিরত থাকাই অপরিগ্রহ। আচার্য শঙ্কর এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন — '...দোষদর্শনাদস্বীকরণম্ অনুপাদানম্ অপরিগ্রহঃ। ন পুনরসামর্থ্যেন অস্বীকরণম্' (পা. সূঃ বি. ২/৩০) — যে সর্বপ্রকার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিষয়সংগ্রহে নিজেকে নিবৃত্ত করে রাখতে পারে, সেই যথার্থ অপরিগ্রাহী। বলা বাহুল্য, অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্যা-অপরিগ্রহ, প্রত্যেকটির পরিচর্যাই শরীর, মন ও বাক্য তিনটি সাধনের দ্বারাই করতে হবে। সাধারণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু বা যতমান মোক্ষকামী সাধকের পক্ষে এগুলি অবশ্য পালনীয় ব্রত। সাধারণ জীব, যাদের বিবেকবুদ্ধি নাই, অথবা, যারা যথার্থ মঙ্গল ও অমঙ্গলের সীমারেখা অবধারণ করতে অক্ষম, তাদের মধ্যে বিপরীতবৃত্তি, তথা হিংসা, মিথ্যাচার, কেবলমাত্র স্বকীয় ভোগের জন্য যেন তেন প্রকারেণ ভোগ্যবিষয় আহরণ, যত্র তত্র কামবৃত্তি চরিতার্থতা এবং অপরিমিত বিষয়লোলুপতা মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা ঘটিয়ে থাকে; তাদের নীতিহীনতা তাদেরই ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে; কারণ, এই নীতিহীনতার ফলে তারা স্বার্থান্ধ হয়ে ওঠে এবং পারিপার্শ্বিক ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা, পরস্পরের প্রতি স্বার্থপর বিদ্বেষ ক্রমশ তাদের অবলুপ্তির পথে ঠেলে দেয়। জীব যখন এইভাবে স্থূল, অপরিমিত স্ব-কেন্দ্রিক ভোগের মধ্যে দিয়ে বিনাশগামী হয়ে থাকে, তখন তাকে বলা হয় 'অসুরবৃত্তি'। মঙ্গল-অমঙ্গল-বিবেকবুদ্ধি এবং অহিংসাদি ব্রতের অনুষ্ঠান যখন জীব পরিগ্রহ করে, তখন তাকে বলা হয় 'মনুষ্যবৃত্তি'। ব্রত-অনুষ্ঠানের দ্বারা এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসার দ্বারা সে তখন উত্তরণের পথের সন্ধান করে, নিজের মঙ্গল কামনা করে। এই অহিংসাদি ধর্ম যখন 'সার্বভৌম মহাব্রত' রূপে পালিত হয়, এবং, তা কেবলমাত্র সর্বজীবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, নিজের মঙ্গলের জন্য নয়, তখনই জীব 'দেববৃত্তি' হয়ে উঠতে পারে। — 'ন দেবো অসুরা বা কেচন বিদ্যন্তে মনুষ্যেভ্যঃ; মনুষ্যাণামেব অদান্তা যে অন্যৈরুত্তমৈর্গুণৈঃ সম্পন্নাঃ তে দেবাঃ, লোভপ্রধানা মনুষ্যাঃ, তথা হিংসাপরাঃ ক্রূরাঃ অসুরাঃ। তে এব মনুষ্যা অদান্তত্বাদিদোষত্রয়মপেক্ষ্য দেবাদিশব্দভাজো ভবন্তি, ইতরাংশ্চ গুণান্ সত্ত্বরজস্তমাংসি অপেক্ষ্য। অতএব মনুষ্যৈরেব

শিক্ষিতব্যমেতৎ ত্রয়মিতি' (বৃহদারণ্যক-ভাষ্য, ৫/২/৩৩৭/২)। মনুষ্যজাতির অতিরিক্ত দেব, অসুর ইত্যাদি কিছুই নাই। বস্তুত, মানুষের মধ্যেই যারা মনুষ্যোচিত অন্যান্য উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন হয়েও অদান্তস্বভাব (কামপ্রধান) তারাই দেবতা, যারা লোভপ্রধান তারা মনুষ্য এবং যারা ক্রোধ-হিংসা-পরায়ণ ক্রূরপ্রকৃতি, তারা অসুর নামে অভিহিত হয়। অহিংসাদি ব্রত যখন জাতি, দেশ, কাল ও সময় (পরিমাণের) দ্বারা অনবচ্ছিন্নরূপে পালিত হয়, তখনই তাকে বলা হয় 'সার্বভৌম মহাব্রত' ('জাতি-দেশ-কাল-সময়-অনবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্'। পা. সূ. ২/৩১) আচার্য শঙ্কর বিশেষভাবে নির্দেশ করে বলেছেন — 'এতে ত্বহিংসাদয়ো মহাব্রতসংজ্ঞাঃ সংন্যাসবামনুষ্ঠানীয়াঃ'। সন্ন্যাসীব পক্ষে জাতি-দেশ-কাল-পরিণাম নির্বিশেষে এই মহাব্রতপালন অবশ্য কর্তব্য। আচার্য শঙ্করের এই উক্তিটিকে অবলম্বন করলে সন্ন্যাসাশ্রমে পরিপালনীয় নীতি ও ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁরা শিখা-উপবীত যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়ে সর্ববন্ধবিনির্মুক্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তাঁরা শ্রৌতসমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং সর্বশেষ আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হলেও শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মের তথা বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান (অগ্ন্যাধান প্রভৃতি) আর তাঁদের পক্ষে আবশ্যিক নয়, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের বিধানও তাঁদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে, ধর্মকে ধারণ করার উদ্দেশ্যে এবং সর্বজীবের মঙ্গলকামনায়, তাঁরা নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করে যান, সার্বভৌম মহাব্রত পালনে তৎপর থাকেন, যাবতীয় কর্মের ফল ঈশ্বরার্পণবুদ্ধি-সহকারে সেই ঈশ্বরের মঙ্গলময়, ব্যাপক সত্তাকে তাঁরা প্রতিটি জীবের, প্রতিটি সৃষ্ট পদার্থের কোষে কোষে অনুভব করে থাকেন। এটিই বস্তুত নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। (দ্রঃ ব্র. সূ. শা. ভা. ৩/৩/৩২)[১৬]

সাধকের জন্য নির্দিষ্ট দ্বিতীয় যোগাঙ্গ 'নিয়ম'। 'শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়-ঈশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ' (পা. সূ. ২/৩২)। মৃত্তিকাজলাদির দ্বারা প্রক্ষালন, উপবাস, হবিষ্যান্নগ্রহণ, স্বাঙ্গ জুগুপ্সা. প্রভৃতি 'বাহ্য শৌচ' (শুচিতা), বিপরীতভাবনার দ্বারা কামক্রোধাদি চিত্তমলের আক্ষালন 'আভ্যন্তর শৌচ'; সন্নিহিত বা প্রাপ্ত বিষয়মাত্রের দ্বারা তৃপ্তি এবং অপ্রাপ্তবিষয় প্রাপ্তির তৃষ্ণাপরিহার 'সন্তোষ'; ক্ষুধা-পিপাসা, শীত-উষ্ণ, কাষ্ঠমৌন-আকারমৌন প্রভৃতি বিপরীত অবস্থা বা দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতাকে বলা হয় 'তপঃ'; 'স্বাধ্যায়'-এর অর্থ মোক্ষশাস্ত্র উপনিষদাদি পাঠ বা প্রণবজপ। 'ঈশ্বরপ্রণিধানে'র অর্থ — 'তস্মিন্ পরমগুরৌ সর্বকর্মার্পণম্' — ঈশ্বরে সর্বকর্মসমর্পণ। এই প্রসঙ্গে অদ্বৈতবেদান্তী মধুসূদন সরস্বতীর একটি বাক্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য — 'কর্মনিষ্ঠা এবং জ্ঞাননিষ্ঠা এই উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত বিরোধবশত তাদের সমুচ্চয় সম্ভব নয়। এই জন্য মধ্যমকাণ্ডে ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। সেই ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা সমস্ত বিঘ্ন নাশ করে উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ কর্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠার মধ্যে অনুগত হয়ে থাকে এবং উভয়েরই উপকারক। সেই ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা ত্রিবিধ — কর্মমিশ্রা, শুদ্ধা এবং জ্ঞানমিশ্রা।'[১৭] ভক্তিপূর্বক ঈশ্বরের আরাধনা, তথা ঈশ্বরে ফলার্পণবুদ্ধিতে যাবতীয় কর্মের

অনুষ্ঠান মোক্ষলাভের উপকারক। অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎরূপে মোক্ষের প্রতি কারণ, তথা জ্ঞানমার্গ মোক্ষলাভের প্রতি হেতু; কিন্তু যে চিত্তে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হবে, সেই চিত্তের মলক্ষালন ও বিশুদ্ধতা সম্পাদনের জন্য ক্রিয়ামূলক যোগমার্গ এবং ঈশ্বরানুধ্যানমূলক ভক্তিমার্গ অবশ্য অবলম্বনীয়। ব্রত-উপবাস-নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্মানুষ্ঠানমূলক কর্মমার্গ জীবের চিত্তে ভোগের প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদন করে থাকে এবং তার ফলে চিত্ত বিশেষভাবে সংস্কারযুক্ত হয়ে যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গে প্রবৃত্ত হয়। সংস্কারযুক্ত চিত্তের একাগ্রতা ধারণার জন্য 'প্রসাদ' বা প্রসন্নতা একান্ত প্রয়োজন। বিষয়দোষ দর্শন করলেও শরীরধারণের জন্য জীবজগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে সবাইকেই থাকতে হয়। কিন্তু সেই সম্বন্ধ এমন কৌশলের সঙ্গে রাখতে হবে যাতে তা সাধকের অভীষ্টসিদ্ধির পথে বাধা না হয়ে বরং অনুকূল হয়। যে সমস্ত প্রাণী সুখসম্ভোগাপন্ন তাদের প্রতি অসূয়াদিবর্জিত মৈত্রীভাবনাপন্ন হতে হবে। দুঃখিতের প্রতি করুণা, যারা পুণ্যকর্মশীল, তাদের প্রতি মুদিতা বা আনন্দ এবং যারা অপুণ্যকর্মশীল তাদের প্রতি উপেক্ষা ভাবনা করলে, শুক্ল, উজ্জ্বল ধর্মের আবির্ভাব হয় এবং তখনই চিত্ত 'প্রসাদ' লাভ করে। যাঁরা অদ্বৈততত্ত্বে শ্রদ্ধাশীল হয়েছেন, যাঁরা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পথে অপরোক্ষতত্ত্বলাভ করতে চলেছেন, তাঁরা এইভাবেই অহিংসাদি ব্রত, মৈত্র্যাদিভাবনারূপ ধর্ম, অবশ্যপালনীয় নিত্যকর্ম, সর্বকর্মের ফল ভক্তিসহকারে ঈশ্বরে বা ইষ্টদেবতাতে অর্পণ করে চলেন, সর্বপ্রাণিকল্যাণকামিত্ববশতঃ তাঁরা সর্বজীবে সেই এক আনন্দময়কে অনুভব করেন। এই অবস্থাকে 'নৈষ্কর্ম্যাবস্থা' বলা হয়। 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' গ্রন্থের রচয়িতা সুরেশ্বরাচার্য বিশেষভাবে নৈষ্কর্ম্যাবস্থা ব্যাখ্যার অভিপ্রায়ে বলেছেন 'এইরূপে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠান দ্বারা তথা ঈশ্বরার্পিত কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা পরিশুদ্ধ্যমান চিত্তে ব্রহ্মলোকাদিবিষয়ক সুনির্মল বৈরাগ্য অভিব্যক্ত হয়। যেহেতু রজঃ-তমো-কলঙ্কিতচিত্ত কামনা-পরবশ হয়ে বিষয়ভোগের জন্য পাপস্থানে ধাবিত হয়, সেইজন্য নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম দ্বারা সম্মার্জিত চিত্তের কলঙ্ক দূর হয় এবং বিপরীতভাবনার দ্বারা স্থির প্রসাদগুণবিশিষ্ট হয়ে ওঠে। যখনই বুদ্ধি অশেষ কাম্যবিষয়প্রবৃত্তি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে অবস্থান করে, তখনই স্বয়ং প্রত্যগাত্মাতে প্রবেশের ইচ্ছা হয়। অতঃপর পুরুষের কর্মাধিকার শেষ হয়ে প্রত্যক্প্রবণতারূপ সন্তানে নিজেকে সমর্পণ করে চরিতার্থ হয়। শুদ্ধির দ্বারা বুদ্ধির প্রত্যক্প্রবণতা উৎপাদনপূর্বক কৃতার্থতাবশত বর্ষান্তে মেঘের ন্যায় সমস্ত কর্ম অস্তগামী হয়। নিত্যকর্মানুষ্ঠানের এইরূপ মহিমাবশত যাঁরা আত্মজ্ঞানাভিলাষী, মোক্ষকামী, তাঁর চিত্তশুদ্ধির জন্য সর্বদাই নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের (প্রায়শ্চিত্তাদি) অনুষ্ঠান করেন। একটি বিশেষ পরম্পরাক্রমে কর্ম এইভাবে অবিদ্যানিবৃত্তি ও মোক্ষের প্রতি কারণ হয়, কিন্তু জ্ঞানের মত অবিদ্যানিবৃত্তির প্রতি সাক্ষাৎ কারণ হয়না; কর্ম কর্তৃত্বাদিবুদ্ধিজন্য এবং কর্তৃত্বাদিবুদ্ধি অবিদ্যাজন্য হওয়ায় কর্ম ও অবিদ্যা অবিরোধী।[১৮] উক্ত পরম্পরা বা ক্রমটি হল নিত্যকর্মানুষ্ঠানের দ্বারা ধর্মোৎপত্তি, ধর্মোৎপত্তির দ্বারা পাপহানি এবং চিত্তশুদ্ধি, শুদ্ধিবশতঃ সংসারের প্রকৃত স্বভাবজ্ঞান, তৎপরে বৈরাগ্য,

তৎপরে মুমুক্ষুত্ব, তৎপরে উপায়ান্বেষণ, তৎপরে সর্বকর্ম ও কর্মসাধন ত্যাগ, তৎপরে যোগাভ্যাস, তৎপরে চিত্তের প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রবণতা, তৎপরে তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্যার্থজ্ঞান, তৎপরে অবিদ্যার উচ্ছেদ এবং তৎপরে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান। জ্ঞান দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত অবিদ্যা ধ্বংস না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্তই যথানির্দিষ্ট কর্ম করে যেতে হবে। অতএব অদ্বৈতমতে নৈষ্কর্ম্যের তাৎপর্য কেবল কর্মহীন জ্ঞানচর্চা নয়, মহাবাক্যজ্ঞানজন্য স্বরূপাবস্থান। এই অদ্বৈতস্বরূপস্থিতিতে যদিও জ্ঞানই সাক্ষাৎ কারণ, তবুও অদ্বৈতবেদান্তীর কাছে বেদবিহিত নিত্যকর্মানুষ্ঠানও মহৎ তাৎপর্যপূর্ণ।

নিদিধ্যাসন, উপাসনা বা অধীত বিদ্যাসমূহ বেদের বিভিন্ন শাখায় পঠিত হয়েছে; প্রকরণভেদবশত যদি এই বিদ্যাগুলির মধ্যে ভেদ স্বীকৃত হয়, তবে অদ্বৈততত্ত্বসাধনে পরস্পরবিরোধ এবং অদ্বৈতহানির আশঙ্কা উপস্থিত হয়। যথা — অথর্ববেদাধ্যায়ী ও শ্বেতাশ্বতরাধ্যায়ী মুন্ডকোপনিষদের 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' (মু. উ. ৩/১/১) এই মন্ত্রটি আত্মবিদ্যাপ্রকরণে পাঠ করেন; কঠশাখাধ্যায়ী সেইস্থলে 'ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে' (ক. উ. ১/৩/১) মন্ত্রটি পাঠ করেন। 'দ্বা সুপর্ণা' মন্ত্রে জীবাত্মার ভোক্তৃত্ব ও পরমাত্মার অভোক্তৃত্ব বর্ণিত হয়েছে, 'ঋতং পিবন্তৌ' মন্ত্রে ছত্রিন্যায়ে উভয়েরই ভোক্তৃত্ব কল্পিত হয়েছে। সমাধানে বলা হয়েছে—দুটি মন্ত্রেই দ্বিত্বসংখ্যার ব্যবহার লক্ষিত হয়। বেদ্য বস্তু তুল্যধর্মযুক্ত না হলে এইভাবে দ্বিবচন বা দ্বিত্বসংখ্যার প্রয়োগ করা যায় না। চেতন ব্যতিরেকে ভোক্তৃত্বদ্রষ্টৃত্বাদি ধর্মের আধান সম্ভব নয়। অতএব, জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়েই চেতনত্ব হল সেই তুল্যধর্ম; পুনরায়, জীবাত্মা-পরমাত্মা ব্যতিরেকে অপর কোন চেতন না থাকায় চেতন পরমাত্মাই চেতন জীবাত্মার তুল্য একথা স্বীকার করতে হবে। চেতন বা চৈতন্যের অবচ্ছেদ সম্ভব নয়, ফলত জীবাত্মা-পরমাত্মা স্বরূপত এক ও অভিন্ন। ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে বিভিন্ন শাখায় অধীত বিদ্যার একত্ব বিষয়ে আচার্য শঙ্কর ভাষ্যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। উষস্ত ও কহোলব্রাহ্মণে অধীত আত্মবিদ্যা, বিভিন্ন শাখায় পঠিত 'অহংগ্রহ উপাসনা' ও 'ব্যতিহার উপাসনা', বৃহদারণ্যকের ৫/৪ ও ৫/৫ ব্রাহ্মণে পঠিত 'সত্যবিদ্যা' তথা 'উদ্‌গীথবিদ্যা' ও 'সত্যবিদ্যা'র একত্ব, একত্র উপাসনা, অন্যত্র স্তুতির উদ্দেশ্যে পঠিত সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার একত্ব, 'প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যা' ও সম্বর্গবিদ্যা' প্রয়োগত ভেদ ও স্বরূপত অভেদ, 'মনশ্চিত অগ্নিবিদ্যা' প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্যার একত্ব উক্ত অংশে প্রমাণিত হয়েছে। প্রত্যেক শাখাস্থ বিদ্যা বা উপাসনার একত্ব প্রতিপাদনে আচার্য শঙ্কর পূর্বমীমাংসা সম্মত 'দ্বাদশ হেতু'কে দ্বার করেছেন এবং স্বসিদ্ধান্তের অনুকূলে 'একং বা সংযোগরূপচোদনাখ্যাবিশেষাৎ' (জ. সূ. ২/৪/৯) এই জৈমিনীয়সূত্রটিকে উল্লেখ করেছেন। এই সূত্রটির বক্তব্য হল — সর্বশাখাপ্রত্যয় এবং সর্বব্রাহ্মণপ্রত্যয় একটি কর্মই উপদিষ্ট হয়েছে। শাখাভেদের কারণে কর্মের ভেদ হতে পারে না। কারণ, একই ফলের জন্য একটি কর্ম সকল শাখাতেই বিহিত হয়েছে, সর্বত্রই যখন কর্মের দ্রব্য, দেবতা ও

নাম অভিন্ন এবং সকল স্থলেই যখন একই প্রকার প্রযত্নের দ্বারা কর্ম নিষ্পন্ন হয়, অথবা, সর্বত্রই একই প্রকারের বিধি যখন দৃষ্ট হয়, তখন এইসমস্ত কারণের অস্তিত্ববশত বিভিন্ন শাখায় উক্ত হলেও কর্মস্বরূপটি যে অভিন্ন, তা স্বীকার করতে হয়; বিশেষত 'এটি সেই কর্ম' এই অভেদ প্রত্যভিজ্ঞাও থাকে। সুতরাং সেই একই ফল, একই রূপ, একই চোদনা/প্রবৃত্তি এবং একই নাম থাকায় শাখাভেদ হলেও কর্মের ভেদ হবে না। এইজন্য বার্ত্তিককার বলেছেন — 'সর্বত্র প্রত্যভিজ্ঞানাৎ সংজ্ঞারূপ গুণাদিভিঃ। এককর্মত্ববিজ্ঞানং ন শাখাস্বপগচ্ছতি।।' অর্থাৎ সংজ্ঞা, রূপ এবং গুণাদিবশত যখন অভেদ প্রত্যভিজ্ঞা আছে, তখন ভিন্ন ভিন্ন শাখাতেও কর্মের যে একত্ব প্রতীতি হয়, তার অন্যথা হবে না। অতএব সর্বশাখাপ্রত্যয় এবং সর্বব্রাহ্মণপ্রত্যয় কর্ম একই। সর্বশাখাপ্রত্যয় অর্থ সর্বশাখাপ্রমাণ। একই শাখার ব্রাহ্মণ ভিন্ন ভিন্ন হলেও এবং তাতে একই কর্ম পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হলেও কর্মের ভেদ হবে না। (দ্রঃ মী. সূ. ২/৪/৯, শাবরভাষ্য) পূর্বে উল্লিখিত মীমাংসাসম্মত ভেদগ্রাহক দ্বাদশহেতু হল (১) নাম, (২) রূপ, (৩) ধর্ম, (৪) পুনরুক্তি, (৫) নিন্দা, (৬) অশক্তি, (৭) সমাপ্তি, (৮) প্রায়শ্চিত্ত, (৯) অন্যার্থদর্শন, (১০) সংখ্যা, (১১) শব্দান্তর এবং (১২) প্রকরণ; ভেদগ্রাহক হলেও এই হেতুগুলিকেই সিদ্ধান্তপক্ষ ভেদনিরাকরণের উদ্দেশ্যেও প্রয়োগ করে থাকেন। পূর্বমীমাংসাসম্মত প্রক্রিয়াবিশেষ সম্বন্ধে এই আলোচনার মাধ্যমে এটি পরিস্ফুট যে, প্রক্রিয়া অংশে অদ্বৈতবেদান্তী পূর্বমীমাংসাপ্রক্রিয়াকে যথাপ্রয়োজন গ্রহণ করে থাকেন, সেই অর্থে উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত বিরোধ নাই; বরং আস্তিকদর্শনসম্প্রদায়ে উভয়ের সুসমঞ্জস সহাবস্থান স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

এই পর্যন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য — এই ত্রিবর্ণ আশ্রমবিধি অনুসরণ করে কর্মমার্গ-উপাসনামার্গ-জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে কিভাবে পরমপুরুষার্থ লাভ করবে, তা আলোচিত হল। কিন্তু বিপত্নীক হওয়ার ফলে যারা অনাশ্রমী এবং স্ত্রীলোক ও শূদ্রবর্ণ যাদের উপনয়নের দ্বারা সংস্কার হয় না এবং বিহিত বেদপাঠে যাদের অধিকার নাই, তাদের জন্য অদ্বৈতবেদান্তসম্প্রদায়ে কি ব্যবস্থা প্রকল্পিত হয়েছে? অর্থাৎ এই সমস্ত ব্যক্তির ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে না নাই? বিপত্নীক ব্যক্তির আশ্রমকর্মে অধিকার না থাকায় তাঁর কর্ম জ্ঞানের সাধনরূপেও সফল হবে না; উত্তরে বলা হয়েছে, বিপত্নীক, অন্তরালবর্তী অর্থাৎ যাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম শেষ হলেও গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ হয়নি, সপত্নীক কিন্তু দরিদ্র, অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি শ্রৌতকর্মে অনধিকারী ব্যক্তিদের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে।[১১] এই বিষয়ে শঙ্করাচার্য শ্রুতি ও স্মৃতি বলে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। যুক্তির দিক থেকে বিচার করলে, শ্রৌতকর্ম ব্যতীত জপ, উপবাস, দেবার্চনা, যমনিয়মাদির অভ্যাস প্রভৃতি ধর্মবিশেষের অনুগ্রহবশত ব্রহ্মবিদ্যোপপত্তি সম্ভব। এতদ্ব্যতীত, জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত আশ্রমকর্ম, সঞ্চিত শুভকর্ম ও যোগজনিত সংস্কারসমূহের দ্বারা শ্রৌতকর্মবিহীন ব্যক্তি

পরা গতি লাভ করেন। বিশেষত অনাশ্রমী ও সন্ন্যাসাতিরিক্ত আশ্রমীর ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তি হবে না এরূপ প্রতিষেধ কোথাও দৃষ্ট হয় না। অতএব, ব্রহ্মবিদ্যার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রবণাদিতে অধিকার অবশ্যস্বীকার্য। শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'সম্বর্গবিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার স্বীকৃত হলেও শ্রৌতব্রহ্মবিদ্যাতে তার অধিকার নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদে সম্বর্গবিদ্যা আলোচিত হয়েছে। সম্বর্গ শব্দটির অর্থ সম্যক গ্রাসকারী তথা সম্যক্ লয়স্থান; ছান্দোগ্যে 'বায়ুই সম্বর্গ' প্রভৃতি বাক্যে বায়ু অধিদৈবত অগ্নি প্রভৃতির সম্বর্গরূপে অবধারিত হয়েছেন এবং 'প্রাণই সম্বর্গ' প্রভৃতি বাক্যে মুখ্যপ্রাণ অধ্যাত্ম বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলের সম্বর্গরূপে অবধারিত হয়েছেন। অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতরূপে প্রাণ ও বায়ুর ভেদ গ্রহণ করা হলেও 'যা প্রাণ, তাই বায়ু' (বৃহদারণ্যক ৩/৪/৫) এই বাক্যবলে উভয়ের স্বরূপত অভেদ গ্রহণ করা হয়। এখন আপত্তি হল যে, বেদবিধি অনুসারে উপনয়নের পরে যিনি বেদ অধ্যয়ন করেছেন, বেদের অর্থ সম্যক্‌রূপে অবগত হয়েছেন, তিনিই কেবলমাত্র বেদপ্রতিপাদিত বিষয়ে অধিকারী; উপনয়ন কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই বর্ণত্রয়কে বিষয় করে, অতএব উপনয়নবিহীন শূদ্রের বেদাধ্যয়নে তথা বেদবিহিত ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নাই। ধনসম্পত্তি, শারীরিক ও মানসিক পটুতা প্রভৃতি লৌকিক সামর্থ্যও এই অধিকারের প্রতি হেতু হতে পারে না, কারণ শাস্ত্রীয় অধিকার কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় সামর্থ্যকেই অপেক্ষা করে। শাস্ত্রবিহিত উপনয়নের দ্বারা সংস্কারযুক্ত হলে তবেই শাস্ত্রীয় সামর্থ্য উৎপন্ন হয়। এই বিষয়ে স্মৃতিবাক্যকেও প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে বিদুর, ধর্মব্যাধ প্রভৃতি শূদ্রজাতীয় ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে পূর্বকৃতকর্ম-সংস্কারের হেতুতাও স্বীকার করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, ইতিহাস-পুরাণাদি-স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের দ্বারা বিহিত ধর্মবিষয়ক জ্ঞানে শূদ্রজাতিকেই মুখ্য অধিকারীরূপে গণ্য করা হয়েছে। দেবতাগণ ত্রিবর্ণের অন্তর্গত না হওয়ায়, উপনয়নাদির অভাববশত শূদ্রজাতির ন্যায় তাঁদেরও শ্রৌতব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নাই — এই আপত্তির উত্তরে বলা হয়েছে যে, যথার্থই শ্রৌতব্রহ্মবিদ্যাতে দেবতাগণের অধিকার না থাকলেও যেহেতু তাঁরা স্বয়ং প্রতিভাতবেদ, অতএব শূদ্রের সঙ্গে তাঁদের অধিকার প্রসঙ্গে এইটুকুই মাত্র ভেদ। দেবতাদের মত শূদ্র স্বয়ংপ্রতিভাতবেদ নয়, পরন্তু বেদাধ্যায়নবর্জিত; সেইহেতু বিদ্যালাভের অধিকারের প্রতি হেতু যে বিদ্বত্তা, তার অভাববশত শূদ্রের শ্রৌতব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নাই। গৌতম-ধর্মসূত্রে বেদশ্রবণকারী শূদ্রের কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে বলা হয়েছে—'নিকটে উপস্থিত বেদশ্রবণকারী শূদ্রের কর্ণবিবর ত্রপু (সীসা) ও জতুর (গালা) দ্বারা পরিপূরণ হয়'[২০] ইত্যাদি। কিন্তু বিদুর, ধর্মব্যাধ প্রভৃতির ধর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রসিদ্ধ; স্বয়ং মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, যিনি মহাভারত ও অষ্টাদশপুরাণের রচয়িতারূপে প্রসিদ্ধ, তিনিও ছিলেন শূদ্রাজাত; সত্যকাম জাবাল, ইতরাপুত্র ঐতরেয় প্রভৃতি শূদ্রাজাতের বিদ্যার্থিত্বও প্রসিদ্ধ।

তবে শূদ্রের বেদাধ্যয়ননিষেধ বা প্রায়শ্চিত্তের যথার্থ তাৎপর্য কোথায়? শাঙ্করভাষ্যে বলা হয়েছে — 'যেষাং পুনঃ পূর্বকৃতসংস্কারবশাৎ বিদুরধর্মব্যাধপ্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তিঃ, তেষাং ন শক্যতে ফলপ্রাপ্তিঃ প্রতিষেদ্ধুম্ জ্ঞানস্য ঐকান্তিকফলত্বাৎ। 'শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্' ইতি চ ইতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্বর্ণস্য অধিকারস্মরণাৎ। বেদপূর্বকস্তু নাস্তি অধিকারঃ শূদ্রানাম্ ইতি স্থিতম্।' (ব্র. সূ. ১/৩/৩৮) বিদুর, ধর্মব্যাধ প্রভৃতির পূর্বজন্মকৃত সংস্কার বলে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তাঁদের মোক্ষরূপ ফলপ্রাপ্তির প্রতিষেধ সম্ভব নয়, যেহেতু জ্ঞানের ফল অবশ্যম্ভাবী। সিদ্ধ শূদ্রের মোক্ষফলপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী যেরূপে সেইরূপেই সাধক শূদ্রের জ্ঞানলাভে চার বর্ণেরই অধিকার স্মৃতিতে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, ইতিহাসপুরাণ থেকেই শূদ্রের জ্ঞানলাভ সম্ভব, কিন্তু বেদপূর্বক জ্ঞানোৎপত্তিতে তার অধিকার নাই (ঐতরেয়ব্রাহ্মণ — সায়ণভাষ্য)। বেদের স্বরূপ কি? 'শিক্ষা' নামক বেদাঙ্গ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বিবৃত 'শীক্ষা-উপনিষদে' বলা হয়েছে বিহিত ক্রম ও স্বরাদিবিশিষ্ট যে বেদগ্রন্থেপঠিত বর্ণ সেটিই বেদের স্বরূপ বা সংহিতা। অদ্বৈতবেদান্তগ্রন্থ পঞ্চপাদিকাবিবরণে বলা হয়েছে 'তত্তৎ ক্রমবিশিষ্টানাম্ এব বর্ণানাং বেদশব্দাভিধেয়ত্বাৎ' (বিবরণ ১/১/৩); বেদে পঠিত ককারাদি বর্ণ ও লৌকিক যে ককারাদি বর্ণ, তাদের মধ্যে কোনপ্রকার ভেদ নাই। কিন্তু উক্ত ক্রম (আনুপূর্বী) ও স্বরাদি যোজিত হলে তবেই সেটি বিধিরূপতা প্রাপ্ত হয় এবং ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের উপায়রূপে গৃহীত হয়, তথা বেদরূপতা প্রাপ্ত হয়। এইপ্রকারে 'শিক্ষাবিহিত' ক্রম ও স্বরাদিবিশিষ্টরূপে শ্রুতির বর্ণসকলের যে অধ্যয়ন, তাকে বলা হয় 'স্বাধ্যায়' বা বেদাধ্যয়ন। ক্রম ও স্বরসহযোগে গুরুকর্তৃক উচ্চারিত শ্রুতিপঠিত বর্ণসকলের উচ্চারণ করতে করতে বেদব্রতাদিসহ যে 'সাঙ্গে' বেদগ্রহণ, সেটিই 'স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ' এই অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ বেদগ্রহণ। সুতরাং, ক্রম ও স্বরাদিহীন যে বেদাক্ষরের উচ্চারণ তাকে মুখ্য বেদপাঠ বলা যায় না; এইরূপ পাঠে বেদের সংস্কারও হয়না, পাঠকের বেদপাঠজনিত পাপ বা পুণ্য কোনপ্রকার অদৃষ্টও উৎপন্ন হয় না; ফলত যথাবিধি গৃহীত ও অধীত না হলে সেই বেদাধ্যয়নের দ্বারা বেদার্থবিষয়ক যে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তাকে আর বেদপূর্বক বেদার্থজ্ঞান বলা যায় না। উপনয়নসংস্কারের অভাববশত শূদ্রের পক্ষে অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ বেদগ্রহণ এবং বেদব্রত-ক্রম-স্বরাদিসহ অনুচ্চারণের অভাববশত তাকে আর বিধিসিদ্ধ বেদগ্রহণ বলা যায় না, সুতরাং তজ্জনিত জ্ঞানকেও বেদপূর্বক জ্ঞান বলা যাবে না। সেটি শূদ্রের পক্ষে বস্তুত ইতিহাস ও পুরাণ শ্রবণেরই সমান। ব্রহ্মবিদ্যা তথা অদ্বৈততত্ত্ব প্রধানত উপনিষদ গ্রন্থের উপজীব্য; উপনিষদের বাক্যগুলি বেদের অর্থবাদ অংশে পঠিত হয়, বিধির অংশে নয়; সুতরাং উপনিষৎ পাঠেও একই যুক্তিতে শূদ্রজাতির কোন বাধা থাকা উচিত নয়। শূদ্রের বেদশ্রবণে প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থাপক যে বাক্য সেটির তাৎপর্য

মুখ্যত বেদশ্রবণনিষেধের গুরুত্ববিবেচনার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা উচিত, আক্ষরিক অর্থে কর্ণপরিপূরণাদিব্যবস্থা গ্রহণ অদ্বৈতসাধকের সার্বভৌম মহাব্রতপালনের পরিপন্থী, সুতরাং এই ব্যবস্থা অদ্বৈতবেদান্তীর কাছে কখনই সমাদরণীয় নয়। গুণকর্মগতজাতিভেদ অথবা ভাট্টসম্মত জন্মগতজাতিভেদ, যেটিই স্বীকার করা হোক না কেন, সনাতন বৈদিক ধর্মে কোন বর্ণে কোন আশ্রমে কখনও কারও জিজ্ঞাসানিরসন বা তাত্ত্বিক জ্ঞানলাভ বা যোগ্যতা অনুযায়ী পুরুষার্থসিদ্ধিতে কোনও প্রকার বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছে এমন কোনও শাস্ত্রবাক্য বা ইতিহাস আখ্যানাদি দেখা যায় না। বরং প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব যোগ্যতা অনুযায়ী উত্তরণের পথনির্দেশের সাক্ষ্য সর্বত্র পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে, স্ত্রীলোকের পক্ষেও আত্মিক উন্নতির জন্য ক্রমস্বরাদিবিহীন বেদপাঠ , যা সাধারণ সাহিত্যপাঠের সমতুল্য, তাতে কোনও নিষেধ নাই। কিন্তু ইচ্ছামাত্র স্বরপ্রয়োগ এবং বিহিত অনুষ্ঠান (যজ্ঞাদি) ভিন্ন অন্যত্র অধিকারী অথবা অনধিকারীর বেদগায়ন বা পাঠ সর্বশাস্ত্রনিষিদ্ধ ও নিন্দিত। শূদ্রত্বসম্পর্কে অদ্বৈতবেদান্তীর ধারণাও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করে যে, বেদের বেদত্বরক্ষা করেও সর্বজনের হিতের জন্য কি প্রকারে ধর্মচর্চা নির্ধারিত হতে পারে। তাঁদের মতে, জাতিগত শূদ্রভিন্ন ব্রাহ্মণ্যধর্ম থেকে বিচ্যুত ব্রাহ্মণও শূদ্ররূপে পরিগণিত হবেন, এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই পূর্বোক্ত বেদপাঠসম্পর্কিত নিষেধ বলবৎ থাকবে। ব্রাহ্মণের শূদ্রত্বপ্রাপ্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে — 'যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ'(মনুসংহিতা ২/১৬৮),'ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ' (মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৮৯/৭), 'বেদসন্ন্যাসতঃ শূদ্রস্তস্মাৎ বেদং ন সন্ন্যসেৎ' (বশিষ্ঠ সং ১২), 'ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী। বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্বং লোভাত্ত্বজ্ঞানতাং গতাঃ'।। (মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৮৮/১৫), মুখ্যত বেদসন্ন্যাস বা বেদপরিত্যাগ ব্রাহ্মণ্যনাশ ও শূদ্রতাপ্রাপ্তির প্রতি হেতু। সেই কারণে বেদসন্ন্যাসের অভাব যে স্থলে আছে সেইস্থলে ব্রাহ্মণ্যস্থিতি অবশ্য স্বীকার্য, কিন্তু বেদ শব্দের যথার্থ তাৎপর্য যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে, তাকে কোনস্থলেই উল্লঙ্ঘন করা যাবে না। অর্থাৎ, জাতিশূদ্রের ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তি সাঙ্গবেদাধ্যয়নের অভাববশত কখনই সম্ভব নয়, যদিও বেদের তত্ত্বগ্রহণে কোনো নিষেধ জাতিশূদ্রের ক্ষেত্রে নাই। স্ত্রীলোকেরও একইভাবে উপনয়নাদি সংস্কারের অভাববশত সন্ন্যাসে অথবা শ্রৌতব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার স্বীকৃত নয়। শারীরিক অক্ষমতাবশত অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য শ্রৌতকর্মে স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র অধিকার, উপনয়ন ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম গ্রহণ প্রভৃতির নিষেধ করা হয়েছে। যদিও গৃহী যজমানের শ্রৌতকর্ম তখনই সুসম্পন্ন হবে, যখন তিনি সপত্নীক অনুষ্ঠান করবেন, অন্যথা নয়। শ্রৌতবিদ্যার ক্ষেত্রে একইভাবে উপনয়নাদিসংস্কারের অভাববশত 'স্বাধ্যায়' বা ক্রমস্বরাদিসহিত বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ হলেও আগমশাস্ত্রপাঠ স্বরাদিবিহীন বেদপাঠ,

লিখিতপাঠ, প্রভৃতির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করায় কোন বাধা নাই। বিশেষত নিত্য-অনিত্য-বস্তু-বিবেকজ্ঞান দ্বারা যাঁর চিত্ত মার্জিত হয়েছে, এবং যিনি স্ত্রী-পুরুষ-সংস্কার বা ভাবনা মুক্ত তাঁর বিদ্যোপযোগিত্ব স্বীকারে কোন বাধা নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ ও যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীসংবাদে স্পষ্টত দেখা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্য গার্গী ও মৈত্রেয়ীকে তাঁদের অভিলষিত ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন। কঠোপনিষদের শাঙ্করভাষ্যে অগ্নিবিদ্যাসম্পর্কিত আলোচনাকালে অগ্নিত্বের প্রমাণপুরুষরূপে মাতা, পিতা ও আচার্য নির্দিষ্ট হয়েছেন; এই বিষয়ে 'মাতৃমান্ পিতৃমান্' শ্রুতিবাক্যটি প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হয়েছে। অগ্নিতত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভতত্ত্বের জ্ঞান না থাকলে সেই বিষয়ে প্রমাণপুরুষত্ব লাভ করা যায় না; সুতরাং, মাতার তজ্‌জ্ঞানবত্তা এইস্থলে প্রমাণিত এবং এই হিরণ্যগর্ভতত্ত্বের জ্ঞান শ্রৌতজ্ঞান বিশেষ। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, স্ত্রীলোকের সন্ন্যাসগ্রহণ বর্ণাশ্রমধর্মবিরুদ্ধ রূপে গৃহীত বলেই সম্ভবত আচার্য শঙ্করের এই বিষয়ে নীরবতা বা উপেক্ষা লক্ষ্য করা যায়। গার্গী, সুলভা প্রভৃতি ব্রহ্মচারিণীরূপে বর্ণিত হলেও শিখা-উপবীত বিসর্জনপূর্বক আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসগ্রহণের কোন অবকাশ নারীসম্প্রদায়ে নাই বলে এই বিষয়ে আলোচনা নিরর্থক বলে সম্ভবত মনে করা হয়। তবে উপনিষৎ অবলম্বন করে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণনাকালে চতুর্বিধ ভূতগ্রামের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেস্থলে অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চারটি প্রকারের কথাই বলা হয়েছে। স্ত্রীপুরুষভেদ সেস্থলেও উল্লিখিত হয়নি, তেমনই ব্রহ্মসূত্রে রংহত্যধিকরণে অথবা বৃহদারণ্যক উপনিষদে অথবা ছান্দোগ্য উপনিষদে মৃত্যুকালে শরীর থেকে জীবের উৎক্রান্তি ও গতিবিধি সম্পর্কেও সামান্যত 'জীব' শব্দেরই ব্যবহার করা হয়েছে, সেস্থলেও স্ত্রীপুরুষ ভেদ অনুচ্চারিত। একইভাবে জীবের বদ্ধদশা বা ভোগ এবং মোক্ষদশাবর্ণনা কালেও 'জীব' শব্দের সামান্যপ্রয়োগ দেখা যায়। বস্তুত, তত্ত্ববিচার কালে স্ত্রীপুরুষভেদ বিদ্বানের কাছে কখনই অভিপ্রেত নয় — উপসংহারে এই কথা বলা যেতে পারে। সুতরাং, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে যিনি বৈরাগ্যবান, শমদমাদিসম্পন্ন, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকবান, ইহ-অমুত্র-ফলভোগ-বিরক্ত এবং জিজ্ঞাসু তাঁরই সামান্যতব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার অদ্বৈতবেদান্ত সম্প্রদায় স্বীকার করেন, সেস্থলে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ বা লিঙ্গভেদ কখনও বাধা হতে পারে না। তবে অধিকার স্বীকৃত হলেও অধিকারীর যোগ্যতাভেদ তথা সংস্কার অনুযায়ী মনোবৃত্তির ভেদ তত্ত্বলাভের প্রক্রিয়া নির্বাচনের পক্ষে নিয়ামক। সেই কারণে শ্রৌতব্রহ্মবিদ্যা, তথা শাণ্ডিল্য-দহরাদি বিভিন্ন বিদ্যাসহকৃত বিহিত কর্মানুষ্ঠানজন্য-সংস্কারযুক্ত চিত্তে আত্মজ্ঞানোদয় এবং স্মার্তব্রহ্মবিদ্যা, তথা বিভিন্ন সূত্র-ভাষ্য, রামায়ণ-মহাভারত, বা ইতিহাস, পুরাণ, আগমের তত্ত্বগ্রহণ ও তন্নির্দিষ্ট উপায়ে সংস্কারযুক্ত চিত্তে আত্মজ্ঞানোদয়, উভয় পক্ষেই অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করা সম্ভব, অদ্বৈতবেদান্তের এটিই সার্বভৌম নীতি।।

টীকা ও তথ্যপঞ্জী

১। 'স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুর্মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্মং গ্রাহয়ামাস বেদোক্তম .... বৈদিকো ধর্মঃ তদধীনত্বাদ্ বর্ণাশ্রমভেদানাম্'। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-শাঙ্করভাষ্য-উপোদ্ঘাত)।

২। 'অভ্যুদয়ার্থোঽপি যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্মঃ ... তদ্বিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে ময়া'। (ঐ)

৩। 'তস্য অস্য গীতাশাস্ত্রস্য সংক্ষেপতঃ প্রয়োজনং ... ইহ অপি চ অন্তে উক্তম্ অর্জুনায় 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' ইতি।' (ঐ)

৪। 'অপেক্ষতে চ বিদ্যা সর্বাণি আশ্রমকর্মাণি... বাহ্যতরাণি যজ্ঞাদীনি ইতি বিবেক্তব্যম। (ব্রহ্মসূত্র- শাঙ্করভাষ্যঃ ৩/৪/২৬-২৭)

৫। শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ ... স বেদ ইতি শ্রুতেঃ'। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা- শাঙ্করভাষ্য ৪/৩৩)

৬। 'তথা চ উক্তং শেষলক্ষণে ... কর্মকাণ্ডেন অস্যৈকবাক্যতাবগতিঃ'। (ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্য ৩/৪/২০)

৭। 'বিরজ্য বিষয়ব্রাতাদ্ দোষদৃষ্ট্যা মুহুর্মুহুঃ। স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে।' (বিবেকচূড়ামণি, শ্লোক-২২)

৮। 'বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্য স্থাপনং স্বস্বগোলকে। উভয়েষামিন্দ্রিয়াণাং স দমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।' (ঐ, শ্লোকে-২৩)

৯। 'বাহ্যানালম্বনং বৃত্তেরেষোপরতিরুত্তমা।' (ঐ শ্লোক-২৩)

১০। 'সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্বকম্। চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে।' (ঐ শ্লোক-২৪)

১১। 'শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যবধারণম্। সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভির্যয়া বস্তূপলভ্যতে।।' (ঐ শ্লোক-২৬)

১২। 'সর্বদা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি সর্বথা। তৎ সমাধানমিত্যুক্তং ন তু চিত্তস্য লালনম্।।' (ঐ শ্লোক-২৬)

১৩। 'ধারণং ধৃতিঃ। তস্যাঃ কারণং শরীরমিন্দ্রিয়াণাম্। ন হি শরীরমপ্রাপ্য ইন্দ্রিয়াণি ধৃতিং লভন্তে। তানি চেন্দ্রিয়াণি তস্য শরীরস্য ধৃতিকারণং ভবন্তি। ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারেণ হি শারীরং ধ্রিয়তে। তথা মহাভূতান্যাকাশাদীনি শরীরাণাং ধৃতিকারণম্। মহাভূতারব্ধানি হি শবীরাণি ব্রহ্মাদিস্তম্বাবসনানি পরস্পরম্ উপকার্য্যোপকারকত্বদ্বারেণ ধৃতিকারণম্। তথা সর্বেষাং পদার্থানাং তৈর্যগ্যৌনমানুষদৈবতানি ধৃতিকারণম্। কুতঃ? পরস্পরার্থত্বাৎ। ... এবং বর্ণাশ্রমাণামপ্যন্যোন্যোপকারেণ ধৃতিকারণত্বম্। পরস্পরোপা শ্রয়েণ হি জগদখিলমপিধ্রিয়তে।' (শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত পাতঞ্জলসূত্র-ব্যাসভাষ্য-বিবরণ)।

১৪। 'ন হি যথাকামচারিণাং যোগাধিকারঃ। ... যমনিয়ময়োশ্চ যমস্য প্রথমোপাদানং প্রাধান্যখ্যাপনার্থম্। যমস্য হি প্রাধান্যং সর্বত্র সিদ্ধম্। যমনিয়মযুক্তস্যাধিকৃতস্য যোগিন আসনাদ্যঙ্গানাং পূর্বপূর্বে স্থিরপদপ্রাপ্তস্য উত্তরোত্তরানুষ্ঠানং প্রাপ্তম্। ন হি প্রথমসোপানমনারুহ্য উত্তরামারোঢুং শক্যম্। যদন্যত্রোচ্যতে 'স্থানাসনবিধানানি যোগস্য বিধয়োঽপি বা।ব্যাক্ষেপজনকাঃ সর্বেন তে যোগস্য হেতবঃ।।সর্বদোষপরিত্যাগঃ সমাধিশ্চেতি তদ্দ্বয়ম্।' (ঐ. সূত্র-সংখ্যা-২/২৯)

১৫। 'তস্মাৎ পরীক্ষ্য সর্বহিতং সত্যং ব্রয়াৎ উক্তং চ সত্যং ব্রুয়াৎ। প্রিয়ং ব্রুয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রুয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।।' (ঐ. সূত্র-সংখ্যা-২/৩৩)

১৬। 'তেষাম্ অপান্তরতমঃ প্রভৃতীনাং .... যুগপৎ ক্রমেণ বা অধিতিষ্ঠন্তি'। (ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্য ৩/৩/৩২)

১৭। 'কর্মনিষ্ঠাজ্ঞাননিষ্ঠে কথিতে প্রথমান্ত্যয়োঃ ... জ্ঞানমিশ্রা চ সা ত্রিধা।' (গীতাভূমিকা-গূঢ়ার্থদীপিকা। শ্লোক-৫-৭)

১৮। 'এবং নিত্যনৈমিত্তিককর্মানুষ্ঠানেন শুধ্যমানং তু তচ্চিত্তমীশ্বরার্পিতকর্মভিঃ .... কর্মাবিদ্যাং নিরস্যতি।' (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, শ্লোক সংখ্যা ৪৭-৫২)

১৯। দ্রষ্টব্য: 'বিধুরাধিকরণম্': ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্য, ৩/৪/৩৬ - ৩/৪/৩৯।

২০। দ্রষ্টব্য: 'অপশূদ্রাধিকরণম্': ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্য, ১/৩/৩৪ - ১/৩/৩৮।

গ্রন্থপঞ্জী

কঠোপনিষৎ-শাঙ্করভাষ্যসমেতা, অনুবাদ ও সম্পাদক ঃ পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য- বেদান্ততীর্থ; প্রকাশক ঃ শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত, লোটাস লাইব্রেরী, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।

জৈমিনীয়সূত্রম্, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশনা ঃ শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দ।

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ, শ্রীসুরেশ্বরাচার্য রচিত

পাতঞ্জলসূত্র-ব্যাসভাষ্য-বিবরণটীকা (শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যকৃত), সম্পাদনা ও প্রকাশনা: পোলকম্ শ্রীরাম শাস্ত্রী, এস. আর. কৃষ্ণমূর্থি শাস্ত্রী ও টি. চন্দ্রশেখরণ, মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, মূল পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ১৯৫২।

বিবেকচূড়ামণিঃ, শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্যরচিত, অনুবাদ ও প্রকাশনা ঃ স্বামী বেদান্তানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রাঁচী,

বেদান্ত দর্শন - ব্রহ্মসূত্র - শাঙ্করভাষ্য, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত।

বৈশেষিকসূত্রম্, শ্রীশঙ্করমিশ্রকৃত উপস্কারটীকাসহিত, সম্পাদক ঃ শ্রী নারায়ণ মিশ্র, বারাণসী;

চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ,
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ-শাঙ্করভাষ্যসমেতা, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ; প্রকাশক ঃ শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, দেবসাহিত্য কুটীর,
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা - গূঢ়ার্থদীপিকাটীকা, মধুসূদন সরস্বতী। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্তৃক অনূদিত। নবভারত পাবলিশার্স,
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-শাঙ্করভাষ্যসমেতা, হিন্দী সংস্করণ, গোবিন্দভবন কার্যালয়, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর।
সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যরচিত, সম্পাদনা ও প্রকাশনা ঃ এম. রঙ্গাচার্য, অজয় বুক সার্ভিস,

বিধির অর্থ বিষয়ে অনুনৈতিক পর্য্যালোচনা

ইন্দ্রাণী সান্যাল

আস্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতীয় দার্শনিকের কাছে শ্রুতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিধি-মন্ত্র-নামধেয়-অর্থবাদ-নিষেধাত্মক যে শ্রুতি বা বেদ, তা ঈশ্বর কর্তৃক রচিত কিংবা নয় এই বিষয়ে মতদ্বৈধতা সত্ত্বেও কোন আস্তিক্য বুদ্ধি সম্পন্ন ভারতীয় দার্শনিক বেদের প্রামাণ্য সম্পর্কে দ্বিধা প্রকাশ করেন নি। বিধি প্রসঙ্গে আস্তিক্য মনোভাবাপন্ন ভারতীয় দার্শনিকেরা বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্থাপন ও নিরসন করার প্রয়াস করেছেন। তবে লক্ষ্য করা যায় যে দার্শনিক আলোচনায় 'বিধি' শব্দটি একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। মহর্ষি গৌতম যখন বলেন 'বিধির্বিধায়কঃ' এবং ন্যায়ভাষ্যে যখন বলা হয় 'যদ্ বাক্যং বিধায়কং চোদকং স বিধিঃ, (অর্থাৎ যে বাক্য প্রণোদিত করে তাই বিধি), তখন স্পষ্টত বিধি বলতে বিধিবাক্য বোঝানো হয়েছে। সুতরাং 'বিধি' শব্দের একটি অর্থ বিধিবাক্য এবং বেদবাক্যই বিধিবাক্য। মীমাংসা শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে 'চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ',[১] অর্থাৎ চোদনা বা বিধিবাক্য দ্বারা জ্ঞাপিত অর্থকে ধর্ম বলে। 'চোদনা' শব্দের দ্বারা প্রবর্তনা বিধায়ক বিধিবাক্য এবং পরোক্ষভাবে নিবর্তনা বিধায়ক নিষেধবাক্য এই দুই-ই বোঝানো হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, বিধিবাক্যে যে বিধিলিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয় থাকে তার অর্থকেও 'বিধি' বলা হয়ে থাকে এবং কেউ কেউ লিঙ্, লোট্ ইত্যাদি প্রত্যয়কেই বিধি বলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে 'বিধি' শব্দটি অর্থবিধিবাদসম্মত পরিভাষায় গৃহীত হয়েছে। বিধি প্রত্যয়ের অর্থ বিষয়ে নানা আলোচনা ও মতভেদ আছে। এই বিষয়ে আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

বিধি প্রবর্তনা বা প্রেরণা স্বরূপ। স্বভাবত প্রশ্ন জাগতে পারে বিধ্যর্থ বা প্রবর্তনা কার ধর্ম? ভারতীয় দর্শনের বিধির অর্থবিষয়ক মতগুলিকে মোটামুটি চারটি বিকল্পে সুবিন্যস্ত করা যায়; যথা,

(১) বিধ্যর্থ কর্তার ধর্ম,
(২) বিধ্যর্থ কর্মের ধর্ম,
(৩) বিধ্যর্থ করণধর্ম,
(৪) বিধ্যর্থ নিযোক্তৃধর্ম

এই প্রবন্ধের স্বল্পপরিসরে এই সকল দুরূহ প্রশ্নের সামগ্রিক বিচার সম্ভব নয়। বর্তমান

প্রবন্ধে প্রযত্ন বা যত্ন বিধি প্রত্যয়ের অর্থ কিনা মূলত এই প্রশ্নটি আলোচিত হবে। ভারতীয় দর্শনে প্রযত্নরূপ সবিষয়ক এক বিশেষ আত্মগুণ স্বীকার করা হয়। স্থান বিশেষে উক্ত প্রযত্ন কৃতি, উদ্যোগ ইত্যাদি নামান্তরের দ্বারা উল্লিখিত হয়েছে। চেষ্টা বা ক্রিয়া প্রযত্নের বিষয়রূপে স্বীকৃত হয়। প্রযত্নের ফলে চেতনপুরুষের দেহে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ প্রযত্নরূপ আত্মগুণ জন্য যে দৈহিক ক্রিয়া তাই চেষ্টা। প্রযত্ন বা কৃতির বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করতে গিয়ে এইরকম বলা যায় যে ইহা একধরণের গুণ যা চেষ্টার জনক। প্রযত্নের আবার শ্রেণীবিভাগ আছে; প্রযত্ন ভেদে ইহা তিন প্রকার যথা, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ও জীবনযোনিপ্রযত্ন। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে বলা হয়েছে —

'প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ তথা জীবনকারণম্।
এবং প্রযত্ন-ত্রৈবিধ্যং তান্ত্রিকৈঃ পরিদর্শিতম্।।'[২]

নিম্নলিখিত পরিলেখের সাহায্যে ত্রিবিধ প্রযত্নের শ্রেণীবিভাগ উপস্থাপিত হয়েছে ঃ
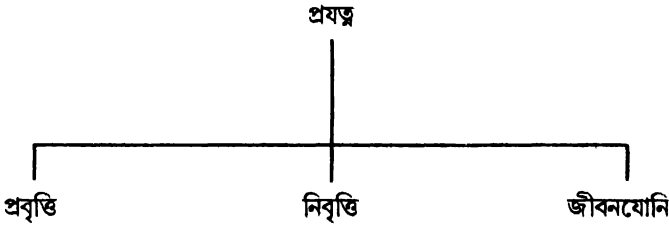
প্রযত্নরূপধর্ম বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ হতে পারে কিনা এই বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে নানা আলোচনা ও মতভেদ দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনের যে তিনটি সম্প্রদায়ের মত বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হবে সেগুলি হল ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণ।

মূলপ্রশ্ন আলোচনার পূর্বে ভারতীয় দর্শনে দার্শনিক আলোচনার একটি পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য যে ভাষার আলোচনা সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, ভাষার আলোচনা ভারতীয় দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ভাষার আলোচনা বৈয়াকরণ বা আলংকারিকেরা কেবলমাত্র অধিকার করে রেখেছিল এই ধরণের সিদ্ধান্ত বিভ্রান্তিজনক। সুদূর বেদের যুগে বাগ্‌দেবীর আবাহন হয়েছিল। পূর্বমীমাংসা দর্শনের বিভিন্ন আলোচনা নানাভাবে ভাষাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ভাষাদর্শনের মূল আলোচ্য ভাষা ও ভাষাতীত তত্তার সম্পর্ক। শাব্দবোধ সম্পর্কে অভিহিতান্বয়বাদ, অন্বিতাভিধানবাদ অথবা অপর কোন বিকল্প মতবাদ যাই স্বীকার করা হোক না কেন

সকলের মতেই এটা স্বীকার্য যে পদার্থে পদের সংকেত গ্রহ না থাকলে অগৃহীত সংকেত পদ থেকে কখনও অর্থের অবগতি হতে পারবে না। এজন্য সকল দার্শনিককেই বাক্যার্থ প্রতীতির পূর্বে বাক্যঘটক পদগুলির সংকেতগ্রহ থাকা যে আবশ্যক স্বীকার করতে হয়।

কোন একটি পদের সঙ্গে সেই পদের দ্বারাই বাচ্য পদার্থের সম্বন্ধকে শক্তি বলা হয়। তাই পদটিকে শক্ত এবং অর্থটিকে শক্য বা বাচ্য বলা হয়। পদশক্ত এবং অর্থশক্য হলে শক্তপদ থেকে শক্যার্থের বা পদার্থের বোধ জন্মে। শক্তির জ্ঞান অর্থাৎ কোন পদের সাথে পদবাচ্য পদার্থের সম্বন্ধের জ্ঞান নানাভাবেই হতে পারে এবং শক্তিগ্রহের অন্যতম স্বীকৃত উপায় ব্যাকরণ। প্রাচীন ন্যায়ে শক্তিগ্রহের একাধিক উপায়ের উল্লেখ আছে। শক্তিগ্রহের স্বীকৃত উপায়গুলি যথাক্রমে ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আপ্তবাক্য, ব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবরণ এবং প্রসিদ্ধার্থক শব্দের সমানাধিকরণতা। শক্তিগ্রহের এই বিভিন্ন উপায় গুলির মধ্যে তারতম্য আছে এই কারণে যে এই বিভিন্ন উপায়গুলির মধ্যে প্রতিটিই সমানভাবে প্রাথমিক শক্তিগ্রহের পক্ষে উপযোগী নয়; যেমন অব্যুৎপন্ন বালকের পক্ষে উপমানরূপ উপায় দ্বারা বাচ্যার্থের প্রাথমিক শক্তিগ্রহ সম্ভব হয় না। 'বৃদ্ধস্য ব্যবহারতঃ', অর্থাৎ প্রযোজ্য বৃদ্ধের সঙ্গে প্রযোজক বৃদ্ধের ব্যবহার থেকে প্রাথমিক শক্তিগ্রহের উৎপত্তি স্বীকৃত হয়েছে। ধাতু, প্রাতিপদিক ও নিপাতরূপ প্রকৃতি, কৃৎ, তদ্ধিত প্রভৃতি প্রত্যয় ও সমাসের শক্তির জ্ঞান সাধারণত ব্যাকরণ থেকে লাভ করা যায়। তবে কোন দার্শনিক সিদ্ধান্তের সাথে বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তের বিরোধ দেখা দিলে বৈয়াকরণমত যে সর্বস্বীকৃত হবে এমন বলা যায় না। বর্তমান প্রবন্ধে বিধিপ্রত্যয়ের বাচ্যার্থ কি হতে পারে সেই বিষয়ে ব্যাকরণ, ভাট্ট মীমাংসা ও ন্যায়দর্শনের মত আলোচিত হবে।

বিধিবাক্যগুলি কি ধরণের বাক্য সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে ক্রিয়াবাচক গম্, পচ্, কৃ, প্রভৃতি ধাতুর অন্তে লট্, লিট্, লোট, লিঙ্ ইত্যাদি দশটি প্রত্যয় বা তিঙ্ বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে। এই দশলকারকে আখ্যাত বা তিঙ্ বলা হয়। কোন ক্রিয়া বর্তমান কালে ঘটলে ধাতুর অন্তে লট্, কিংবা প্রার্থনা, আশীর্বাদ, প্রবর্তনা অর্থে লোট্, বিধিনিষেধ প্রবর্ত্তনা অর্থে বিধিলিঙ্ এবং প্রবর্তনা অর্থেও লেট্ তিঙ্ বিভক্তি যুক্ত হয়। একই ধাতু, ধরা যাক্ পচ্ ধাতু, ক্রিয়ার কাল ও ভাব অনুসারে লট্, লঙ্, লিঙ্ প্রভৃতি বিভিন্ন তিঙ্ বিভক্তি যুক্ত হতে পারে। ধাতুর অন্তে যুক্ত বিভক্তি দ্বারা ক্রিয়ার কালের বোধ হয়, ক্রিয়ার কর্তার সংখ্যা ও পুরুষের বোধ হয়। সাধারণ বুদ্ধিতে একটি আদেশমূলক বা অনুজ্ঞাবোধক বাক্যের সাথে বর্ণনামূলক, বাক্যের পার্থক্য সেই বাক্যঘটক ক্রিয়াপদটির দ্বারা করা হয়। যে কোন ক্রিয়াপদে দুটি অংশ থাকে, একটি ধাতু বা প্রকৃতির অংশ ও অপরটি প্রত্যয়ের অংশ বা আখ্যাতের অংশ। এই দুই ধরণের বাক্যের আপাত পার্থক্য আখ্যাতাংশের

উপরে নির্ভর করে। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে বলা যায় যে বর্ণনামূলক বাক্যগুলি লট্, লঙ্ এইসব ল-কার আখ্যাত যুক্ত। অপরদিকে নির্দেশমূলক বাক্যগুলি লোট্, বিধিলিঙ্ এইসব ল-কার আখ্যাত যুক্ত। একটি নির্দেশমূলক বাক্যবাহিত নির্দেশ বা আদেশ যে শ্রোতা শুনছে তার কাছে সেই বার্তা পৌঁছাচ্ছে। কি ভাবে শ্রোতার শাব্দবোধে বাক্যটি ভাসমান হচ্ছে? যিনি প্রযোজক আদেষ্টা ব্যক্তি তিনি কোন ব্যক্তিকে আদেশ করছেন কোন কিছু করার জন্য। আদিষ্ট পুরুষকে, আদেশ করা হচ্ছে, 'যাও গরু বাঁধ'। তখন সেই আদিষ্টপুরুষ বুঝতে পারছে যে প্রযোজক পুরুষ তাকে গরু বাঁধার জন্য আদেশ করছে। আদিষ্টপুরুষ এক ধরণের প্রেরণা অনুভব করছে ঃ 'অয়ম্ মাং প্রবর্ত্তয়তি'। এই ধরণের একটি ব্যাখ্যা লৌকিক বাক্যের ক্ষেত্রে হতে পারে। 'স্বর্গকামঃ বিশ্বজিতা যজেত', 'চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ', 'কারীর্যা বৃষ্টিকামো যজেত' ইত্যাদি বিধিবাক্যের মধ্যে এমন কি আছে যার দ্বারা ব্যক্তি প্রবর্তিত হয়? বিধিবাক্য ঘটক ক্রিয়াপদটির উপর সেই কারণে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হচ্ছে। বিধিবাক্যের প্রবর্তনার স্বরূপ বুঝতে হলে, বাক্যঘটক ক্রিয়াপদটির প্রকৃতি বা ধাতুর অর্থ এবং আখ্যাতের বা প্রত্যয়ের অর্থ কি বুঝতে হবে। ভারতীয় দর্শনে ব্যাকরণ, ন্যায় এবং মীমাংসা শাস্ত্রে এই সকল প্রশ্নের অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং অতি গভীর আলোচনা আছে। বর্তমান প্রবন্ধে বিধির স্বরূপ সম্বন্ধে যে আলোচনা তা বলা যেতে পারে বিধির অর্থ বিষয়ে অনুনৈতিক পর্যায়ের আলোচনা। ব্যাকরণ, মীমাংসা এবং ন্যায় দর্শনের ভিন্নতা বিশেষভাবে ধরা পড়েছে বিধির স্বরূপ আলোচনার প্রসঙ্গে। ঐ তিন সম্প্রদায়ের মত বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে যথাক্রমে আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অংশে উদয়নাচার্যের মত আলোচনা করা হয়েছে এবং এই অংশেই প্রবন্ধের উপসংহার টানা হয়েছে।

এক

বৈয়াকরণ মতানুসারে কোন একটি বাক্যের শাব্দবোধে ধাতুর অর্থ মুখ্য বিশেষ্য হয়। 'চৈত্রঃ পচতি' এই বাক্যটিকে গ্রহণ করলে দেখা যাবে যে 'পচতি' এই তিঙন্তপদের দুটি ভাগ আছে ঃ

(১) 'পচ্'

(২) 'তি'

এর মধ্যে প্রথমটি ধাতু বা প্রকৃতি এবং দ্বিতীয়টি প্রত্যয়। বৈয়াকরণভূষণসারে বলা হয়েছে

'ফল ব্যাপারয়োধাতুরাশ্রয়ে তু তিঙঃ স্মৃতাঃ।
ফলে প্রধানং ব্যাপারস্তিঙর্থস্তু বিশেষণম্।।'

ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত অনুসারে ধাতু ও প্রত্যয়ের শক্য নিম্নরূপ ঃ
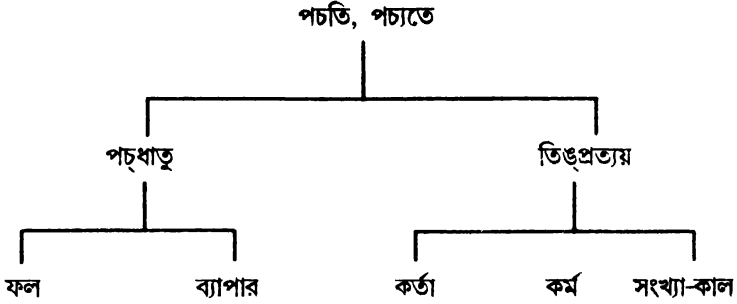
উক্ত কারিকাটি বাংলায় অনুবাদ করলে এইরকম দাঁড়ায় : ধাতুর শক্য বা বাচক ফল এবং ব্যাপার, তিঙ্ প্রত্যয়টির শক্য বা বাচক আশ্রয়, অর্থাৎ ধাত্বর্থরূপে গৃহীত হয়েছে যে ব্যাপার এবং ফল এই দুয়েরই আশ্রয় বোঝানো হয়। তিঙ্ প্রত্যয়টির শক্য বা বাচক ফলাশ্রয় কর্ম ও ব্যাপারাশ্রয় কর্তা। কর্তৃবাচ্যে অর্থাৎ 'পচতি' এই তিঙন্তপদের ক্ষেত্রে তিঙ্ এই আখ্যাতের অর্থ কর্তা এবং কর্মবাচ্যে 'পচ্যতে' এই তিঙন্তপদের ক্ষেত্রে আখ্যাতের অর্থ কর্ম। কর্তা ও কর্ম ছাড়াও তিঙর্থ সংখ্যা ও কাল। ফল এবং ব্যাপার এই দুটিকেই ধাতুর অর্থ বা বাচক স্বীকার করলেও ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত অনুসারে শাব্দবোধের ক্ষেত্রে ফলের অপেক্ষা ব্যাপারের অধিক গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। উক্ত কারিকায়, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 'ফলব্যাপারয়োঃ' শব্দটি দ্বিবচনে প্রযুক্ত হয়েছে। এখানে দ্বিবচনের প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ কারণ বৈয়াকরণদের মধ্যে এই ব্যাপারে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন বৈয়াকরণের মত, ধাতুর অর্থরূপে ফলে এবং ব্যাপারে পৃথক পৃথক শক্তি স্বীকার করলে গৌরব দোষ হয়। কেউ কেউ তাই বলেন যে ধাতুর শক্যার্থ ফলবিশিষ্ট ব্যাপার, সুতরাং এক। কৌণ্ডভট্ট মনে করেন ধাতুর শক্য ফলবিশিষ্ট ব্যাপার নয় বরং ফল এবং ব্যাপার। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এখানে ফল বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? অতি সরলভাবে বলা যায় যে উদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়া করা হয়,সেই উদ্দেশ্য তদুক্ত ক্রিয়ার ফল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যে প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে পাকাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সেই প্রয়োজন পাকাদি ক্রিয়ার প্রধান ফল রূপে গৃহীত হয়। যাগক্রিয়া স্বর্গকামনায় অনুষ্ঠিত হয়, কোন দ্রব্যলাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না, সুতরাং বলা যেতে পারে যে যাগাদি ক্রিয়ার ফল স্বর্গ। পাকক্রিয়া কি উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় বুঝতে পারলে পাকক্রিয়ার ফলরূপে কি গৃহীত হতে পারে তা পরিষ্কার হবে। যদি বলা হয় যে ক্ষুধানিবৃত্তির উদ্দেশ্যে পাকক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে ক্ষুধানিবৃত্তি ধরা যেতে পারে ক্রিয়ার ফল।

'ফলের' এই অতি সহজ সরল ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এখানে প্রথমত, এই ধরণের আপত্তি উঠতে পারে যে 'অপাক্ষীৎ' অর্থাৎ পাক হয়ে গেছে, এই ধরণের প্রয়োগ ভোজন এবং পাক হয়ে থাকলেও করা যাবে না যদি না ভোজনদ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়ে থাকে। তাছাড়া, এইভাবে 'ফল' শব্দের ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে ধাতুগুলির মধ্যে সকর্মকত্ব ও অকর্মত্বের সর্বজনস্বীকৃত পার্থক্য রক্ষা করা যাবে না। সুতরাং 'ফল' শব্দটিকে বিশেষ পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। ফলের লক্ষণ এইভাবে দেওয়া যায়ঃ 'তদ্ধাত্বর্থজন্যত্বে সতি, তদ্ধাতুজন্যোপস্থিতিবিষয়ত্বং তদ্ধাত্বর্থত্বং বা'।[৫] ধাতুর অর্থ ফল বলতে ধাতুর অপর অর্থ যে ব্যাপার, সেই ব্যাপারজন্য বোঝানো হয় এবং ধাতুদ্বারা জন্য উপস্থিতির বিষয় হয়। এই লক্ষণ অনুসারে বলা যায় যে পচ্ ধাতুর অর্থ যে ফল তা হলো বিক্লিত্তি। 'বিক্লিত্তি' শব্দের অর্থ শিথিলভাব বা অবয়বের বিশেষ সংযোগ বা বিভাগ। অপর প্রশ্ন, ব্যাপার বলতে কি বোঝানো হয়? ব্যাপার বলতে একধরণের ক্রিয়া — ফুৎকার. অধঃসন্তাপন ইত্যাদি বোঝানো হয়। সাধারণত পচ্ধাতু দ্বারা ফুৎকার, অধঃসন্তাপন ইত্যাদি যে ক্রিয়া বোঝানো হয় তা বিক্লিত্তিরূপ ফলের জনক। সুতরাং, পচ্ধাতু দ্বারা ফুৎকার, অধঃসন্তাপন ইত্যাদি, ব্যাপার বোঝানো হয়। কিন্তু এর থেকে এইরকম মনে করার কোন কারণ নেই যে ধাতু নানার্থক হয়। যখন পচ্ধাতু দ্বারা ফুৎকার ইত্যাদি বোঝানো হয় তখন প্রকৃতপক্ষে ফুৎকারাবচ্ছিন্ন ব্যাপার বোঝানো হয়। অধঃসন্তাপনাবচ্ছিন্ন ব্যাপার বোঝান হয়। ব্যাকরণ মতে ব্যাপারই ভাবনা। 'ভাবনা' বা 'অভিধা' শব্দের অর্থ — 'জনয়তি ফলমিত্যভিধা সাধ্যত্বেন ধাতুনাভিধীয়ত ইতি বাভিধা'। অর্থাৎ যে ক্রিয়া ফলের জনক তাই অভিধা অথবা সাধ্যত্ববশত যে ক্রিয়া ধাতু দ্বারা অভিধীয়মান তাই ব্যাপার বা অভিধা। বৈয়াকরণভূষণসারে স্পষ্টত বলা হয়েছে 'ব্যাপারস্তু ভাবনাভিধা সাধ্যত্বেনাভিধীয়মানা ক্রিয়া। সংক্ষেপে বলা যায়, সাধ্যত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় যে ক্রিয়া তাই ব্যাপার। সুতরাং ব্যাকরণ মতানুসারে ফল এবং ব্যাপার উভয়ই ধাতুর অর্থ।

এখন প্রশ্ন তিঙর্থ কি? পূর্বেই বলা হয়েছে যে ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত অনুসারে আখ্যাত তিঙের অর্থ কর্তা ও কর্ম। আখ্যাতের অর্থ যে কর্তা ও কর্ম সেই বিষয়ে যুক্তি হল এই যে ধাতু বা প্রকৃতির সাথে আখ্যাত যুক্ত হলে তবেই কর্তা ও কর্মের প্রতীতি হয়। কিন্তু ব্যাকরণ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে এই যুক্তিতে যে ধাতুর সাথে তিঙ্ ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হলে তবেই কর্তা ও কর্মের প্রতীতি হয় বলেই কর্তা ও কর্ম আখ্যাতের অর্থ হবে এমন বলা যায় না।

মূল বক্তব্য এই যে আখ্যাতের অর্থ কর্তা ও কর্ম না স্বীকার করেও ধাতুর সাথে তিঙাদি প্রত্যয় যুক্ত হলে যে কর্তা ও কর্মের প্রতীতি হয় তার ব্যাখ্যা অন্য যুক্তি দ্বারা করা যায় —

(১) লক্ষণা দ্বারা
(২) আক্ষেপ দ্বারা
(৩) সমীপবর্তী প্রথমান্ত পদ দ্বারা

(১) লক্ষণা দ্বারা : 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই বাক্যে 'গঙ্গা' পদের শক্যার্থ ধারা বা প্রবাহ। কিন্তু লক্ষণা দ্বারা 'গঙ্গা' পদের শক্য তট। এই প্রসঙ্গে মীমাংসকদের কথা উল্লেখযোগ্য। মীমাংসকেরা মনে করেন তিঙ্ পদের অর্থ ভাবনা এবং লক্ষণা দ্বারা তিঙপদের শক্য দাঁড়ায় কর্তা ও কর্ম। মীমাংসক মত পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

(২) আক্ষেপ দ্বারা : 'আক্ষেপ' শব্দের অর্থ ধরা যেতে পারে মীমাংসক স্বীকৃত অর্থাপত্তিপ্রমাণ। বলা হয় 'যেন বিনা যদনুপপন্নং তত্তেনাক্ষিপ্যতে' অর্থাৎ যে কারণ ব্যতীত যে কার্য অনুপপন্ন হয় সেই কার্য থেকে সেই কারণের কল্পনা করা হয়। যেমন 'পীনোহয়ং দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্ক্তে' : স্থূল দেবদত্তো দিনের বেলায় ভোজন করে না। ভোজন বিনা শরীর হৃষ্টপুষ্ট হতে পারে না, সুতরাং দেবদত্তের ক্ষেত্রে রাত্রিভোজন কল্পনা করা হয়। মীমাংসকেরা মনে করেন তিঙের অর্থ ভাবনা, কিন্তু ভাবনা আশ্রয় বিনা থাকতে পারে না। সুতরাং তিঙর্থ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনার আশ্রয় কর্তা ও কর্মের লাভ হয় আক্ষেপ দ্বারা। এই ধরনের ব্যাকরণ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে তিঙর্থ থেকে যেহেতু কর্তা ও কর্ম আক্ষেপ দ্বারা লভ্য, সেইজন্য কর্তা ও কর্ম তিঙের অর্থ এই যে দাবী তা যুক্তিযুক্ত নয়।

(৩) প্রথমান্ত পদ দ্বারা : আপত্তি হতে পারে যে প্রথমান্ত পদের অর্থ কর্তা ও কর্ম, তাহলে তিঙের অর্থ কিভাবে কর্তা ও কর্ম হয়? 'দেবদত্ত পচতি' এখানে প্রথমান্ত পদ 'দেবদত্ত'-এর অর্থ কর্তা, একইভাবে বলা যায় কর্মবাচ্যে লিখিত 'তণ্ডুলঃ পচ্যতে' এই বাক্যে প্রথমান্ত 'তণ্ডুল' পদের অর্থ কর্ম।

এই তিনটি যুক্তির কোনটিই ব্যাকরণের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। বৈয়াকরণেরা মনে করেন যে লক্ষণা দ্বারা তিঙ্ পদের অর্থ কর্তা ও কর্ম এই যুক্তি গ্রহণীয় নয় কারণ তাহলে ভাবনার ব্যাখ্যা করা যাবে না। কারণ যদি বলা হয় তিঙপদের অর্থ ভাবনা তাহলে তিঙপদের শক্য দাঁড়ালো ভাবনা ; আবার যদি বলা হয় যে লক্ষণা দ্বারা তিঙপদের অর্থ কর্তা ও কর্ম, তাহলে একই তিঙ্পদের যুগপৎ বৃত্তিদ্বয় উৎপন্ন হচ্ছে এইরকম স্বীকার করতে হয়। যুগপৎ তিঙ্পদের অর্থ ভাবনা এবং কর্তা ও কর্ম স্বীকার করলে বিরোধ দেখা যায়। বিরোধের আপত্তি পরিহার করার জন্য এইরকম বলা যায় যে লক্ষণা দ্বারা তিঙ্পদের অর্থ ভাবনাশ্রয়রূপ কর্তা ও কর্ম। এক্ষেত্রে যুগপৎ বৃত্তিদ্বয়ের পরিবর্তে একই লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ভাবনা এবং ভাবনাশ্রয় রূপ অর্থ পাওয়া যায়। বৈয়াকরণেরা মনে করেন যে যুগপৎ বৃত্তিদ্বয়েব উৎপত্তির আপত্তি পরিহারের জন্য এই যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য হতে

পারে না। বৈয়াকরণেরা আপত্তি করেন যে ভাবনাশ্রয়ে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করলে, ভাবনা ভাবনাশ্রয়ে বিশেষণ রূপে অপ্রধান হয়ে যাবে। ভাবনা অপ্রধান এই মত বৈয়াকরণদের কাছেই কেবল নয়, মীমাংসকদের কাছেও, যারা ভাবনা-মুখ্য-বিশেষ্যক বোধ স্বীকার করেন, তাদের কাছেও গ্রহণীয় হবে না। বৈয়াকরণেরা মনে করেন যে একই আপত্তি উঠবে যদি তিঙের অর্থ ভাবনা থেকে আক্ষেপ দ্বারা তিঙের আশ্রয়রূপে কর্তা ও কর্ম অর্থরূপে স্বীকার করা হয়। কারণ সেক্ষেত্রেও কর্তা ও কর্ম প্রধান হবে এবং বিশেষণরূপে ভাবনা অপ্রধান হবে। ভাবনা অপ্রধান এই সিদ্ধান্ত মীমাংসা মতেরই বিরোধী।

আক্ষেপ দ্বারা লব্ধ এই শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য বিষয়ে মীমাংসক ও নৈয়ায়িকের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। নৈয়ায়িকেরা অর্থাপত্তি প্রমাণরূপে স্বীকার করেন না,এবং 'আক্ষেপদ্বারা লব্ধ' বলতে অর্থাপত্তির কথা বলেন না। ন্যায় মতে আক্ষেপের অর্থ অনুমান। তবে 'আক্ষেপলভ্য' শব্দের এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করলেও আখ্যাতের অর্থ কতা ও কর্ম নয় এই ব্যাকরণ বিরোধী সিদ্ধান্ত স্থাপন করা যাবে না। কারণ 'আক্ষেপ'-এর ন্যায় সম্মত ব্যাখ্যা অর্থাৎ অনুমান স্বীকার করলে অনুমানের জন্য ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক। বৈয়াকরণেরা মনে করেন যে 'পচতি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীতই আশ্রয়ের জ্ঞান হয়। সুতরাং ব্যাকরণ মতানুসারে এই পক্ষও গ্রহণযোগ্য নয়।

'লঃ কর্মনি চ ভাবে চাহকর্মকেভ্যঃ'[৭] এই পাণিনি সূত্র উল্লেখ করে ব্যাকরণ স্বমত সমর্থনের প্রয়াস করেন। পাণিনির এই সূত্রটির প্রকৃত ব্যাখ্যা কি হবে এই বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। ব্যাকরণ মতানুসারে এখানে 'চ' শব্দ দ্বারা 'কর্তরি' পদ বোঝানো হচ্ছে, এবং এই সূত্রেব বক্তব্য এই যে ল-কারের অর্থ সকর্মক ধাতুর ক্ষেত্রে কর্তা ও কর্ম এবং অকর্মক ধাতুর ক্ষেত্রে ল-কারের অর্থ ভাব ও কর্ম। সুতরাং এই ব্যাখ্যা অনুসারে পাণিনীয় সূত্রের বক্তব্য ল-কারার্থ অর্থাৎ আখ্যাতার্থ কর্তা ও কর্ম। এই ব্যাখ্যার সপক্ষে বৈয়াকরণেরা 'অত্র হি চ-কারাৎ কর্ত্তরি কৃৎ' এই পাণিনি সূত্র উদ্ধৃত করেন।

'লঃ কর্মনি চ ভাবে চাহকর্মকেভাঃ এই বিতর্কিত সূত্রটির দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে বলা হয় যে এখানে কর্তৃত্বকর্মত্ব বোঝানো হয়েছে। এইভাবে সূত্রটির তাৎপর্য গৃহীত হলে কর্তৃত্বের অর্থ কৃতি অর্থাৎ ব্যাপার হয় এবং কর্মত্বের অর্থ ফল হয়। তাহলে বলতে হয় আখ্যাতের অর্থ কৃতি (বা ব্যাপার) ও ফল। এই ব্যাখ্যা বৈয়াকরণসম্মত নয়। 'অনন্যলভ্যো হি শব্দার্থঃ'[৮] এই নিয়মানুসারে শব্দর অর্থরূপে সেটি গ্রাহ্য হবে যেটি পূর্বে অপর কোন শব্দের অর্থরূপে গৃহীত হয়নি। ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত অনুসারে ধাতুর অর্থরূপে ফল এবং ব্যাপার পূর্বেই গৃহীত হয়েছে সুতরাং ল-কারের অর্থরূপে আবার যদি ফল এবং ব্যাপার গৃহীত হয় তাহলে 'অনন্যলভ্যো হি শব্দার্থ' এই নিয়ম লঙ্ঘন কবা হয়।

বৈয়াকরণের এ সমাধানের বিরুদ্ধে মীমাংসক পক্ষ অবলম্বন করে বলা যেতে পারে যে বিতর্কিত পাণিনীয় সূত্রটিতে এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ন্যস্ত হলেও 'অনন্যালভ্যো হি শব্দার্থঃ' এই নিয়ম লঙঘন করা হচ্ছে না। কারণ মীমাংসক মতে ব্যাপার ধাতুর অর্থ নয় এবং উক্ত ব্যাপার যদি ল-কারের অর্থ হিসেবে গৃহীত হয় তাহলে 'অনন্যলভ্যোঃ হি শব্দার্থঃ' এই নিয়ম লঙঘন করা হচ্ছে না।

কিন্তু মীমাংসক সম্মত এই প্রস্তাব বৈয়াকরণের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে না। বৈয়াকরণের পক্ষ থেকে পাণিনি সূত্রের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণে ঘোরতর আপত্তি আছে।

দুই

মীমাংসক মতে শাব্দবোধে ভাবনারূপ ব্যাপার প্রধান হয়। মীমাংসা মতানুসারে 'দেবদত্তঃ পচতি' এই বাক্যের শাব্দবোধ 'দেবদত্তাভিন্নৈককর্তৃকা-বর্ত্তমানকালিকা-পাকানুকূলা ভাবনা' এই আকারে হয়। মীমাংসক সম্মত ভাবনা বৈয়াকরণ স্বীকৃত ব্যাপার বা ভাবনার সাথে তুলনীয়।

তবে এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে বৈয়াকরণ ভাবনা বা ব্যাপার রূপে যা স্বীকার করেন তা ধাতু দ্বারা বোধিত এবং মীমাংসক স্বীকৃত ভাবনা আখ্যাত দ্বারা বোধিত হয়। সুতরাং সেই দিক থেকে বিচার করলে বৈয়াকণের মতো মীমাংসকেরা ধাত্বর্থ মুখ্য বিশেষ্যক শাব্দবোধ যে স্বীকার করেন না তা স্পষ্টতই বোঝা যায়। ভাট্ট মীমাংসকেরা ভাবার্থাধিকরণম্ এই মতে বিশ্বাস করেন। এই মতানুসারে প্রত্যয়বাচ্য ভাবনা শাব্দবোধ প্রধান। এখানে মীমাংসকের সাথে বৈয়াকরণের বিরোধ কারণ বৈয়াকরণ মতে প্রত্যয়বাচ্য কর্তা।

আদেশমূলক বাক্যগুলি যেমন লৌকিক হয় তেমনি অলৌকিকও হয়। ভাট্ট মীমাংসকেরা মনে করেন আদেশমূলক বাক্যের কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে হলে এমনই কোন ব্যাখ্যা দিতে হবে যা বৈদিক ও লৌকিক উভয় বাক্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। সুতরাং গৌরব দোষ পরিহারের জন্য লৌকিক ও বৈদিক উভয়ক্ষেত্রেই শব্দনিষ্ঠ ভাবনারূপ ব্যাপার স্বীকার করা হয়। ভাট্ট মীমাংসকেরা বেদের কোন কর্তা স্বীকার করেন না। লৌকিক বাক্যের প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী আদেষ্টা ব্যক্তির অভিপ্রায় অনুসারে আদিষ্ট নিযোজ্য পুরুষের প্রবৃত্তি জন্মে এইরকম কল্পিত হতে পারে। কিন্তু অপৌরুষেয় বেদবাক্যগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজক পুরুষের অভিপ্রায় বা ইচ্ছা প্রযোজ্য পুরুষের প্রেরণা বা প্রবর্তনা এইরকম বলা যাবে না ; প্রযোক্তা পুরুষ প্রযোজক পুরুষনিষ্ঠ প্রেরণা অনুভব করছে এমন দাবী করা যাবে না। ভাট্টমীমাংসা মতানুসারে আপৌরুষেয় বৈদিক বিধিবাক্যেব ক্ষেত্রে কোন

প্রবর্তক পুরুষ স্বীকৃত না হওয়ায় বৈদিক-বিধিবাক্য-ঘটক পদ ভাবয়িতা বা উৎপাদন কর্তা। ভাট্টমীমাংসকেরা এই প্রসঙ্গে ভাবনার কথা বলেন। ভাবনা একধরণের ব্যাপার। মীমাংসক মতে কারণ হলো কার্যানুকূল শক্তিমৎ অর্থাৎ যা কার্য উৎপন্ন করতে সমর্থ। ভাবনা মীমাংসক মতে একধরণের কারণ।

অর্থসংগ্রহ অনুসারে ভাবনার সামান্য লক্ষণ নিম্নরূপ ঃ 'ভাবনানামভবিতুর্ভবনানুকূল-ভাবয়িতা ব্যাপার বিশেষঃ'।[৯] ভাবনা কি? 'ভবিতু' অর্থাৎ উৎপদ্যমান বস্তুর 'ভবন,' উৎপত্তির অনুকূল 'ভাবয়িতুঃ' অর্থাৎ ভাবক বা উৎপাদন কর্তার ব্যাপার বিশেষই ভাবনা। 'ভাবয়িতা' শব্দের অর্থ প্রযোজক। ভাবয়িতার অর্থাৎ উৎপাদয়িতার ব্যাপার বিশেষ হল ভাবনা। ভাবনা ভাট্টমীমাংসক মতে দু'প্রকার যথা --

(১) শাব্দীভাবনা বা মুখ্যার্থ বোধক অভিধা
(২) আর্থীভাবনা

'স্বর্গকামঃ যজেত' এই বিধি বাক্যটিতে মীমাংসা মতানুসারে 'যজেত', এই তিঙন্ত পদটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে উক্ত পদটির দুটি অংশ আছে, যথা (১) যজ্ ধাতু বা প্রকৃতি (২) ঈত প্রত্যয়।

এই দ্বিতীয় তিঙ্প্রত্যয়াংশ আবার দুই ধরনের ধর্মের দ্বারা নির্দিষ্ট ঃ (১) দশলকারের সাধারণ আখ্যাতত্বরূপ সাধারণ ধর্ম, (২) লিঙ্ত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম। এক্ষেত্রের বলা যায় যে লিঙ্ প্রত্যয় আখ্যাতত্বধর্মাবচ্ছিন্ন ও লিঙ্ত্বধর্মাবচ্ছিন্ন উভয়ই হয়। লিঙ্ত্ব ও আখ্যাতত্ব এই দুই ধর্মের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো এই যে লিঙ্ত্বধর্মাবচ্ছিন্ন লিঙ্ প্রত্যয় শাব্দী ভাবনা প্রতিপাদিত করে এবং আখ্যাতত্বধর্মাবচ্ছিন্ন লিঙ্প্রত্যয় আর্থীভাবনা প্রতিপাদিত করে। শাব্দীভাবনার অর্ন্তভুক্ত তিনটি বিভাগ আছে, যথাক্রমে সাধ্য, সাধন-ও-ইতিকর্তব্যতা। অপরদিকে আর্থীভাবনার মধ্যেও সাধ্য, সাধন ও ইতিকর্তব্যতা এই ধরণের তিনটি ভাগ আছে। ভাবনা যে ব্যাপার স্বরূপ তা আমরা পুর্বেই দেখেছি, অন্যান্য যে কোন ক্রিয়ার মত ভাবনার ক্ষেত্রেও সাধ্য, সাধন ও ইতিকর্তব্যতার বিভাগ আছে। 'কুরু' এই পদ শ্রবণে শ্রোতার তিন ধরণের আকাঙ্খার উদয় হয় ; কিং কুর্যাৎ, অর্থাৎ কোন কর্ম করা উচিত? দ্বিতীয়ত, কেন কুর্যাৎ, অর্থাৎ কোন করণের দ্বারা করা উচিত? তৃতীয়ত, কথং কুর্যাৎ, অর্থাৎ কি ভাবে করা উচিত। লিঙ্শব্দজন্য শাব্দীভাবনা এইভাবে তিন ধরণের আকাঙ্খা সহ উত্থাপিত হয়। মীমাংসা সিদ্ধান্তে শাব্দীভাবনার কর্ম বা ভাব্য পুরুষপ্রযত্নরূপ অর্থভাবনা এবং এক্ষেত্রে লিঙাদির জ্ঞান করণ এবং স্তুতিপ্রকাশক অর্থবাদবাক্য থেকে প্রাপ্ত প্রাশস্ত্যজ্ঞান উপায় বা ইতিকর্তব্যতারূপে অন্বিত হয়। লিঙের জ্ঞান এখানে সাধন যা আর্থীভাবনা উৎপন্ন করে, আর্থীভাবনা শাব্দীভাবনার সাধ্যরূপে গৃহীত হয়। এখানে যাগযজ্ঞের প্রশস্তিজ্ঞান ইতিকর্তব্যতা অংশভুক্ত।

নিম্নাঙ্কিত পরিলেখের সাহায্যে অংশত্রয়বতী শাব্দীভাবনা উপস্থাপিত করা যায় —
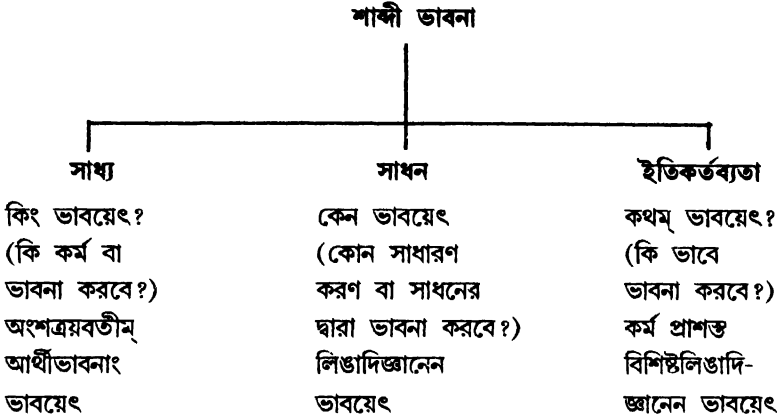
ভাট্টমীমাংসকেরা আর্থীভাবনা বলতে পুরুষনিষ্ঠ প্রযত্ন বিশেষ বোঝান। 'অর্থ' শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। একটি ব্যাখ্যানুসারে 'অর্থ' শব্দের দ্বারা ফল বোঝানো হয় ঃ 'অর্থ্যতে প্রার্থতে ফলং যেন ইতি অর্থঃ', অর্থাৎ যার দ্বারা ফল অর্থিত বা প্রার্থিত হয় তাই অর্থ। 'অর্থ' শব্দের অপর একটি ব্যাখ্যা আছে : এই ব্যাখ্যা অনুসারে ফলকামনাযুক্ত পুরুষ 'অর্থ' শব্দের বাচ্য হয়। এই ভাবনা পুরুষনিষ্ঠ স্বীকৃত হওয়ায় বলা হয় আর্থীভাবনা। কি, কিসের দ্বারা এবং কি উপায়ে — এই তিনটি প্রশ্নে আর্থীভাবনার তিনটি অংশকে পাওয়া যায়। কি ভাবনা উৎপাদন করবে এই প্রশ্নের উত্তরে স্বর্গাদি ফল ভাব্যরূপে উপস্থিত থাকে। কিসের দ্বারা স্বর্গ উৎপাদন করবে এই প্রশ্নের উত্তবে বলা যায় যাগের দ্বারা, স্বর্গ উৎপাদন করবে। তৃতীয়ত, কি উপায়ে যাগের দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তরে অগ্ন্যাধ্যান, আহনন প্রভৃতি গ্রহণ করা হয়।

নিম্নাঙ্কিত পরিলেখের সাহায্যে ভাট্টমীমাংসা সম্মত আর্থীভাবনা উপস্থাপিত হয়েছে :
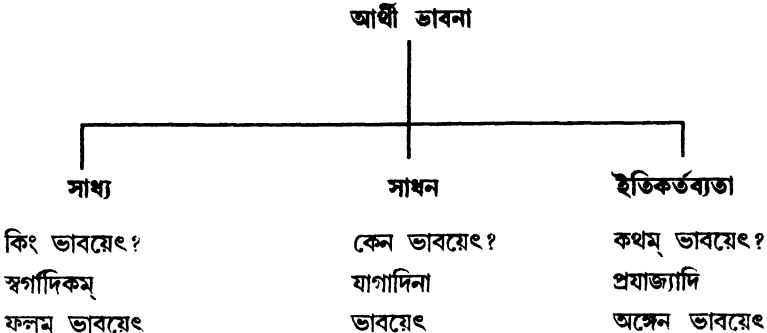
শাব্দীভাবনা ও আর্থীভাবনার মধ্যে পার্থক্য নিম্নলিখিত ভাবে করা হয়েছে। শাব্দীভাবনা সম্পর্কে বলা হয়েছে —

'যস্তু শব্দগতঃ প্রযোজক ব্যাপার যত্র পুরুষপ্রবৃত্তিসাধ্যতাম্ প্রতিপদ্যতে সা শাব্দীভাবনা'।[১০] যো ভাবনা ক্রিয়াকর্ত্তৃবিষয়ঃ প্রযোজক ব্যাপার পুরুষস্থ যত্র ভাবনা ক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা স্বর্গাদিকর্মতামাপদ্যতে যোহর্থভাবনা শব্দেনোচ্যতে ব্যাখ্যাতশ্চহসৌ'।[১১] শাব্দীভাবনা বা শব্দ ব্যাপার জন্য, আর্থীভাবনা যা পুরুষকে প্রবৃত্ত করে বিশেষ কোন লক্ষ্যের দিকে। ভাট্টমীমাংসক মতে, আর্থীভাবনার কর্ম বা সাধ্যরূপে স্বর্গ স্বীকৃত হয়েছে। মীমাংসা সিদ্ধান্তে স্বর্গ কোন বিশেষ স্থান নয়, এই মত অনুসারে স্বর্গ প্রীতি স্বরূপ। 'স্বর্গ' পদের বাচ্য সুখ অবিমিশ্র সুখ, তাই সুখ দুঃখ মিশ্রিত নয়, এই সুখ অক্ষয় অনন্ত কারণ এর নাশ নেই, তাই ভবিষ্যকালিক দুঃখমিশ্রিত নয় এবং অভিলাষ মাত্র প্রাপ্ত হয় বলে অতীতকালিক দুঃখমিশ্রিত নয়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে যাগ কেন আর্থীভাবনার কর্মরূপে স্বীকৃত হয়নি? 'যজেত' এই একটি পদের দ্বারা 'যজ' ধাতু ও 'ঈত' প্রত্যয় গৃহীত হওয়ায় যেহেতু প্রকৃতি ও প্রত্যয় সন্নিহিততম, সেহেতু 'ঈত'প্রত্যয়ার্থ ভাবনার সাধ্য বা কর্ম যজ্ ধাতুরূপ প্রকৃত্যর্থ যাগ কেন হবে না? মীমাংসা সিদ্ধান্তে প্রকৃত্যর্থ যাগ প্রত্যয়ার্থ ভাবনার ভাব্য বা কর্ম রূপে স্বীকৃত হয়নি। কর্ম কাকে বলে সেই ব্যাপারে পাণিনীয় সূত্রে বলা হয়েছে 'কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম', অর্থাৎ কর্তার ক্রিযার দ্বারা যেটি সর্বাপেক্ষা ঈপ্সিত তাই কর্ম। শাস্ত্রীয় যাগ বহু শ্রম ও বিত্তসাধ্য, এবং সেই কারণে কর্তার ঈপ্সিততম হতে পারে না। সুতরাং কর্মরূপে যাগ গৃহীত হতে পারে না। স্বর্গ সেই ঈপ্সিততম, যাগ তার সাধন। সেই কারণে ভাট্টমীমাংসকেরা মনে করেন যাগ নয়, স্বর্গই আর্থীভাবনার ভাব্য। সাধনাকাঙ্খার নিবৃত্তির পর ইতিকর্তব্যতার আকাঙ্খা উত্থাপিত হয়, 'কথং যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ?' এই ধরণের। প্রযাজ প্রভৃতি যাগের অঙ্গসমূহ রূপে স্বীকৃত। বৈদিক বিধিবাক্য, 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত', 'উদ্ভিদা পশুকামো যজেত', 'চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ' ইত্যাদি বিধিবাক্যে 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং', 'চিত্রয়া', 'উদ্ভিদা' ইত্যাদি স্থলে তৃতীয়া বিভক্তি থাকায় বোঝা যায় যে যাগ স্বর্গরূপ ফলের সাধন বা হেতু। কোন ক্রিয়ানিষ্পত্তির সময়ে যা প্রধান সাধন রূপে গৃহীত হয় তাকেই করণ বলে, 'সাধকতমং করণম্'। যাগরূপ ক্রিয়া স্বর্গফল সাধনের হেতুরূপে গৃহীত হলেও প্রশ্ন হতে পারে যে যাগ যেহেতু একটি ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান তা একক্ষণ মাত্র স্থায়ী থাকে এবং উৎপত্তির পরক্ষণেই ক্রিয়া বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যাগের অব্যবহিত পরেই তো যাগক্রিয়ার ফল পাওয়া যায় না। যজমান দীর্ঘকাল পরে স্বর্গাদি ফল লাভ করেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হয় যে স্বর্গাদি ফলের কারণ রূপে যাগাদিকে কিভাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়? কারণ কার্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে থাকা চাই। আবার বেদবিহিত যাগাদিকে স্বর্গাদির কারণ রূপে না স্বীকার করলে 'স্বর্গকামো

যজেত' ইত্যাদি বিধিবাক্যের প্রামাণ্য সংশয়িত হয়ে পড়ে। অতএব ক্ষণমাত্রস্থায়ী যাগাদির অনুষ্ঠান থেকে স্বর্গাদি ফল যাতে উৎপন্ন হতে পারে সেইরকম কল্পনা করতে হয়। ভাট্ট মীমাংসকেরা অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা ক্ষণমাত্রস্থায়ী যাগ এবং স্বর্গাদি ফলের মধ্যবর্তী অন্য একটি পদার্থ স্বীকার করেন। সেই পদার্থকেই অদৃষ্ট, অপূর্ব ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে।

অপূর্বের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ওঠে। মীমাংসা শাস্ত্রে অপূর্ব একধরণের যোগ্যতারূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রধান যাগকর্ম ও তার সহকারী অন্যান্য প্রযাজাদি অঙ্গ কর্মসমূহ অনুষ্ঠানের পূর্বে অনুষ্ঠাতা পুরুষ স্বর্গফল লাভের অযোগ্য থাকে এবং ক্রতুসকলও স্বর্গরূপ কার্য বা ফল উৎপন্নের অযোগ্য থাকে এইরকম অবশ্য স্বীকার করা প্রয়োজন। যাগাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান স্বর্গফল সাধন করে এইরূপ স্বীকার করতে হলে প্রধানকর্ম ও অঙ্গকর্ম অনুষ্ঠাতৃ পুরুষের উক্তকর্ম সকল অনুষ্ঠানের পূর্বে যে অযোগ্যতা ছিল এবং ক্রতু সকলের যে স্বর্গফল জন্মাবার যে অযোগ্যতা ছিল তা দূরীভূত হয়েছে — একথা বলতে হয়। স্বর্গফল সাধনের অযোগ্যতা দূর না হলে অযোগ্য পুরুষ কর্তৃক অথবা অযোগ্য ক্রতুদ্বারা স্বর্গসাধন হল এইরকম বলতে হয়। সুতরাং প্রধান কর্ম অনুষ্ঠানের পূর্বে অনুষ্ঠাতা পুরুষের ফললাভের যে অযোগ্যতা ছিল সে সকল অপনোদিত হয় প্রধানকর্ম অনুষ্ঠানের পরে এবং অনুষ্ঠাতৃ পুরুষগত ফললাভের যোগ্যতা ও অনুষ্ঠেয় কর্মগত ফলগত যোগ্যতা উৎপন্ন হয়, তাই ভাট্টমতে অপূর্ব রূপে কথিত।

> 'কর্মভ্যঃ প্রাগযোগ্যস্য কর্মণঃ পুরুষস্য বা।
> যোগ্যতা শাস্ত্রগম্যা যা পরা সাপূর্বমিষ্যতে।।[১৩]

এখানে আপত্তি হতে পারে যে অপূর্ব নামক পৃথক পদার্থ স্বীকার যদি করতে হয় তবে অপূর্বকেই স্বর্গাদি ফলের সাধন স্বীকার করা উচিত। অপূর্ব স্বর্গসাধন স্বীকার করলে যাগ বা স্বর্গসাধন রূপে স্বীকার করা হয়েছে, তা স্বীকারের প্রয়োজন থাকে না। এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে যাগই স্বর্গের কারণ, অপূর্ব মধ্যবর্ত্তী ব্যাপার মাত্র। অপূর্ব স্বয়ং যাগ থেকে জাত, অথচ যাগজাত স্বর্গের জনক। সুতরাং অপূর্বকে ব্যাপার বলা যেতে পারে। কুঠারের উদ্যমন ও নিপাতনরূপ ব্যাপার দ্বারা কুঠারের ছেদন সাধনতা অস্বীকৃত হয় না। এখানে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। যাগজন্য স্বর্গের উৎপত্তি হয় এমন কোন বিভ্রান্তিকর দাবী এখানে করা হয়নি কারণ স্বর্গের বিদ্যমানতা স্বীকৃত। এখানে স্পষ্টত যাগসম্পাদন দ্বারা যজ্ঞকর্তার স্বর্গাদিরূপ ফলের প্রাপ্তি হয় এমন বলা হয়েছে।

মীমাংসক সম্মত ভাবনাবাদ সংক্রান্ত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল শাব্দীভাবনা

এবং আর্থীভাবনা — এই দু'টি ভাবনার সম্পর্কটি কি ধরণের? আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে এই মতানুসারে 'যজেত' এই পদভুক্ত লিঙ্‌প্রত্যয় 'ত' এর বাচকতাবচ্ছেদক ধর্ম দুই ধরণের, যথাক্রমে আখ্যাতত্ব ও লিঙ্‌ত্ব। এই দুটি ভাবনার মধ্যে সম্পর্ক একপ্রত্যয়াভিধেয়ত্ব, কারণ দু'টি ভাবনাই একই 'ত' প্রত্যয় দ্বারা বাচ্য। সুতরাং শাব্দীভাবনা এবং আর্থীভাবনার মধ্যে কোন ভাবনাটি পূর্বে এবং কোনটি পরে এই ধরণের প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ নেই। তবে ভাট্টমীমাংসকদের মধ্যে এই ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কুমারিলভট্ট স্বয়ং দুটি ভাবনার মধ্যে পৌর্বাপর্যের সম্পর্কের কথা না বললেও পরবর্তী ভাট্টমীমাংসকদের মধ্যে এই বিষয়ে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়।

এতদূর পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে ব্যাকরণের মূল সিদ্ধান্ত থেকে মীমাংসকেরা দূরে সরে গেছেন। মীমাংসকের বক্তব্য যে ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত যদি এই হয় যে ধাত্বর্থ ফল এবং ব্যাপার দুইই, তাহলে প্রশ্ন হবে আখ্যাতার্থ তিঙ্‌বাচ্য ভাবনা না কি ধাতুবাচ্য ভাবনা? এই প্রশ্ন উঠছে কারণ আমরা জানি ব্যাকরণমতে ব্যাপারের অপর নাম ভাবনা। সেই ভাবনা বা ব্যাপার ধাত্বর্থ রূপে গৃহীত হলে আবার আখ্যাত তিঙর্থ রূপে কি ভাবে গৃহীত হতে পারে? আমরা পূর্বেই দেখেছি মীমাংসকেরা তিঙর্থ ভাবনা স্থাপনের স্বপক্ষে। এক্ষেত্রে এই দুটি পরস্পর বিরোধী মতের মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে? মীমাংসার পক্ষ থেকে আপত্তি উঠেছে যে ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত ধাত্বর্থ ফল এবং ব্যাপার স্বীকার করলে দুইভাবে স্ববিরোধিতার শিকার হয়ে পড়বে। মীমাংসা মতে 'প্রকৃতি প্রত্যয়ার্থয়োঃ প্রত্যয়ার্থস্য প্রাধান্যম্'[১৪] অর্থাৎ প্রকৃতি এবং প্রত্যয় এই দুইয়ের মধ্যে প্রত্যয়ের অর্থ প্রধান হয়। বৈয়াকরণ মতেও শাব্দবোধে ভাবনা বা ব্যাপার প্রধান হয়। যাস্ক তার নিরুক্তে ধাতুর লক্ষণ দিয়েছেন 'ভাবপ্রধানম্ আখ্যাতম্'।[১৫] এই নিরুক্তটির একটি ব্যাখ্যা অনুসারে 'ভাব' শব্দটি ব্যাপার অর্থে গৃহীত হয়ে সূত্রটির অর্থ দাঁড়িয়েছে যে ব্যাপারই ধাতুর মুখ্য অর্থ। সুতরাং মীমাংসকেরা মনে করেন যে বৈয়াকরণ যদি ভাবনা বা ব্যাপারকে ধাত্বর্থ স্বীকার করেন তাহলে প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের মধ্যে প্রত্যয়ের অর্থ প্রধান এই মতের তারা বিরোধিতা করবেন। দ্বিতীয়ত, 'তদাগমেদশ্যাতে'[১৬] এই নিয়ম অনুসারে কোন একটি পদের সাথে অপর পদের অন্বয় হলে যে অর্থ প্রতীত হয় সেই পদটির উক্ত অর্থ বাচ্য এমন স্বীকার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে পচ্ ধাতুর সাথে তিঙ্ প্রত্যয়ের অন্বয় হলে তবেই ব্যাপার রূপ অর্থের প্রতীতি হয়। তিঙ্-বিবর্জিত পচ্ ধাতু দ্বারা ব্যাপাররূপ অর্থের প্রতীতি হয় না। সুতরাং মীমাংসকের দাবী যে তিঙের অর্থ ব্যাপার, ধাতুর অর্থ নয়।

ব্যাকরণের দিক থেকে ধাত্বর্থ যে ব্যাপার সেই বিষয়ে বহু যুক্তি আছে। আমাদের আলোচনার প্রারম্ভেই দেখেছি ব্যাকরণ মতানুসারে 'ফলব্যাপারয়োর্ধাতুঃ....'[১৭] অর্থাৎ ধাতুর

অর্থ ফল এবং ব্যাপার। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত পরিহার করে যদি বলতে হয় ধাত্বর্থ ফল মাত্র এবং ধাত্বর্থ ব্যাপার নয় তাহলে বৈয়াকরণেরা মনে করেন কর্তা ও কর্মের ভেদ রক্ষা করা যাবে না। যদি কেবল ফলকে ধাতুর অর্থ স্বীকার করা হয়, তাহলে কর্মের 'ফলাশ্রয়ত্বং কর্ম' এই লক্ষণ অনুসারে ধাত্বর্থফলের আশ্রয় রূপে কর্ম গৃহীত হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'ঘটং ভাবয়তি', এই ক্ষেত্রে ধাত্বর্থ উৎপত্তিরূপ ফলের আশ্রয় ঘট, এবং লক্ষণীয় যে সংস্কৃতব্যাকরণের 'কর্মণি দ্বিতীয়া বিভক্তি' সূত্রানুসারে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়েছে। তুল্যভাবে যখন 'ঘটঃ ভবতি' এই ধরণের প্রয়োগ হয়, তখনও বলা উচিত ধাত্বর্থ উৎপত্তিরূপ ফলের আশ্রয় ঘট। ফলাশ্রয় কর্ম এই লক্ষণানুসারে এক্ষেত্রে ঘটের কর্মসংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে কর্মণি দ্বিতীয়া বিভক্তি হওয়া উচিত। কিন্তু তা আমাদের অনুভববিরোধী। বৈয়াকরণ যেহেতু ধাতুর অর্থ ফল এবং ব্যাপার দুই স্বীকার করে তাই 'ঘটঃ ভবতি' এই ক্ষেত্রে উৎপত্তিরূপফলের ঘট আশ্রয় হলে তার যেমন কর্মসংজ্ঞাপ্রাপ্তি হয় তেমন উৎপত্ত্যনুকুল ব্যাপারাশ্রয় ঘট হলে ঘটের কর্তৃসংজ্ঞাপ্রাপ্তি হয়। ব্যাকরণ মতে কর্তার লক্ষণ ব্যাপারাশ্রয়ত্বম্ কর্ত্তৃত্বম্। ঘটের কর্তৃসংজ্ঞা প্রাপ্তি হলে কর্মসংজ্ঞা বাধ হয়ে যাবে।

ব্যাকরণের পক্ষ থেকে দাবী যে ধাত্বর্থরূপে ফল এবং ব্যাপার দুই-ই স্বীকার করতে হবে। ধাতুর অর্থ ব্যাপার স্বীকার না করলে ধাতুর ক্ষেত্রে সকর্মক অকর্মক ভেদ ব্যাখ্যা করা যাবে না। ব্যাকরণসম্মত সকর্মকত্বের[১৮] লক্ষণ দুইভাবে করা যায়, যথা —

(১) স্বার্থফলব্যধিকরণব্যাপারবাচিত্বম্

(২) স্বার্থব্যাপারব্যধিকরণফলবাচকত্বম্

সকর্মকত্বের প্রথম লক্ষণ অনুসারে বলা হয় যে স্ব-অর্থ অর্থাৎ ধাত্বর্থ যে ফল তার থেকে ভিন্ন অধিকরণে (ব্যধিকরণ) আশ্রিত যে ব্যাপার, সেই ব্যাপারের বাচক ধাতু সকর্মক হয়। অথবা দ্বিতীয় লক্ষণ অনুসারে স্বার্থ বা ধাত্বর্থ যে ব্যাপার তার থেকে ভিন্ন অধিকরণে আশ্রিত যে ফল, তার বাচকতা যে ধাতুতে তাই সকর্মক। সুতরাং ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত ফল এবং ধাতু দুইই ধাত্বর্থ স্বীকার করতে হবে।

মীমাংসকেরাও সকর্মক অকর্মক ক্রিয়ার ভেদ বিসর্জন দিতে চান না। মীমাংসক সম্মত সকর্মকত্বের লক্ষণ নিম্নরূপ ঃ[১৯] স্বযুক্তাখ্যাতার্থ ব্যাপার ব্যাধিকরণ ফলবাচকত্বং অর্থাৎ স্ব (ধাতু) সহিত যুক্ত যে আখ্যাত (তিঙ্) তার অর্থ যে ব্যাপার, তার থেকে ভিন্ন অধিকরণে আশ্রিত যে ফল তার বাচকধাতু সকর্মক। উদাহরণ স্বরূপ, 'পচতি' এই তিঙন্তপদের ক্ষেত্রে পচ্ ধাতুর সাথে যুক্ত আখ্যাত তিঙর্থ যে ব্যাপার, তার আশ্রয় দেবদত্তাদি কর্তা, এবং পচ্ ধাত্বর্থ বিক্লিত্তিরূপ ফল ভিন্ন অধিকরণে অর্থাৎ তণ্ডুলে থাকে, সুতরাং উক্তধাতুটি

সকর্মক হয়। মীমাংসা মতে কর্তার লক্ষণ দাঁড়ায় 'আখ্যাতরূপ তিঙর্থ যে ব্যাপার সেই ব্যাপারের আশ্রয় কর্তা।

'পচতি' এই পদের প্রকৃত বিবরণ কি হওয়া উচিত, এই ব্যাপারে বৈয়াকরণ এবং মীমাংসকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। 'পচতি' পদের অন্তত দুধরণের বিবরণ হতে পারে : একটি ভাবনা প্রধান বিবরণ ও অপরটি কর্তা প্রধান বিবরণ। পচ্ ধাতুর ভাবনা প্রধান বিবরণ অনুসারে বলা যায় পচ্ ধাতুর অর্থ পাকরূপফল এবং 'তি' প্রত্যয়ের অর্থ করোতি। কিন্তু বৈয়াকরণের দিক থেকে এই ধরণের বিবরণ গ্রহণযোগ্য নয়। বৈয়াকরণেরা 'পাকানুকূল ব্যাপারবান কর্ত্তা' এই ধরণের বিবরণ দেন। মীমাংসক এবং ব্যাকরণের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের পেছনে রয়েছে বিবরণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দুই সম্প্রদায়ের মতভেদ।

বৈয়াকরণেরা মনে করেন ধাতুর অর্থ কেবল ফল মানলে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবহারের সাথে মিলবে না। ফল উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত 'পাকং ভবতি' এইরকম ব্যবহার হতে পারবে না, যদিও আমরা পাক আরম্ভ হতেই 'পাকং ভবতি' এইরকম প্রয়োগ করি। আবার যতক্ষণ পাকক্রিয়ার ফল বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত 'পাকো বিদ্যতে' এইরকম বলতে হবে, যদিও পাকব্যাপার সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পরই আর ঐ ধরণের প্রয়োগ হয় না।

তিন

নৈয়ায়িকেরা মনে করেন শাব্দবোধে প্রথমান্তার্থ মুখ্য বিশেষ্যক অর্থাৎ যে পদার্থ প্রথমান্ত পদের দ্বারা উপস্থিত হয়, তাই মুখ্য বিশেষ্যরূপে শাব্দবোধে উপস্থিত হয়, 'চৈত্রস্তণ্ডুলং পচতি' এইরকম বাক্য প্রযুক্ত হলে উক্তবাক্যের অন্তর্গত প্রথমান্ত 'চৈত্র' পদটি মুখ্য বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হয়। চৈত্রাংশে সাক্ষাৎ আশ্রয়ত্ব (সমবায়) সম্বন্ধে পচতি এই তিঙপ্রত্যয়ের অর্থ কৃতি অর্থাৎ প্রযত্ন বিশেষণরূপে ভাসমান হয়। নৈয়ায়িকেরা মনে করেন এই প্রসঙ্গেবৈয়াকরণ মত এবং মীমাংসক মত— এই উভয় মতই গৌরবদোষ দুষ্ট। আমরা পূর্বেই দেখেছি প্রাচীন বৈয়াকরণ মতে কর্তাতে অর্থাৎ যা কৃতিমান তাতে আখ্যাতের শক্তি স্বীকৃত। কর্তা বা কৃতিমান আখ্যাতের শক্য হিসাবে গৃহীত হলে সেক্ষেত্রে শক্যতার অবচ্ছেদক হবে কৃতি। অপরদিকে নৈয়ায়িকেরা এই মত মানেন না। ন্যায়মতে আখ্যাতের শক্য হিসাবে কৃতি স্বীকার করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে কৃতিত্বজাতি শক্যতার অবচ্ছেদক হবে।

আখ্যাতের শক্য যত্ন বা কৃতি কেন স্বীকার করতে হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমত,

নৈয়ায়িকেরা মনে করেন যে তাদের এই সিদ্ধান্ত অপর সম্প্রদায়ের গৃহীত সিদ্ধান্ত অপেক্ষা বহুলাংশে লঘু হবে। ন্যায়মতে কৃতি অসংখ্য, কিন্তু ন্যায়মত অনুসারে প্রতিটি কৃতিতে পৃথকভাবে শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন নেই। কারণ কৃতিত্বাবচ্ছেদে অর্থাৎ কৃতিত্ব বিশিষ্ট শক্যতাবচ্ছেদক কৃতিত্বের যাবতীয় অধিকরণে একটি মাত্র শক্তি স্বীকৃত হয়েছে। অপরদিকে আমরা আলোচনা করেছি ব্যাকরণের মতে আখ্যাতের শক্য কর্তা এবং কর্ম। পুরুষভেদে এবং বিষয়ভেদে শক্যতাবচ্ছেদক কৃতি অসংখ্য বলে প্রতিটি কৃতিতে শক্তি স্বীকার করলে অসংখ্য শক্তি কল্পনা করতে হয়। কিন্তু ন্যায়কে যেহেতু এই ধরণের কল্পনা করতে হচ্ছে না তাই তাদের দাবী যে তারা গৌরবদোষ পরিহার করতে পারছেন।

দ্বিতীয়ত, নৈয়ায়িকেরা আরও একটি যুক্তিদ্বারা তাদের মতের সপক্ষে কল্পনা লাঘবের দাবী করেন। সাধারণত এটি স্বীকৃত যে, যে সকল পদার্থ শাব্দবোধের বিষয় হয় সেইগুলি ধর্মবিশিষ্ট হয়ে শাব্দবোধের বিষয় হয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় জাতি এবং অখন্ডোপাধির ক্ষেত্রে। কারণ জাতি বা অখন্ডোপাধি শাব্দবোধের বিষয় হয় কোন ধর্ম বিশিষ্ট না হয়েই। ব্যাকরণমতে আখ্যাতের শক্য যেহেতু কর্ত্তা, তাই কৃতি শক্যতার অবচ্ছেদক। এখন কৃতি শাব্দবোধের বিষয় হলে কোন ধর্ম বিশিষ্ট (অর্থাৎ কৃতিত্ব ধর্ম) হয়েই শাব্দবোধের বিষয় হতে হবে কারণ কৃতি জাতি বা অখণ্ডোপাধি নয়। অপরদিকে ন্যায় মতে যেহেতু আখ্যাতের শক্য কৃতি, তার শক্যতাবচ্ছেদক কৃতিত্ব। এখন কৃতিত্বজাতি কোন ধর্মবিশিষ্ট না হয়েও শাব্দবোধের বিষয় হতে পারে। সুতরাং ন্যায়মত গৌরব দোষ পরিহার করছে। সুতরাং ন্যায়মতে কৃতি বা যত্ন আখ্যাতার্থ বা আখ্যাতের শক্য।

ন্যায়মতে যেভাবে প্রযত্ন বোঝানো হয়েছে তাতে প্রযত্ন যে চেতনের ধর্ম সেটা স্পষ্ট। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি আপাত অসুবিধা দেখা যেতে পারে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্র লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ধাতুর প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমন কোন সীমা টানা নেই যে ধাতু কেবল চেতন পুরুষবাচক শব্দের সাথে যুক্ত হবে। ধাতু অচেতনবাচক শব্দের সাথে যুক্ত হয়েছে এমন লোকব্যবহার বহুক্ষেত্রে আছে। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যায় যে যেমন 'চৈত্রঃ জানাতি', 'চৈত্রঃ যততে' ধরণের ব্যবহার আছে তেমনি 'রথঃ গচ্ছতি', 'অশ্বঃধাবতি' এই ধরণের ব্যবহারও আছে।[২০] 'রথ' অচেতনবাচক শব্দ কারণ রথ অচেতনবাচক বস্তু। ন্যায়মত স্বীকার করলে বলতে হয় যে আখ্যাত সামান্যের অর্থ যত্ন। তাহলে 'দেবদত্ত পচতি' স্থলে যেমন 'পাকানুকূল কৃত্যাশ্রয়ঃ দেবদত্ত'; রূপ শাব্দবোধ হয়েছে সেইরকম 'রথঃ গচ্ছতি' স্থলে 'গমনানুকূল কৃত্যাশ্রয়রথ' রূপ শাব্দবোধ এখানে হওয়া উচিত। এখানে আপত্তি হতে পারে যে রথ অচেতন, এবং কৃতি ও যত্ন চেতনের ধর্ম, সুতরাং অচেতন

রথ কিভাবে কৃতির আশ্রয় হতে পারবে? আপত্তি তুলে তাই এখানে বলা হয়ে থাকে যে 'গচ্ছতি' ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে 'গম্' ধাতুর প্রত্যয়ের অর্থ যত্ন বা প্রযত্ন বলা যায় না। অচেতন রথে আখ্যাতার্থ যত্ন বাধিত হওয়ায় তাহলে আখ্যাতের শক্য কি হবে? বৈয়াকরণের পক্ষ থেকে তাই বলা হয়ে থাকে যে কৃতি বা যত্ন আখ্যাতার্থ স্বীকার্য নয়। বৈয়াকরণেরা সেই কারণে মনে করেন যে কৃতি বা যত্নের পরিবর্তে ধাত্বর্থ ব্যাপার স্বীকার করলে তা চেতন এবং অচেতন উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হতে পারবে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে অনুকুল ব্যাপার ধাত্বর্থ, যত্ন আখ্যাতের অর্থ নয়।

উত্তরে এখানে ন্যায়মত অবলম্বন করে বলা যেতে পারে যে আখ্যাতের প্রয়োগ কোথাও বাচনিক, কোথাও লাক্ষণিক এটা যদি স্বীকার করা যায়, তাহলে আর কোন অসুবিধা হয় না। নৈয়ায়িকেরা পদের শক্তি এবং লক্ষণা এই দুটি বৃত্তি স্বীকার করেন। 'ইদং পদমিমর্থং বোধয়তু' এইরূপ শক্তি এবং স্বনিরূপিত শক্তিশূন্যত্বে সতি স্বসম্বন্ধি শক্তিত্বরূপ পদগত লক্ষণা গৃহীত হয়। 'রথো গচ্ছতি' ইত্যাদি স্থলে রথে কৃতির অন্বয়ের অনুপপত্তি হয় বলে আখ্যাতের লক্ষণা স্বীকার করা হয়। অশ্বাদিসংযুক্ত রজ্জ্বাদির সাথে রথসংযোগ এখানে গমনাকূল ব্যাপার। রথের গমনাভাবকালে রথসংযোগরূপ ব্যাপার থাকা সত্ত্বেও 'রথো গচ্ছতি' এইরকম প্রয়োগ হয় না। এইজন্য এখানে আপত্তি উঠতে পারে যে উক্ত ব্যাপারের অননুভব হয় বলে ব্যাপারে লক্ষণাবৃত্তি করা যাবে না। সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে রথগমনরূপ স্বব্যাপারবিশিষ্ট বা গমনাশ্রয় যে রথ তাতে নিরূঢ়লক্ষণা স্বীকার করতে হবে।

একই পদের যে দু'ধরণের প্রয়োগ হতে পারে, অর্থাৎ বাচনিক প্রয়োগ এবং লাক্ষণিক প্রয়োগ তা স্বীকারের বিপক্ষে কোন যুক্তি নেই। 'কৃ' ধাতুর প্রয়োগ যে যত্নার্থক তা উভয়বাদি সিদ্ধান্ত। যখন কোন চেতনবাচক পদের সাথে 'কৃ' ধাতুর অন্বয় হয়ে প্রয়োগ হয় তখন 'কৃ'ধাতুর যত্নার্থক যে প্রয়োগ তাই বাচনিক প্রয়োগরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু অচেতনবাচক পদের ক্ষেত্রে 'কৃ'ধাতুর প্রয়োগ যে বাচনিক হয়েছে তা বলা যায় না। যেমন 'তন্তবঃ পটং কুর্বন্তি' এই ব্যবহারের স্থলে 'কৃ' ধাতুর প্রয়োগ লাক্ষণিক।

আখ্যাতের এক ক্ষেত্রে একটি মুখ্যার্থ ও অপর একটি বাচ্যার্থ এইরকম স্বীকার করতে কেউ কেউ আপত্তি কবতে পারেন। অনেকের মনে হতে পারে যে আখ্যাতের অর্থ যত্ন স্বীকার না করলে, অচেতনস্থলে আখ্যাতের কোন গৌণার্থ স্বীকারের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই ধরণের যুক্তির সাহায্যে আখ্যাতের মুখ্যার্থ ও গৌণার্থের ভেদ অস্বীকার করা যায় না। বরং লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে আখ্যাতের ক্ষেত্রে মুখ্যার্থ ও গৌণার্থের ভেদ অন্যত্র স্বীকার করা হয়ে থাকে। আখ্যাতের যে মুখ্যার্থ ও গৌণার্থের ভেদ আছে তা মধ্যম পুরুষগামী ও উত্তম পুরুষগামী যে সকল প্রত্যয় সেইগুলির ব্যবহারের দ্বারা

কখনও কখনও বোঝা যায়। যখন 'ত্বং গচ্ছ' এই ধরণের ব্যবহার করা হয় তখন যাকে উদ্দেশ্য করে 'ত্বং' এই ধরণের ব্যবহার করা হয়, সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যে চেতন তা ধরে নিয়েই আখ্যাতের মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ হয়। একইভাবে যখন আখ্যাতের উত্তম পুরুষের প্রয়োগ হয়, যথা, 'অহং গচ্ছামি' তখন উচ্চারয়িতা যে চেতন ব্যক্তি এই ধরে নিয়েই উত্তমপুরুষের প্রয়োগ হয়। এইগুলি সবই আখ্যাতের সাধারণ প্রয়োগ বলা যেতে পারে। কিন্তু কখনও চিত্রাঙ্কিত কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে 'ত্বং গচ্ছ' এই ধরণের মধ্যমপুরুষে আখ্যাতের যে প্রয়োগ হয় সেটি আখ্যাতের গৌণ প্রয়োগ বলে স্বীকার করতে হয় কারণ চিত্রস্থ ব্যক্তি চেতন পুরুষ নয়। তাছাড়া প্রথম পুরুষ স্থলে চিত্রস্থ অচেতনকে লক্ষ্য করে 'ইচ্ছতি', 'জানাতি' ইত্যাদি রূপে আখ্যাতের প্রয়োগ হয়। এই সকল ক্ষেত্রে আখ্যাতের গৌণতা অবশ্য স্বীকার্য।

যত্ন বা কৃতি যে আখ্যাতার্থ তা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নৈয়ায়িকেরা আরও একটি যুক্তি দেন। আমরা প্রবন্ধের আরম্ভে উল্লেখ করেছি যে পদের শক্তি গ্রহের বিবিধ উপায়ের মধ্যে বিবরণও একটি উপায়। 'বিবরণ' বলতে সমানার্থক পদের দ্বারা প্রযুক্ত পদের অর্থ কথন এইরকম বলা হয়। অন্যত্র, যেমন শব্দ-শক্তি-প্রকাশিকা গ্রন্থে 'বিবরণ' শব্দের দ্বারা বাক্যার্থ বোধের অনুকূল সুস্পষ্ট তুল্যার্থক বাক্যান্তর কথন বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিবরণের দ্বারা আখ্যাতমাত্রের যত্নার্থকতায় শক্তিজ্ঞান হয়। 'পচতি' এই পদের 'পাকং করোতি' এইরকম বিবরণ দেওয়া যায়। পচ্‌ধাতুর ব্যাখ্যা 'পাকং' পদ দ্বারা এবং তিঙ্‌রূপ আখ্যাতাংশের ব্যাখ্যা 'করোতি' পদ দ্বারা করা যায়। এর থেকেই বোঝা যায় 'কৃ' ধাতুর অর্থ কৃতি বা যত্ন এবং তাই আখ্যাতার্থ। নৈয়ায়িকের মত যে আখ্যাতের বিবরণ সর্বদা 'কৃ' ধাতুর দ্বারা হয়ে থাকে। 'পচতি'র মত 'গচ্ছতি'র ক্ষেত্রে একইভাবে বিবরণ দেওয়া যায়। 'গম্‌' ধাতু 'গমন' শব্দ দ্বারা এবং তিপ্‌ এর ব্যাখ্যা 'করোতি' শব্দ দ্বারা করা হয়ে থাকে। সুতরাং যেহেতু সর্বদা তিপ্‌ এর ব্যাখ্যা 'কৃ' ধাতু দ্বারা করা হয়, তাই বলা যায় কৃতিই আখ্যাতার্থ। যে শব্দ দ্বারা যে অর্থ নিয়মত প্রতীত হয়, সেই তার অর্থ। তিপ্‌ পদের দ্বারা সব সময়ে কৃতি বোধিত হয়, সুতরাং কৃতি আখ্যাতার্থ।

যত্ন, কৃতি যে সমানার্থকতা বোঝাবার জন্য ন্যায়দর্শনে 'কৃততা ব্যবহারের' উল্লেখ দেখা যায়। 'কুলালঃ ঘটং করোতি' বা 'কুলালেন ঘটং কৃতঃ' কুলালের ঘট বিষয়ে এইরকম ব্যবহার' দেখা যায়। এই ধরণের ব্যবহারকে 'কৃততা ব্যবহার' বলে। এই ধরণের 'কৃততা ব্যবহার' কতকগুলি স্থলে সম্ভব হয় এবং কতকগুলি স্থলে সম্ভব হয় না। লক্ষণীয় ঘট যেমন কুলাল জন্য, অঙ্কুরও তেমন বীজ জন্য, কিন্তু বীজজন্য অঙ্কুরের বিষয়ে আমাদের 'বীজঃ অঙ্কুরং করোতি' বা 'বীজেন অঙ্কুরঃ কৃতঃ' এই ধরণের ব্যবহার দেখা যায় না।

এই দুইরকমের ব্যবহারের পিছনে কারণ হলো যে কুলাল যত্নবান চেতন পুরুষ এবং যত্নবান চেতন পুরুষই কর্তা হতে পারে। যে বিষয়ের সম্পর্কে কৃততা ব্যবহার হয় সেই বিষয় সম্পর্কে যত্নপূর্বকত্বজ্ঞান থাকতে হবে। যত্নপূর্বকত্বেরজ্ঞান থাকলে ঘটাদিতে কৃততা ব্যবহার হয়। কিন্তু যে স্থলে যত্নপূর্বকত্বের জ্ঞান নেই সেখানে কৃততা ব্যবহার হয় না, যেমন 'অঙ্কুরঃ কৃতঃ' এইরকম ব্যবহার হয় না। যেহেতু অঙ্কুর বিষয়ে হেতুপূর্বকত্বের জ্ঞান থাকলেও যত্নপূর্বকত্বের জ্ঞান নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে যত্নই কৃতি অর্থাৎ 'কৃ' ধাত্বর্থ। যত্নপূর্বকত্ব জ্ঞানের পরিবর্তে যদি বলা হয় যৎকিঞ্চিৎ অনুকূলপূর্বকত্বজ্ঞান আছে তাহলেও কৃততা ব্যবহার এবং অকৃততা ব্যবহারের ভেদ সিদ্ধ হবে না। যৎ কিঞ্চিৎঅনুকূলপূর্বকত্বের জ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না কেননা এক স্থলে 'ঘটঃ কৃতঃ' এইরকম ব্যবহার হচ্ছে এবং অন্য একস্থলে 'অঙ্কুরঃ ন কৃতঃ' এইরকম ব্যবহার হচ্ছে। কারণ যৎকিঞ্চিৎ অনুকূলপূর্বকত্বজ্ঞান ঘট এবং অঙ্কুর উভয় স্থলেই থাকায় 'ঘটঃ কৃতঃ' এবং 'অঙ্কুরঃ ন কৃতঃ' এইরকম ব্যবহারের ভিন্নতার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কর্তৃর ব্যাপারই 'কৃ' ধাতুর অর্থ এবং কর্তা চেতন হয়; এখন প্রশ্ন হতে পারে, প্রকৃতপক্ষে কর্তা কাকে বলা যাবে? এই প্রসঙ্গে একাধিক বিকল্প আছে :

(১) বলা যেতে পারে, ধাতু বা আখ্যাতের দ্বারা প্রধানরূপে অভিধীয়মান যে ব্যাপার সেই ব্যাপারবত্তা কর্তৃত্ব। কিন্তু কর্তৃত্বের এই লক্ষণ আপত্তিকর কারণ এই লক্ষণ অনুসারে তাহলে দাঁড়ায় যে অনভিধান কালে যে ব্যক্তি কৃতিমান সেই ব্যক্তি কর্তা বলে গৃহীত হতে পারবে না।

(২) কর্তৃত্বের প্রথমলক্ষণটিকে কিছুটা পরিমার্জিত করে বলা যায় যে অভিধীয়মান ব্যাপারবত্তা কর্তৃত্ব নয়, বরং বলা যেতে পারে আখ্যাতের দ্বারা অভিধানযোগ্য ব্যাপারবত্তা কর্তৃত্ব বোঝানো হয়। কিন্তু এই লক্ষণের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে ব্যাপারের অভিধানযোগ্যতা নিরূপণ করা যায় না। ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে বলা হয়েছে — 'অভিধানযোগ্যতায়া এবানিরূপণাৎ'।

(৩) কর্তৃত্বের তৃতীয় লক্ষণ বলা যায় ফলানুকূলব্যাপারবত্তা কর্তৃত্ব। কর্তার ব্যাপার যে ফলানুকূল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু ফলানুকূলতা সকল কারকেরই আছে। কর্তার ব্যাপার যেমন ফলানুকূল তেমনি অন্যান্য কারকের ব্যাপারও ফলানুকূল। 'ফলানুকূলমাত্রস্য সর্বকারক ব্যাপার সাধারণত্বাৎ'।

(৪) কর্তার লক্ষণ আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে কারক ফলানুকূলব্যাপার বিশিষ্টরূপে বিবক্ষিত তাই কর্তা। এই ভাবে প্রদত্ত কর্তৃত্বের লক্ষণ অবিবক্ষা স্থলে প্রযোজ্য হবে না। এই আপত্তির উত্তরে বলা যেতে পারে যে স্ব স্ব ব্যাপারের প্রতি সকল কারকেরই কর্তৃত্ব

থাকে। সকল কারকের স্ব স্ব ব্যাপারের প্রতি কর্তৃত্ব থাকলে তাহলে তো বলতে হয় সকল কারকই কর্তৃকারক এবং তা হলে কারকের কর্ম করণ ইত্যাদি ভেদ স্বীকার করা যায় না। 'স্বব্যাপারে চ কর্তৃত্বং সর্বত্রৈবাস্তি কারকে -- ইতি ন্যায়েন করণাদিবিলোপ প্রসঙ্গঃ'।[২০] এই প্রসঙ্গে দুটি বিষয় লক্ষণীয় ঃ কারকের প্রধান ক্রিয়া, যে ক্রিয়া উদ্দেশ্যে কারকের প্রবৃত্তি ব্যাখ্যাত হয় এবং কারকের স্বব্যাপাররূপ অবান্তর ক্রিয়া, অবান্তর ব্যাপারের উদ্দেশ্যে কারকের প্রবৃত্তি নয়। কারক কি বোঝাতে গিয়ে তাই ন্যায়দর্শনে বলা হয়েছে যে ক্রিয়ার সাধন হয়ে ক্রিয়া বিশেষযুক্ত পদার্থই কারক এবং কারকের লক্ষণে এই দুটি পদেরই, যথাক্রমে 'ক্রিয়াবিশেষযুক্ত' এবং 'ক্রিয়ার সাধন', নিবেশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অবান্তর ক্রিয়ার সাধন মাত্রকে কারক বলা হলে যেহেতু প্রতিটি কারকের স্বক্রিয়ানিমিত্ত কর্তৃরূপ আছে অর্থাৎ অবান্তর ক্রিয়াতে কর্তৃত্ব আছে, তাহলে সব কারকই কর্তৃকারক হয়ে যাবে, কারকের বৈচিত্র্য রক্ষা করা যাবে না। প্রধান ক্রিয়ার সাধন হয়ে অবান্তর ক্রিয়াবিশেষযুক্ততাই কারক; যেহেতু প্রধান ক্রিয়া সাপেক্ষে কারক শব্দের প্রয়োগ, তাই 'প্রধান ক্রিয়া সাধন' এইমাত্র বললেই কারকের লক্ষণ ব্যক্ত হবে এমন বলা যায় না। প্রধান ক্রিয়ার সাধনই কারক, কিন্তু প্রতিটি কারকের স্ব স্ব ব্যাপার হেতু, কারকগুলির কর্তা, কর্ম, করণ ইত্যাদি বিভিন্নতা। 'দেবদত্ত কুঠারের দ্বারা কাষ্ঠছেদন করছে,' এই ক্ষেত্রে ছেদনই প্রধান ক্রিয়া, কুঠারের উদ্যমন ও নিপাতন অবান্তর ক্রিয়া, কাষ্ঠের সাথে কুঠারের সংযোগ কাষ্ঠের অবান্তর ক্রিয়া বা ব্যাপার।

এখন প্রশ্ন, প্রধান ক্রিয়াকে অবলম্বন করে 'কর্তৃকর্মাদি ব্যবহার বিশেষ নিয়মে কিং কারণমিতি .... এর উত্তরে বলা হয়ে থাকে স্বতন্ত্র অর্থৎ প্রযত্ন সমবায়। সমবায় সম্বন্ধে কৃতিমত্ত্ব। সুতরাং সর্বত্র যত্নই আখ্যাতার্থ।

ন্যায়মতে আখ্যাতের অর্থ প্রযত্ন, অর্থাৎ আখ্যাত সাধারণের ধর্ম প্রযত্নত্ব; প্রাচীন ন্যায়মতে যত্ন বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ নয়। বিধিলিঙের অর্থ প্রাচীন ন্যায়মতে ইষ্টসাধনত্ব প্রভৃতি। এখানে ইষ্টসাধনত্ব প্রভৃতি বলতে ইষ্টসাধনত্ব, কৃতিসাধ্যত্ব এবং বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব অভিপ্রেত। সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীতে[২১] বলা হয়েছে ঃ 'ইষ্টসাধনত্বার্দেবিধ্যর্থত্বে চ' (ইষ্টসাধনত্ব ইত্যাদি বিধির অর্থ)। অন্যত্রও প্রাচীন ন্যায়ে বলা হয়েছে ঃ 'প্রবর্ত্তক চিকীর্ষায়া হের্তুধীবিষয়ো বিধিঃ।' প্রবৃত্তির কারণ যে চিকীর্ষা, তার হেতু যে জ্ঞান, তার বিষয়ই বিধি। ফলত, এই মতানুসারে ইষ্টসাধনত্ব, কৃতিসাধ্যত্ব এবং বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব যে বিধি বুঝতে গেলে ন্যায়দর্শনে কিভাবে প্রবৃত্তির আলোচনা হয়েছে এই বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন। ন্যায়দর্শনে প্রবৃত্তির ক্রম যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে প্রবৃত্তির অনুকূল, আত্মার বিশেষ গুণরূপে স্বীকৃত যে ইচ্ছা তার থেকে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। 'ইচ্ছা' ব্যাপক অর্থে দুই প্রকারের হয় —

(১) ফলবিষয়ক ইচ্ছা; এবং
(২) উপায়বিষয়ক ইচ্ছা।

ন্যায় মতে ইষ্ট বা ফল হল সুখ এবং দুঃখাভাব। জ্ঞান থেকে ইচ্ছা জন্মে এইজন্য জ্ঞানের অভাবে ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারে না। ফলজ্ঞান থেকে ফলেচ্ছা জন্মে অর্থাৎ সুখের জ্ঞান থেকে সুখের ইচ্ছা জন্মে সুখ ও দুঃখাভাবের ইচ্ছা ফল-বিষয়িনী। সুতরাং সুখ ও দুঃখাভাবের জ্ঞান এই ইচ্ছার কারণরূপে গৃহীত হয়। ন্যায়মতে সুখ ও দুঃখাভাব স্বতঃ-পুরুষার্থ। স্বতঃ-পুরুষার্থের লক্ষণ হল .... 'যজ্ জ্ঞাতং সৎ, স্ববৃত্তিতয়েষ্যতে, সঃ স্বতঃ পুরুষার্থ ইতি ....'[২২] অর্থাৎ যে পদার্থের জ্ঞান হলে, সেই পদার্থস্ববৃত্তিত্বরূপে অর্থাৎ 'আমার হোক' বলে ইচ্ছার বিষয়, সেই পদার্থ স্বতঃপুরুষার্থ। স্বতঃপুরুষার্থের এই লক্ষণটির অলক্ষ্য স্থলে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য বলা হয়েছে 'ইতরেচ্ছানধীনেচ্ছা বিষয়ত্বং ফলিতোহর্থঃ। সকল প্রাণীর স্বভাবিক ধর্ম সুখ বা ইষ্টলাভের ইচ্ছা অপর কোন ইচ্ছার অধীন নয়। ফলেচ্ছা অন্যেচ্ছা প্রযুক্ত নয় তাই সেই ইচ্ছার বিষয় স্বতঃপুরুষার্থ। ন্যায়স্বীকৃত দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছা হল উপায়েচ্ছা, যে ইচ্ছার সম্পর্কে 'ইতরেচ্ছানধীনেচ্ছা' বলা যায় না। প্রবৃত্তির উৎপত্তির ক্রম যেভাবে ন্যায়দর্শনে বিন্যস্ত হয়েছে তার থেকে বোঝা যায় যে উপায়েচ্ছার প্রতি ফলসাধনতা বা ইষ্টসাধনতার জ্ঞান কারণ। প্রথমত, সুখ ও দুঃখাভাবরূপ ফলের জ্ঞান থেকে সুখ ও দুঃখাভাবরূপ ফলের ইচ্ছা জন্মে; দ্বিতীয়ত, ফল লাভের উপায় সম্পর্কে ইষ্টসাধনতা জ্ঞান জন্মে, তৃতীয়ত, উপায়ে ইচ্ছা বা চিকীর্ষা জন্মে এবং শেষে উপায়ে প্রবৃত্তি বা কৃতি জন্মে। এই ক্রম লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে উপায়েচ্ছা ফলেচ্ছার অধীন। সুতরাং উপায়েচ্ছার বিষয় স্বতঃপুরুষার্থ নয়।

ফলেচ্ছা স্বতঃকাম্য সুতরাং নিঃশর্ত। কিন্তু ফলসাধনের ইচ্ছা বা উপায়েচ্ছা একাধিক শর্তের উপর নির্ভরশীল। প্রবৃত্তির প্রতি কারণ উপায়েচ্ছা বা চিকীর্ষা। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে চিকীর্ষার লক্ষণে বলা হয়েছে ঃ 'কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারিকেচ্ছা।'[২৩] চিকীর্ষা যেহেতু কৃতি সাধ্যত্বপ্রকারক ইচ্ছা, এবং ইচ্ছা মাত্রেরই স্বপ্রকারকজ্ঞানজন্যত্ব আছে তাই চিকীর্ষা কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারকজ্ঞানজন্য। প্রবর্তমান পুরুষের যে সাধন সম্পর্কে স্বীয় কৃতির দ্বারা সাধ্যতাজ্ঞান আছে এবং উক্ত জ্ঞান জন্য যে স্বীয় কৃতির দ্বারা সাধ্যতার ইচ্ছা জন্মে তাই চিকীর্ষা। এইকারণে কৃতিসাধ্য যে বিষয় সেই সংক্রান্ত ইচ্ছা চিকীর্ষা, অর্থাৎ কৃতিসাধ্যবিষয়িনীচ্ছা।

চিকীর্ষার প্রতি কি কারণ এই বিষয়ে নৈয়ায়িক এবং প্রাভাকর মীমাংসকেরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। প্রাভাকর মীমাংসক মতে কার্যতাজ্ঞান চিকীর্ষাকে দ্বার করে প্রবৃত্তির

প্রতি কারণ হয়। অপরদিকে ন্যায়মতে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান এবং বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বজ্ঞান চিকীর্ষাকে ব্যাপার করে প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। প্রাভাকর মীমাংসকেরা কার্যতাজ্ঞানকে এবং নৈয়ায়িকেরা কৃতিসাধ্যতার জ্ঞানকে প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বলেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে যে এই উভয়বিধ জ্ঞানের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে দার্শনিকেরা এই জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একমত নন।

গাগাভট্ট. তার ভাট্টচিন্তামণি গ্রন্থে দু'ধরণের কার্যতাজ্ঞানের সর্ম্পকে আলোচনা করেছেন। একধরণের কার্যতাজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশিত আকার 'ময়া ইদং কর্ত্তুম শক্যতে' বা 'ইহা আমার দ্বারা করা যায়' এই ধরণের। এই ক্ষেত্রে কোন ক্রিয়া সর্ম্পকে কর্তার সম্পাদনের যোগ্যতা আছে এই অর্থ প্রকাশ করে। কার্যতাজ্ঞানের দ্বিতীয় ধরণের আকার এইরূপ ঃ 'ময়া ইদম অবশ্যম্ কর্ত্তব্যম্'। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোন ক্রিয়া সম্পর্কে কর্তার সম্পাদন যোগ্যতার অতিরিক্ত কিছু দাবী করা হয়; এক্ষেত্রে কর্তার কোন ক্রিয়া সম্পর্কে 'তার অবশ্য করা উচিত' এই বোধও থাকে। প্রথম প্রকার ব্যাখ্যা অনুসারে কার্যতাজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্যতার যোগ আছে এবং দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটি ঔচিত্যের যোগ আছে।

ন্যায়মতে কোন কর্মে প্রবৃত্তি হতে গেলে সেই কর্ম সম্পর্কে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান থাকা চাই। যেখানে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান নেই সেখানে প্রবৃত্তি হয় না। কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান অর্থাৎ 'ইহা আমার চেষ্টা বা যত্নসাধ্য' এইরূপ জ্ঞান। বৃষ্টিকরণ বা বৃষ্টির উৎপাদন কৃতির অসাধ্য বলে সেখানে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান নেই ফলে ঐ জাতীয় কর্মে প্রবৃত্তি হয় না। এইজন্য নৈয়ায়িকেরা কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি অন্যতম আবশ্যিক শর্ত হিসেবে গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় শর্ত ইষ্টসাধনতাজ্ঞান। 'ইহা আমার ইষ্টের অর্থাৎ অভিপ্রেত ফলের সাধন' এই ধরণের জ্ঞানকে ইষ্টসাধনতার জ্ঞান বলা হয়। ন্যায় মতে প্রবৃত্তির প্রতি ইষ্টসাধনতার জ্ঞান অন্যতম আবশ্যিক শর্ত। যে কার্যে কোন ইষ্ট বা ফল নেই সেই কার্যে কোন পুরুষের প্রবৃত্তি হয় না। এইজন্য নিষ্ফল জলতাড়ন কার্যে প্রবৃত্তি হয় না।

এই প্রসঙ্গে কেবল মাত্র ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ এইরকম মত নৈয়ায়িকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আকাশের চাঁদ ধরতে পারলে ইষ্টের সাধন হয়, এই ধরণের বোধ আকাশের চাঁদ ধরতে প্রবৃত্ত করে না কারণ ঐ ধরণের ক্রিয়া সম্পর্কে কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান নেই। প্রবৃত্তির কারণ হিসেবে নৈয়ায়িকেরা আরও একটি তৃতীয় শর্তের, বলবদনিষ্ঠাননুবন্ধিত্ব জ্ঞানের উল্লেখ করেন। কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান ও ইষ্টসাধনতার জ্ঞান মাত্রই যদি প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হত তাহলে বিষমিশ্রিত অন্নভোজনে, যেহেতু ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ ইষ্টের সাধন

ও কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান আছে, প্রবৃত্তি হতো। কিন্তু বাস্তবিক বিষমিশ্রিত অন্নভোজনে কারোর প্রবৃত্তি হয় না। 'বলবদনিষ্ঠাননুবন্ধিত্ব' এই শব্দটি কি ভাবে ব্যাখ্যা করা হবে এই বিষয়ে নৈয়ায়িকগণ একমত নন। এই ব্যাপারে মূলত দুই প্রকার ব্যাখ্যা আছে। একটি ব্যাখ্যা অনুসারে বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব একটি সদর্থক শর্ত এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে এটি নঞর্থক শর্ত। 'বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বজ্ঞান' এই সমাসবদ্ধ পদটিতে কোন সমস্ত পদটির, জ্ঞানের অথবা অভাবের, প্রাধান্য স্বীকৃত হবে এই ব্যাপারে দ্ব্যর্থকতার অবকাশ আছে। 'বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বজ্ঞান' পদটি বিশ্লেষণ করে আমরা এই দুটি বিকল্প পেতে পারি, যথাক্রমে —

(১) বলবদনিষ্টের অপ্রয়োজক জ্ঞান, অথবা

(২) বলবদনিষ্টের প্রয়োজক জ্ঞানাভাব

বিশ্বনাথ নঞর্থক ব্যাখ্যা গ্রহণে আগ্রহী। প্রবৃত্তির প্রতি প্রতিবন্ধক বলবদনিষ্টসাধনতাজ্ঞান, সুতরাং বলবদনিষ্টসাধনতাজ্ঞানাভাব প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তবে অনেকের মতে প্রবৃত্তির শর্তরূপে বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বজ্ঞান নঞর্থক হতে পারে না। কারণ অনিষ্টজনক জ্ঞানাভাব রূপ বিষয় দুর্বোধ্য; আমরা কোন অনিষ্ট বলবদনিষ্টের জনক কিনা তা সদর্থক ভাবে বুঝতে পারি।

নৈয়ায়িকগণ প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হিসেবে যে তিনটি আবশ্যিক শর্তের উল্লেখ করেছেন সেই সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার সমালোচনা উঠেছে। প্রথমত, প্রবৃত্তির প্রতি শর্তরূপে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান কতদূর এবং কি অর্থে গ্রহণ করতে পারি সেই বিষয়ে আলোচনা করতে পারি। যেমন একটি বালক যখন ভবিষ্যতে যৌবনকাল প্রাপ্ত হবে, তখন তার যে সমস্ত বিনোদনে প্রবৃত্তি হবে সেই সমস্ত বিনোদন বিষয়ে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান তার বাল্যাবস্থায় থাকলেও প্রবৃত্তি হয় না। সেক্ষেত্রে আপত্তি হতে পারে যে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান যদি প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয় তবে ঐ বালকটির কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যুবাসুলভ বিনোদনে তার কেন প্রবৃত্তি নেই? এখানে নৈয়ায়িকদের উত্তর হলো কেবলমাত্র কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান হলেই হবে না, সেই জ্ঞানটিকে তদানীম্ এই বিশেষণে বিশেষিত করতে হবে অর্থাৎ যে কালে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হচ্ছে তৎকালেই সেই কার্যের সম্পর্কে পুরুষের কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান আবশ্যিক। এইজন্য বালকের যুবকসুলভ বিনোদনে প্রবৃত্তি নেই, কারণ তার তৎকালীন কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান নেই।

প্রবৃত্তির দ্বিতীয় শর্তরূপে ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ইষ্টসাধনতাজ্ঞান কি প্রকৃতপক্ষেই আবশ্যিক শর্ত? এর উত্তরে ন্যায় মত হল, কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানের ন্যায় ইষ্টসাধনতাজ্ঞানকে তদানীন্তন এই বিশেষণে বিশেষিত করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভোজন-তৃপ্ত পুরুষের ভোজনে প্রবৃত্তি হয় না। তার কারণ সেই মুহূর্তে ভোজনে

তার কোন ইষ্ট নেই। সুতরাং ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের পূর্বেও তদানীন্তন এই বিশেষণযুক্ত করতে হবে। ন্যায়মতে প্রবৃত্তির কারণ যে চিকীর্ষা তার হেতু যে জ্ঞান তার বিষয়ই বিধি; ফলত আমাদের আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে ন্যায়মতে ইষ্টসাধনত্ব, কৃতিসাধ্যত্ব এবং বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব এই তিনটিই বিধির অর্থ।

ইষ্টাসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ রূপে স্বীকার বিষয়ে পূর্বপক্ষীর দিক থেকে সংশয় দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকার কর্মের একটি বিভাগের প্রণালী অনুসারে কর্ম দুইপ্রকার, যথা —

(১) নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম ও
(২) কাম্যকর্ম

নিত্যকর্ম বলতে কি ধরণের কর্ম বোঝানো হবে এই ব্যাপারে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। নিত্যকর্মের একটি লক্ষণ অনুসারে বলা যায় যে কর্ম যে আশ্রমের এবং যে বর্ণের পুরুষের পক্ষে নিয়ত নিমিত্ত প্রাপ্ত, তাই নিত্যকর্ম। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনা নিত্যকর্ম। নিত্যকর্মের সাথে তুলনা করে আমরা নৈমিত্তিক কর্ম কাকে বলে বুঝতে পারি। যে কর্ম কোন নিমিত্ত উপস্থিত হলে করণীয়। পুত্রের জন্মরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হলে বৈশ্বানরেষ্টি বা জাতেষ্টি কর্তব্য তাই ঐ কর্ম নৈমিত্তিক কর্ম। যেমন গঙ্গাস্নান ইত্যাদি কোন বিশেষ তিথিতে করণীয়। নিত্যত্বের একটি লক্ষণ অনুসারে নিত্যত্ব ধ্বংসাভাবের অপ্রতিযোগী এবং প্রাগভাবের অপ্রতিযোগী, 'ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বেসতি প্রাগভাবাপ্রতিযোগিত্বং নিত্যত্বম্'। নিত্যকর্ম প্রসঙ্গে 'নিত্য' শব্দের এই অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। 'নিত্য' শব্দ প্রতিদিন অর্থে প্রযোজ্য হবে না। অপরদিকে, কাম্য বলে যে কর্মগুলি চিহ্নিত সেইগুলিই মাত্র ফলকামনায় করা হয়। স্বর্গ, পশু, বৃষ্টি, গ্রাম প্রভৃতি পদার্থের কামনাবশে যে কর্মসমূহ বেদাদিশাস্ত্রে উপদিষ্ট হয়েছে তাই কাম্য কর্ম। যথা, 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত', 'চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ, 'কারীযা বৃষ্টিকামো যজেত' ইত্যাদি বেদবিহিত কর্মই কাম্য। এই ধরণের ফলকামনা যার নেই সে ঐরূপ কর্ম করবে না। নৈয়ায়িকেরা মনে করেন যে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান কেবলমাত্র কাম্য বা অভিলষিত কর্মে প্রবৃত্তির কারণ তা নয়, নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে প্রবৃত্তিরও শর্ত। সকল কর্মে প্রবৃত্তির প্রতি ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের কারণতা সিদ্ধ হওয়ায় বৈদিক কাম্য কর্মের ক্ষেত্রে কিংবা 'বিশ্বজিতা যজেত' প্রভৃতি বিধিবাক্যের ক্ষেত্রে, যেখানে ফলের উল্লেখ করা হয়নি, উভয়ক্ষেত্রেই একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। এই ধরণের ব্যাখ্যা সাধারণ ব্যাখ্যা রূপে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে। বিশেষ করে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান দ্বারা প্রবৃত্তির কারণতা ব্যাখ্যা করার কিছু অসুবিধা আছে। পূর্বপক্ষীর দিক থেকে প্রশ্ন ওঠে যে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান যদি প্রবৃত্তির প্রতি সর্বক্ষেত্রেই

কারণ হয় তবে 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' প্রভৃতি নিত্যকর্মস্থলে যেখানে কোন ফল উৎপন্ন হয় না, সেখানে কি ভাবে অভিপ্রেত ফলের বা ইষ্টের সাধনতার জ্ঞান থাকতে পারে কিংবা প্রবৃত্তি উৎপন্ন হতে পারে? আরও প্রশ্ন হবে তাহলে 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' এই প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত সমাধানের উপর নির্ভর করছে ন্যায়স্বীকৃত ইষ্টসাধনত্ব বিধ্যর্থরূপে স্বীকার করা যাবে কিনা।

এই প্রশ্নের সমাধানের উদ্দেশ্যে দুটি বিকল্প প্রস্তাব করা যেতে পারে —

প্রথমত, নিত্যকর্মের ফল আছে এইরকম একটি মত গ্রহণ করা যেতে পারে,

অথবা দ্বিতীয়ত, নিত্যকর্মে প্রবৃত্তি হয় না এইরকম স্বীকার করতে হয়।

প্রথম বিকল্পটি আলোচনা করা যাক। অর্থবাদ বাক্যগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় কখন ব্রহ্মালোক আবার কখন প্রত্যবায়াভাব ফলরূপে কথিত হয়েছে। একটি অর্থবাদবাক্য[২২] যথা, 'সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং শংসিত ব্রতাঃ। বিধুত পাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মালোকং সনাতনম্।।' (অর্থাৎ 'যাহারা কিন্তু ব্রতপরায়ণ হইয়া সর্বদা সন্ধ্যার উপাসনা করে, তাহারা নিষ্পাপ হইয়া অনাময় ব্রহ্মালোক গমন করে'), উদ্ধৃত করে দেখানো যায় যে ব্রহ্মালোক প্রাপ্তিকে নিত্যকর্মের ফল বলে দেখানো হয়েছে। সুতরাং সন্ধ্যোপাসনার ক্ষেত্রে অর্থবাদ বাক্যবোধ্য ব্রহ্মালোক বা প্রত্যবায়াভাব ফলরূপে গৃহীত হতে পারে। কিন্তু নিত্যকর্মের যদি ফল স্বীকার করা হয় তাহলে সেই কর্ম ফলের কামনায় করা হচ্ছে স্বীকার করতে হয়। এই ধরণের বিকল্প গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ কাম্যকর্ম সফল এবং নিত্যকর্ম নিষ্ফলরূপে স্বীকৃত, সুতরাং কাম্যত্ব এবং নিত্যত্বের মধ্যে বিরোধ আছে। সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়ার প্রতি কামনাজন্যত্ব হেতু স্বীকার করলে নিত্যকর্মের নিত্যত্বের হানি হয়।

দ্বিতীয় বিকল্প গ্রহণ করলে নিত্যকর্মের ক্ষেত্রে কোন ফলকামনা বা ফলেচ্ছা নেই এই বিকল্প গ্রহণ করতে হয়। নিত্যকর্মের ক্ষেত্রে ফলসাধনতা না স্বীকার করলে নিত্যকর্মের ক্ষেত্রে ইষ্টসাধনতা আছে বলা যাবে না। ইষ্টসাধনতাজ্ঞান না থাকলে নিত্যকর্মের অকরণের আপত্তি হয় এক্ষেত্রে বলা যাবে যে নিত্যকর্ম নিষ্ফল। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে যে নিত্যকর্মের ফল সম্পর্কে যে শ্রুতি বা বিধিবাক্য আছে সেগুলির কি হবে? নিত্যকর্মসম্পর্কিত ফলশ্রুতি-গুলিকে অর্থবাদরূপে বুঝতে হয়। নিত্যকর্ম সম্পর্কিত ফলশ্রুতি, ফলশ্রুতি রূপে নিরর্থক কিন্তু অর্থবাদরূপে স্তুতিতে পর্যবসিত হয়। সুতরাং এই দ্বিতীয় বিকল্পটিও গ্রহণযোগ্য হয় না।

ন্যায়ের পক্ষ থেকে ইষ্টসাধনত্ব বিধির অর্থ এই মত স্থাপনের প্রয়াসে কিভাবে নিত্যকর্মের প্রতি প্রবৃত্তি ব্যাখ্যা করা যায় সেই চেষ্টায় অপর যুক্তির অবতারণা করা যায়। এই প্রসঙ্গে দুই ধরণের বেদবিহিত ক্রিয়ার উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে যে কোন কোন

ক্রিয়াতে একাধিক বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে এবং একাধিক বৈশিষ্ট্য থাকার অর্থ এই নয় যে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি পরস্পর বিরোধী। গ্রহণশ্রাদ্ধ নামক সূর্যাদিগ্রহণ নিমিত্ত শ্রাদ্ধের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। গ্রহণশ্রাদ্ধ নিত্যকর্ম অথচ ঐ শ্রাদ্ধ গ্রহণ উপলক্ষ্যে করতে হয় বলে নৈমিত্তিককর্মও বলা হয়ে থাকে। সুতরাং একই ক্রিয়া গ্রহণশ্রাদ্ধে নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব থাকা সত্ত্বেও কোন বিরোধ নেই। ভরণীশ্রাদ্ধ, আরেক প্রকার শ্রাদ্ধ, ক্রিয়াতে কাম্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্বের কোন বিরোধ নেই। সেইরকমই সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্মের ক্ষেত্রে নিত্যত্ব ও কাম্যত্ব উভয় বৈশিষ্ট্যই আছে তাতে কোন বিরোধিতা নেই।

সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্মের অকরণের আপত্তি কেন গ্রহণযোগ্য নয় সেই প্রসঙ্গে কতকগুলি যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে। প্রাভাকর মীমাংসকেরা মনে করেন প্রবৃত্তির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার জন্য নিত্যকর্মে কাম্যত্ব এবং নিত্যকর্মের প্রতি ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের কল্পনা অযৌক্তিক। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা মনে করেন ত্রৈকালিক স্তব পাঠাদিস্থলের মত সন্ধ্যোপাসনার ক্ষেত্রেও কামনার অস্তিত্ব কল্পিত হয়। বেদবোধিত কার্যতার জ্ঞান থেকে প্রবৃত্তির উদয় হয় না। অনুষ্ঠাতা পুরুষের ইষ্টসাধনতা না হলে বেদবোধিত সহস্র কার্যতার জ্ঞান দ্বারা প্রবৃত্তির উদয় হয় না।

কোন কোন প্রাভাকর মীমাংসকেরা নিত্যকর্মের পণ্ডাপূর্বরূপ ফল স্বীকার করেন। পণ্ডাপূর্ব বলতে এক অদৃষ্ট বিশেষ বোঝানো হয় যা ফল সাধনে অযোগ্য। যে অপূর্ব দ্বারা উত্তরকালে স্বর্গাদি ফল লাভের সম্ভাবনা নেই সেইরকম নিষ্ফল অপূর্ব হল পণ্ডাপূর্ব। নৈয়ায়িকেরা মনে করেন তারা যে নিত্যকর্মের ক্ষেত্রে অকরণের আপত্তি তুলছেন, সেই আপত্তির উত্তর সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্মের ফলরূপে পণ্ডাপূর্ব স্বীকার নয়। পণ্ডাপূর্বরূপ ফল স্বীকার করলেও পণ্ডাপূর্বরূপ ফলের ক্ষেত্রে ফল কামনা বা ফলেচ্ছা থাকে না, সুতরাং পণ্ডাপূর্বরূপ ফল স্বীকার করলেও নিত্যকর্মের অকরণের আপত্তি থেকেই যায়।

নিত্যকর্মের ফল না থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে নিত্যকর্মের ফল কল্পিত হয় এবং তার দ্বারা নিত্যকর্মের অকরণের আপত্তির উত্তর হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয় যে রাত্রিসত্রবাচ্য কতকগুলি কর্মের কোন ফলশ্রুতি না থাকলেও অর্থবাদবাক্যোক্ত প্রতিষ্ঠারূপ ফল কল্পিত হয়। অর্থবাদশ্রুতিতে আছে, 'প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বা য এতা রাত্রীরূপয়ন্তী।'[২৬] কেউ কেউ প্রত্যবায়ের অনুৎপত্তিকে নিত্যকর্মের ফল স্বীকার করেন। কিন্তু অনুৎপন্ন প্রত্যবায়ের ফলত্ব নেই, সুতরাং ফলত্বাভাববশত ফলসাধনাজ্ঞান নেই। ফলসাধনাজ্ঞানের অভাবে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্মে কিভাবে প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা করা যায়? পূর্বমীমাংসা সিদ্ধান্তে নিত্য নৈমিত্তিক কর্মজন্য কোন ফল হয় না কিন্তু উহাদের অকরণে প্রত্যবায় (পাপ) হয়। সুতরাং শ্রেয়স্কাম ব্যক্তি অনিষ্ট পরিহারের জন্য নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম করবেন,

'নিত্যনৈমিত্তিক কুর্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া'।[২৭] ভাট্টমীমাংসকেরা সঞ্চিত পাপের নাশকে নিত্যকর্মের ফল বলে স্বীকার করেন। প্রাভাকর মীমাংসকেরা প্রত্যবায়ের প্রাগভাবকে নিত্যকর্মের ফল বলে স্বীকার করেন। এখানে মীমাংসকদের বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে। মীমাংসকেরা যেভাবে নিত্যকর্মের ফলের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নৈয়ায়িকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রাভাকর মীমাংসকেরা প্রত্যবায়ের প্রাগভাবকে নিত্যকর্মের ফল স্বীকার করেছেন নিত্যকর্মের অকরণাপত্তি দূর করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রাগভাব উৎপন্ন হয়নি বলে তা ফলরূপে কল্পিত হতে পারে না এবং তদ্বিষয়ে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

মীমাংসকদের পক্ষ থেকে এইভাবে উত্তর দেওয়া যেতে পারে যে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম অনুষ্ঠিত হলে প্রত্যবায়ের প্রাগভাব থাকে, নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান না হলে প্রত্যবায়াভাবের অভাব থাকে, অর্থাৎ নিত্যকর্ম না করলে প্রত্যবায় হয়। এখানে আরও বলা হয় যে প্রত্যবায়ের প্রাগভাব থাকলে দুঃখের প্রাগভাব থাকে। প্রত্যবায়ের প্রাগভাবের অভাব থাকলে দুঃখের প্রাগভাবের অভাব থাকে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠেছে। ইষ্টসাধনতাজ্ঞান যদি প্রবৃত্তির প্রতি আবশ্যিক শর্ত হয় তবে যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করতে প্রবৃত্ত হচ্ছে, সেক্ষেত্রেও কি স্বীকার করতে হবে যে ঐ ব্যক্তির আত্মহত্যা বিষয়ে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান আছে? অর্থাৎ আমাদের জিজ্ঞাস্য হল, আত্মহননরূপ ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তমান পুরুষের কোন ইষ্টের জ্ঞান থাকে? এই অভিযোগের উত্তরে নৈয়ায়িকদের বক্তব্য হল, এই ক্ষেত্রেও ব্যক্তির ইষ্টসাধনতাজ্ঞান থাকে, কারণ ক্রোধদ্বারা দূষিত চিত্ত ব্যক্তির বিষাদি ভক্ষণে প্রবৃত্তি হয় এবং সেই সময়ে অনুষ্ঠাতা ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে বলবান অনিষ্টের অজনকজ্ঞান থাকে। অস্বাভাবিক মনের ভাব থাকে বলে বিচারবুদ্ধি যথাযথভাবে পরিচালিত হয় না, সুতরাং বিষভক্ষণ সম্পর্কে তদানীম্‌বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বজ্ঞান থাকে। এক্ষেত্রে 'বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব' বাক্যাংশটি সদর্থকভাবে গৃহীত হয়েছে। এই বাক্যাংশটির নঞর্থক ব্যাখ্যার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বলতে হবে আত্মহত্যার ক্ষেত্রে বলবৎ অনিষ্টের জ্ঞানের অভাব থাকে। যখন কোন দেশপ্রেমিক দেশের জন্য মৃত্যুবরণ করতে প্রবৃত্ত হয় সেক্ষেত্রে তার চিত্ত রাগদূষিত চিত্ত নয়, তার তখন মৃত্যু সম্পর্কে বলবান অনিষ্টের অজনক জ্ঞান থাকে।

এখন আমাদের প্রশ্ন হল, বলবান অনিষ্টের অননুবন্ধিত্বজ্ঞানকে কিভাবে প্রবৃত্তির শর্তরূপে ব্যাখ্যা করা হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষাপরিচ্ছেদকার মনে করেন 'ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ' ইত্যাদি বিধিবাক্যের ক্ষেত্রে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান বা কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানকে প্রবৃত্তির হেতু বলা যায় না কারণ এই উভয়জ্ঞানের সঙ্গে নঞর্থের অন্বয় সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে আমাদের ইষ্টসাধনতাজ্ঞান ও কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান উভয়ই আছে। কিন্তু কলঞ্জভক্ষণ অর্থাৎ বিষলিপ্তবাণের দ্বারা নিহত মৃগমাংসভক্ষণ নরকদুঃখ ভোগরূপ বলবান অনিষ্টের জনক, এইজন্য এইক্ষেত্রে

বলবান অনিষ্টাননুবন্ধিত্ব জ্ঞানের সঙ্গেই নঞর্থের অন্বয় হচ্ছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বলবান অনিষ্টাননুবন্ধিত্ব জ্ঞানকেই প্রবৃত্তির শর্ত বলতে হবে। এখানে একটি প্রশ্ন উঠছে বলবান অনিষ্টের অননুবন্ধিত্বজ্ঞানকে যদি বিধিবাক্যের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির হেতু বলা যায় তবে নরকত্বসাধনজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পুরুষের অগম্যস্ত্রীগমন অথবা শত্রুবধরূপ ক্রিয়াতে প্রবৃত্তির কি ব্যাখ্যা হবে? উত্তরে বলা হয় যে উৎকট রাগ ইত্যাদির ফলে পুরুষের নরকত্বসাধনের জ্ঞান তখন তিরোহিত হয়ে যায়।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'শ্যেনেন অভিচরন যজেত' এবং শ্যেনযাগ মরণজনক, সুতরাং হিংসা উৎপন্ন করে। শ্যেনযাগ বিহিত কর্ম বলে শ্যেনযাগে পুরুষের প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু এই স্থলে 'বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব' এই শর্ত কিভাবে পালিত হচ্ছে? কারণ মরণের জনক শ্যেনযাগ হিংসা বলে বরং বলবান অনিষ্ট নরকের সাধন হয়েছে। শ্যেনযাগে যে হিংসা তা বৈধ হিংসা বলে কি গণ্য হতে পারে? শাস্ত্রে বৈধ হিংসা বলে একধরণের হিংসা স্বীকার করা হয়। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে হিংসা নিষিদ্ধ হয়েছে। 'মা হিংস্যাৎ' অর্থাৎ 'হিংসা করিও না'। এই বিধিবাক্য হিংসা নিষেধ করে। অপরদিকে কিছু কিছু ধরণের হিংসা নিষেধ বিধির আওতার বাইরে পড়ে কারণ সেই ধরণের হিংসা শাস্ত্র-বিহিত। শ্যেনযাগকে কেন্দ্র করে যে মরণজনক হিংসা উৎপন্ন হয় সেই হিংসা সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে বৈধ হিংসারূপে গৃহীত হয়নি। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে অভিচার কর্মের অনুষ্ঠানে যদি কোন অধর্ম না হত তবে বেদের অভিচারকর্মকাণ্ডে শ্যেনযাগকর্তার প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হতো না।

এখানে আবার প্রশ্ন উঠতে পারে যে শ্যেনযাগকে হিংসাত্মক বলা হচ্ছে কারণ তা মরণজনক; কিন্তু তাহলে মরণজনক কার্যমাত্রই কি হিংসাত্মক বলে গণ্য হবে? তাহলে যে খড়্গ নির্মাণ করে এবং যে নির্মিত খড়্গ ব্যবহার করে প্রাণী হত্যারূপ হিংসা করা হয় তার সম্পর্কেও কি হিংসার আপত্তি উঠতে পারে? অথবা গললগ্ন অন্নভোজনে কারো মৃত্যু হলে তাকে কি অত্মহত্যা বলা যাবে? এই ক্ষেত্রে হিংসা বলতে কি বোঝায় তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কোন ক্রিয়া অনুষ্ঠানের ব্যাপার রূপে হিংসা থাকতে পারে, আবার কোন ক্রিয়ার উদ্দেশ্যই হিংসা হতে পারে। হিংসার লক্ষণ এখানে করা হয়েছে ঃ 'মরণোদ্দেশ্যক মরণানুকূল ব্যাপার'[২৮] — অর্থাৎ মরণ যেখানে কোন ক্রিয়ার ব্যাপার রূপে এবং উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং হিংসার লক্ষণে 'মরণোদ্দেশ্যক' পদ নিবেশ করা হয়েছে এবং এই নিবেশের দ্বারা মরণানুকূল ব্যাপার মাত্রে হিংসার আপত্তি নিবারিত হল। হিংসার লক্ষণ 'মরণোদ্দেশ্যক মরণানুকূল ব্যাপার' রূপে গৃহীত হলে কিছু অসুবিধা দেখা দেয়। অন্যের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত নারাচ, মরণের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত নারাচ নয়, তার দ্বারা ব্রাহ্মণ নিহত হলে, সেক্ষেত্রে নারাচ নিক্ষেপকারীর প্রায়শ্চিত্তের

বিধান আছে। এই ক্ষেত্রে নারাচ নিক্ষেপকারীর কাজ গর্হিত বলে গণ্য হচ্ছে। হিংসার দ্বিতীয় লক্ষণ, 'মরণোদ্দেশ্যক অদৃষ্টাদ্বারক মরণানুকূল ব্যাপার'।[২৯] এই লক্ষণ অনুসারে হিংসার বৈশিষ্ট্য অদৃষ্ট অদ্বারকত্ব অর্থাৎ অদৃষ্ট অজনকত্ব। কোন ক্রিয়ার মরণজনকত্ব দুইভাবে থাকতে পারে; কোন ক্রিয়ার সাক্ষাৎ মরণজনকত্ব থাকতে পারে; আবার কোন ক্রিয়া অদৃষ্টদ্বারা মরণজনক। যে সমস্ত ক্রিয়া সাক্ষাৎভাবে মরণের জনক সেইগুলিই হিংসাত্মক। শ্যেনযাগ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মরণজনক নয়। শ্যেনযাগের দ্বারা উৎপন্ন অপূর্ব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মরণজনক। শ্যেনযাগ মরণানুকূল ব্যাপার হলেও, শ্যেনযাগের দ্বারা অদৃষ্ট বিশেষের উৎপত্তি হয় বলে শ্যেনযাগ হিংসাত্মক হল না। শিবপূজাদি থেকে প্রথমত অদৃষ্ট বিশেষের উৎপত্তি হয় এবং তার ফলে কাশীতে মৃত্যু হয়। সুতরাং শিবপূজা মরণানুকূল ব্যাপার হল, কিন্তু যেহেতু অদৃষ্টের জনক, তাই, হিংসাত্বের লক্ষণ 'অদৃষ্টাদ্বারকত্ব' তাতে থাকল না। কিন্তু হিংসার এই লক্ষণের যাথার্থ্য সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠেছে। শ্যেনযাগ স্থলে খড়্গাঘাতের দ্বারা উৎপন্ন ব্রণ সমূহের (ক্ষতের) পাকপরম্পরায় ক্ষতজনিত রোগ দ্বারা ব্রাহ্মণের মৃত্যু হলে যেখানে খড়্গাঘাতের হিংসাত্ব অনুপপন্ন হয়। মূলকথা, শ্যেনযাগ বৈধ বলে পাপরূপে গণ্য না হলেও, শ্যেনযাগের প্রয়োজনে খড়্গাঘাত, ইত্যাদি জন্য পশ্চাৎভাবি পাপ হয় এবং সেই কারণে শ্যেনযাগে সাধু লোকেরা প্রবৃত্ত হন না।

এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করলাম তার থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে প্রাচীন ন্যায় মতে বিধির অর্থ দাঁড়াল বলবৎ অনিষ্টের অননুবন্ধিত্ববিশিষ্ট ইষ্টসাধনত্ববিশিষ্ট কৃতিসাধ্যত্ব। এই মতানুসারে ইষ্টসাধনতাই বিধি প্রত্যয়ের অর্থ। কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে এই মতানুসারে প্রবৃত্তির কারণ যে চিকীর্ষা, তার হেতু যে জ্ঞান তার বিষয়ই বিধি। চিকীর্ষার প্রতি কারণ কি বিস্তারিত আলোচনার পর আমরা দেখি যে ন্যায়মতে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান, কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান এবং বলবদনিষ্টাজনকত্বের জ্ঞান কারণ। এই জ্ঞানের বিষয়রূপে পাওয়া যায় ইষ্টসাধনত্ব, কৃতিসাধ্যত্ব এবং বলবদনিষ্টাজনকত্ব। ফলত, ইষ্টসাধনত্ব, কৃতিসাধ্যত্ব ও বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব বিধির অর্থ। অথবা, এইভাবেও বলা যায় যে বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব বিশিষ্ট কৃতিসাধ্যতাবিশিষ্ট ইষ্টসাধনত্ব বিধি প্রত্যয়ের অর্থ। 'ইহা করলে আমার অভিলষিত সিদ্ধ হবে' এই ধরণের জ্ঞান চিকীর্ষার জনক এবং চিকীর্ষারূপ ব্যাপার দ্বারা কার্যে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু কেবল ইষ্টসাধনতা জ্ঞান থাকলেই প্রবৃত্তি হয় না, কৃতিসাধ্য বিষয়ে ইষ্টসাধনতা জ্ঞান থাকলে অধিকারী ব্যক্তি, তত্তৎকার্যে প্রবৃত্ত হয়। 'ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ' এই ক্ষেত্র বিবেচনার পর বলবদনিষ্টের অজনকত্ব বিধির অর্থ স্বীকার করতে হয়।

ব্যাকরণভূষণসারে বলা হয়েছে যে প্রবৃত্তিজনকত্বরূপ প্রবর্তনা বিধি। এই মতানুসারে প্রবৃত্তিজনক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানীয় বিষয়তার অবচ্ছেদকধর্মকে প্রবর্তনাত্ব বলে। যথা

'যাগো মদিষ্টসাধনম্' — এই জ্ঞান যাগক্রিয়ার প্রবর্তক বা প্রবৃত্তিজনক হয়। এই জ্ঞানের বিষয়তারূপ বিশেষ্যতা যাগক্রিয়াতে আছে এবং প্রকারতা ইষ্টসাধনে আছে। এই কারণে বৈয়াকরণ দাবী করেন যে ইষ্টসাধনত্ব বিধি প্রত্যয়ের অর্থ কারণ ইষ্টসাধনত্বের বিশেষ্যতা নিরূপকত্ব রূপ অবচ্ছেদকত্ব আছে। ন্যায়ের মতে প্রবৃত্তিজনকজ্ঞান বিষয়তাবচ্ছেদকত্ব কৃতিসাধ্যত্বেও আছে, কৃতিসাধ্যত্ব বিধি প্রত্যয়ের অর্থ। কিন্তু কৌন্ডভট্টের মতে মৎকৃতিসাধ্যত্ব প্রবৃত্তির প্রযোজক হলেও মৎকৃতিসাধ্যত্বে লিঙ্ লকারের শক্য স্বীকার করা যায় না কারণ, যাগাদির প্রতি কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞান অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ। ব্যাকরণ এটা মানেন যে কোন ক্রিয়া সম্পর্কে ইষ্টসাধনত্ব বোধ থাকা সত্ত্বেও অমুক ক্রিয়া আমার কৃতিসাধ্য এইরকম বোধ না থাকলে প্রবৃত্তি হয় না। এখানে উদাহরণ স্বরূপ, 'স্বর্গকামো যজেত' অর্থাৎ 'স্বর্গ প্রাপ্তির অভিলাষী যাগ করো' এই বিধিবাক্য সত্ত্বেও শ্রম ও অর্থসাধ্য যাগে দীনব্যক্তির প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ব্যাকরণ মতে কৃতিসাধ্যত্ব বিধি প্রত্যয়ের অর্থ নয়, প্রবৃত্তির জনক কৃতিসাধ্যত্ব অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধ। 'অনন্যলভ্যোঃ হি শব্দার্থঃ' এই নিয়ম অনুসারে বিধিবোধক প্রত্যয়ের শক্য কৃতিসাধ্যত্ব নয় যেহেতু শব্দের অর্থ সেটাই হয় যা অন্য কোন প্রকারে উপলব্ধ হয়নি। প্রাচীন নৈয়ায়িক মতানুসারে বলবান অনিষ্টের অননুবন্ধী অর্থাৎ অপ্রযোজক জ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। বিষসম্পৃক্ত অন্নভোজনে মহানিষ্ট আশঙ্কায় বিষসম্পৃক্ত অন্নভোজনে কারোর প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা মনে করেন যে বলবদনিষ্টাননুবন্ধিজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। ব্যাকরণভূষণসারে এই ন্যায় ব্যাখ্যা স্বীকার করা হয়নি। কৌন্ডভট্ট মনে করেন কোন কোন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনিষ্টের প্রযোজক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কোন ক্রিয়ার প্রতি দ্বেষ না থাকায় প্রবৃত্তি হয়। কার্যমাত্রের প্রতি প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে দ্বেষাভাবরূপ প্রতিবন্ধকাভাব কারণ হয়। কোন আস্তিক কামুক ব্যক্তির 'অগম্যাগমনং নরকসাধনং' এই ধরণের অনিষ্ট প্রযোজক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কোন উৎকট ইচ্ছাবশত যদি 'অগম্যাগমন' সম্পর্কে দ্বেষ না থাকে তাহলে প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং এইরকম ক্ষেত্রে বলবৎ অনিষ্টের প্রযোজকজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রবৃত্তি হয়। প্রাচীন নৈয়ায়িকের স্বীকৃত বলবৎ অনিষ্টের অপ্রযোজক জ্ঞান যদি প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি না হওয়া উচিত। এই স্বীকৃত কারণাভাব সত্ত্বেও কার্য উৎপন্ন হলে ন্যায়ের স্বীকৃত বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব কারণ রূপে স্বীকারের যোগ্যতা হারায়। ব্যাকরণ মতে তাই ইষ্টসাধনত্ব বা প্রবর্তনাত্ব বিধি প্রত্যয়ের অর্থ।

ভাট্টমীমাংসকেরা মনে করেন যে 'বিধি' পদের ইষ্টসাধনত্ব অর্থ নয়। ভাট্টমীমাংসক মত আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এক্ষেত্রে তাদের একটি যুক্তি হল এই যে যদি 'বিধি' পদের অর্থ ইষ্টসাধনত্ব হয় তাহলে 'বিধি' এবং 'ইষ্টসাধন' এই শব্দ দু'টি পর্যায় শব্দ হত। সাধারণত পর্যায়বাচক শব্দগুলির সহপ্রয়োগ হয় না, কিন্তু লক্ষ্য করলে

দেখা যাবে যে 'বিধি' এবং 'ইষ্টসাধন' শব্দ দুটির সহপ্রয়োগ সম্ভব। যথা 'সন্ধ্যোপাসনাং তে ইষ্টসাধনং, তস্মাৎ তৎ ত্বং কুরু' অর্থাৎ সন্ধ্যোপাসনা তোমার ইষ্টসাধন, অতএব তুমি তাহা কর' — এই বাক্যে 'কুরু' এই বিধিবোধক প্রত্যয় এবং 'ইষ্টসাধন' পদ এই দু'টিই একই সাথে বিদ্যমান। অতএব আলোচ্য বাক্যটিতে একই পদের পুনরুক্তি না হলেও একই অর্থের পুনরুক্তি হয়েছে এইরকম বলতে হয়। 'বিধি' পদের অর্থ ইষ্টসাধনত্ব না হলেও বিধিবলে ইষ্টসাধনত্ব অনুমান বা অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা জানা যায়, যেহেতু প্রামাণিক পুরুষ এবং বেদ ইষ্টসাধনেই প্রবর্তিত করে। সুতরাং প্রমাণান্তরের দ্বারা যদি ইষ্টসাধনত্বের জ্ঞান হয় তবে তা শব্দার্থ হবে না কারণ প্রমাণান্তরলভ্য অর্থ শব্দার্থ নয় — 'অনন্যোলভ্য শব্দার্থঃ', সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং বলা যায় বিধির অর্থ ইষ্টসাধনত্ব নয়। ভাট্টমীমাংসক সিদ্ধান্ত আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। মীমাংসা সিদ্ধান্তে শাব্দীভাবনার কর্ম বা ভাব্য পুরুষপ্রযত্নরূপ অর্থভাবনা ; এক্ষেত্রে লিঙাদির জ্ঞান করণ এবং অর্থবাদবাক্যের প্রশস্তিরূপ লাক্ষণিক অর্থের জ্ঞানই ইতিকর্তব্যতা।

চার

বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ ইষ্টসাধনত্ব কিনা এই ব্যাপারে নব্য নৈয়ায়িকেরাও প্রাচীন নৈয়ায়িকদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। উদয়নাচার্য ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে বিধ্যর্থ যে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান নয় তাই প্রতিষ্ঠা করেছেন। উদয়ানাচার্যের বক্তব্য কৃতিসাধ্যতার সমানাধিকরণ ইষ্টসাধনতা জ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ রূপে স্বীকৃত হলেও বিধির অর্থ ইষ্টসাধনতা নয়। আচার্য উদয়নের প্রশ্ন, যেমন বালক স্তন্যপানাদির ইষ্টসাধনতা অনুমানের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে অবগত হয়, তেমনি লিঙের দ্বারা কি সাক্ষাৎভাবে ইষ্টসাধনতা জানা যায়? অথবা লিঙের দ্বারা অবগত আপ্তাভিপ্রায়রূপ অর্থ বিশেষের দ্বারা ইষ্টসাধনতা অনুমিত হয়? উদয়ানাচার্য পাঁচটি যুক্তির সাহায্যে লিঙের ইষ্টসাধনত্ব অর্থ খন্ডন করেছেন[৩০] —

> 'হেতুত্বানুমানাচ্চ মধ্যমাদৌ বিয়োগতঃ।
> অনত্র ক্লৃপ্তসামর্থ্যান্নিষেধানুপপত্তিতঃ।।

প্রথম যুক্তি, 'হেতুত্বাৎ'। 'অগ্নিকামো দারুনী মন্থীয়াৎ' অর্থাৎ 'অগ্নিকামী ব্যক্তি অরণিকাষ্ঠদ্বয় মন্থন করবে' এটি একটি বিধিবাক্য। এই বিধিবাক্য শ্রবণ করলে স্বাভাবিকভাবে শ্রোতার মনে মন্থনের হেতু সম্পর্কে 'কেন করবে?' এই ধরণের প্রশ্ন জাগে। এর উত্তরে বক্তা বলেন যে 'মন্থনের দ্বারা অগ্নিলাভ হবে'। অর্থাৎ মন্থন অগ্নিরূপ ইষ্টসাধন। 'মন্থীয়াৎ' এই বিধিলিঙের অর্থ যদি ধরা হয় ইষ্টসাধনত্ব, সেই মন্থনের কারণ বা হেতুরূপেও আছে

ইষ্টসাধনত্ব। তাহলে এখানে বিধির অর্থরূপে ইষ্টসাধনত্ব স্বীকার করা হয়েছে এবং বিধ্যর্থের হেতুরূপেও ইষ্টসাধনত্ব কল্পিত হয়েছে; প্রথম ক্ষেত্রে বিধির অর্থ যেহেতু সাধ্য, তাই ইষ্টসাধনত্ব সাধ্য; আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিধ্যর্থের হেতু রূপে ইষ্টসাধনত্ব সাধন। সাধ্য এবং সাধন দুই রূপেই ইষ্টসাধনত্ব স্বীকার করলে অসঙ্গতি হয়। সুতরাং বিধ্যর্থের হেতুরূপে ইষ্টসাধনত্ব স্বীকৃত হওয়ায় ইষ্টসাধনত্ব বিধ্যর্থরূপে স্বীকার করা যায় না।

ইষ্টসাধনত্ব বিধি প্রত্যয়ের অর্থ নয়, এই মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য দ্বিতীয় যুক্তি দেওয়া হয়েছে 'অনুমানাৎ' ইত্যাদি। এখানে বক্তব্য এই যে অর্থবাদবাক্য থেকে ইষ্টসাধনতা জ্ঞান হলে বিধিবাক্যের অনুমান করা হয়। 'তরতি মৃত্যুং তরতি ব্রহ্মহত্যা' এই অর্থবাদবাক্যে বলা হয় 'যে অশ্বমেধযজ্ঞ করে সে মৃত্যু ও ব্রহ্মহত্যা উত্তীর্ণ হয়'। এই ধরণের অর্থবাদ বাক্য থেকে অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পর্কে ইষ্টসাধনতার জ্ঞান হয়। অশ্বমেধযজ্ঞের ব্রহ্মহত্যাদি তরণরূপ ইষ্টসাধনতা জ্ঞাত হলে 'মৃত্যু ব্রহ্মহত্যাতরণকামোঽশ্বমেধেন যজেত' এই বিধিবাক্যের অনুমান হয়। অর্থবাদবাক্যের দ্বারা ইষ্টসাধনতা অবগত হলে এবং সেই ব্যাপারে কোন প্রত্যক্ষ শ্রুতি উপলব্ধ না হলে শ্রুতির অনুমান করা হয় এবং সেটি সর্বশাস্ত্রসম্মত। কিন্তু বিধ্যর্থ ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হলে, শ্রুতির অনুমানের ক্ষেত্রে বিধিবাক্যের দ্বারা ইষ্টসাধনত্বের বোধ হয়। কিন্তু অর্থবাদবাক্য দ্বারা ইষ্টসাধনত্বের জ্ঞান পূর্বে হয়ে থাকলে, অনুমিত শ্রুতি দ্বারা যদি আবার ইষ্টসাধনত্বের জ্ঞানই হয়, শ্রুতি সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিশেষ কোন অর্থের বোধক হয় বলা যায় না এবং বিধিবাক্যের অনুমানের কোন সার্থকতা না থাকায়, উক্ত অনুমান ব্যর্থ হয়। কিন্তু সবদর্শনেই এইধরণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ শ্রুতির অনুমান স্বীকার করা হয়। সুতরাং অনুমানের সার্থকতা প্রতিপন্ন করতে হলে ইষ্টসাধনতার অতিরিক্ত অন্য কোন কিছু বিধির অর্থ এইরকম অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। উদয়নাচার্য মনে করেন আপ্তাভিপ্রায় সেই অতিরিক্ত অর্থ যা বিধ্যর্থ রূপে গৃহীত হয়। শাস্ত্রের আলোচনায় দেখা যায় যে নিষেধ বিধিরও একইভাবে অনুমান হয়। নিন্দার্থবাদবাক্য যথা, 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে কে আত্মহনোজনাঃ (অর্থাৎ যারা আত্মহনন করে তারা অন্ধতমসনরকে প্রবিষ্ট হয়) থেকে অনিষ্টসাধনতাজ্ঞান হয়; এবং এই ধরণের অনিষ্টসাধনতাজ্ঞান থেকে 'নাত্মানং হন্যাৎ' এইরকম নিষেধবিধির অনুমান হয়। এই নিষেধ বিধির অর্থ আপ্তাভিপ্রায়।

ইষ্টসাধনত্ব বিধি প্রত্যয়ের অর্থ এই মত খন্ডনের অভিপ্রায়ে তৃতীয় হেতু 'মধ্যমাদৌবিয়োগতঃ'। মধ্যমপুরুষস্থলে ও উত্তমপুরুষস্থলে বিধিলিঙের ব্যবহার ইষ্টসাধনতার বোধক হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে যখন মধ্যমপুরুষ স্থলে 'কুর্যাঃ' অর্থাৎ 'করো' এইরকম প্রয়োগ হয় তখন বক্তার আজ্ঞা প্রকাশ পায়। অনুরূপভাবে উত্তমপুরুষ প্রয়োগস্থলে কৃ-ধাতু বিধিলিঙ্ প্রত্যয় যোগে যে 'কুর্যাম্' রূপ হয়, তার

দ্বারা 'ইহা আমার ইষ্টসাধন' এইরকম বোধ হয় না; কিন্তু ইষ্টসাধনতা বোধের পর 'ইহা আমি করিব' এইরকম সঙ্কল্প প্রকাশিত হয়। সুতরাং মধ্যমপুরুষ এবং উত্তমপুরুষের ক্ষেত্রে লিঙের অর্থ আজ্ঞা ও অনুজ্ঞা স্বীকার করলে প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রেও লিঙের অর্থ আপ্তাভিপ্রায় মানতে হয়।

চতুর্থ যুক্তি অন্যত্র 'ক্লৃপ্তসামর্থ্যাৎ' লিঙের বিভিন্ন প্রয়োগ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে আজ্ঞা, অধ্যেষণা, অনুজ্ঞা, সংপ্রশ্ন, প্রার্থনা ও আশংকা লিঙ্ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অধ্যেষণা বলা হয়েছে 'শ্রোতুঃ পূজাসামান্যাভিব্যঞ্জিকা ইচ্ছা অধ্যেষণা' যে স্থলে বক্তার ইচ্ছা শ্রোতার পূজা ও সম্মানের ব্যঞ্জক। অনুজ্ঞা আরেক প্রকারের ইচ্ছা, যার দ্বারা নিষেধের অভাব সূচিত হয়। তাই বলা হয় 'বারণাভাবব্যঞ্জিকা ইচ্ছা'। সম্প্রশ্ন বলা হয়েছে 'অভিধানপ্রয়োজনেচ্ছা'। 'লাভেচ্ছা প্রার্থনা' অর্থাৎ কোন কিছু লাভের ইচ্ছা প্রার্থনা। আশংসা আরেকপ্রকার ইচ্ছা। শুভকামনা বা আশীঃ নাম আশংসা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিধির সাধারণ অর্থ কোন না কোন প্রকার ইচ্ছা। সুতরাং বিধিলিঙ্ স্থলে ইচ্ছাই লিঙর্থ স্বীকার করা উচিত। ইচ্ছারই অপর নাম অভিপ্রায়।

পঞ্চম যুক্তি 'নিষেধানুপপত্তিতঃ' ইত্যাদি মূলবক্তব্য এই যে বিধি প্রত্যয়ের যে বিভিন্ন অর্থের কথা আলোচনা করা হয়েছে সেই সকল স্বীকৃত অর্থের কোনটির দ্বারা সুষ্ঠুভাবে নিষেধ বিধির ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। নিষেধ বিধির ব্যাখ্যা কি হবে এই বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আছে। বর্তমান প্রবন্ধে নিষেধবিধির আলোচনা করা হচ্ছে না। উদয়নাচার্য মনে করেন যে নিষেধ বিধির যথাযথ উপপত্তির জন্য অভিপ্রায় বিধি প্রত্যয়ের অর্থ স্বীকার করতে হবে। সুতরাং নব্যন্যায়ের মতে প্রবৃত্তিনিবৃত্তি বিষয়ক বক্তার অভিপ্রায়রূপ বিধি লিঙাদিপ্রত্যয়ের বাচ্যার্থ। নব্যন্যায়ের মতে যাগাদি বিষয়ে ইষ্টসাধনতা অনুমেয়। এই অনুমানের আকার নিম্নরূপ, যথাঃ 'যাগো মম স্বর্গকামস্য বলবদনিষ্টাননুবন্ধীষ্টসাধনম্ মৎকৃতিসাধ্যতয়া আপ্তেচ্ছাবিষয়ত্বাৎ মৎকৃতিসাধ্যতয়েষ্যমাণভোজনবৎ'।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে ভাট্টমীমাংসকদের মতে লিঙের অর্থ অভিধারূপ ভাবনা। নব্যন্যায়ের মতে প্রেরণা বা অনুজ্ঞারূপ প্রযোক্তৃগতধর্ম অর্থাৎ লিঙ্ ঘটিত বাক্যের উচ্চারয়িতা যে পুরুষ তদ্‌গত অভিপ্রায় বিশেষ এবং লিঙাদি দ্বারা তাই প্রতীত হয় সুতরাং অভিপ্রায় লিঙাদির অর্থ। ভাট্টমীমাংসকের মতে পুরুষ ধর্ম যে অভিপ্রায় বিশেষ তা অপৌরুষেয় বেদবাক্যস্থ লিঙের অর্থ হতে পাবে না। সুতরাং পারস্পরিক বিবাদের নিরসন অনায়াসসাধ্য নয়। বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা গেল যে বিধির অর্থ বুঝতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে (১) ধাতুর অর্থ, (২) আখ্যাতের অর্থ, (৩) লিঙের অর্থ ও (৪) কর্তার অর্থ এবং তবেই প্রবর্তনাব স্বরূপ অবগত হবে।

ধাতুর অর্থ

ন্যায় মতে ফল

মীমাংসা মতে ফল

ব্যাকরণ মতে ফল ও ব্যাপার

আখ্যাতের অর্থ

ন্যায়মতে কৃতি

ভাট্টমতে ভাবনারূপ ব্যাপার

ব্যাকরণ মতে ফলাশ্রয় ও ব্যাপারাশ্রয়

লিঙের অর্থ

ন্যায়মতে ইষ্টসাধনতা অথবা অভিপ্রায়

ভাট্টমতে আর্থীভাবনা

ব্যাকরণমতে ইষ্টসাধনতা বা প্রবর্তনা

কর্তা ছাড়া নৈতিকতার ব্যাখ্যা হতে পারে না। কর্তার অর্থ বিষয়ে ন্যায়, ভাট্টমীমাংসা ও ব্যাকরণের মতভেদ আছে —

কর্তার অর্থ

ন্যায়মতে কৃত্যাশ্রয় কর্তা

ভাট্টমতে আখ্যাতার্থ ব্যাপারাশ্রয় কর্তা

ব্যাকরণমতে ধাত্বর্থব্যাপারাশ্রয় কর্তা

আমাদেব আলোচনা বহুদূর প্রসারিত হয়েছে, বিধ্যর্থ বিষয়ে ব্যাকরণ, ভাট্টমীমাংসা ও ন্যায়মতের মধ্যে বহু ভিন্নতা ধরা পড়েছে। বহু বিষয়ে এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ থাকলেও একটি বিষয়ে এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষণীয় ঐকমত্য আছে। প্রবর্তনাবিধায়ক বিধিবাক্যের আলোচনায় নৈয়ায়িক, ভাট্টমীমাংসক অথবা বৈয়াকরণের কাছে ইষ্টসাধনতা জ্ঞান বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এই তিন দার্শনিক সম্প্রদায়ের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান ব্যতীত প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় না। ন্যায়, ভাট্টমীমাংসা অথবা ব্যাকরণ যে একই ভাবে ইষ্টসাধনতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নয়। প্রাচীন ন্যায়মতে ইষ্টসাধনতা বিধির অর্থ এবং নৈয়ায়িকেরা মনে করেন যে ফল দ্বারাই ধর্ম এবং অধর্মের পার্থক্য গৃহীত হয়। অপরদিকে ভাট্টমীমাংসক মতেও ফল অথবা ইষ্ট প্রবর্তক, যদিও ভাট্টমীমাংসকেরা বিধ্যর্থরূপে ফল বা ইষ্ট স্বীকার করেন না। ব্যাকরণ মতেও ইষ্টসাধনতা বিধেয়। এই তিন সম্প্রদায়ের মতের পূর্বপক্ষরূপে প্রাভাকর মীমাংসকের নাম বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। প্রাভাকর মীমাংসকেরা বিধির অর্থ রূপে অথবা প্রবর্তক রূপে ইষ্টসাধনতার প্রসঙ্গ স্বীকার করেন না। কাম্যকর্ম অথবা নিত্যকর্ম — কোন কর্মের ক্ষেত্রেই ইষ্টসাধনতা জ্ঞান প্রবর্তক জ্ঞানের বিষয় নয়। প্রাভাকর মীমাংসকেরা কর্তব্যতাকেই প্রবর্তক জ্ঞানের বিষয় বলে স্বীকার করেছেন। এই কর্তব্যতারই অপর নাম কার্যতা।

কর্তব্যতা বা কার্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাভাকর মীমাংসকদের যথেষ্ট মতভেদ আছে। প্রাভাকর মীমাংসকদের এক সম্প্রদায় মতে স্ববিশেষণবত্তা-প্রতিসন্ধানজন্যকার্যতাজ্ঞান বিধির অর্থ। প্রাভাকর মতে তাই বিধিলিঙাদি যুক্ত বাক্যগুলি কার্যাভিধায়ক এবং কার্যতাবাচী। বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে প্রাভাকর মীমাংসকমত আলোচনা না করা হলেও প্রাভাকর সম্প্রদায়ের মতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

টীকা ও তথ্যপঞ্জী

১। মীমাংসাদর্শনম্, ১ম অধ্যায়, ১ম পাদ, সূত্র ২

২। ভাষাপরিচ্ছেদ, সূত্র ১৪৯

৩। বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, বৈয়াকরণভূষণসার (লকারার্থ নির্ণয়), পৃঃ ৮২

৪। বৈয়াকরণভূষণসার, সূত্র ২, পৃঃ ৭

৫। ঐ পৃঃ ১১

৬। ঐ পৃঃ ১০

৭। ঐ পৃঃ ১৫

৮। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, পৃঃ ৪৪৫, বৈয়াকরণভূষণসার, পৃঃ ১৭

৯। অর্থসংগ্রহ, পৃঃ ১৬

১০। ঐ পৃঃ ২১

১১। ঐ পৃঃ ২২

১২। বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী (বিভক্ত্যর্থ (কারক) প্রকরণম্), পৃঃ ১২

১৩। মীমাংসাদর্শনম্, ২য় অধ্যায়, ১ম পাদ, পৃঃ ২৪৪

১৪। বৈয়াকরণভূষণসার, পৃঃ ২৫, ৪২

১৫। ঐ পৃঃ ২৫, ৪৩

১৬। ঐ পৃঃ ৪২

১৭। ঐ পৃঃ ৭

১৮। ঐ পৃঃ ২৩

১৯। ঐ পৃঃ ২৪

২০। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, পঞ্চমস্তবক
২১। ভাষাপরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫৬৯
২২। ঐ পৃঃ ৫৫৫
২৩। ঐ পৃঃ ৫৫৫
২৪। *The ethics of the hindus*, পৃঃ ৩১
২৫। ভাষাপরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫৬৭
২৬। ঐ পৃঃ ৫৬৫
২৭। ঐ পৃঃ ৫৬৭
২৮। ঐ পৃঃ ৫৬৯ - ৫৭০
২৯। ঐ পৃঃ ৫৬৯ - ৫৭১
৩০। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, পঞ্চমস্তবক, সূত্র ১৪

গ্রন্থপঞ্জী

এথিক্স্ অফ্ দ্য হিন্দুস ঃ সুশীল কুমার মৈত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
অফ্ ইণ্ডিয়ান্ ফিলোসফিস (দ্য ফিলোসফি অফ দ্য গ্রামারিয়ামস্), ভল্যুম ফাইভ, এইচ, জি, কাওয়ার্ড ও কে, কুঞ্জুন্নিরাজা সম্পাদিত, মোতীলাল বনারসীদাস, নিউ দিল্লী,

কারিকাবলী ঃ শ্রীবিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য প্রণীত, ন্যায়মুক্তাবলী সম্বলিত দীনকরী রামরুদ্রী ব্যাখ্যা, আত্মারাম নারায়ণ কৃষ্ণদাস একাডেমী, বারাণসী

ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ঃ শ্রী উদয়নাচার্য, সংস্কৃতব্যাখ্যা হরিদাস ভট্টাচার্য, কুসুমাঞ্জলিপরিমল হিন্দী ব্যাখ্যাকার আচার্য বিশ্বেশ্বর সিদ্ধান্ত শিরোমণি, চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী,

ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ঃ শ্রী উদয়নাচার্য, বোধনী, প্রকাশ, প্রকাশিকা, মকরন্দ ব্যাখাচতুষ্টয়োপেত সম্পাদক ন্যায়াচার্য পদ্মপ্রসাদোপাধ্যায় ও ন্যায়াচার্য ঢুণ্ডিরাজ শ্রাস্ত্রী, চৌখম্বা সংস্কৃত সীরিজ, বারাণসী

ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ঃ উদয়নাচার্য, (গদ্যপদ্যাত্মক) শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য বঙ্গানুবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা

ফিলোসফি আর.সি. পান্ডে, মোতীলাল বনারসীদাস, নিউদিল্লী,

বিধিবিবেক ঃ আচার্য মন্ডনমিশ্র, বাচস্পতি মিশ্রকৃত 'ন্যায়কনিকা' টীকা সহিত, বঙ্গানুবাদ শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা

বৈয়াকরণ ভূষণসার ঃ কৌণ্ডভট্ট বিরচিত সাবিত্রি - হিন্দী, ব্যাখ্যা সহ আদ্যাপ্রসাদ মিশ্র, সম্পূনানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বারানসী

বৈয়াকরণসিদ্ধান্ত কৌমুদী ঃ শ্রীমৎ ভট্টোজি-দীক্ষিত বিরচিত, হিন্দীব্যাখ্যা সহিত, শ্রীধরানন্দ বিল্ডিয়াল, মোতীলাল বনারসীদাস

ভাষাপরিচ্ছেদ ঃ মুক্তাবলী সংগ্রহ, ন্যায় সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী টীকা সহ - শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা

মীমাংসা দর্শনম ঃ (প্রথম খণ্ড) পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ অনদিত। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা

অর্থসংগ্রহ ঃ লৌগাক্ষি ভাস্কর কৃত, পট্টাভিরাম শাস্ত্রি কৃত 'অর্থালোক' সংস্কৃতটীকা সম্বলিত, হিন্দী ব্যাখ্যাকার ডাঃ বাচস্পতি উপাধ্যায়, চৌখম্বা ওরিয়ন্টলিয়া, বারাণসী,

নৈতিকতা ঃ চার্বাকের দৃষ্টিতে

সৌমিত্র বসু

ভারতীয় দর্শনের আঙ্গিনায় নৈতিকতা সংক্রান্ত ব্যতিক্রমী ধারার চিন্তাভাবনার সন্ধান পাওয়া যায় চার্বাকদের আলোচনার মধ্যে। এক্ষেত্রে অবশ্যাই মনে রাখা দরকার যে চার্বাক দার্শনিকদের লেখা কোন এক বা একাধিক গ্রন্থের উপর নির্ভর করে চার্বাক মতকে সামগ্রিক ভাবে জানা এখনও পর্য্যন্ত সম্ভব নয় কারণ তেমন কোন গ্রন্থের সন্ধানই এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। অথচ অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের প্রায় প্রতিটিই পূর্বপক্ষরূপে চার্বাকমতের উপস্থাপনা এবং খন্ডন করেছেন। ফলে চার্বাকমতের আলোচনা করতে হলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থের উপরই মূলত নির্ভর করতে হয়। কিন্তু এ ধরনের নির্ভরতার একটা অসুবিধের দিক রয়েছে ঃ পূর্বপক্ষ হিসেবে চার্বাকদের উপস্থাপিত করার সময় যে সমস্ত বক্তব্য চার্বাকদের মত বলে উপস্থাপিত করা হয়েছে সেগুলি বস্তুতই চার্বাকদের মত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হলেও সন্দেহ নিরসন করার সহজ কোন উপায় নেই। নৈতিকতা সম্পর্কে চার্বাকদের মত আলোচনা করার সময় বারবার এই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। চার্বাক দর্শনেব মূল প্রবক্তা বৃহস্পতির বক্তব্য রূপে এমন অনেক কথাই উপস্থাপন করা হয়েছে যে কথাগুলি বৃহস্পতির বলা অন্য অনেক কথার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণও নয়। অনেক সময় বৃহস্পতিকে এমন অনেক কথা বলতে শোনা যায় যে কথা বললে চার্বাকদের মতকে আর আক্ষরিক অর্থে 'লোকায়ত' বলে স্বীকার করা যায় কি না সে বিষয়েই সন্দেহ দেখা দেয়। আলোচ্য প্রবন্ধে চার্বাকদের নৈতিকতা সংক্রান্ত মতবাদ আলোচনা করার প্রসঙ্গে আমরা এই সব অসঙ্গতিপূর্ণ অংশগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করব এবং সঙ্গতিপূর্ণ চার্বাক নৈতিকতার ধারণাটি কেমন হতে পারে তাও বোঝার চেষ্টা করব।

এক

ভারতীয় নৈতিকতার মূল স্রোতের নিরিখে বিচার করলে চার্বাকদের নীতিচিন্তার সবচেয়ে বিতর্কিত অংশটি হল তাদের পুরুষার্থ সম্পর্কিত ধারণাটি। মূলস্রোতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে গিয়ে চার্বাকরা দাবী করেন একমাত্র কামই হল পুরুষার্থ। 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে মাধবাচার্য্য চার্বাকমত সঙ্কলন প্রসঙ্গে চার্বাকদের পুরুষার্থ সম্পর্কিত ধারণাকে বিশ্লেষণ করে বলেন

'অঙ্গনার আলিঙ্গন ও অন্যান্য কাম্য বিষয়ের প্রাপ্তিজন্য যে সুখ তাই পুরুষার্থ।'[১] মাধবাচার্য্যের এই বিশ্লেষণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, সাধারণত চার্বাকস্বীকৃত পুরুষার্থের আলোচনায় 'কাম' শব্দটিকে এমনভাবে অন্যান্য দার্শনিকরা প্রয়োগ করেন যাতে মনে হয় যে চার্বাকরা 'কাম'কে একটি সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেছেন। সঙ্কীর্ণ অর্থে 'কাম' শব্দের অর্থ স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক সম্পর্কজাত অনুভূতি। মাধবাচার্য্যের রচনা থেকে বোঝা যায় যে শুধুমাত্র দৈহিক সম্পর্কজ সুখকেই চার্বাক পুরুষার্থ বলছেন না। এ বিষয়ে অন্যান্য সাক্ষ্য থেকেও বোঝা যায় যে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজন্য সুখ বিশেষই 'কাম' পদবাচ্য।

কামকে একমাত্র পুরুষার্থ বলে স্বীকার করার বিরুদ্ধে অন্যতম আপত্তিতে বলা হয় যে কামজ সুখ সবসময়ই দুঃখ সংপৃক্ত হওয়ায় তা কখনও মুখ্য পুরুষার্থ হতে পারে না। মানুষ দুঃখ চায়না, দুঃখ পরিহার করতেই চায়। কাজেই যে ধরণের সুখে দুঃখ অপরিহার্য সে ধরণের সুখই মানুষ চূড়ান্ত প্রাপ্তি বলে স্বীকার করে নেবে তা হতে পারে না। মনে রাখা দরকার যে চতুর্বর্ণের সমর্থক বৈদিক দার্শনিকরা এই যুক্তিতেই কেবলমাত্র ধর্ম, অর্থ ও কামকে পুরুষার্থ না বলে মোক্ষকেও পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছেন। অর্থ ও কামের কথা তো বলাই বাহুল্য, এমন কি ধর্মজনিত সুখকেও চিরস্থায়ী বলা যায় না বলে ধর্মাতিরিক্ত পুরুষার্থ স্বীকার করা প্রয়োজন বলে বৈদিক দার্শনিকরা মনে করেন।[২] কামজ সুখ যে দুঃখমিশ্রিত হতে পারে সে কথা চার্বাকরাও স্বীকার করেন। কিন্তু তারা একথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে দুঃখ মিশ্রিত হলেই যে মানুষ সেই সুখকে পরিত্যাগ করবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। এক্ষেত্রে মানুষের কর্তব্য হল সুখভোগের পথে যতটা সম্ভব দুঃখকে পরিহার করার চেষ্টা করা এবং যে ক্ষেত্রে যতটা সুখ আহরণ করা সম্ভব ততটাই আহরণ করা। অর্থাৎ চার্বাকরা মনে করেন দুঃখের আশঙ্কায় সুখকে পরিত্যাগ করা মনুষ্যোচিত কাজ নয়। তাই চার্বাকষষ্টিতে বলা হয়েছে, 'বিষয় প্রাপ্তিজন্য সুখ দুঃখের দ্বারা সংসৃষ্ট বলে তা পুরুষগণের ত্যাজ্য হবে — এ ধরণের বিচার মূর্খতার পরিচায়ক। এই জগতে এমন কোন সুখার্থী আছে কি যে তুষযুক্ত ও কণাযুক্ত বলে সিতবর্ণের উত্তম তণ্ডুল যুক্ত ধানকে পরিত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করবে?'[৩] চার্বাকরা আরও দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে বস্তুত পক্ষে দুঃখের সম্ভাবনায় আমরা সুখজনক কাজ থেকে বিরত থাকি না। হরিণ এসে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দেবে এই ভয়ে যেমন কৃষকেরা কৃষিকাজ থেকে বিরত থাকে না, ভিক্ষুক এসে চাইলে দিয়ে দিতে হবে এই ভয়ে যেমন গৃহস্থ রান্না করা থেকে বিরত হয় না, তেমনি অন্যত্রও দুঃখের ভয়ে সুখের অন্বেষণ থেকে বিরত থাকা অকর্তব্য। অর্থাৎ চার্বাকরা মনে করেন দুঃখের পরিহার করাই আমাদের চরম লক্ষ্য হতে পারে না। চার্বাকদের মতে পশুর সাথে মানুষের

অন্যতম পার্থক্য এই যে, কোন কাজে দুঃখের সম্ভাবনা আছে বুঝতে পারলে পশুরা সে কাজ থেকে বিরত থাকে, কিন্তু মানুষ নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে পরিস্থিতির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে পারে এবং দুঃখকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে গিয়ে সুখলাভের চেষ্টা করতে পারে। সুতরাং এ ধরণের চেষ্টা করাই মনুষ্যোচিত কর্তব্য।

চার্বাকরা সুখকে মুখ্য পুরুষার্থরূপে স্বীকার করেন বলেই যে চতুর্বর্গবাদী দার্শনিকরা তাদের সমালোচনা করেন কেবলমাত্র তা নয়। কোন সুখকে উৎকৃষ্টতর বলে গণ্য করা হবে সে বিষয়েও চার্বাকদের সাথে আস্তিকদের মতবিরোধ রয়েছে। সাধারণভাবে আস্তিকরা স্বীকার করেন যে বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান করলে স্বর্গসুখও লাভ করা সম্ভব। যদি সুখকেই পুরুষার্থ বলে গণ্য করতে হয় তাহলে স্বর্গসুখের উপযোগী ধর্মানুষ্ঠান করাই কর্তব্য হওয়া উচিত; কেন না স্বর্গসুখ অন্যান্য যে কোন সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। আস্তিকদের এই মত চার্বাকরা সমর্থন করেন না। চার্বাকমতে স্বর্গসুখ অলীক কল্পনা মাত্র, ঐহিক সুখই একমাত্র বাস্তব। চার্বাকরা বলেন যে, স্বর্গের বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই বলেই স্বর্গসুখও কাল্পনিক বিষয়। আস্তিকরা বেদবাক্যকেই স্বর্গের অস্তিত্বের প্রমাণ বলে স্বীকার করেন এবং দাবী করেন বেদবিহিত কর্ম যথাযথভাবে সাধন করা হলে স্বর্গলাভ করা সম্ভব। আস্তিকদের এই দাবীকে অসার প্রমাণ করার অভিপ্রায়ে চার্বাক যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেন সেগুলি প্রধাণত দু প্রকারের। প্রথম প্রকারের যুক্তিতে চার্বাকরা বলেন, বেদবিহিত এমন কিছু কর্ম আছে যা অভিপ্রেত দৃষ্ট ফল উৎপন্ন করতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় প্রকারের যুক্তিতে বলা হয়, বেদবাক্যগুলির প্রামাণ্য সম্বন্ধে আস্তিকদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী মত রয়েছে বলে সেগুলির প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। প্রথম যুক্তির আলোচনায় চার্বাক বলেন, বেদে বলা হয়েছে পুত্রকামী ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে পুত্র লাভ করবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অনেকেই উক্ত যজ্ঞ করার পর অভিপ্রেত ফল লাভ করেন না। কাজেই বেদবাক্যের মিথ্যাত্বের প্রসক্তি হয়। একটি বেদবাক্যও যদি এভাবে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় তাহলে বেদকর্তাকে আপ্ত বলা যায় না, এবং ফলত অন্যান্য বেদবাক্যকেও প্রমাণ বলে স্বীকার করা যায় না।

চার্বাকদের এই যুক্তির উত্তরে বৈদিক দার্শনিকরা বলেন, যজ্ঞসম্পাদন করলেই পুত্রলাভ করা যাবে এ ধারণা ঠিক নয়। যে সমস্ত শর্ত পূরণ করলে পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ অভিপ্রেত ফল উৎপন্ন করতে পারে সেগুলি হল ঃ (১) যজ্ঞসম্পর্কিত কর্তা, কর্ম ও সাধনের হানি হওয়া চলবে না, (২) জন্মদাতা মা ও বাবার শারীরিক বৈকল্য থাকা চলবে না এবং (৩) পুত্রজন্মের প্রতিবন্ধক দুরদৃষ্টের অভাব থাকতে হবে। দার্শনিকরা দাবী করেন এই তিনটি শর্তের কোন কোনটি পূরণ না হওয়ার ফলেই অনেক ক্ষেত্রে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করা

সত্ত্বেও যজমানের পক্ষে পুত্রলাভ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং যাগজনিত দৃষ্টফল উৎপন্ন না হলেই সেই যাগের উপদেশক বেদবাক্যকে মিথ্যা বলা যায় না।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে চার্বাকদের বক্তব্য সাধারণত অন্যান্য সম্প্রদায়ের পূর্বপক্ষরূপেই উপস্থাপিত হয়। সম্ভবত এই কারণেই অনেকক্ষেত্রে চার্বাকের মত খণ্ডনের জন্য যে সব যুক্তি দেওয়া হয় তার যথাযোগ্য উত্তর চার্বাকের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হলেও উত্তরপক্ষীর লেখা গ্রন্থে সেই উত্তরের কোন উল্লেখ আমরা পাই না। যাগসফলতা ও বেদবাক্যের সত্যতার সপক্ষে দেওয়া আগের যুক্তিটিও বাস্তবিক পক্ষে চার্বাকদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য না হওয়ারই কথা। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, যে ভাবে চার্বাকদের বিরুদ্ধে যুক্তিটি সাজানো হয়েছে তাতে কখনই পুত্রেষ্টি যাগনির্দেশক বাক্যকে মিথ্যা বলা যাবে না। যদি পুত্রেষ্টি যাগের পর যজমান পুত্র লাভ করেন তাহলে বলা হবে বাক্যটির সত্যতা প্রমাণিত হল ; অথচ যদি যজমান অভিপ্রেত ফল লাভ না করেন তাহলে বলা হবে ফললাভের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূর্ণ হয় নি বলেই যাগ ব্যর্থ হয়েছে। ফলত এক্ষেত্রেও যাগ নির্দেশক বাক্যটি সত্য বলে গণ্য হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, যাগনির্দেশক বাক্যটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে কেবলমাত্র যদি একথা প্রমাণ করা যায় যে যাগের সফলতার সব শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও যাগ অভিপ্রেত ফল প্রদান করে নি। কিন্তু এভাবে বাক্যটির মিথ্যাত্ব প্রমাণের সম্ভাবনাও উত্তরপক্ষী স্বীকার করেন না। উত্তরপক্ষীর মতে যাগ সফল হল কি না তার উপর ভিত্তি করেই অনুমান করতে হবে শর্তগুলির যথাযোগ্য পূরণ হয়েছে কি না। অতএব বেদবাক্যটির মিথ্যাত্ব প্রমাণের যাবতীয় সম্ভাবনাকেই অস্বীকার করা হচ্ছে। আলোচ্য যুক্তিটিকে বস্তুতপক্ষে কখনই একটি সৎযুক্তি বলে স্বীকার করা সম্ভব নয় এই কারণে যে এই যুক্তিটি স্বীকার করলে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, যে কোন যজ্ঞ যে কোন ফল উৎপন্ন করতে পারে। যেমন, সেক্ষেত্রে দাবি করা যাবে যে 'পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে রাজ্য লাভ করা যায়' এই বাক্যটিও সত্য। কোন ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে রাজ্য লাভ না করলেও ঐ বাক্যটির মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হবে না, কারণ সেক্ষেত্রেও বলা যাবে যে যাগানুষ্ঠানের সব শর্ত পূরণ হয় নি বলেই অভিপ্রেত ফললাভ হয় নি। এভাবে যে কোন ফলের প্রতি যে কোন যাগের কার্যকারিতা সিদ্ধ হলে বিশেষ ফললাভের জন্য বিশেষ যজ্ঞ করার বৈদিক বিধির কোন প্রাসঙ্গিকতাই থাকবে না। সুতরাং যে যুক্তি গ্রহণ করলে বেদবাক্য তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় সেই যুক্তি প্রয়োগ করে বৈদিক দার্শনিক কী ভাবে চার্বাকমত খণ্ডন করার চেষ্টা করবেন?

স্বর্গসুখের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে চার্বাক যে দ্বিতীয় প্রকারের যুক্তির অবতারণা করেন তাতে বলা হয়, স্বয়ং বৈদিক দার্শনিকরাই বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে পরস্পর বিরোধী মত পোষণ করেন, সুতরাং বেদবাক্যকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা অযৌক্তিক। সর্বদর্শন-

সংগ্রহে মাধবাচার্য্য চার্বাকদের এই যুক্তিটি উপস্থাপিত করে বলেন, 'কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্যবাদী মীমাংসকগণ ও জ্ঞানকাণ্ডের প্রামাণ্যবাদী বেদান্তিগণ পরস্পর বেদের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য খণ্ডন করিয়াছেন. অর্থাৎ মীমাংসক জ্ঞানকাণ্ডের এবং বেদান্তী কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য খণ্ডন করিয়াছেন। পরস্পর পরস্পরের প্রামাণ্য খণ্ডন করায় সমস্ত বেদেরই প্রামাণ্য খণ্ডিত হইয়াছে।'[৪] বলা বাহুল্য আস্তিকরা এই মতকে গ্রহণ করবেন না। বৈদিকদের সমর্থনে পণ্ডিত পঞ্চানন শাস্ত্রী বলেন যে, কর্মমীমাংসক ও বেদান্তীদের মধ্যে বিচারের মূল বিষয় বেদের প্রামাণ্য নয়, পরন্তু বেদের মুখ্যার্থ নির্ণয়ই এই বিচারের লক্ষ্য। সুতরাং উভয় মীমাংসকের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও সে মতপার্থক্যের দ্বারা বেদের প্রামাণ্যের হানি হয় না।[৫] অর্থাৎ চার্বাকেরা মীমাংসকদের বিচারের মূল অর্থ বুঝতে পারেননি বলেই তাদের ধারণা হয়েছে বেদ অপ্রমাণ। কিন্তু চার্বাকদের সমর্থনে এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, মুখ্যার্থ বিষয়ে মতভেদ কোনও ভাবেই বেদবাক্যের সত্যতা সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি করতে পারে না একথা বলা যায় না। উভয় মীমাংসকই নিজ নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকে মুখ্যার্থ সংক্রান্ত তত্ত্বকে প্রচার করছেন। কিন্তু উভয়ের মুখ্যার্থ সম্পর্কিত মতকেই কি যুগপৎ সত্য বলে স্বীকার করা যায়? অবধারিত ভাবেই যায় না কেননা সেক্ষেত্রে উভয় মতের মধ্যে বিরোধের কোন প্রসঙ্গই হত না। অতএব মুখ্যার্থ সম্পর্কিত মত দুটির অন্তত একটি ভ্রান্ত এবং কোনটি ভ্রান্ত তা নির্ধারণ করার কোন সাধারণ নিয়ম নেই। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বেদবাক্যকে বিভ্রান্তিজনক এবং জীবিকা অর্জনের উপায়রূপে ব্যবহৃত বাক্য বলে অভিহিত করাও অযৌক্তিক নয়।[৬] এবং এ ধরণের বাক্যকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে সেই বাক্যনির্দেশিত স্বর্গসুখের সন্ধান করাও কতটা যুক্তিসঙ্গত সে ব্যাপারে সংশয়ের অবকাশ থেকেই যায়।

চার্বাকরা যে শুধুমাত্র স্বর্গসুখের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন তাই নয়; তাঁরা পরলোক ও জন্মান্তরের সম্ভাবনাও অস্বীকার করেন। দেহাত্মবাদী চার্বাকের মতে ইহলোকে দেহের নাশ হওয়ার পরে আত্মার কোন অস্তিত্বই থাকে না বলে সেই আত্মার বাসস্থানরূপে পরলোককে স্বীকার করার কোন প্রয়োজনই হয় না। বৃহস্পতিসূত্রে তাই বলা হয়, 'নাস্তি পরলোকঃ। পরলোকিনাহভাবাৎ পরলোকাভাবঃ'। আবার, দেহই যদি আত্মা হয় তাহলে মৃত্যুর পর দেহ নষ্ট হয়ে গেলে কারও পক্ষেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করা সম্ভব নয়। নৈতিকতা সংক্রান্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে পরলোক ও জন্মান্তরের অস্বীকৃতি সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আস্তিক সম্প্রদায়ের নৈতিকতা সংক্রান্ত তত্ত্বের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হল কর্মফলবাদ এবং পরলোক ও জন্মান্তরের সম্ভাবনাকে স্বীকার না করলে প্রচলিত কর্মফলবাদকে স্বীকার করা যায় না। আস্তিকদের মতানুসারে পূর্বজন্মে অর্জিত কর্মের ফলভোগের জন্যই মানুষের ইহজন্ম এবং এই জন্মে যে সমস্ত কর্ম করা হবে তার অধিকাংশেরই ফল হয় পবলোকে অথবা পরবর্তী কোন জন্মে লাভ করা যাবে। আস্তিকেরা

মনে করেন মানুষকে ধর্মাচরণ করতে বলার বা অধর্ম থেকে বিরত থাকতে বলার কোন অর্থই হয় না যদি ধর্মাধর্মের ফল ভোগের সম্ভাবনা না থাকে। আমরা অভিজ্ঞতায় দেখতে পাই শাস্ত্র নির্দেশিত ধর্মাচরণ করার ফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহজীবনে পাওয়া যায় না। কাজেই যদি পরলোকে বা জন্মান্তরেও কর্মফল লাভের সম্ভাবনা অস্বীকার করা হয় তাহলে নৈতিক জীবন মূল্যহীন হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে চার্বাকদের বক্তব্য হল, যদি নৈতিক জীবন যাপন করা বলতে বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করাকে বোঝান হয় তাহলে অবধারিতভাবেই নৈতিক জীবনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। চার্বাকদের মতে শাস্ত্রোক্ত কাম্য কর্মের মত বর্ণাশ্রম ধর্মগুলিও ফল উৎপাদন করতে অক্ষম। তাই বৃহস্পতি বলেন 'নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকা।'[৭] কাম্য কর্ম ছাড়াও লোকান্তরে ফলোৎপত্তির আশায় অনুষ্ঠিত অন্যান্য কর্মেরও যে ফলোৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না তা প্রমাণ করার জন্য চার্বাক বিশেষভাবে পারলৌকিক ক্রিয়াগুলির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন। পরলোকগত পুর্বপুরুষের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে ইহলোকগামী উত্তরপুরুষকে শ্রাদ্ধ ইত্যাদি পারলৌকিক ক্রিয়া করার বিধান দেওয়া হয়। চার্বাক বলেন যদি শ্রাদ্ধ করলে পরলোকগামী ব্যক্তির পাথেয় সংগৃহীত হয় তাহলে গৃহস্থ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করলে এই পৃথিবীতে পর্যটনকারী ব্যক্তিরও পাথেয় সংগৃহীত হয়ে যেতে পারে বলে স্বীকার করা হোক। কিন্তু আমরা জানি তা অসম্ভব। ফলত এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া যদি ইহলোকের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই ফলপ্রদ না হয় তাহলে তা পরলোকগত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফলপ্রদ হওয়ার সম্ভাবনা সুদুর পরাহত। চার্বাক আরও বলেন যে, কোন প্রাসাদের নিম্ন তলে কোন বস্তু দান করা হলে যেমন তা দ্বারা প্রাসাদের উপরে কোন ব্যক্তির তৃপ্তি সাধিত হতে পারে না তেমনই ইহলোকে আহার্যাদি দান করলে পরলোকবাসীর তৃপ্তি হওয়াও অসম্ভব। লক্ষণীয় যে, আলোচ্য যুক্তিগুলিতে চার্বাক একথাই বলতে চান যে যদি আমরা পরলোকের অস্তিত্ব তর্কের খাতিরে স্বীকারও করে নিই তাহলেও পারলৌকিক ক্রিয়ার সার্থকতাকে প্রশ্ন করা যায়। এই যুক্তিগুলি দিয়ে চার্বাক একথাও প্রমাণ করতে চাইবেন যে যদি কোন একটি ক্রিয়ার কর্তা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তার অনুষ্ঠিত ক্রিয়াটি ফল উৎপন্ন করতে অক্ষম হয় তাহলে কর্তার অনুপস্থিতিতে একটি ক্রিয়া ফল উৎপাদন করবে এমন চিন্তাও অবাস্তব।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে পরলোক, জন্মান্তর, আস্তিক-স্বীকৃত কর্মফলবাদ ইত্যাদিকে অস্বীকার করলে নৈতিকতার কি আর কোন প্রাসঙ্গিকতা থাকে? নৈতিক আচরণ এবং অনৈতিক আচরণের মধ্যে যদি কোন ফলগত পার্থক্য না থাকে তাহলে কেনই বা একজন ব্যক্তি অহেতুক নৈতিক আচরণ করবে? বস্তুত পক্ষে এই প্রশ্নের চার্বাকসম্মত উত্তর অত্যন্ত স্পষ্ট। চার্বাকরা বিশ্বাস করেন যে সমস্ত কাজ ইহজীবনে সুখভোগে সাহায্য করে তাই নৈতিক কাজ। যে সমস্ত কাজ বিপরীত ফল প্রদান করে স্বাভাবিক ভাবেই

সে সব কাজ অনৈতিক। এই তত্ত্বটিকেই চার্বাক সম্মত সুখবাদ বলে অভিহিত করা হয়। অনেকে মনে করেন যে চার্বাক সম্মত সুখবাদের স্বরূপটি কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর অভিমত আমরা উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেন, 'সুখবাদী চার্বাকগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন — একশ্রেণীর চার্বাক একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক, সংকীর্ণ, স্থূল, ইন্দ্রিয়োপভোগজন্য, পশু সুলভ সুখকেই পুরুষার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদিগের মতে — "অঙ্গনালিঙ্গনা জন্য সুখমেব পুমর্থতা"। . . . ভবিষ্যতে অধিকতর ও উৎকৃষ্টতর সুখের একান্ত সম্ভাবনা থাকিলেও, এই শ্রেণীর চার্বাকগণ বর্তমানকালমাত্রলভ্য সুখের বিন্দুমাত্র পরিত্যাগ করিতে, অথবা অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চিতলভ্য সুখপ্রাপ্তির জন্য কোনও যত্ন বা ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।'[৮] দক্ষিণারঞ্জনের মতে এই শ্রেণীর চার্বাক বর্তমান সুখকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। বর্তমান সুখ যদি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয় তা হলেও তাঁরা এই সুখভোগে বিরত থাকবেন না, কারণ তাঁরা মনে করেন কেবল দীর্ঘস্থায়ী বস্তুই সমাদৃত হবে এবং ক্ষণস্থায়ী বস্তু উপেক্ষিত হবে এমন কোন সাধারণ নিয়ম থাকতে পারে না। কেননা সেক্ষেত্রে কোন বাগানে অনেক যত্নে উৎপন্ন ফুল অপেক্ষা কৃত্রিম ফুলকে বেশী উপভোগ্য বলে স্বীকার করতে হয় কারণ তা অধিক স্থায়ী। এই শ্রেণীর চার্বাকদের মত বিবৃত করে দক্ষিণারঞ্জন বলেন, 'ক্ষণিক হইলেও, অল্প হইলেও, দুঃখ মিশ্রিত হইলেও, যে সুখটি বর্তমান মুহূর্ত্তে পাইতেছ তাহাকে ত্যাগ করিও না। আগামীকল্য লভ্য ময়ূরটি অপেক্ষা অদ্য যে কপোতটি পাইতেছ তাহার মূল্য অনেক অধিক। ... যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ভোগসুখেই বাঁচিয়া থাক, ঋণ করিয়াও ঘৃত পান কর।' দক্ষিণারঞ্জনের মতে অপর এক শ্রেণীর চার্বাকি ছিলেন যারা মনে করেন আত্মকেন্দ্রিক, স্থূল এবং ক্ষণিক-উপভোগযোগ্য সুখকে পুরুষার্থরূপে স্বীকার করলে সমাজব্যবস্থা অসম্ভব হয়। 'তাই এই শ্রেণীর চার্বাকিগণ উদার, বহুজনভোগ্য, নিষ্কলুষ ও কালান্তরস্থায়ী, কলাবিদ্যার অনুশীলনে লভ্য সূক্ষ্মতর সুখানুভূতিকেও বরণ করিয়া লইয়াছেন।'[৯] তৃতীয় এক শ্রেণীর চার্বাকমতের উল্লেখ করে দক্ষিণারঞ্জন বলেন যে এই শ্রেণীর চার্বাকদের মূল বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এরা মানুষের সুখ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর সুখের মধ্যে তফাৎ করেন এবং মনুষ্যোচিত সুখকেই মানুষের পুরুষার্থ বলে অভিহিত করেন। 'এই শ্রেণীর চার্বাকিগণ কেবলমাত্র জৈব সুখকে সুখ বলিয়াই স্বীকার করেন না তাঁহারা উপনিষদের ঋষির সহিত সুর মিলাইয়া বলিয়া থাকেন "ভূমৈব সুখম"। ভূমা বা আনন্দই যথার্থ সুখ।'[১০] দক্ষিণারঞ্জনের মতে এই শ্রেণীর চার্বাকিই সুশিক্ষিত চার্বাকি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে চার্বাকদের এই শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করার সময় দক্ষিণারঞ্জন কোন গ্রন্থের উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ কোন কোন গ্রন্থে স্থূল বা ধূর্ত চার্বাকদের পরিচয় পাওয়া যায়, অথবা কোন গ্রন্থে সুশিক্ষিত চার্বাকদের মত

সামগ্রিকভাবে পাওয়া যায় সে প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন কিছু বলেননি। অবশ্য প্রসঙ্গান্তরে তিনি বলেছেন যে মাধবাচার্য্যের সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থটিতে কেবলমাত্র ধূর্ত চার্বাকদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এই গ্রন্থে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলা হয়েছে, লৌকিক বিষয়ক অনুমানকে যে শ্রেণীর চার্বাকিরা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন তার উল্লেখ এই গ্রন্থে নেই। বস্তুতপক্ষে চার্বাকিদের কোন আকরগ্রন্থে চার্বাক সম্প্রদায়ের এই শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়নি বলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের লেখার ওপর ভিত্তি করে এই শ্রেণীবিভাগকে অনুমান করা গেলেও সে অনুমান সম্পর্কে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। এক্ষেত্রে বলা হতে পারে যে যদি এ ধরনের শ্রেণীবিভাগকে স্বীকার করা না হয় তাহলে বৃহস্পতির মত বলে যা প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কখনও বৃহস্পতি বলছেন 'অর্থকামৌ পুরুষার্থৌ' আবার কখনও বলছেন 'কাম এবৈকঃ পুরুষার্থ।' কখনও বৃহস্পতির বাক্যে আমরা পাই 'প্রত্যক্ষমেবৈকং প্রমাণম্' আবার কখনও পাই 'লোকপ্রসিদ্ধমনুমানং চার্বাকৈরপীষ্যত'। যদি চার্বাকদের নানা শ্রেণীর কথা স্বীকার না করা হয়, যদি ধরে নেওয়া হয় এই সমস্ত কথাই একই বৃহস্পতির উক্তি তাহলে এই সমস্ত উক্তির সঙ্গতিবিধান কি ভাবে করা যাবে?

একথা ঠিকই যে যদি চার্বাকমত বলে প্রচলিত নানা উক্তির মধ্যে সঙ্গতিবিধানের জন্য চার্বাকদের শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করা আবশ্যক হয় তবে তা করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সঙ্গতিবিধানের প্রশ্নে আমাদের মনে রাখা দরকার যে আদৌ সঙ্গতিবিধান প্রয়োজন কি না সে প্রশ্নেরও মীমাংসা হওয়া দরকার। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কাপালিকদের অনেক সময়ই চার্বাকদের সাথে অভিন্ন করে উপস্থাপিত করা হয়েছে যদিও কাপালিকরা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ধর্মাচরণের বিরুদ্ধতা করেন। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে ধর্মাচরণ সম্পর্কে কাপালিকদের যে মত তাকে চার্বাকমত বলে স্বীকার করা যাবে কি না। এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্নভাবে করেছেন। তার মধ্যে দক্ষিণারঞ্জনের সিদ্ধান্ত হল কাপালিকমতের সাথে চার্বাকমতের সমন্বয় সাধনের প্রশ্ন ওঠে না কারণ চার্বাকমতের মূল যে সুর তার সাথে কাপালিকদের মত মেলে না।[১১] সুতরাং এক্ষেত্রে সঙ্গতিবিধানের প্রশ্নকে দক্ষিণারঞ্জন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না। একইভাবে আমরা বলতে পারি যে, কোন একটি উক্তিকে কোন একটি গ্রন্থে বৃহস্পতির উক্তিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে দেখেই একথা ধরে নেওয়া সঙ্গত নয় যে বস্তুতই উক্তিটি বৃহস্পতির। প্রাথমিকভাবে আমাদের দেখা দরকার বৃহস্পতির উক্তিরূপে উল্লিখিত অন্যান্য যে সমস্ত উক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কোন উক্তিকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া দরকার। তাছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ প্রসঙ্গে নজর দেওয়া দরকার, তা

হল, কোন গ্রন্থে ওই উক্তির সন্ধান আমরা পাই। চার্বাকমত আলোচনা প্রসঙ্গে এই দ্বিতীয় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনেক সময়ই চার্বাককে হেয় করার জন্যও হয়ত চার্বাকমতরূপে অনেক বক্তব্যকে সংযোজিত করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় কৃষ্ণমিশ্র রচিত 'প্রবোধ- চন্দ্রোদয়' নামক নাটকে চার্বাকমত বর্ণনা প্রসঙ্গে বৃহস্পতির নানা উক্তি উপস্থাপিত করা হয়েছে। অনেকেই মনে করেন এই নাটকে চার্বাক মতের একটি সংক্ষিপ্তরূপ আমরা পাই। কিন্তু নাটকটি কি উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল তা যদি আমরা খেয়াল রাখি তাহলে তার বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হতে হয়। এই নাটকটি প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'অ্যারিস্টোফেনিস্ যেমন সক্রেটিসের মত ও চরিত্র নিয়ে নেহাতই স্থূল ব্যঙ্গবিদ্রূপ রচনা করেছিলেন, কৃষ্ণমিশ্রও কিছুটা সেইভাবেই তাঁর এই রূপক নাটকটিতে বুন্দেলখন্দরাজ কীর্তিবর্মার চিত্তপরিতোষের উদ্দেশ্যে এবং অদ্বৈতবেদান্ত-মতের গৌরবপ্রচার কল্পে বৌদ্ধ, জৈন, লোকায়ত, কাপালিক প্রভৃতি বেদান্তবিরোধী কিন্তু জনপ্রিয় নানা মতবাদ নিয়ে অত্যন্ত স্থূল ব্যঙ্গবিদ্রূপেরই প্রয়াস করেছেন।'[১২] কৃষ্ণমিশ্রের রচনায় বলা হয়েছে যে, কোনও নারী বা ধন নিজের কি অপরের সে বিচার চার্বাক করেন না। প্রাণী হিংসায়, যথেচ্ছ নারীগমনে ও পরস্বাপহরণে কর্তব্যাকর্তব্য বিচার পৌরুষহীন তথাকথিত আস্তিকেরাই করে থাকেন, চার্বাকেরা করেন না। প্রশ্ন হল, বৃহস্পতি-সূত্র বলে অন্যান্য রচনায় যে সমস্ত বাক্যের সন্ধান আমরা পাই তার সাথে কি কৃষ্ণমিশ্রের বক্তব্য সঙ্গতিপূর্ণ? দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, পঞ্চানন শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তি বাহস্পর্ত্যসূত্র রূপে যে সমস্ত সূত্র সঙ্কলিত করেছেন তার সাথে কৃষ্ণমিশ্র উল্লিখিত চার্বাক জীবনধারার কোন সামঞ্জস্যই পাওয়া যায় না। একথা বলাও সঙ্গত নয় যে বৃহস্পতির পরবর্তী চার্বাকেরা অর্থাৎ নবীন চার্বাকেরা কৃষ্ণমিশ্রের উপস্থাপিত জীবনধারার সমর্থক, কেননা মাধবাচার্য্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' রচিত হয়েছে কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় রচনার পরে। যদি বস্তুতই তথাকথিত ধূর্তচার্বাকদের জীবনধারা কৃষ্ণমিশ্রবর্ণিত চার্বাক জীবনধারার সাথে অভিন্ন হত তাহলে মাধবাচার্য্যের রচনাতেও কি তার ইঙ্গিত আমরা পেতাম না?

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করছি তা হল ঃ নৈতিক দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কখনওই চার্বাককে স্থূল ভোগবাদী নৈতিকতার সমর্থক বলে চিহ্নিত করা যায় না। ফলে ভোগবাদের রকমফেরের ওপর নির্ভর করে নানা শ্রেণীর চার্বাককে স্বীকার করারও প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা বৃহস্পতির সেই সমস্ত সূত্রকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করব যেগুলি বৃহস্পতির উক্তি হিসেবে অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত হয়। অর্থাৎ যে উক্তিগুলিকে বৃহস্পতির উক্তি বলে স্বীকার করলে অবিসংবাদিত-স্বীকৃত উক্তির বিরোধ হয় অথবা যে উক্তিগুলির প্রামাণ্য

সম্পর্কে ঐকমত্য নেই সেগুলি আমরা প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করব না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'অর্থকামৌ পুরুষার্থৌ' বা 'লোকপ্রসিদ্ধমনুমানং চার্বাকৈরপীষ্যতে' ইত্যাদি বাক্যকে বস্তুতপক্ষে বৃহস্পতিকথিত বলে স্বীকার করা যায় কি না সে সম্বন্ধে মতপার্থক্য রয়েছে। "অর্থকামৌ পুরুষার্থৌ' বাক্যটিকে কৃষ্ণমিশ্র বৃহস্পতির মত বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে পন্ডিতেরা একমত নন। পণ্ডিত পঞ্চানন শাস্ত্রী 'বার্হস্পত্য সূত্রম্' রূপে যে একশটি সূত্র উল্লেখ করেছেন সেখানে এই সূত্রটি তিনি বর্জন করেছেন। শুধু তাই নয়, চার্বাকমতের ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, 'চার্বাকমতে প্রসিদ্ধ ধর্ম, অর্থ ও মোক্ষ পুরুষার্থ নহে। কারণ ধর্ম নাই, যেহেতু উহা প্রত্যক্ষ নহে। ধনসম্পত্তিরূপ অর্থ থাকিলেও উহা বলবৎ দুঃখের জনক বলিয়া সর্বদা বলবৎ দুঃখের সহিত সংসৃষ্ট। তাই তাহা পুরুষার্থ হইতে পারে না।'[১৩] মাধবাচার্য্যও 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে চার্বাক স্বীকৃত পুরুষার্থ আলোচনার সময় একবারও অর্থকে পুরুষার্থ রূপে উল্লেখ করেননি ; যদিও সামগ্রিকভাবে চার্বাকমত আলোচনার শুরুতে তিনি বলেছেন যে নীতিশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র অনুসারে বহু লোকই অর্থ ও কাম দুটিকেই পুরুষার্থ বলে মনে করেন। সুতরাং অর্থকে পুরুষার্থরূপে গণ্য করার ধারণাটি আদৌ বৃহস্পতি-মতানুগ কিনা সে বিষয়ে সংশয় থাকায় উক্ত ধারণার সাথে বৃহস্পতির মতের সামঞ্জস্য বিধানের প্রশ্নটি অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। 'লোকপ্রসিদ্ধমানুমানং চার্বাকৈরপীষ্যতে' বাক্যটির ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। পঞ্চানন শাস্ত্রী সঙ্কলিত 'বাহর্স্পত্যসূত্রে'র মধ্যে এই বাক্যটিও অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এবং মাধবাচার্য্যও স্পষ্টভাবেই প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা যেতে পারে যে মাধবাচার্য্যের গ্রন্থটি একটি "সংগ্রহ" গ্রন্থ। সংগ্রহ গ্রন্থের লক্ষ্য হল কোন সম্প্রদায়ের মূল সিদ্ধান্তগুলির বিশেষ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা। মাধবাচার্য্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' যে এ ব্যাপারে একটি সফল গ্রন্থ সে বিষয়ে খুব একটা সংশয়ের অবকাশ নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও একথা বলা যায় যে বৃহস্পতির অনুগামী চার্বাকেরা লোকসিদ্ধ অনুমানের স্বতন্ত্র প্রামাণ্য স্বীকার করবেন না, কেননা সে সম্ভাবনা যদি থাকত তা হলে মাধবাচার্য্যের পক্ষে তা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা সম্ভব হত না।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বৃহস্পতির মতে কামই পুরুষার্থ। প্রশ্ন হল বৃহস্পতি-অনুমোদিত এমন কোন জীবনধারা সম্ভব কি না যাকে স্থূল-ভোগসর্বস্ব নৈতিকতার পরিচায়ক বলা যায় এবং যা স্বীকার করে নিলে সমাজ জীবন অসম্ভব হয়। প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক হয় এই কারণে যে, অনেক দার্শনিকই মনে করেন যে চার্বাকমত স্বীকার করে নিলে সমাজজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে বলেই আস্তিকেরা অত্যন্ত কঠিনভাবে চার্বাকদের বিরোধিতা করেছেন এবং প্রায়ই কঠিন ভাষায় চার্বাকদের নিন্দাও করেছেন।[১৪] কিন্তু বাস্তবিকই কি বৃহস্পতি-মতানুসারীরা সমাজ-শৃঙ্খলা-ধ্বংসকারী নৈতিকতা সমর্থন করতে পারেন? অনেকে

এই মত পোষণ করেন যে, যে কোন উপায়ে যে কোন প্রকারের সুখভোগই চার্বাকের অভিপ্রেত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়, 'স্বদার-পরদারেষু যথেচ্ছ বিহরেৎ সদা' — এই নীতিটিকে চার্বাকষষ্ঠীতে চার্বাকের নীতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও বলা হয়, প্রয়োজন হলে 'বলপ্রয়োগের দ্বারা পাপকার্য করা' এবং 'ঋণ করেও ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করা' প্রভৃতি কাজকে চার্বাকেরা সমর্থন করেন। এ কথা সত্য যে এই সকল ধারণার সমর্থনে শ্লোকের সন্ধান চার্বাকষষ্ঠীতে পাওয়া যায়। এই শ্লোকগুলির মধ্যে দ্বিতীয় নীতিটির সমর্থক শ্লোকটি অর্থাৎ 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ' --- শ্লোকটির উল্লেখ 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' গ্রন্থেও হয়েছে। কিন্তু এই শ্লোকটি এবং পূর্ববর্তী শ্লোকগুলি বস্তুতপক্ষে বৃহস্পতি উল্লেখ করেছিলেন কিনা সে প্রসঙ্গে মতপার্থক্য রয়েছে। পঞ্চানন শাস্ত্রী তাঁর 'চার্বাকদর্শন' গ্রন্থে স্পষ্টতই বলেছেন যে এই শ্লোকগুলি প্রকৃতপক্ষে বৃহস্পতি-কথিত নয়। পরন্তু শ্লোকগুলি 'চার্বাকষষ্ঠী' নামক ৬০ টি শ্লোকের সঙ্কলনের অন্তর্গত এবং তাঁর মতে শ্লোকগুলিতে বৃহস্পতি সূত্রকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যাখ্যাকারের মতামতের দায় যেহেতু সূত্রকারের উপর আরোপ করা উচিত নয় সে কারণে আমরা এ দাবী করতেই পারি যে উক্ত শ্লোকগুলি বৃহস্পতির মতের সাথে পরবর্তীকালে কোনভাবে যুক্ত হয়েছে। অবশ্য 'যাবৎজীবেৎ' ইত্যাদি শ্লোকটির অংশবিশেষ প্রচলিত লোকগাথায়ও পাওয়া যায় বলে সেটিকে বৃহস্পতি-সূত্রেরই অংশ হিসেবে গণ্য করার জোরালো দাবী উঠতে পারে। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, লোকগাথায় উল্লিখিত শ্লোকটিতে 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ' অংশটি নেই। সেখানে বলা হয়েছে 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেদ্ নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।' অতএব আলোচ্য শ্লোক তিনটিকে বৃহস্পতি সূত্রের অন্তর্ভূক্ত করা বা না করার ব্যাপারে আমরা পঞ্চানন শাস্ত্রীর সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করব। এই সমর্থনের অপর যে কারণের কথা আমরা উল্লেখ করব তা হল এই যে বৃহস্পতি যেভাবে 'কাম'কে বিশেষিত করেছেন তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে উক্ত মতগুলিকে গ্রহণ করা যায় না। বৃহস্পতি সূত্রে বলা হয়েছে 'শারীরস্থিতিহেতুত্বাদাহারঃ-সধর্ম্মানো হি কামাঃ।' অর্থাৎ শরীর রক্ষার জন্য যেমন আহার প্রয়োজন কামও সেরূপই প্রয়োজনীয়। আমরা কি একথা বলতে পারি যে 'পরদার গ্রহণ' বা বলপূর্বক অপরের ভোগ্যদ্রব্য কেড়ে নিয়ে ভোগ করা ইত্যাদি ক্রিয়া বাস্তবিকই শরীর স্থিতির জন্য প্রয়োজনীয়? এ প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরই বোধহয় সর্বসম্মত হবে। তাছাড়া, পরদার গমন ইত্যাদিকে যদি কোন দর্শন নীতি হিসেবে উপস্থাপিত করে তাহলে বাস্তবিকই কি সেই দর্শনের পক্ষে লোকায়ত হয়ে ওঠা সম্ভব? মনুস্মৃতিতে স্পষ্টতই বলা রয়েছে যে 'পরদারাভিমর্শে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে রাজা উদ্বেজক দণ্ডদ্বারা চিহ্নিত করিয়া রাষ্ট্র হইতে নির্বাসিত করিবেন।' তৎসত্ত্বেও কি একথা বলা যেতে পারে যে পরস্ত্রীতে অনুরক্ত ব্যক্তি

দুঃখকে পরিহার করে সুখ লাভ করতে পারবেন? বৃহস্পতি স্বয়ং মনে করেন রাজাই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। সুতরাং রাজার উপস্থিতি সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর বলপ্রয়োগ করে সুখভোগ করবে এই সম্ভাবনাই বা বৃহস্পতির মতের সাথে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ হয়? রাজার কাজ সমাজকে রক্ষা করা, সর্বত্র বলবানেরই জয় হবে এই যদি প্রচলিত নীতি হয় তাহলে রাজার পক্ষে রাজ্যশাসন ও সমাজরক্ষা কি সম্ভব হতে পারে? এই কারণেও 'বলপ্রয়োগের দ্বারা পাপ কার্য করা উচিত' এ জাতীয় বাক্যকে বৃহস্পতি সমর্থিত বাক্য বলে স্বীকার করা যায় না। অবশ্য এ প্রসঙ্গে বলা হতে পারে যে স্বয়ং রাজার অন্যায় ও পাপকার্যকে সমর্থন জানানোর জন্যই বৃহস্পতি এই জাতীয় নীতির অবতারণা করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই সম্ভাবনাকে স্বীকার করা যায় না। চার্বাকদর্শন যদি রাজার স্বার্থরক্ষার জন্যই রচিত হয়ে থাকত তাহলে অন্য দর্শনগুলির মত সেটিও রাজার অনুগ্রহ লাভ করত এবং এই দর্শনটির আকর গ্রন্থগুলি এভাবে বিলুপ্ত হয়ে যেত না বলেই মনে হয়। অনেকে মনে করেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধিতা করার ফলেই সংস্কৃতির রক্ষক ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমর্থক রাজাদের সহযোগিতায় চার্বাকদের গ্রন্থরাজিকে ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কেননা, শুধুমাত্র চার্বাকরাই যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন তা নয়, বৌদ্ধরা ও জৈনরাও বৈদিক ধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণদের কোপে সে সব দর্শনের প্রামাণিক গ্রন্থ এভাবে বিলুপ্ত হয়নি। তাছাড়া, রাজার স্বার্থসিদ্ধিই যদি চার্বাকদের উদ্দেশ্য হত তাহলে কোন অর্থেই অর্থের পুরুষার্থত্ব তারা অস্বীকার করতেন না। কারণ, একথা বলাই বাহুল্য যে অর্থকে পুরুষার্থরূপে স্বীকার করলে রাজারই সবচেয়ে বেশী লাভবান হওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন হতে পারে যে, যথেচ্ছ নারীগমন ইত্যাদি যদি বৃহস্পতির মতাবলম্বীরা কর্তব্য বলে মনে নাই করেন তাহলে পরবর্তীকালেই বা এগুলি চার্বাকমতের সাঙ্গে যুক্ত হল কীভাবে। যদি আমরা খেয়াল রাখি যে বৌদ্ধ, কাপালিক প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের মতকেও অনেক সময়ই পরবর্তীকালের গ্রন্থগুলিতে চার্বাকমত বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে হয় তো এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব। ন্যায়কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থে উদয়নাচার্য্য বৌদ্ধমতকে চার্বাকের মতরূপে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপে, তর্করহস্যদীপিকায় গুণরত্ন কাপালিকদের চার্বাক বলে চিহ্নিত করেছেন। অন্যান্য মতকে এভাবে চার্বাকমতের সাথে অভিন্ন বলে মনে করার অন্যতম কারণ হল অন্যান্য মতেও অনেক ক্ষেত্রে কামকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধদের কোন কোন গুহ্যসম্প্রদায় মনে করেন যে ইন্দ্রিয় কামনাপূরণের মাধ্যমেই নির্বাণ লাভ করা যায়। এই বৌদ্ধ তন্ত্রে নারীকেও সাধনার অঙ্গরূপে বর্ণনা

করা হয়েছে। সর্ব অর্থেই এই সম্প্রদায় কামকে সাধনার প্রধান উপজীব্যরূপে গ্রহণ করায়, এই সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধদের চার্বাকরূপে গণ্য করার প্রবণতা দেখা যায়। বামাচারী কাপালিকরাও পঞ্চ'ম'কারের সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করেন এবং বৎসরের কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে যথেচ্ছ নারীগমনকেও তাঁরা সাধনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মরূপে বিবেচনা করেন। এই সব কাপালিকের আচরণীয় স্ত্রীসম্ভোগাদি কর্মকেও পরবর্তীকালে চার্বাকের মত রূপে উল্লেখ করা হয়েছে বলে দেখা যায়। বলা বাহুল্য এভাবে অন্যান্য মতকে চার্বাকমত বলে চিহ্নিত করার ফলে পরবর্তীকালে এমন অনেক কথাই বৃহস্পতির মতের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে যা আদৌ বৃহস্পতির মতসম্মত নয়।

সুতরাং পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বোধহয় এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে যেমন তেমনভাবে সুখলাভ করাকে বৃহস্পতি পুরুষার্থের সাধন বলে মনে করেন নি। যে ধরণের সুখ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করলে আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব সে ধরণের সুখের সাধনাই হয়তো তাঁর অভিপ্রেত ছিল। আমরা যদি মনে রাখি যে সুখকে পুরুষার্থ বলে স্বীকার করার অর্থ হল একথাও স্বীকার করা যে সকলের পক্ষেই এই সুখ লাভ করা সম্ভব এবং সকলেরই এই সুখের সাধনা করা কর্তব্য তা হলেই বোঝা যায় যে সেই সুখ কখনওই স্থূল সহজলভ্য এবং নিতান্ত আত্মকেন্দ্রিক হতে পারে না। বৃহস্পতি হয়তো সেই সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে সকলের পক্ষেই সুখী হওয়া সম্ভব, তিনি হয়তো সেই সুখকেই কাম্য বলে মনে করেছিলেন যা সকলে মিলে একসাথে ভোগ করা যায়, যে সুখভোগ এই পৃথিবীতেই স্বর্গের সন্ধান দিতে পারে।

টীকা ও তথ্যপঞ্জী

১। 'অঙ্গনাদ্যালিঙ্গনাদি-জন্য-সুখমেব পুরুষার্থঃ'।

২। 'স্বর্গাদিসুখস্যাপি তন্নাশজ্ঞানেন দুঃখসম্বন্ধিত্বমব্যাহতমেব' — দিনকরী।

৩। চার্বাকষষ্ঠী — শ্লোক ৫৯। অনুবাদ, লেখককৃত।

৪। মাধবাচার্য্য লিখিত 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থের 'চার্বাকদর্শন' অংশের অনুবাদ, পঞ্চানন শাস্ত্রী লিখিত চার্বাক-দর্শনম্।

৫। পঞ্চানন শাস্ত্রী, 'চার্বাক-দর্শনম্', পৃঃ ২৭

৬। চার্বাক বলেন, 'অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদন্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্, বুদ্ধি-পৌরুষ হীনানাং জীবিকা ধাতৃ নির্মিতা।' অর্থাৎ ত্রিদণ্ড, অগ্নিহোত্র হোম, ত্রিবেদ, ভস্মলেপন-এইগুলি

বুদ্ধিহীন ও পৌরুষহীন মানবগণের বিধাতার সৃষ্টি জীবিকা অর্থাৎ জীবিকার উপায়। পূর্বোক্তগ্রন্থ, পৃঃ ৮৫

৭। 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' দ্রষ্টব্য।

৮। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, 'চার্বাকদর্শন,' পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা পৃঃ ১৫০

৯। ঐ, পৃঃ ১৪৯

১০। ঐ, পৃঃ ১৫১

১১। ঐ, পৃঃ ১৫২

১২। ঐ, পৃঃ ১৮২-৮৩

১৩। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন ; নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃঃ ৪৮

১৪। পঞ্চানন শাস্ত্রী, 'চার্বাক-দর্শনম্' পৃঃ ১৫-১৬

১৫। হিরিয়ানা, আউটলাইনস অব ইণ্ডিয়ান ফিলসফি, চার্বাকদর্শন সংক্রান্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৬। 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র

মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়

এক

ভূমিকা

ধর্মের পরিচয় প্রসঙ্গে অনেক সময়ই বলা হয় 'ধর্ম হল নৈতিক কর্মেব অনুষ্ঠান মাত্র'।[১] ধর্মের এই স্বরূপটি বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ধর্ম ও নৈতিকতার যোগসূত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এই দর্শনে, যার অন্যতম অভিধাই হল 'শীলভিত্তিক ধর্ম।'

বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে ধর্মীয় জীবন সদ্‌গুণসম্পন্ন নৈতিক জীবন, যার দ্বারাই মুমুক্ষু তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন। যদিও নির্বাণের স্তর উপলব্ধির স্তর, যেখানে পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ এই বৈপরীত্য থাকে না, কিন্তু যতক্ষণ না এই স্তরে উন্নীত হওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ নৈতিক জীবন যাপনের মাধ্যমে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে পারেন। অঙ্গুত্তর-নিকায় গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অনৈতিক কর্মে লিপ্ত, তিনি কখনই মুক্তিলাভের অধিকারী নন। সেই শ্রমণ-ই নির্বাণের অধিকারী যিনি পরম নৈতিক, যাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজের বশীভূত, যিনি মিতাহারী এবং ধর্মপালনে নিযুক্ত। তাই বুদ্ধদেবের অনুশাসন হল ঃ

> সব্বপাপস্‌স অকরণং কুসলস্‌স উপসম্পদা।
> সচিত্ত পরিয়োদপনং এতং বুদ্ধানুশাসনম্‌।।
> খন্তী পরমং তপো তিতিক্‌খা নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা।
> ন হি পব্বজিতো পরূপঘাতী সমণো হোতি পরং বিহেধয়ন্তো।।
> অনূপবাদো অনূপঘাতো পতিমোক্‌খে চ সংবরো।
> মওঞ্‌ঞুতা চ ভওস্মিং পন্থঞ্চ সয়নাসনং।
> অধিচিত্তে চ অযোগো এতং বুদ্ধানুশাসনং।।[২]

অর্থাৎ সকল পাপকাজ থেকে বিরতি, কুশলকর্মের অনুষ্ঠান এবং আপন চিত্তশুদ্ধি —

এ হল বুদ্ধদেবের অনুশাসন। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা পরম তপস্যা এবং নির্বাণ সর্বশ্রেষ্ঠ। পরকে আঘাত দিয়ে কেউ ভিক্ষু হতে পারে না। অপরের নিন্দা না করা, অপরকে আঘাত না করা, নিয়মসমূহ যথাযথ পালন করা, চিত্তকে সুদৃঢ় করা, মিতাহারী হওয়া, সর্বদা মনকে যোগযুক্ত রাখা — এই হল বুদ্ধদেবের উপদেশ।

বৌদ্ধ অনুশাসন বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় এখানে শুধু জ্ঞান বা প্রজ্ঞার দ্বারা বা শুধু সমাধিস্থ হওয়া, যোগযুক্ত হওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। প্রজ্ঞা, সমাধির সাথে সাথে শীল বা চরিত্রগঠনকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনে শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা আধ্যাত্মিক অগ্রগতির তিনটি পর্যায় হিসাবে কল্পিত। শীল বলতে বোঝায় চারিত্রিক শুদ্ধতা, সমাধি হল মনঃসংযোগ এবং প্রজ্ঞা হল তত্ত্বজ্ঞান। অর্থাৎ চারিত্রিক শুদ্ধতার মধ্যেই আধ্যাত্মিক অগ্রগতির সূচনা; সমাধি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে প্রজ্ঞা বা চরম তত্ত্বজ্ঞানে এই অগ্রগতির পরিসমাপ্তি। শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা পরস্পর অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যুক্ত — এদের কোনটিই অপরটির সাহায্য ছাড়া ক্রিয়াশীল হতে পারে না। শীল বা চারিত্রিক শুদ্ধতা আধ্যাত্মিক অগ্রগতির সূচনা হিসাবে গৃহীত হওয়ায় বৌদ্ধমত 'শীলভিত্তিক ধর্ম' বলে অভিহিত।

চারিত্রিক শুদ্ধতা মানে কিন্তু নিছক বাহ্য আচরণের শুদ্ধতা নয়। বাহ্য আচরণের ভালো-মন্দ, ইচ্ছার ভালো-মন্দের উপর নির্ভরশীল। তাই বৌদ্ধদর্শনে নৈতিকতা কেবলমাত্র বাহ্য আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য প্রযুক্ত নয়, মনকে সংযত, নিয়ন্ত্রিত করাও নৈতিকতার অন্যতম উদ্দেশ্য। মনই সমস্ত চেতন কর্মের উৎস। আমরা প্রথমে ইচ্ছা করি তারপর কাজ করি। তাই ইচ্ছাশক্তি শুদ্ধ না হলে কর্মের শুদ্ধি সম্ভব হবে না। সেইজন্য বৌদ্ধ দর্শনে বাহ্য ক্রিয়া এবং মানসিক ইচ্ছাশক্তি উভয়ের সঠিক নিয়ন্ত্রণের জন্য নৈতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

দুই

সামাজিক পটভূমিকা

বৌদ্ধ নৈতিকতার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হয় কোন প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের সূত্রপাত হয়েছিল সে-দিকে। প্রাক্-বুদ্ধ ভারতবর্ষে তিন ধরণের দার্শনিক চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল — একদল যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মানুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং মনে করতেন যে এই সমস্ত যাগাদি ক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি যে কোন ধরণের কাম্য বস্তু লাভ করতে পারে। দ্বিতীয় মতাবলম্বী দার্শনিকরা মনে করতেন ব্রহ্ম-ই একমাত্র সৎ বস্তু এবং ব্রহ্মভিন্ন

যা কিছু আছে তা সবই অসৎ, অনিত্য। তৃতীয় দলের অভিমত হল, জগতে কোন স্বতন্ত্র নৈতিক নিয়ম নেই, কোন কিছু সৎ, নিত্য বলে স্বীকার করা যায় না ঃ যা কিছু বর্তমান তা স্বাভাবিক নিয়মবশেই বর্তমান, তার জন্য অন্য কোন নৈতিক তত্ত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। এই তিনটি ধারা পৃথকভাবে প্রচলিত থাকলেও প্রথম দুটির সূত্র বেদ, উপনিষদেই পাওয়া যায়। এবং এই বৈদিক ধারার পটভূমিকাতেই বৌদ্ধদর্শনকে বুঝতে হয়।

বেদের মধ্যে দুই বিপরীতমুখী নৈতিক মতের সন্ধান পাওয়া যায় — কর্মমার্গ এবং জ্ঞানমার্গ। জগতকে কাম্য ও ভোগ্য বিষয়ে পরিপূর্ণ মনে করে কর্মমার্গের উপাসকরা জীবন সম্পর্কে এক আশাবাদী দৃষ্টি গ্রহণ করেন — জীবনে দুঃখের উপস্থিতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাঁদের চেষ্টা হতে থাকে কিভাবে কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিজেদের আকাঙ্খিত বিষয় লাভ করা যায়। কিন্তু এই পথের অসুবিধা হল এখানে বাহ্য আড়ম্বরের উপর জোর দেবার ফলে চিত্তের নৈতিক গুণগুলি উপেক্ষিত হতে থাকে — যেমন, শান্তি, করুণা, অহিংসা ইত্যাদি। এককথায় বলা যায় এই স্তরের নৈতিক দর্শন হল প্রবৃত্তির দর্শন।

উপনিষদের স্তরে কিন্তু প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, অল্পকে পরিত্যাগ করে 'ভূমা'-র জন্য, পরম সত্যের অন্বেষণে সচেষ্ট হতে বলেছেন। মানুষ যে কেবল দেহ-মনের সম্মেলন মাত্র নয়, অতিরিক্ত কিছু, এই ধারণার উপর গুরুত্ব আরোপ করে কেবল কাম্য বস্তুর প্রাপ্তিকে জীবনের পরম লক্ষ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয় নি। যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীর উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে এই আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে -- 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্য্যাম্'। মানুষের মূল লক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে অমৃতত্বকে — যে অমৃতত্ব মানুষের সমস্ত দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটাতে পারে। কিভাবে অমৃতত্ব লাভ করা যায়, কিভাবে সমস্ত দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটানো যায় — এই চিন্তাই তখন মূল দার্শনিক সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। এক কথায়, এই স্তরে আমরা পাই নিবৃত্তির দর্শন।

প্রবৃত্তির দর্শন ও নিবৃত্তির দর্শনের পার্থক্যের দরুণই অপবর্গ বা মুক্তিলাভের পথ হিসেবে কর্ম ও জ্ঞান এই দুটি ভিন্ন মার্গের নির্দেশ বৈদিক দার্শনিকদের মধ্যে দেখা যায়। এই দুটি বিপরীত ধারার সঙ্গে আরেকটি পথের স্বীকৃতিও দেখতে পাওয়া যায় ভারতীয় চিন্তাধারায়। সেই পথ হল ভক্তির পথ যেখানে কোন একজন বিশেষ দেবতার প্রতি অনন্যা অবিচলা ভক্তি প্রদর্শনই মুক্তিলাভের একমাত্র পথ হিসেবে গণ্য করা হত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি তিনটিকেই ব্যক্তির গুণগত তরতম্য অনুসারে মুক্তির জন্য নির্দেশ করা হয়েছে।

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম — তিনটির লক্ষ্য একই মুক্তি হলেও এদের মধ্যে জ্ঞানের পথকেই সাধারণভাবে উচ্চতর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে প্রাক্ বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য সমাজে। অথচ এই জ্ঞানমার্গের দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। কেবলমাত্র বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তি ঃ যাঁরা বুদ্ধির দিক দিয়ে বা চিন্তাধারার দিক দিয়ে সমাজে উচ্চতর আসন অলঙ্কৃত করতে পেরেছিলেন তাঁরাই এই মার্গের অধিকারী হিসেবে কথিত হতেন। সমাজের বাকি সাধারণ ব্যক্তির জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় পথ-ই ছিল একমাত্র অবলম্বনের বিষয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমাজের মধ্যে প্রচলিত হয় বর্ণবৈষম্য — এক শ্রেণী উচ্চ বর্ণের, অন্য শ্রেণীরা নীচ বর্ণের।

এই সামাজিক ও দার্শনিক পটভূমিকায় যখন বুদ্ধদেব তাঁর দর্শন রচনা করেন, তখন তিনি প্রথমেই এই বর্ণবৈষম্যের অবসান ঘটান। তিনি তাঁর ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দেন সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের দিকে, তাদের সবাইকেই তাঁর সংঘের অংশ করে তোলেন। মুক্তির পথ হিসেবে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানরূপ কর্মমার্গ অথবা দেবতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন রূপ ভক্তিমার্গ পরিহার করে তিনি ধ্যান এবং চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মনে করেন তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বা সম্যক জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি লাভ করা যায় এবং এই জ্ঞান উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, জাতি-বর্ণনির্বিশেষে সকলের জন্য প্রশস্ত। মুক্তি কোন বিশেষ শ্রেণীর করায়ত্ত না করে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়াই বৌদ্ধ ধর্মের অভিনবত্ব। ব্রাহ্মণদের সেবাই যারা নিজেদের জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতেন, সেই শূদ্র শ্রেণীর লোকের-ও যে ব্রাহ্মণের মত মুক্তিতে সমান অধিকার আছে, এই মত প্রচার করে বুদ্ধদেব তৎকালীন সামাজিক পটভূমিকায় এক ধরণের বিপ্লবের সূচনা করেন। এবং এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারাই বৌদ্ধ দর্শনের দিগ্বিজয়ের মূলহেতু।

ব্রাহ্মণ্য নৈতিকতায় সঙ্গে বৌদ্ধ নৈতিকতার মৌলিক প্রভেদ এখানেই যে বৌদ্ধ নৈতিকতায় সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ না করে সার্বজনীন সত্যের অনুসন্ধান করা হয়েছে যা একান্তভাবেই ব্যক্তির চরিত্র গঠন ও জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল। মুক্তির জন্য ব্যক্তির নিজের উপর গুরুত্ব স্থাপন তৎকালীন সমাজের পটভূমিকায় অসাধারণ-ই বলতে হবে। মানুষকে দৈব শক্তির উপর বা বাহ্য কোন শক্তির উপর নির্ভর না করে, প্রত্যেক মানুষকে নিজের ভাগ্যবিধাতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলিষ্ঠ পৌরুষ বা আত্মপ্রভাব-ই নির্বাণ পথযাত্রীর একমাত্র পাথেয়, দেবপ্রসাদ বা দৈবীকৃপা নয়। মনস্বী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থে বলেছেনঃ "বৌদ্ধধর্মের সার উপদেশ এই যে, প্রত্যেক মনুষ্য নিজ কর্মগুণে, নিজ পুণ্যবলে আত্মপ্রভবে, সত্যোপার্জনে, প্রেম, দয়া, মৈত্রীবন্ধনে ঐহিক, পারত্রিক মঙ্গল নিদান

নির্বাণরূপ মুক্তিলাভের অধিকারী। যে পথে চলিতে হইবে, তা বুদ্ধ প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গিক ধর্মপথ। গম্যস্থান নির্বাণমুক্তি সারথি আত্মশক্তি।"

তিন

বৌদ্ধদর্শনে বুদ্ধদেবের স্থান

বৌদ্ধ দর্শনে বুদ্ধদেবকে নিছক প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেই দেখা হয় নি — তিনি পরম সত্যের দ্রষ্টা এবং প্রকাশকর্তা — তিনি সমস্ত জীবের পরিত্রাতা। তাঁকে কেন্দ্র করেই সমগ্র বৌদ্ধ চিন্তাধারা আবর্তিত হয় এবং সকল ব্যক্তির লক্ষ্য-ই হল এই বুদ্ধত্ব অর্জন করা। বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে ব্যক্তিক পরিপূর্ণতা ও সার্বিক সত্যতা এক হয়ে গেছে। তিনি ধর্ম এবং সত্যের মূর্ত প্রতীক। তাই বলা হয় 'যো বুদ্ধং পশ্যতি স ধম্মং পশ্যতি'। তথাগতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বৌদ্ধ গ্রন্থে বলা হয়েছে — তাঁর শরীরও ধর্ম (ধম্মকায়) এবং তিনি 'ধম্মভূত', ধর্ম বা সত্যদ্বারা গঠিত। এইভাবে ধর্মকে কোন ব্যক্তির সঙ্গে একীভূত করা, ভারতীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই অভিনব।

জগতের ইতিহাসে বুদ্ধদেব একজন পথপ্রদর্শক, যিনি দুঃখ থেকে দুঃখাতীতে যাবার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। এই পথের স্রষ্টা যে তিনি নিজেই অথবা তিনিই সর্বপ্রথম মহাপুরুষের এই পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, তা-ও নয়। যুগে যুগে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, যাঁরা এই পথ খুঁজে পেয়েছিলেন এবং সেই পথের সন্ধানও সমসাময়িক ব্যক্তিদের কাছে তুলে ধরেছিলেন; সেইদিক থেকে বুদ্ধদেবের প্রচেষ্টা অভিনব কিছু নয়। তিনি তাঁর নিরলস চেষ্টায় এই পথকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করেছেন শুধু এবং এই পথের শেষে যে সত্যতার জগৎ যেখানে সমস্ত দুঃখকষ্টের অবসান, সেখানে উপনীত হয়েছেন। তাঁর চেষ্টা অতঃপর হল এই পথকে সাধারণ লোকের কাছে তুলে ধরা। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যবহারিক। দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত সমস্ত প্রাণীকে এই দুঃখের অতীতে উপনীত করা। দুঃখান্তে উপনীত হওয়া কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির নিজের চেষ্টাসাপেক্ষ। ব্যক্তিকে নিজেকেই উদ্যমী হতে হবে, শুধু পথের সন্ধান বুদ্ধদেব দিয়ে দিয়েছেন। —

> তুমহে হি কিচ্চং আতপ্পং অক্খাতারো তথাগতা।
> পটিপন্না পমোকখন্তি ঝায়িনো মারবন্ধনা।। ধম্মপদ। ২০.৪

তাই বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধদেব জীবের উদ্ধারকর্তা নন, তিনি পথ-প্রদর্শক মাত্র। তিনি ঈশ্বররূপে পূজ্য বা সম্মানীয় নন, তিনি সম্মানীয় সত্যের পথ বা পরম জীবনের পথ প্রদর্শনের ভূমিকার জন্য। ধম্মপদ গ্রন্থে স্বাভাবিকভাবেই এই ধরণের পথপ্রদর্শক ব্যক্তিকে গুপ্তধন প্রদর্শনকারীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে — যিনি গুপ্তধন দেখিয়ে দেন তাঁকে

লোকে যেমন ভজনা করে, যিনি কোন কাজ বর্জনীয় তা বলে দেন, দোষ দেখলে তিরস্কার করেন — সেই জ্ঞানী পন্ডিতগণকে সেই রকম শ্রদ্ধা করা কর্তব্য। তাতেই মঙ্গল হয়, এবং অনিষ্ট নাশ হয়।[৩]

চার

বৌদ্ধ দর্শনে মধ্যপন্থা অবলম্বন

বৌদ্ধ নৈতিকতার অন্যতম মূলমন্ত্র হল মধ্যপন্থা অবলম্বন। আগেই বলা হয়েছে বৌদ্ধ দার্শনিকরা প্রবৃত্তি মার্গ বা নিবৃত্তি মার্গ, কোনটিই অবলম্বন করার কথা বলেন না। সুখের অনিত্যতা এবং ক্ষণস্থায়ী স্বরূপের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রবৃত্তি বা জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্তি বর্জনের কথা বলে থাকেন তাঁরা। চিত্তের কামনা, বাসনা আসক্তি দূর করা মানেই কিন্তু কঠোর তপশ্চর্যার জীবন অতিবাহিত করা নয়। সত্যের পথ হল মধ্যপন্থা। এর দ্বারাই একমাত্র জীবকে পাপ এবং দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এই দিক দিয়ে দেখলে বৌদ্ধ নৈতিকতার সঙ্গে জৈন নৈতিকতার মূলগত প্রভেদ আছে — জৈনগণ মনে করেন কঠোর তপশ্চর্যার মধ্য দিয়েই আত্মোপলব্ধি সম্ভব; কিন্তু বৌদ্ধমতে আত্মনিপীড়ন কখনই পথ হতে পারে না। সেই দিক দিয়ে বৌদ্ধ মতবাদ অনেক বেশী মানবিক এবং ব্যবহারোপযোগী।

এই মধ্যপন্থা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, উভয় দিক থেকেই তাৎপর্যমন্ডিত। এর দ্বারা সন্ন্যাসীর পরিমিত জীবনকে সূচিত করা হয়েছে। বিনয়পিটক গ্রন্থে এই সন্ন্যাসীর জীবন কি হওয়া উচিত তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই মতবাদের অর্থ হল শাশ্বতবাদ (জগতের সমস্ত কিছুই শাশ্বত, চিরস্থায়ী) এবং উচ্ছেদবাদ (জগতের সমস্ত কিছুই বিনশ্বর) এই উভয় চরমপন্থী মতবাদের থেকে নিরস্ত থাকা। ধম্মচক্কপবত্তন-সূত্ত গ্রন্থের প্রথম সূত্রেই সতর্ক করে বলা হয়েছে প্রত্যেকেরই দু'প্রকারের চরমপন্থা পরিহার করা উচিত — (১) সংসারী লোকের অবস্থা যাঁরা যাগ, যজ্ঞ, পূজা, আয়োজন ইত্যাদির অনুষ্ঠান করেন আবার একই সঙ্গে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে নিমগ্ন থাকেন: (২) অপরদিকে আছে সন্ন্যাসীরা যাঁরা সত্যদর্শনের আশায় আত্ম-নিপীড়নের পথ বেছে নেন। বৌদ্ধ মতে এই দুই পথের কোনটাই মুক্তির পথ হতে পারে না, তাই প্রয়োজন মধ্যমপন্থা যা ব্যক্তির জ্ঞানের দৃষ্টি উন্মোচিত করবে, যার সাহায্যে ব্যক্তি নির্বাণ রূপ তত্ত্ব অবগত হতে পারবেন। প্রথম প্রকারের চরম পন্থার অনুগামী হলেন তৎকালীন ধনী ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ যাঁরা একদিকে বিলাসে বাহুল্যে নিমগ্ন থাকতেন আবার অপরদিকে অন্য পূজারীকে দিয়ে বহু পশুবলি পূর্বক যাগযজ্ঞের আয়োজন করতেন

ভবিষ্যত জন্মে মুক্তিপ্রাপ্তির আশায়। দ্বিতীয় প্রকার চরম পন্থার অনুগামী হলেন অব্রাহ্মণ কট্টরবাদী যাঁরা বনে থাকা, স্বল্প আহার গ্রহণ করা অথবা উপবাসাদি কঠোর নিয়ম পালনের মাধ্যমে দেহ ও মনের সংযম বিধান করেন। এই দুই চরমপন্থীর বিপরীতে বুদ্ধদেব মধ্যম ধরণের কৃচ্ছ্রতাবাদ (asceticism) প্রচার করেন। তিনি মনে করতেন যে সন্ন্যাসীর নিজের কর্তব্য পালনের জন্যই শরীরের সুরক্ষা একান্ত প্রয়োজন আর শরীর রক্ষার্থে পরিমিত আহার, বস্ত্র, এবং বাসস্থান প্রয়োজন। আহার, বস্ত্র, বাসস্থান একান্ত প্রয়োজনীয় হলেও সেই আহার, বস্ত্র নিয়ে নিমগ্ন থাকলে চলবে না — ভিক্ষালব্ধ অন্ন বস্ত্রেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কোন বিশেষ আহার বা পোষাকের প্রতি আসক্তি থাকা চলবে না। এইভাবে দুই চরমপন্থী মতবাদের অবসান ঘটিয়ে সন্ন্যাসীর উপযোগী মধ্যপন্থার নির্দেশ পাওয়া যায় বৌদ্ধ দর্শনে।

এই মধ্যপন্থার মূল উদ্দেশ্য হল সত্য অনুসারে জীবনের আদর্শ উপলব্ধি। এটাই আর্যপথ এবং এটা 'সম্বোধিগামিন্' বা 'সম্বোধিপরায়ণ'। অর্থাৎ এই পন্থা যথাযথ অনুসরণ করে বোধি প্রাপ্তি সম্ভব। এই বোধি হল মানুষের দুর্বলতা, ভ্রান্তি, দোষ, সমস্ত কিছুর অবসান — সদর্থকভাবে, জগতের নৈরাত্ম্যস্বরূপ, অনিত্য স্বরূপ উপলব্ধিই বোধি। এই জ্ঞান থেকেই দুঃখের নিবৃত্তি ঘটান সম্ভব। সংক্ষেপে বলা যায় যে বৌদ্ধ নৈতিকতায় সর্বোচ্চ লক্ষ্য হল ব্যক্তির নিজের জীবনে সত্যের নিত্যতা ও একত্ব উপলব্ধির মধ্য দিয়ে বুদ্ধ বা অন্যান্য তথাগতদের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি। কেবল দর্শন এবং বিদ্যায় নয়, চারিত্রিক এবং মানসিক উন্নতিব মাধ্যমেই এই উপলব্ধি সম্ভব।

পাঁচ

বৌদ্ধ দর্শনে দুই স্তরের নৈতিকতা

যদিও বুদ্ধদেবের লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষকে নির্বাণের পথ দেখান, কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সাধারণ মানুষের পক্ষে এই লক্ষ্য এতই দুর্গম, এতই দুঃসাধ্য যে তারা কখনই এই লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে না তাই তাদের জন্য তিনি জটিল তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ না করে অতি সাধারণ উপদেশ দিয়েছেন — পরস্পরের প্রতি দয়ালু হওয়া, মিথ্যা কথা না বলা, পরদ্রব্য অপহরণ না করা, প্রতিটি আশ্রমের যথোপযুক্ত কর্তব্য সম্পাদন করা, ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এই উপদেশের মধ্যে অভিনব কিছু নেই; কিন্তু বুদ্ধদেব অনুভব করেছিলেন যে সাধারণ দৈনন্দিন কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি সৎ, সুন্দর, সুস্থ জীবনের উপযোগী হয়ে ওঠে। তাই সাধারণ মানুষের জন্য তিনি এইসব সাধারণ উপদেশ দিয়েছেন, আর তাঁর দর্শনের গূঢ় তত্ত্ব বিশেষ কিছু শিষ্যের কাছে তুলে

ধরেছেন। অর্থাৎ বৌদ্ধ দর্শনে সমস্ত নৈতিক কর্তব্য পালন যেন আসল 'মার্গের'-ই প্রবেশদ্বার। কেউ কখনও আশা করতে পারেন না যে তিনি এই সাধারণ কর্তব্য পালন না করেই উচ্চ মার্গে প্রবেশের অধিকারী হয়ে উঠবেন। এই সৎ কর্ম সম্পাদনের উপর জোর, তৎকালে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যবাদের পটভূমিকায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদে সাধারণ ধর্মের কথা স্বীকার করা হলেও মনে করা হত যে ব্যক্তির সুখ সমৃদ্ধি এই সাধারণ ধর্মের উপর নির্ভরশীল নয় — তার জন্য প্রয়োজন যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান। বুদ্ধদেব যাগাদি অনুষ্ঠানকে দূরে সরিয়ে রেখে চরিত্র গঠন করাকে সুখসমৃদ্ধি লাভের পথ হিসেবে গণ্য করেছেন। সুখ, সমৃদ্ধি লাভের উপায় হলেও চরম লক্ষ্য মোক্ষপ্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই কর্তব্য পালন সোপান স্বরূপ, তদতিরিক্ত নয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেই মানসিক এমন এক স্তরে উপনীত হন, যেখানে সহজেই চিত্তকে সংযত করা যায় বা আবেগ দমন করা যায়। এই ধরণের মানসিক অবস্থায় ব্যক্তির পক্ষে উচ্চ পর্যায়ের নৈতিকতায় প্রবেশ সহজসাধ্য হয়।

এইভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বৌদ্ধ দর্শনে দুই স্তরের নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে — নিম্ন স্তর এবং উচ্চ স্তর। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন নৈতিক কর্তব্য পালন যা নিছক-ই প্রস্তুতিমূলক, যার মধ্যে বৌদ্ধ উপাদান আলাদা করে পাওয়া সম্ভব নয়; এবং উচ্চ পর্যায়ের নৈতিকতা, যার লক্ষ্য হল নির্বাণ প্রাপ্তি এবং যা একান্তভাবেই বৌদ্ধ দর্শনের। এই পর্যায়ের নৈতিকতাব লক্ষ্য নিছক ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য করা নয়, এখানে লক্ষ্য হল আরো গভীর — কিভাবে মানুষকে দুঃখের হাত থেকে ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক মুক্তি দেওয়া সম্ভব।

এই উদ্দেশ্যে তিনি মানুষকে দুঃখ, তার উৎপত্তি, নিবৃত্তি ও নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। এই চারটি বিষয় সম্পর্কে তাঁর যে মত তাই হল তাঁর এই স্তরের নৈতিকতার মূলতত্ত্ব। এইগুলিকে বলা হয় আর্যসত্য। সুতরাং চারটি আর্যসত্য হল দুঃখ, দুঃখসমুদায়, নিরোধ ও মার্গ।

ছয়

চতুরার্যসত্য

প্রথম আর্যসত্য — দুঃখ আছে। বুদ্ধদেবের মতে জগতে সমস্ত সত্তাই দুঃখময়। জন্ম দুঃখ, তেমনই রোগ, জরা, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু সবই দুঃখ। দুঃখ দৈহিক ও মানসিক উভয়ই হতে পারে। মানসিক দুঃখ যেমন প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ, অনাকাঙ্খিত জনের সঙ্গে সংযোগ, প্রিয় বস্তুর অপ্রাপ্তি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে জগত যে দুঃখময়, এই মতবাদ

কেবল বৌদ্ধ দার্শনিকরা নয়, সাংখ্য দার্শনিকরা, নৈয়ায়িকরা-ও বিশ্বাস করতেন। সাংখ্যকারিকায় প্রথমেই বলা হয়েছে দুঃখ তিনপ্রকার — আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। উদ্যোতকরের মতে দুঃখ একুশ প্রকার। চার্বাক ভিন্ন সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকরা মনে করেন যে জগতের সবই দুঃখদায়ক। তবে বৌদ্ধ দার্শনিকরা যখন জগতকে দুঃখময় বলে উল্লেখ করেন তখন দুঃখ বলতে তাঁরা কিন্তু সাধারণ জাগতিক কষ্ট বোঝান না। তাঁদের মতে দুঃখ হল জগতে যে কোন ধরণের অস্তিত্ব, তা মানুষরূপে হোক, বা মনুষ্যেতর প্রাণী রূপে হোক বা উচ্চপর্যায়ের দেবতা, এমন কি ব্রহ্মা রূপেই হোক। কারণ জগতে যে ধরণের সত্তাই থাকুক না কেন, ধন, জন,সম্মান এমন কি অলৌকিক ক্ষমতা পর্যন্ত সবই একসময় না একসময় ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) সমন্বয়ে যা কিছু গঠিত তারই দুঃখে পরিসমাপ্তি এবং প্রত্যেকের সঙ্গেই দুঃখের যোগ আছে কারণ প্রতি মুহূর্তে সেগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং শেষে সবগুলিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এইভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে দুঃখের সঙ্গে যোগ থাকায় জগতের সবই দুঃখময়।

ব্যাবহারিক স্তরে অবশ্য বুদ্ধদেব সুখ বা পরিতৃপ্তিবোধকে অস্বীকার করেন না। তাই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জগতে যেমন দুঃখ আছে তেমনি আবার সুখ-ও আছে। জাগতিক অস্তিত্ব যদি নিছক দুঃখময়, কষ্টদায়ক হত, তাহলে ঐ অস্তিত্বব্যাপারে কারোর মধ্যেই কোন আকর্ষণ থাকত না। আবার বিপরীতক্রমে জগতে দুঃখকষ্ট আছে বলেই তার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করে মানুষ। একমাত্র পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই জগতের সমস্ত কিছু এমন কি যা আপাত দৃষ্টিতে পরিতৃপ্তিদায়ক বলে মনে হয়েছে, তা দুঃখ ছাড়া আর কিছু নয় বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। বস্তুর নিজস্ব ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য বৈশিষ্ট্যবশত সুখদায়ক বস্তুও বিনাশের পর দুঃখাবহ হয়ে যায়। তাই সুখে আত্মহারা হওয়া খুবই ক্ষণস্থায়ী যা কৌশলে পরিতৃপ্তিকে দূরে সরিয়ে রাখে। বস্তুর এই ক্ষণিক বিনাশী বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ সম্যকভাবে অবগত না হওয়ায় তারা এই সমস্ত বস্তুর পিছনে ছুটে বেড়ায় এবং পরিণামে কষ্টভোগ করে। অজ্ঞতাবশত তারা দুঃখের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখের এই সর্বব্যাপী বৈশিষ্ট্যের উপর প্রাধান্য দিয়ে মানুষের জীবনকে দুঃখের নামান্তর বলে মনে করা হয়েছে। দুঃখ তাই এই দর্শনে রোগ এবং রোগের উপসর্গ উভয়ই। এবং এই দুঃখ কেবল শারীরিক বা মানসিক পীড়া নয়। বুদ্ধদেব যখন বলেন 'সংবিত্তেন পঞ্চুপাদানখ্‌খন্ধা দুক্‌খা' তখন তার দ্বারা শারীরিক ও মানসিক অতৃপ্তি বোঝাতে চান নি — এই শরীর এবং মন সংক্রান্ত অতৃপ্তি বোঝাতে চেয়েছেন। এই অতৃপ্তিই সমস্ত আধ্যাত্মিক অসন্তোষের মূল।

দ্বিতীয় আর্যসত্য হল দুঃখসমুদায় বা দুঃখের কারণ আছে। যদিও সমস্ত ভারতীয়

দার্শনিকরাই একমত যে জগতে দুঃখ আছে, দুঃখের উৎপত্তি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। বৌদ্ধ দার্শনিকরা তাঁদের প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের সাহায্যে দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা করেন। এই মতে জগতের সমস্ত বিষয়ের অস্তিত্ব কোন না কোন হেতু বা প্রত্যয়ের উপর নির্ভরশীল। অহেতুক কোন বস্তু জগতে নেই। যেহেতু, জগতের সব জিনিসের অস্তিত্ব অন্য সামগ্রীর উপর নির্ভরশীল তাহলে নিশ্চয়ই জগতে এমন কিছু আছে, যা থাকার দরুণ জগতে দুঃখ আছে। বৌদ্ধমতে জগতে যে বিভিন্ন প্রকার দুঃখ আছে যাকে আমরা সংক্ষেপে জরামরণ বলে উল্লেখ করি তার কারণ জগতে জন্ম বা জাতি আছে। যদি কোন মানুষ না জন্মায়, তাহলে তার দুঃখভোগ করার কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব দুঃখের কারণ হল জন্ম বা জাতি। এই জন্মও নিঃশর্ত নয়। এর কারণ আমাদের জন্মানর ইচ্ছা। যাকে বলা হয় 'ভব'। 'ভব' কথাটির অর্থ হওয়া — এখানকার তাৎপর্য, পুনর্বার জন্মগ্রহণের জন্য ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা বা ইচ্ছার কারণ হল উপাদান বা জাগতিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি। এই আসক্তির কারণ হল তৃষ্ণা বা ভোগস্পৃহা। এবং এই তৃষ্ণার কারণ হল বেদনা বা সুখস্মৃতিবিজড়িত পূর্ব-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। আমরা পূর্বে এই জাতীয় বস্তু ভোগ করেছি এবং সেই ভোগ করার জন্য সুখ অনুভব করেছি। সেই সুখস্মৃতি হল তৃষ্ণার কারণ। এই বেদনার কারণ হল স্পর্শ বা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর সংযোগ। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যদি বস্তুর সংযোগ না ঘটে তাহলে কখনই সুখানুভূতি বা বেদনা উৎপন্ন হতে পাবে না। এই ইন্দ্রিয় এঁদের মতে ষড়ায়তন — পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় যথা চক্ষু,কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং অন্তরিন্দ্রিয় বা মন। কিন্তু ষড়ায়তন বা ছটি ইন্দ্রিয় কাজ করতে পারে না, যদি না নামরূপ বা দেহ-মনের সংগঠন থাকে। এই নামরূপের অস্তিত্ব সম্ভব নয় যদি বিজ্ঞান বা চেতনা না থাকে। এই বিজ্ঞান বা চেতনা আছে বলেই জীবদেহ মাতৃগর্ভে ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হতে পারে। কিন্তু এই চেতনা বা বিজ্ঞানও কারণহীন নয়। এর কারণ হল পূর্ব পূর্ব জীবনের সংস্কার। পূর্ব বা অতীত জীবনের যেসব কর্ম সম্পাদিত হয়, সেসব কর্ম একপ্রকার শক্তি উৎপন্ন করে যাকে বলা হয় সংস্কার। এই সংস্কার হল অতীত জীবনের ছাপ। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মধ্যে এই সংস্কারই চেতনার সৃষ্টি করে। এই সংস্কারের কারণ কি? এই সংস্কার, যার জন্য পুনর্জন্ম হতে থাকে তার কারণ হল অবিদ্যা। অবিদ্যা অর্থ আর্যসত্য চারটি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অভাব। অবিদ্যাবশত মানুষ মিথ্যাকে সত্য বলে মনে করে,বা যা প্রকৃতপক্ষে দুঃখজনক তাকেও সুখদায়ক বলে মনে করে। সুতরাং এই অবিদ্যাই হল জগতের দুঃখের মূল কারণ। এই অবিদ্যা আবার তিন ধরণের - অহং বোধের কারণ যে নিত্য আত্মা তার অনস্তিত্বের সম্বন্ধে অবিদ্যা, জাগতিক বিষয়ের ক্ষণিকত্ব বা অনিত্যতা বিষয়ে অবিদ্যা এবং জগতের সমস্তই যে দুঃখময় সেই বিষয়ে অবিদ্যা। যদি আমাদের অবিদ্যা না থাকত, যদি আমরা বুঝতে

পারতাম যে নিত্য আত্মা বলে কিছু নেই,বা আমরা যদি জাগতিক বস্তুর ক্ষণিক বা দুঃখময় স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারতাম, তাহলে আমরা এমন কোন কাজ করতাম না যার দরুণ পুনর্জন্ম হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রেও মহর্ষি গৌতম অনুরূপভাবে দুঃখের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। যদিও তিনি বৌদ্ধদের মত বারোটি কারণ স্বীকার করেন নি, কেবল পাঁচটি কারণ স্বীকার করেছেন, তবু তিনিও দুঃখের কারণ হিসেবে জন্মকে, জন্মের কারণ হিসেবে প্রবৃত্তিকে, এবং সব কিছুর মূল কারণ হিসেবে মিথ্যা জ্ঞানকে অভিহিত করেছেন। মিথ্যা জ্ঞান যেহেতু সমস্ত দুঃখের মূলকারণ তাই মিথ্যাজ্ঞানের অবসানেই অপবর্গ বা মোক্ষের উৎপত্তি বলে অভিহিত হয়েছে

> "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষঃ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে
> তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ।" ন্যা. সূ. ১.১.২

সংক্ষেপে বৌদ্ধমতে দুঃখের কারণ বারোটি —

অবিদ্যা-সংস্কার-বিজ্ঞান-নামরূপ-ষড়ায়তন-স্পর্শ-বেদনা-তৃষ্ণা-উপাদান-ভব-জাতি-জরামরণ।

দুঃখের এই কারণশৃঙ্খলে বারোটি জোড় আছে। যদিও এই কারণের পরপর উল্লেখের ব্যাপারে মতভেদ আছে, তবুও সাধারণভাবে এই আকারটিই গৃহীত হয়। বৌদ্ধ দার্শনিকরা বিভিন্ন নামে এই কারণশৃঙ্খলের উল্লেখ করে থাকেন। কখনও একে বলা হয় দ্বাদশনিদান, কখনও ভবচক্র। তবে একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে এখানে যে বারোটি কারণের কথা বলা হয়েছে তা কিন্তু সমকালীন নয়। যেমন অবিদ্যা, সংস্কার এই দুটি পূর্বজীবনের, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তষ্ণা, উপাদান, ভব এগুলি বর্তমান জীবনের আবার জাতি, জরামরণ ভবিষ্যৎ জীবন সংক্রান্ত। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে বৌদ্ধ মতে আমাদের অতীত জীবন, বর্তমান জীবনের নির্ধারক, বর্তমান জীবন আবার ভবিষ্যত জীবনের নিয়ন্তা।

তৃতীয় আর্যসত্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে দুঃখের নিবৃত্তি ঘটবে। এখানে কারণের নাশে কার্যের নাশ হবে। এই দুঃখনিরোধকে বৌদ্ধ দর্শনের পরিভাষায় নির্বাণ বলে বর্ণনা করা হয়।

যদি কোন ব্যক্তি কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণভাবে জয় করতে পারেন, এবং সত্যের অবিরত অনুশীলন করে যান, তাহলে তিনি জাগতিক আসক্তির দ্বারা বদ্ধ হবেন না। ফলে যা আমাদের জগতে সকল ধরণের বন্ধনের কারণ তিনি তার উর্ধ্বে অবস্থান করবেন।

তিনি মুক্ত, এবং তাঁকে বলা হয় অর্হৎ। এই মুক্ত পুরুষের অবস্থাই নির্বাণ বলে বর্ণিত। সুতরাং নির্বাণ হলো দুঃখ সমুদায়ের নিবৃত্তি, সমস্ত জাগতিক বাসনার প্রতি নিরাসক্তি, জাগতিক বস্তুর পরিত্যাগ এবং ঐ সমস্ত বস্তু প্রাপ্তিতে অনীহা।

ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'নির্বাণ' কথাটির অর্থ নিভে যাওয়া। অনেক সময় নির্বাণ বোঝাতে প্রদীপের নিভে যাওয়ার রূপক ব্যবহৃত হয়। এই ধরণের ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে কেন্দ্র করে অনেকেই নির্বাণ বলতে জীবন থেকে সর্বপ্রকার মুক্তিকে বুঝিয়ে থাকেন। কিন্তু এই মত ঠিক নয়। কারণ নির্বাণ বলতে যদি সব ধরণের অস্তিত্ব থেকে বিরতি বোঝায় তবে কখনই বলা যাবে না যে মৃত্যুর আগে বুদ্ধদেব নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেক্ষত্রে যথার্থ জ্ঞানলাভ ও বুদ্ধত্বলাভ সম্বন্ধে তাঁর বাক্যগুলি মিথ্যা হয়ে পড়বে। অতএব নির্বাণ বলতে সম্পূর্ণভাবে অস্তিত্বের নিবৃত্তি বুদ্ধদেব বোঝাতে চান নি। যদিও নির্বাণ বলতে তিনি পুনর্জন্মের নিবৃত্তি এবং ভবিষ্যৎ জীবনের সব ধরণের দুঃখ ও সমুদায়ের নিবৃত্তি বুঝিয়েছেন, তবু মৃত্যুর পর নির্বাণ প্রাপ্ত পুরুষ কোনভাবে অবস্থান করেন কি না, এই প্রশ্নে তিনি নিরুত্তর।

যদিও নির্বাণকে সাধারণত দুঃখের নাশ ইত্যাদি নঞর্থক বিশেষণ দ্বারা বর্ণনা করা হয়ে থাকে, তবুও নির্বাণের কয়েকটি সদর্থক বৈশিষ্ট্য আছে। মিলিন্দ-পন্‌হা গ্রন্থে নাগসেন নির্বাণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ নির্বাণে আমাদের সর্বপ্রকার কামনা-বাসনার অবসান ঘটে। দ্বিতীয়তঃ নির্বাণে অসংখ্য গুণের সমাবেশ দেখা যায় যেমন জ্ঞান, পবিত্রতা ইত্যাদি। অন্নের মত নির্বাণ আমাদের জীবনে অবলম্বনের বিষয়। অন্ন যেমন সকলের শক্তি বৃদ্ধি করে তেমনি নির্বাণও জীবের ঋদ্ধির বৃদ্ধি ঘটায়। অন্ন যেমন সৌন্দর্যের উৎস, পবিত্রতারূপ সৌন্দর্যের উৎস নির্বাণ। নির্বাণের কোন জন্ম নেই, বার্দ্ধক্য বা মৃত্যুও নেই। এটি অজেয়; কোন কিছুই এর অবরোধ ঘটাতে পারে না। এটি অসীম। কল্পতরুর মত এটি আমাদের সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করে আনন্দ দেয়। এটি পরিশুদ্ধ। নাগসেনের বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নির্বাণ সদর্থক বস্তু যা স্থিতি, আনন্দ, পরিশুদ্ধি ও মুক্তি বৈশিষ্ট্যযুক্ত। অর্থাৎ নাগসেনের মতেও নির্বাণ মানে সমস্ত সচেতন জীবনের অবলুপ্তি নয়, বরং পবিত্র, আনন্দ এবং সম্পূর্ণ জীবন যাপন। বুদ্ধঘোষের মতেও নির্বাণ কামনা-বাসনা, ঘৃণা, প্রবঞ্চনা থেকে অব্যাহতি। এই নির্বাণের কোন জন্ম নেই। জন্ম নেই বলেই এর ক্ষয় বা বিনাশ নেই। জন্ম, ক্ষয়, নাশ রহিত বলে এই নির্বাণ নিত্য। নিত্য হলেও নির্বাণ বৈশেষিক অণু-পরমাণুর সদৃশ নয়। কারণ অণুগুলি যতই ক্ষুদ্র হোক তাদের কারণ আছে। নির্বাণ কিন্তু কারণরহিত। দীঘনিকায় গ্রন্থে নির্বাণ অজাত, অভূত, অকৃত, অসংস্কৃত রূপে বর্ণিত হয়েছে।

বৌদ্ধগণ দুই ধরণের নির্বাণের মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন— সোপাধিশেষনিরোধ

আর অনুপাধিশেষ। যখন অর্হৎ তাঁর জীবনের সব কলুষতা, অপবিত্রতা বর্জন করে সত্য বা বোধিপ্রাপ্ত হন, অথচ তিনি দেহ ধারণ করে থাকেন, তখন তাঁর নির্বাণ সোপাধিশেষনিরোধ। কিন্তু যে অর্হতের দেহাবসান ঘটেছে তাঁর নির্বাণকে অনুপাধিশেষ-নিরোধ বলা হয়। দুই ধরণের নিরোধ বা নির্বাণ অনেকাংশে বেদান্তদর্শনের জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির অনুরূপ।

চতুর্থ আর্যসত্য হল যে এই নির্বাণ লাভের উপায় আছে। এই উপায় অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ নীতিবিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে। এই মার্গ সন্ন্যাসী এবং সাধারণ মানুষ সকলের জন্যই প্রশস্ত। এই মার্গ মুখ্যত তিনটি ভাগে বিভক্ত — শীল, চিত্ত ও প্রজ্ঞা। প্রথম বক্তব্য হল যে এই ধর্মের অনুগামীদের কতগুলি নৈতিক নিয়ম পালন করতে হবে অর্থাৎ বাহ্য আচরণ ও বাক, এই দুই-এরই সংযত ব্যবহার করা উচিত। বৌদ্ধ মতে শীলের অন্তর্ভুক্ত হল সম্মাবাচা বা সম্যক বাক, সম্যককম্মান্ত বা সম্যক্কর্ম্মান্ত ও সম্মাজীব বা সম্যকজীবন। সম্যকবাক্ বলতে বোঝায় মিথ্যাবাক্য, বিদ্বেষপরায়ণবাক্য, পরুষ ও অসার বাক্য বলা থেকে বিরত থাকা। সম্যককর্ম্মান্ত হল হত্যা, অপহরণ, ভোগবাসনাচরিতার্থকরণ সংক্রান্ত কাজ, মিথ্যাচরণ এবং প্রমত্ত আচরণ থেকে বিরত থাকা। সম্যকজীবন বলতে বোঝায় অসদুপায়ে জীবিকার্জন থেকে বিরত থেকে সৎ উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করা। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে জীবিকানির্বাহের খাতিরেও অসদুপায় অবলম্বন করা উচিত নয়।

বাহ্যিক আচরণের পরই অনুগামীদের মানা দরকার যে আচরণগুলি তা চিত্ত সংক্রান্ত, যাকে সাধারণ ভাষায়, ধ্যান এবং সমাধি বলে অভিহিত করা হয়। বৌদ্ধ দর্শনে চিত্ত সংক্রান্ত যে নিয়মগুলি বর্ণনা করা হয়েছে তা কেবল কিন্তু মনঃসংযোগ সংক্রান্ত নয়। এই বিভাগের অন্তর্গত হল সম্মাবায়াম বা সম্যক ব্যায়াম, সম্মাসতি বা সম্যক সংকল্প। সম্মাবায়াম হল সেই সমস্ত প্রচেষ্টা যার সাহায্যে মনকে বাজে চিন্তার থেকে মুক্ত রাখা যায়। কেবল বাজে চিন্তা থেকে মুক্ত রাখলেই চলবে না, আমাদের মনকে সর্বদাই সৎ চিন্তায় নিযুক্ত রাখতে হবে। সম্মাসতি বা সম্যকস্মৃতির অর্থ বস্তুর বিনাশশীল বৈশিষ্ট্য স্মরণ। অর্থাৎ ব্যক্তি যা অধিগত হয়েছেন, তা সর্বদাই স্মরণ করতে হবে। সম্মাসমাধি মানে হল চার ধরণের সমাধি — বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, স্পর্শ। প্রথম সমাধিকে বলা হয় ধ্যান। এই পর্যায়ে ব্যক্তি অন্যান্য আচরণের দ্বারা পরিশীলিত মনকে সত্য সংক্রান্ত বিতর্ক ও বিচারে নিযুক্ত রাখেন এবং সমস্ত আসক্তিমুক্ত একধরণের আনন্দ অনুভব করেন। যখন এই পর্যায়ের সমাধি লাভ ঘটেছে তখন আসে দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাধি; এই পর্যায়ে সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটে, ফলে বিচার, বিতর্কের কোন অবকাশ থাকে না। এই পর্যায়েও আনন্দ, শান্তি, ইত্যাদি ব্যাপারে চৈতন্য থাকে। তৃতীয় পর্যায়ের সমাধিতে এই

আনন্দ, শান্তি ইত্যাদি থেকে নিরাসক্তি বোঝায়। এই পর্যায়ে দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এক ধরণের আনন্দের অনুভূতি বর্তমান থাকে। চতুর্থ পর্যায়ে কিন্তু এই অনুভূতিও সম্পূর্ণভাবে বর্জিত হয়। সমাধির এই পর্যায়ে উদাসীনতা আসে এবং সমস্ত ধরণের দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে। এই পর্যায়েই জাগে যথার্থ প্রজ্ঞা।

সম্যকসঙ্কল্প বা সম্মাসঙ্কপ্প — কেবল আর্যসত্য সম্বন্ধে যথাযথ বোধ হলেই চলে না, ঐ সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের জীবন গঠন করাও কর্তব্য। তাই প্রয়োজন জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্তি বর্জন করা। অন্য ব্যক্তির প্রতি খারাপ মনোভাবাপন্ন না হওয়া এবং সমস্ত খারাপ আচরণ থেকে বিরত থাকা। এগুলিই সম্যকসঙ্কল্প।

তৃতীয় মার্গ বা প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায় সম্যকদৃষ্টি বা সম্মাদিট্ঠি থেকে। যেহেতু অবিদ্যা এবং তার ফল, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মিথ্যা জ্ঞানই আমাদের সব ধরণের দুঃখের কারণ, তাই সর্বপ্রথম যা করণীয় তা হল সম্যক বা যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা। একেই সম্যকদৃষ্টি বলা হয়। সাধারণভাবে সম্যকদৃষ্টি হল চতুরার্যসত্য সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্যকদৃষ্টি হল স্কন্ধ, ধাতু,আয়তন, ইত্যাদি সবই পরিবর্তনশীল, ক্ষণকাল স্থায়ী অনাত্ম এবং অনিত্য এই বোধ।

অতএব সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি, সম্যগাজীব, সম্যকবাক্, সম্যককর্মান্ত, সম্যকসমাধি — এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাহায্যেই নির্বাণলাভে করা যায়। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্ত দিক — নৈতিক, মানসিক, জ্ঞান লক্ষ্য করেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

বাহ্য ও মানসিক আচরণে সম্পূর্ণতা অর্জনের পর নির্বাণলাভেচ্ছু ব্যক্তি মনকে এইভাবে পরিশীলিত করেন যাতে জগতের সমস্ত বস্তুর প্রতি তার আসক্তি দূর হয়; এবং আর্যসত্য সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হয়, যার ফলে দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

মগ্গসংযুক্ত গ্রন্থে এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে 'কল্যাণমিত্র', রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে এর মাধ্যমেই যে কোন মুমুক্ষু ব্যক্তি আধ্যাত্মিক শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারেন। এই স্বাচ্ছন্দ্য হল---

(১) জন্ম, বার্দ্ধক্য, মৃত্যুজনিত দুঃখ থেকে অব্যাহতি
(২) রাগ, দোষ, মোহ প্রভৃতি থেকে অব্যাহতি
(৩) আকাঙ্খা, বিতর্ক, প্রত্যক্ষ থেকে অব্যাহতি
(৪) কামতন্থা, ভবতন্থা, বিভবতন্থা থেকে অব্যাহতি
(৫) কামনা, ভব, অবিদ্যা, এবং মিথ্যাজ্ঞান থেকে জাত অশুদ্ধি থেকে অব্যাহতি
(৬) জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্তি, মিথ্যাদৃষ্টির প্রতি আসক্তি, আচার-অনুষ্ঠান

পালনের প্রতি আসক্তি, এবং নিত্য আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস প্রসঙ্গে আসক্তি — এই সমস্ত আসক্তির থেকে অব্যাহতি

(৭) পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয় এবং তাদের বিষয়ের প্রত্যক্ষ থেকে জাত সুখ, আনন্দ, ইত্যাদির থেকে অব্যাহতি

(৮) নির্বাণের পথে যা কিছু প্রতিবন্ধক স্বরূপ যথা ঘৃণা, কামনা, বাসনা, অহংকার ইত্যাদির থেকে অব্যাহতি।

এই সমস্ত নঞর্থক সুবিধা ভিন্ন কিছু সদর্থক সুবিধা বা স্বাচ্ছন্দ্য-ও অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাহায্যে লাভ করা যায়। যদি অহংকার বিসর্জন দিয়ে বিবেক, বৈরাগ্য, নিরোধের সাহায্যে এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ যথাযথ পালন করা যায়, তাহলে মুমুক্ষু ব্যক্তি সোতাপত্তি, শকাদাগামী, অনাগামী, অর্হত্ত, প্রভৃতি স্তরে উন্নীত হতে পারেন।

সাত

বৌদ্ধ নৈতিকতায় শীলের ভূমিকা

এই চতুরার্যসত্য বা অষ্টাঙ্গিক মার্গের তত্ত্বগুলি ভালো ভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে বৌদ্ধ নৈতিকতায় শীল, চিত্ত ও প্রজ্ঞাকে নিবৃত্তি লাভের উপায় হিসেবে গণ্য করা হলেও, শীলের গুরুত্ব সর্বাধিক। পালি ভাষায় 'শীল' শব্দটির অর্থ হল চরিত্র। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে আধ্যাত্মিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে যখন 'শীল' কথাটি ব্যবহার করা হয়, তখন তার অর্থ বিশেষ ধরণের চরিত্র — সৎ চরিত্র — যাকে নৈতিক চরিত্র বলে অভিহিত করা যায়। নৈতিক চরিত্র বলতে বোঝায় সেই সমস্ত চারিত্রিক অভ্যাস যা নৈতিক নিয়মানুসারে পরিচালিত এবং নৈতিক গুণের দ্বারা ভূষিত। শীল বলতে বোঝায় কাজে ও কথায় নৈতিক নিয়মানুবর্তিতা। কিন্তু নিছক বাহ্য ক্রিয়াকলাপ, তা শারীরিক-ই হোক বা বাচনিক-ই হোক, তাকেই শীল বলা হয় না; শীল কথাটির গভীর মনোবিজ্ঞানমূলক তাৎপর্য আছে। এই দ্বিতীয় অর্থে শীল বলতে বোঝায় নৈতিক শুদ্ধতা, চরিত্রের আভ্যন্তরীণ শুচিতা যা জীবনকে নৈতিক নিয়মের দ্বারা চালিত করার ফলেই অর্জিত হয়। শীলের এই দ্বিতীয় অর্থ ক্রিয়ার ব্যক্তিকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যমূলক দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। অর্থাৎ তখন যে কোন কাজকে নিছক একটা বাহ্যিক কাজ হিসেবে না দেখে যে স্বভাবের যে বৈশিষ্ট্য থেকে এই কাজের সূচনা তার উপর আলোকপাত করা হয়।

সুতরাং বিচার করলে শীলের দুটি মাত্রা ফুটে ওঠে বাহ্যিক যার উদ্দেশ্য চরিত্রের শুদ্ধি এবং আভ্যন্তরীণ যার উদ্দেশ্য স্বভাবের শুদ্ধি। তবে এই দুটি মাত্রা বুদ্ধদেবের

উপদেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নরূপে, স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে নির্দেশিত হয় নি। তারা একই সমগ্রের দুটি দিক, এবং পরস্পরের পরিপূরক — একটার থেকে অপরটি নিঃসৃত হয় অথবা নিজের নিজের ক্ষমতানুযায়ী একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে। সুতরাং শারীরিক বা বাচনিক ক্রিয়া, বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, দুটি বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র স্বরূপের অনুষঙ্গ নয়, তারা চিত্তের অবস্থার মূর্ত প্রতিফলন; এবং এই চিত্তের অবস্থাগুলি সমস্ত ক্রিয়ার মূল উৎস। চিত্তের অবস্থা বা মানসিক অবস্থা, বিপরীতক্রমে কেবলমাত্র মনোজগতে সীমাবদ্ধ কোন স্তর নয়, পরিস্থিতি অনুসারে, চৈতন্যের ধারা থেকে উৎপন্ন হয়ে, শরীর, বাক্ এবং চিন্তার প্রকোষ্ঠ দিয়ে বাহ্য জগতের ঘটনা হয়ে পড়ে। অন্তর্জগত বাহ্যজগতের এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্যই নৈতিক চরিত্র এবং স্বভাবের শুদ্ধতা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়ে পড়ে।

বাহ্য ক্রিয়া এবং মনোজগতে তার উৎস স্বভাব, এই দুই ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হলেও আধ্যাত্মিক উন্নতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনোজগতের স্বভাব বা বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির গুরুত্ব বেশী; এবং আমাদের দৈহিক ক্রিয়া বা বাচনিক ক্রিয়া ঐ ধরণের চিত্তবৃত্তির প্রকাশক হবার জন্যই, তাদের নৈতিক গুণাগুণের প্রশ্নটি এতটা তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে ওঠে। শিক্ষার দিক থেকে কিন্তু বাহ্য ক্রিয়া এবং তাদের পরিচালক নৈতিক নিয়মাবলী প্রথমে আসে। শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে চারিত্রিক শুদ্ধতা আদর্শ হিসেবে গণ্য হয়, সূচনা হিসেবে নয়। তাই তখন আমাদের ক্রিয়াগুলি কিভাবে সৎ হয় সেই প্রশ্নটি-ই গুরুত্বপূর্ণ।

বিচার করলে বোঝা যায় যে অনাদিকাল থেকে আমাদের চৈতন্য প্রবাহ লোভ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদির দ্বারা আচ্ছন্ন এবং এই রিপুগুলিই আমাদের অধিকাংশ চিন্তা, অভ্যাস, ক্রিয়াকলাপের উৎস। এদের প্রভাবেই আমরা জগত সম্বন্ধে বা অপর ব্যক্তির সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধরণা গঠন করে থাকি। কিন্তু এক মুহূর্তে এই সমস্ত দোস দূর করে কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে আধ্যাত্মিক শুদ্ধির পরিপূর্ণতায় উপনীত হওয়া অসম্ভব। তাই প্রয়োজন ধীরে ধীরে চিত্তের অশুদ্ধি নাশ।

যেহেতু বাহ্য ও আন্তর জগত পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, তাই একটাকে অপরটির শুদ্ধিকরণের উপায় হিসেবে অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন আমাদের চিত্তবৃত্তির প্রকাশ ঘটে বাহ্য ক্রিয়া বা বাক্যপ্রয়োগের মাধ্যমে, তেমনি, কোন বিশেষ কর্ম করা থেকে নিবৃত্ত থাকা বা কোন বিশেষ কর্মের অনুষ্ঠান চিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং সেই বিষয়ক চিত্তের যে মূল প্রবণতা তার পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারে। যেমন ঘৃণা, লোভের দ্বারা আচ্ছন্ন মানসিক বৃত্তির প্রভাবে ব্যক্তি হিংসাকর্মে লিপ্ত হন অথবা চুরি করেন অথবা মিথ্যা কথা বলেন। আবার বিপরীতক্রমে হিংসা থেকে, চুরি করা বা মিথ্যা বলা থেকে বারংবার নিবৃত্ত করার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিচিত্তের এইলোভাদি রিপুগুলি দমন করে

দয়া, সন্তোষ, সততা, সত্যতা প্রভৃতি গুণগুলি বিকশিত করা সম্ভব। তাই, যদিও নৈতিক শুদ্ধতা অর্থে শীল আধ্যাত্মিক উন্নতির সূচনাবিন্দু হতে পারে না, তবুও নৈতিক মানদন্ড অনুযায়ী চরিত্র গঠন করার মধ্য দিয়ে শীল যে কোন নৈতিক আলোচনার লক্ষ্যবিন্দু হতে পারে।

আট

বৌদ্ধমতে ক্রিয়া

শীলের এই অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী মাত্রা, যার প্রকাশ ঘটে অন্তরের শুদ্ধি এবং বাহ্য ক্রিয়া উভয়ের মধ্য দিয়ে, তাদের যোগসূত্র হল ইচ্ছাশক্তি, যার পারিভাষিক নাম 'চেতনা'। 'চেতনা' এমন একটি মানসিক উপাদান যা সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত চেতনক্রিয়ার মধ্যে অব্যবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। এই উপাদানের প্রভাবেই আমাদের অভিজ্ঞতা বা ক্রিয়াকলাপ উদ্দেশ্যমুখী হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেবের মতে সমস্ত কর্মই (এখানে কর্ম এবং ক্রিয়া সমার্থক রূপে ব্যবহৃত) চেতনা — 'চেতনাহং ভিক্ষবো কম্মং বদামি' (অঙ্গুত্তরনিকায়)। বুদ্ধদেবের বচন অনুসরণ করেই বৌদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষ ক্রিয়ার লক্ষণ দিয়েছেন ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত সংক্রান্ত ইচ্ছাশক্তি -- 'কম্মং নাম কুশলাকুশল চেতনা।'

এখানে এক ধরণের ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। মনে হতে পারে যে যেহেতু কর্ম বলতে প্রত্যেক ক্রিয়ার পিছনে বর্তমান চেতন উপাদানকে বোঝান হচ্ছে, তাই কর্ম যেন নিছকই মানসিক। বৌদ্ধগণের কিন্তু এই ধরণের অভিপ্রায় নেই। ক্রিয়া বলতে তাঁরা চেতনা ও চেতয়িত্বা এই দুই প্রকারের ক্রিয়াকেই বোঝান। এর মধ্যে চেতনা সম্পূর্ণ মানসিক — যে কোন ক্রিয়ার মানসিক দিক, যাকে সোজা ভাষায় অভিপ্রায় বলা যায়। কিন্তু চেতয়িত্বা ক্রিয়া হল শারীরিক বা বাচনিক যা এই কাজটা এইভাবে করা হবে এই ধরণের চিন্তা থেকে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ চেতয়িত্বা ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছাশক্তি থেকে জন্মায়। এই অর্থে এই চেতয়িত্বা ক্রিয়াকে ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলে অভিহিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ বৌদ্ধ মতে কর্ম কেবল ঐচ্ছিক ক্রিয়া নয়, ক্রিয়ার পিছনে নিহিত ইচ্ছাশক্তিও কর্ম। চেতনা এবং চেতয়িত্বা এই উভয় ধরণের ক্রিয়ার মধ্যেই চিত্তবৃত্তি বা ইচ্ছা বর্তমান থাকে। যতক্ষণ না কোন ক্রিয়ার মধ্যে এই ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ পাচ্ছে ততক্ষণ কোন ক্রিয়াই কর্ম পদবাচ্য বলে গৃহীত হবে না।

যদিও চেতনা বা ইচ্ছাশক্তি সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যেই বর্তমান, সমস্ত ক্রিয়াই নৈতিক হিসেবে গণ্য হয় না। অর্থাৎ চেতনা বা ইচ্ছাশক্তি কর্মের নির্ধারক হলেও, ক্রিয়ার নৈতিক গুণের নির্ধারক নয়। ইচ্ছাশক্তি যেরকম 'মূলে'র সঙ্গে যুক্ত হবে, সেই অনুযায়ী ক্রিয়া

নৈতিক গুণসম্বলিত হবে। এই 'মূল' দু প্রকারের — অকুশল এবং কুশল। অকুশল এবং কুশল বলতে সাধারণভাবে মন্দ এবং ভালো বলতে যা বোঝান হয় তাই বলা হয়েছে। অকুশল মূল হল লোভ, মোহ, হিংসা; কুশল মূল হল অহিংসা, অ-লোভ, অ-মোহ। যদিও কুশল মূলগুলিকে, নঞর্থক ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে বস্তুত তার দ্বারা সদর্থক নৈতিক গুণাবলী বোঝানো হয়েছে, যথা উদারতা, দয়া, করুণা, মৈত্রী, ইত্যাদি। যখন চেতনা অকুশল মূলযুক্ত হয় তখন দেহ এবং বাক্যের মাধ্যমে অকুশল ক্রিয়া সম্পাদিত হয় যথা হত্যা করা, চুরি করা, মিথ্যা বলা, পরুষ বাক্য বলা ইত্যাদি। এভাবেই মনোজগতের দোষত্রুটি বাহ্যজগতের ক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

যদিও এই রিপুগুলি বা মনোজগতের এই অকুশল বৃত্তিগুলি খুবই শক্তিশালী, কিন্তু তারা সংশোধনের অযোগ্য নয়। যদি অকুশল চেতনাকে বলবত্তর কুশল চেতনার দ্বারা উচ্ছিন্ন করা যায়, তাহলে মনোজগতের সমস্ত বৃত্তিকেই সমূলে পরিবর্তন করা সম্ভব। চেতনার এই পরিবর্তন সাধন করার জন্য প্রয়োজন নৈতিক বিধানগুলি স্বেচ্ছায় অনুসরণ করা, যেমন মন্দ বা খারাপ কোন কাজ থেকে বিরত থাকা এবং ভালো বা সৎ কাজের অনুষ্ঠান করা। যখন আমাদের খারাপ কাজ করার ইচ্ছাকে সংযত করে ভালো কোন কিছু করার ইচ্ছাকে জাগ্রত করা যাবে, তখন-ই আমাদের কথায়, কাজে এক ধরণের পরিবর্তন সূচিত হবে যার প্রভাবে আমাদের চরিত্রের নৈতিক উন্নতি সাধিত হবে।

অকুশল ক্রিয়ার যেমন অকুশল মূলের সঙ্গে যোগ থাকে, তেমনি কুশল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করার অর্থই হল কুশল মূলের প্রাধান্য স্বীকার করা। কুশল মূল এবং অকুশল মূল যেহেতু সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ চরিত্রের এবং দুটি বিরুদ্ধ চরিত্রের বস্তু সহাবস্থান করতে পারে না, তাই অকুশল ক্রিয়ার পরিবর্তে যদি কুশল ক্রিয়া বারংবার অনুষ্ঠান করা হয়,তবে তার অর্থ হল অকুশল মূলকে অপসারিত করে কুশল মূলের প্রতিষ্ঠা। যদি এই কুশল মূলের অবিরত প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহলে সেই মূল চিত্তশুদ্ধি করবে বা চিত্তে মন্দ গুণগুলি আবৃত করে জ্ঞান, প্রীতি, উদারতা ইত্যাদি সদ্‌গুণের প্রাধান্য ঘটাবে। এইভাবে বারবাব সৎকর্ম বা কুশল কর্মের অনুষ্ঠান চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায়, যার ফলে যে চরিত্র প্রাথমিকভাবে ছিল নৈতিক-অনৈতিক স্তরে দোদুল্যমান, তাই হয়ে ওঠে পরম শুদ্ধ, যেখানে মন্দ কিছু করার প্রবৃত্তি-ই আর জাগে না। সোজা কথায়, বৌদ্ধ মতে কোন কাজের ভালো-মন্দ বিচার করার সময় সেই কাজের ইচ্ছাশক্তি-ই আসল। যদি ইচ্ছাশক্তি সৎ হয়, ভালো হয়, তাহলে আচরণ বা কাজ ভালো হতে বাধ্য। এই ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে কাজের সম্বন্ধ এতই ওতঃপ্রোত যে ভালো কাজের অনুষ্ঠান চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূর করে চিত্তকে শুদ্ধ করে তুলবে।

যদিও ইচ্ছাশক্তি বা চেতনা ব্যক্তির চারিত্রিক পরিবর্তনের মূল উপকরণ, ইচ্ছাশক্তি স্বয়ং

অনির্ণীত স্বভাবের হওয়ায় তাকে কুশল বা সৎ পথে চালনা করার জন্য অপর কোন চালিকা শক্তি স্বীকার করতে হয়। অর্থাৎ বৌদ্ধগণের দৃষ্টিভঙ্গি কান্টের 'সদিচ্ছা' (good-will) ধারণার অনুরূপ। কান্টের মতে যেমন সদিচ্ছা বুদ্ধি দ্বারা চালিত হওয়ায় শুদ্ধ, তেমনি বৌদ্ধগণ মনে করেন যে ইচ্ছাশক্তি শুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যতক্ষণ ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি অজ্ঞানে আবৃত থাকে, ততক্ষণ সম্ভাবনা থেকে যায়যে সাধু ইচ্ছাও অসাধু কোন কর্ম বা ধ্বংসাত্মক কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হবে। যাতে ব্যক্তির চেতনা সৎপথে চালিত হয়. কোন অসৎ উপাদানের দ্বারা পরিচালিত না হয়, তাই বুদ্ধদেব অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে শুধু শীল সংক্রান্ত মার্গ বর্ণনা না করে চিত্ত সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান করেছেন।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে শিক্ষার যে ক্রম ফুটে উঠেছে তাতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এর উদ্দেশ্য একই সঙ্গে মানব মনের নিন্দনীয় ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি ধ্বংস করা এবং যা কিছু সৎ ও শুদ্ধ তার প্রতিষ্ঠা করা। এইভাবে বিচার করলে বলা যায় যে বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ অনাবশ্যক, প্রয়োজনাতিরিক্ত ত নয়ই, সৎ কর্ম সম্পাদনের আবশ্যিক পথনির্দেশ। এগুলি নৈতিক শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ইচ্ছাশক্তির সহায়তায় যখন এগুলি প্রয়োগ করা হয়, তখন তারা শুদ্ধির অন্যতম মাধ্যমে পর্যবসিত হয়।

নয়

কাজের ভালো-মন্দ বিচার

বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোন ক্রিয়া ফল-নিরপেক্ষভাবে স্বতই ভালো বা মন্দ,কুশল বা অকুশল বলা যায় না। নৈতিকতা সর্বদাই একটা লক্ষ্যপ্রাপ্তির উপায় — নিম্নস্তরের কর্ম ইহজীবনে বা পরজীবনে সুখপ্রাপ্তির উপায়; উচ্চপর্যায়ের ক্রিয়া পুনর্জন্ম বা জন্মমৃত্যুচক্রের হাত থেকে পূর্ণ নিবৃত্তির উপায়। এক কথায় বলা যায় সৎ বা ভালো তাকেই বলা হবে যা ব্যক্তিকে সুখের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে, আর মন্দ তাই যা দুঃখের আবহ।

মন্দ কাজের পরিচয় দিতে গিয়ে ধম্মপদ গ্রন্থে বলা হয়েছে—

> ন তং কম্মং কতং সাধু যং কত্বা অনুতপ্পতি।
> যস্‌স অস্‌সমুখো রোদং বিপাকং পটিসেবতি।। ৫.৬৮

ভালো কাজের পরিচয় —

> তং চ কম্মং কতং সাধু যং কত্বা নানুতপ্পতি।
> যস্‌স পতীতো সুমনো বিপাকং পটিসেবতি।। ৫.৬৮

তবে, এর থেকে যদি এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে বৌদ্ধ দার্শনিকরা ফল দেখে কাজের নৈতিকতা বিচার করে থাকেন তাহলে ভুল হবে। তাঁরা কখনই কাজকে যান্ত্রিক ক্রিয়া হিসেবে দেখেন না। তাদের মতে কাজ সর্বদাই মানসিক — আমাদের ইচ্ছাশক্তির প্রতিফলন ঘটে আমাদের ক্রিয়ায়। তাই ইচ্ছাশক্তির শুদ্ধতাই গুরুত্বপূর্ণ। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার ফল শুভ বা অশুভ যাই হোক না কেন, তা পুণ্য বা পাপের সঞ্চার করতে পারে না। অন্য দিকে সম্পূর্ণ শুভ অভিপ্রায় নিয়ে যে কাজ করা হয় তার ফল আপাতদৃষ্টিতে মন্দ হলেও তা পুণ্যের কাজ বা ভালো কাজ বলে বিবেচিত হবে। বাবা-মা যখন সন্তানের ভাবী মঙ্গলের কথা ভেবে সন্তানকে তার অন্যায় আচরণের জন্য শাস্তি দেন, তখন বাবা-মার সেই কাজ কখনও মন্দ বলে গণ্য হয় না। অনুরূপভাবে তথাগত নিজেই এমন কাজেব অনুষ্ঠান করতে পারেন যা আপাত হিংসাত্মক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যেহেতু তাঁর অভিপ্রায় সর্বদাই সৎ তাই তার সেই কাজ কখনই পাপজনক বলে গৃহীত হবে না। জৈনমতের সঙ্গে বৌদ্ধ মতের তফাত এখানেই যে জৈনমতে যে কোন কর্মই জীবকে বদ্ধ করে, কিন্তু বৌদ্ধ মতে সৎ অভিপ্রায় দ্বারা চালিত কাজ জীবের বন্ধনের হেতু হয় না। তাই কাজের ভালো-মন্দ বিচারের মাপকাঠির (standard) প্রশ্ন যদি ওঠে তাহলে বলতে হয় বৌদ্ধগণ উপযোগিতাবাদে (utilitarianism) বিশ্বাসী নন; তাঁদের মত অনেকটাই সজ্ঞাবাদ (intuitionism)-এর অনুরূপ।

অপর ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির আচরণের প্রসঙ্গে বৌদ্ধ দার্শনিক আরেকটি ব্যাবহারিক মাপকাঠির কথা বলে থাকেন। তাঁদের বক্তব্য হল যে অপর ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির সেই আচরণই করণীয় যা ব্যক্তি নিজের ক্ষেত্রে করা যায় বলে মনে করেন। অর্থাৎ এখানে অপর ব্যক্তিকে নিজের সদৃশ ভেবে কাজ করা উচিত — 'অত্তানম্ উপমং কত্বা'। এইভাবে যদি কাজ করা হয় তাহলে স্বার্থপর অভিসন্ধি বর্জন করা সম্ভব হবে। ব্যক্তি যেহেতু নিজের সদৃশ ভেবে অপরের সঙ্গে আচরণ করছেন, তাই কখনই তিনি এমন কোন কাজ করতে পারেন না যা অন্যকে আঘাত দেবে বা কষ্ট দেবে। কারণ অন্যকে আঘাত করতে গেলেই ব্যক্তির মধ্যে এই চিন্তা আসবে যে ঐ ব্যক্তির স্থানে সে নিজে থাকলে ঐ আঘাত তার কেমন লাগত। এইভাবে যদি কেউ কাজ করেন তাহলে তার পক্ষে কখনও কোন অন্যায় বা পাপ আচরণ করা সম্ভব নয়।

দশ

বৌদ্ধ কর্মবাদ

বৈদিক মতে মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের এক অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে। এই সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ তার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায়

এবং ঈশ্বর সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করে থাকেন। অর্থাৎ মানুষ তার প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ঈশ্বরেব স্থান বৈদিক দর্শনে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যক্তি তার কৃত কর্ম অনুযায়ী উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হচ্ছে কি না, তার রক্ষকও তিনি। কেউ যদি এই নিয়ম লঙঘন করতে চায় তাকে শাস্তি তিনি দিয়ে থাকেন, তেমনি আবার ব্যক্তির প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হলে তাঁদের শাস্তি মকুব করে দিতে পারেন, অথবা অন্তত লাঘব করে দিতে পারেন। বৌদ্ধ দর্শনে কর্মবাদ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টি পাই। সেখানে মানুষ সম্পূর্ণই তাঁর নিজের উপর নির্ভরশীল। কর্ম নিয়ম নৈর্ব্যক্তিক ও অলঙঘ্য। এই নৈতিক নিয়ম আপন শক্তির প্রভাবেই সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং এই সক্রিয়তা দেবতা বা অন্য কোন সত্তার উপর নির্ভরশীল নয়। বৌদ্ধদর্শনের নাস্তিকতা ও যাগযজ্ঞ পবিহার এই দর্শনে একদিকে কর্মকে স্বয়ংক্রিয় নিয়মে পরিণত করেছে, অপরদিকে ব্যক্তির মর্যাদার উন্নতি ঘটিয়েছে। ব্যক্তি তার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য বাহ্য কোন শক্তির উপর নির্ভরশীল নয় — সে নিজেই তার আপন ভাগ্যের নিয়ন্ত্রা। ব্যক্তি যা, তার ভালো অবস্থা বা মন্দ অবস্থা সবই তার কৃতকর্মের পরিণাম এবং তার ভবিষ্যৎ কি হবে সেটাও সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তার কর্মের উপর। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে একজন নৈতিক কর্তা, যে তার বাক্য, চিন্তা, ক্রিয়া সব কিছুর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। প্রত্যেকটি ক্রিয়াই তার আপাতদৃশ্য ফলের অতিরিক্ত সম্ভাব্য শক্তি উৎপন্ন করে যা ভবিষ্যতে উপযুক্ত সময়ে ফলপ্রদান করে।

জৈন দার্শনিকরাও কর্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা নিজেদের কর্মবাদী ও ক্রিয়াবাদী বলে অভিহিত করেন। 'কর্ম' এবং 'ক্রিয়া' এই শব্দ দুটি এদের মতে ভিন্ন অর্থের দ্যোতক — প্রথমটি হল বন্ধনের হেতু যা জীবের প্রকৃত স্বরূপ আচ্ছন্ন করে তাকে সংসারে আবদ্ধ করে রাখে আর দ্বিতীয়টি হল মানুষের প্রচেষ্টা যার সাহায্যে জীবের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় এবং জীব তার স্ব-স্বরূপে অবস্থান করতে পারে। জৈনগণ মনে করেন যে ব্যক্তি মূলত তার কৃতকর্মের ফলসমষ্টি এবং তার ভবিষ্যতের বিধাতা। প্রত্যেকটি জীবকেই তার নিজের কর্মফল ভোগ করতে হয় এবং তার ফলের ভাগীদার অপর কেউ হতে পারে না! জৈনমতে কর্মের প্রকৃতি হল জড়। প্রত্যেকটি কাজই তার উপযুক্ত ফল উৎপন্ন করবে — সেই কাজ সচেতনভাবে করা হয়েছে না বিশেষ পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলকভাবে করা হয়েছে, ফলোৎপাদনের ব্যাপাবে তাতে কিছু যায় আসে না। কর্মের সঙ্গে জীবের সংযোগ-ই জীবের দুঃখকষ্টের হেতু। নতুন কর্মের সমাগম এবং প্রাক্তন কর্মের প্রভাব বন্ধ কবতে পারলেই জীবের মুক্তি সম্ভব। প্রথমটিকে বলা হয় সংবর ও দ্বিতীয়টিকে নির্জর। এই সংবর ও নির্জরের জন্য জৈনগণ অত্যন্ত কঠোর কষ্টদায়ক কৃত্রিম পদ্ধতি অবলম্বনের কথা বলেন যা এককথায় শরীরের নির্যাতন ছাড়া আব কিছু না।

জীব কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হলেও কিছু পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা এই বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন — জৈনদের এই অভিমত বৌদ্ধ দার্শনিকরা স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন যে, ব্যক্তির জীবনে কর্মের প্রভাব সর্বোচ্চ এবং কোনভাবেই একটি কর্মকে তার উপযুক্ত ফলপ্রদান থেকে বিচ্যুত করা যায় না। মানুষের কোন প্রচেষ্টাই কর্মপ্রবাহকে স্তব্ধ করতে পারে না বা অনুপযুক্ত কর্মকে উপযুক্ত ফলপ্রদানের যোগ্য করে তুলতে পারে না। দীঘনিকায় গ্রন্থে বলা হয়েছে — যদিও জ্ঞানী এবং মূর্খ উভয়ই বিশ্বাস করে থাকেন যে পুণ্যের দ্বারা বা কর্তব্য পালনের দ্বারা অথবা তপশ্চর্যার দ্বারা স্ব-অর্জিত কর্মকে ইচ্ছানুযায়ী ফলপ্রদায়ী করা যাবে, প্রকৃতপক্ষে দুজনেই সমানভাবে ভ্রান্ত, কারুর পক্ষেই কখনও তা করা সম্ভব নয়।

এগারো

কর্মবাদ ও ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা

এখন মনে হতে পারে যে জগতে কর্মের স্থান যদি সর্বোচ্চ হয় এবং কর্মফলভোগ যদি অনিবার্য হয় তাহলে নির্ধারণবাদ (determinism) অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। সমস্ত কিছুই যদি পূর্বনির্ধারিত হয় তাহলে জগতে নৈতিকতার বা নৈতিকত্ববোধের কোন অবকাশ থাকবে না। নৈতিকতা বা নৈতিক দায়িত্ববোধের প্রশ্নটি নির্ভর করে ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতার উপর। যদি কর্মবাদের প্রাধান্য স্বীকার করা হয় তাহলে ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা সম্ভব নয়।

কর্মবাদের গুরুত্ব স্বীকার করা সত্ত্বেও ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা বা কাজের স্বাধীনতা স্বীকার করা বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে অসম্ভব নয়। প্রত্যেকটি ক্রিয়ার মধ্যে 'চেতনা' বা ইচ্ছাশক্তির উপাদান স্বীকার করা বা অষ্টাঙ্গিক মার্গের অন্যতম হিসাবে 'সম্মা সংকপ্প' স্বীকার করার মধ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে বৌদ্ধগণ মানুষেব ইচ্ছাশক্তিকে কর্মসম্পাদনেব ব্যাপাবে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে থাকেন।

বৌদ্ধ মতে ক্রিয়া মানেই ঐচ্ছিক ক্রিয়া এবং ইচ্ছা মানেই পছন্দ-অপছন্দ — একাধিক সম্ভাবনার মধ্য থেকে ব্যক্তির উদ্দেশ্য, কার্যকারিতার ভিত্তিতে কোন একটিকে বেছে নেওয়া। তাই যখনই নৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কোন ক্রিয়া সম্পাদনের প্রশ্ন ওঠে, তখন তার মধ্যে কর্তার সিদ্ধান্ত নিহিত থাকবে। যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বশর্ত হল ব্যক্তির সামনে একাধিক বিকল্প সম্ভাবনা থাকা। এই সমস্ত সম্ভাবনার গুণগত বা চরিত্রগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এদের দুভাগে ভাগ করা যায় — কুশল বা ভালো কোন কিছু করার সম্ভাবনা এবং অকুশল বা মন্দ কোন কিছুর সম্ভাবনা। একটি উন্নতির পথের চালক, অপরটি

ধ্বংসের পথের। সুতরাং আমাদের উন্নতি বা অবনতি সমস্তই আমাদের পছন্দের উপর নির্ভরশীল — তা বাহ্য কোন শক্তির — সে শক্তি জড় বা আধ্যাত্মিক যাই হোক না কেন — উপর নির্ভর করে না। আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্তই আমাদের ভবিষ্যতের নিয়ামক, আমাদের নিয়তির নিয়ন্ত্রা। সুতরাং কর্মবাদ স্বীকার এবং ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা মানার মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই।

প্রকৃতপক্ষে নির্ধারণবাদ ও স্বাধীনতা দুটি বিরুদ্ধ, এই ধারণাই ভুল। স্বাধীনতা মানে কখনই সমস্ত কিছু থেকে মুক্তি হতে পারে না। স্বাধীনতা স্বীকারের প্রয়োজন কর্মের উদ্দেশ্যর জন্য। একটা ক্রিয়া তখনই প্রকৃত ক্রিয়া হয়ে ওঠে যখন তাতে স্বাধীনতার উপাদান থাকে। আবার.অন্য দিকে তার মধ্যে নিয়ন্ত্রণবাদের উপাদানও থাকবেই। যখনই কোন কর্মের অনুষ্ঠান করা হচ্ছে তখন তা বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ সময়ে, বিশেষ পাত্রের উপর নির্ভরশীল হওয়ায়, কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়বেই। সুতরাং কর্মবাদ স্বীকার করলেও, নির্দ্ধারণবাদ মেনে নিতে ও ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করতে কোন অসুবিধা বৌদ্ধ দার্শনিকরা অনুভব করেন না।

বারো

উপসংহার

সমগ্র আলোচনার ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে বৌদ্ধ মতে নৈতিক আদর্শ হল পরিস্থিতি নির্বিশেষে সমস্ত নৈতিক অনুশাসন যথাযথভাবে পালন করা। প্রকৃত নৈতিক হয়ে ওঠার জন্য শীল সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত পূরণ করা দরকার যার জন্য সন্ন্যাসীর জীবন বা বৌদ্ধ পরিভাষায় 'অনাগার' জীবন একান্তভাবে প্রয়োজন। বুদ্ধদেব নিজে শ্রমণকে যথার্থ নৈতিকতার উপযোগী বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে তিনি সংসারের জীবনকে, 'সাগার' জীবনকে মুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে মনে করেন নি। বৌদ্ধ সংঘ চার ধরণের লোক নিয়ে গঠিত হত — ভিক্ষু, ভিক্ষুণি, গৃহী ও নারী। এই চার ধরণেব ব্যক্তির সুশৃঙ্খলিত জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে সংঘের শরীর গঠিত হয়েছে বলে মনে হয় অর্থাৎ সংঘ গঠনের ব্যাপারে এই চার ধরণের ব্যক্তির মধ্যে কোন ভেদ করা হত না। এমনকি কোন কোন উপদেশে বুদ্ধদেব একথাও বলেছেন যে শুদ্ধতা উপলব্ধির পর প্রাকৃতজন ও ভিক্ষুর মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। নৈতিক ব্যক্তির স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ব্রহ্মজালসূত্রের ভাষ্যকার বলেছেন — তার মাতা হল প্রজ্ঞা, তার পিতা হল উপায়, আত্মীয় হল সমস্ত জীব, বাসস্থান হল শূন্যতা, স্ত্রী হল প্রীতি, কন্যা মৈত্রী, পুত্র সত্য; স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-পরিজন থাকা সত্ত্বেও তার পারিবারিক জীবন তাকে সংসারে

আবদ্ধ করে রাখে না। এইভাবে সংসারে থেকে নিজেকে নির্লিপ্ত, উদাসীন রাখার আদর্শ পালন করার কথা বৌদ্ধশাস্ত্রে বলা হয়েছে। এই উপায়েই প্রাকৃতজনের নৈতিকতা ও আদর্শ নৈতিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব।

টীকা ও তথ্যপঞ্জী

১। 'Religion is essentially a doing and doing what is moral.' F H Bradley, *Ethical Studies*, পৃ. ৩১৪

২। ধম্মপদ, ১৪, ১৮৩-৮৫ শ্লোক

৩। নিধীনং'ব পবত্তারং যং পস্‌সে বজ্‌জদস্‌সিনং।
নিগ্‌গয়্‌হবাদিং মেধাবিং তাদিসং পণ্ডিতং ভজে।
তাদিসং ভজমানস্‌স সেয্যো হোতি ন পাপিয়ো।। ধম্মপদ ৬. ১

ধম্মপদ ও ভগবদ্গীতা — একটি তুলনামূলক আলোচনা

তারা চট্টোপাধ্যায়

মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে কথিত হয়েছে ভগবদ্গীতা-কৃষ্ণার্জুন সংবাদ। গীতা আবহমান কাল ধরে ভারতবর্ষে আদৃত হয়েছে, কারণ সাধারণ মানুষ নৈতিক আদর্শের সন্ধান পান এই গ্রন্থে ; নৈতিক সমস্যা সমাধানের পথ প্রদর্শক গীতা। হিন্দু দার্শনিকেরা ও ধর্মপ্রচারকেরা নিজেদের জীবন দর্শনের সঙ্গে সুসমঞ্জস করে গীতাকে বুঝেছেন এবং সাধারণ্যে গীতার বক্তব্য পরিবেশন করেছেন। হিন্দুধর্মের আকরগ্রন্থ চতুর্বেদ হলেও, সর্বাপেক্ষা সুপ্রচলিত গ্রন্থ হচ্ছে গীতা। এইরকম বৌদ্ধধর্মের আকরগ্রন্থ ত্রিপিটক। তারমধ্যে সূত্রপিটক পাঁচটি নিকায়ে বিভক্ত, যার অন্যতম খুদ্দক নিকায়। এই নিকায়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের সমাহার, যার মধ্যে দ্বিতীয়টি ধম্মপদ। ধর্মাধার মহাস্থবির বলছেন যে বইটি সুপ্রাচীন, বুদ্ধদেবের নির্ভেজাল উপদেশাবলী সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। তিনি বলছেন যে 'ধম্ম' ও 'পদ' এই দুটি শব্দের বিভিন্ন অর্থ বৌদ্ধসাহিত্যে প্রচলিত আছে, যা অনুসরণ করলে 'ধম্মপদ' নামটির অর্থ দাঁড়ায়, ধর্মোপলব্ধির পথ বা পুণ্যের পথ।[১] আবার হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 'ধম্মপদ' শব্দটির সহজ, সরল অর্থ করেছেন ধর্ম, অর্থাৎ বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম, সম্পর্কীয় পদ বা কবিতা।[২] সুতরাং ভগবদ্গীতায় ও ধম্মপদে দু'জন মহাপুরুষ আদর্শ জীবন সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। দুটি গ্রন্থই মোটামুটি সমসাময়িক-খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত। দুটির জন্যই এই উপমহাদেশবাসী শ্রোতা গণ্য হয়েছেন। সার্ধ দ্বিসহস্র বছরেও গ্রন্থ দুটি তাদের তাৎপর্য হারায়নি—তাদের মূল্য শুধুমাত্র ঐতিহাসিক নয়, তারা জীবন্ত। সুতরাং তাদের তুলনামূলক আলোচনা করবার অবকাশ আছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে বই দুটির উপদেশাবলীর মধ্যে একান্ত বিরোধ থাকবে। কারণ প্রচলিত হিন্দুধর্মের দোষগুলি প্রত্যক্ষ করে, সেগুলি নিরাকরণের জন্য নতুন, ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন বুদ্ধদেব। তাই দর্শনের চলতি অভিধায় হিন্দুধর্ম তথা দর্শন হচ্ছে বেদানুসারী বা আস্তিক, যেখানে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন হচ্ছে বেদবিরোধী বা নাস্তিক। গীতা হিন্দুধর্মের মুখ্যগ্রন্থ এবং ধম্মপদ বৌদ্ধধর্মের প্রতিরূপস্বরূপ, সুতরাং তাদের বক্তব্যকে পরস্পর বিরোধী মনে করা নিতান্তই স্বাভাবিক। এ ছাড়া গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অর্জুনকে যুদ্ধে বা হিংসায় প্রণোদিত করা, যেখানে ধম্মপদ হচ্ছে হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীতে অহিংসার বাণীর আবাহক ও প্রচারকের উপদেশ—অহিংসা পরম ধর্ম। এখানে ক্ষুদ্র একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধম্মপদে দণ্ডবর্গে বুদ্ধের উপদেশ অত্তানং উপমং কত্বা

ন হনেয্য নিজের সঙ্গে তুলনা করে কাহাকেও আঘাত করবে না বা হত্যা করবে না।[৩] ব্রাহ্মণবর্গে আদর্শ পুরুষের বর্ণনায় আছে যে তিনিই ব্রাহ্মণ যিনি কাহাকেও হনন করেন না বা আঘাত করেন না।

অন্যদিকে গীতায় কৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়েছেন যে ধর্মযুদ্ধে যোগদান করা তাঁর কর্তব্য, এবং কর্তব্যচ্যুতি মহাপাপ। কর্তব্য বুদ্ধিতে কাহাকেও হনন করলে পাপ হয় না, কারণ শেষবিচারে আত্মা অব্যয়, অপরিবর্তনশীল, তিনি কাহাকেও হনন করেন না, কাহার দ্বারা হতও হন না - নায়ং হন্তি ন হন্যতে।[৪] গ্রন্থগুলির গভীরে অনুপ্রবেশ করলে, তারপরও এই মত সমর্থন যোগ্য থাকবে কি না তা এই প্রবন্ধে বিচার্য। কিন্তু উপরোক্ত উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও, একটি কথা মনে রাখা দরকার যে শুধুমাত্র পল্লব গ্রহণ করে আমরা যদি গ্রন্থ দুটির সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করি, তবে আশ্চর্য সাদৃশ্য চোখে পড়বে। তাদের উপদেশাবলী পরস্পর সদৃশ, আদর্শ পুরুষ একই ভাবে চিত্রায়িত হয়েছেন, পরিত্যাজ্য রিপুগুলি পরস্পরের অনুরূপ, এমন কি জীবনের লক্ষ্য পরমপদকেও তাঁরা এক রকমই দেখেছেন। হয়ত একই আধ্যাত্মিক মৃত্তিকা থেকে উত্থিত এবং একই আবহাওয়াতে পরিপুষ্ট হবার দরুণ এই সাদৃশ্য সৃষ্ট হয়েছে। এই সাদৃশ্যগুলি একটু বিশদ করে আলোচনা করা যেতে পারে।

গীতা এবং ধম্মপদ কেহই বিধিবদ্ধ পূজার্চনা এবং আনুষ্ঠানিক ধর্মের কথা বলেননি। আদর্শ জীবন হচ্ছে আন্তরিক ভাবে সত্যের সাধনা ও আচরণ, কৃত্রিম প্রাণহীন আচার পালন নয়। ভাবের ঘরে চুরি করবার অবকাশ নেই, যা কিছু করণীয় তা কায়-মনো-বাক্যে পালনীয়। ধম্মপদে বিভিন্ন বর্গে এই চিন্তা ফিরে ফিরে এসেছে. সুধীর ব্যক্তির চিত্ত-বাক্য-কর্ম সবই শান্ত হয়।[৫] মার্গবর্গে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন বাক্যকে রক্ষা করবে, মনকে সংযত করবে, শরীরের দ্বারা অকুশল কাজ করবে না।[৬] অন্যত্র রয়েছে যে যিনি সংযত-কায়, সংযত-বাক্ ও সংযতমনা তিনিই সুসংযত।[৭] আদর্শ পুরুষের লক্ষণ বিচারে বুদ্ধ বলছেন যে, যে ভিক্ষু শান্তকায়, শান্তবাক্, শান্তচিত্ত ও সুসমাহিত তিনিই উপশান্ত।[৮] শেষ বর্গে—কায়মনোবাক্যে যিনি সংযত, তিনিই ব্রাহ্মণ।[৯] ঠিক একই ভাবে গীতার শেষ অধ্যায়ে আদর্শ পুরুষে প্রসঙ্গে, অন্যান্য বিশেষণের সঙ্গে উক্ত হয়েছে, যে তিনি 'যত বাক্ কায় মানসঃ'।[১০] সপ্তদশ অধ্যায়ে তপস্যার বিশ্লেষণ করছেন গীতাকার। দেব, দ্বিজ, গুরু (পিতা, মাতা, আচার্য) ও তত্ত্ববিদ্গণের পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীর তপ। অন্যের মনোদুঃখনিবারক, সত্য, প্রিয় (শ্রবণকালে শ্রোতার সুখকর) হিত (পরিণামে সুখকর) বাক্য ও বেদাভ্যাস বাচিক তপ। চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্যতা, মৌনভাব, মনোনিগ্রহ ও অন্তঃকরণশুদ্ধি মানসিক তপ। এই ত্রিবিধ তপ সাত্ত্বিক।[১১] গীতাকার বলছেন যে আত্মশুদ্ধির তপস্যা কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সহযোগে করণীয়।[১২]

দুটি গ্রন্থই একমত যে মানসিক শুদ্ধি ও পবিত্রতার দ্বারাই আদর্শপথে অগ্রসর হওয়া

যায়, বাহ্যিক চিহ্নধারণ অগ্রগতির পরিমাপ নয়। সন্ন্যাস যথেষ্ট সমাদৃত হওয়া সত্ত্বেও গীতা বলছেন যে নিরগ্নি (অগ্নিসাধ্য শ্রৌতক্রিয়া ত্যাগী) বা অক্রিয় (অগ্নিনিরপেক্ষ স্মার্ত ক্রিয়া ত্যাগী) হলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনিই যিনি কর্মফলত্যাগ করে কর্তব্য কর্ম করেন।[১৩] ধর্মপদও এই ধারণার সমর্থক, এবং বিভিন্ন বর্গে সে কথা উক্ত হয়েছে। শীলসমূহে প্রতিষ্ঠিত, সংযমী ও সত্যাশ্রয়ীমাত্র কাষায়বস্ত্র পরিধান করবার উপযোগী।[১৪] অনেক কাষায়বস্ত্র পরিধানকারী পাপধর্মী ও অসংযত হয়, এইসব পাপী পাপকর্মের জন্য নরকে যায়।[১৫] প্রচলিত বাহ্যচিহ্ন সকলকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করেছেন বুদ্ধ নগ্নচর্চা, জটাধারণ, পঙ্কানুলেপন বা ভূমিতে শয়ন, এইসকল উৎকট সাধনের দ্বারা ব্যক্তির শোধন হয় না, শান্ত, দান্ত, ব্রহ্মচারী, অলঙ্কার ভূষিত হলেও প্রকৃত ভিক্ষু।[১৬] শুধু যে সন্ন্যাসীর উৎকট আচরণ নিন্দিত হয়েছে তা নয়, বৌদ্ধ শ্রমণদের প্রতিও কটাক্ষ আছে। শুধু পক্ক কেশের দ্বারা স্থবির হয় না, তাঁদের বৃথাবৃদ্ধ বলে। যাঁর মধ্যে অহিংসা, সংযমাদি গুণসকল বর্তমান, তিনিই স্থবির পদবাচ্য।[১৭] এইরকম মস্তকমুণ্ডন করলেই শ্রমণ হওয়া যায় না, পাপের শমণ হেতু শ্রমণ।[১৮]

দুজনেই দেখাচ্ছেন যে কৃতকর্ম অপেক্ষা, যে বুদ্ধিতে কর্ম আচরিত হয়, তার উপর নৈতিকতার মূল্য নির্ভর করে। ধম্মপদ প্রথম গাথাতেই বলছেন যে মনই পূর্বগামী, মনই শ্রেষ্ঠ, সমস্ত কিছুই মনোময়। গীতাতেও শ্রীভগবান অর্জুনকে সাবধান বাণী শোনাচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সংযম করে, মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে স্মরণ করে, সে বিমূঢ়মতি মিথ্যাচারী।[১৯] এই দৃষ্টিভঙ্গীরই চরম পরিণতি দেখা যায় গীতার কর্মযোগে। কৃষ্ণ বলছেন যে কর্মত্যাগ না করে, যদি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পরিবর্তন আনা যায় — যদি কর্মফলে আসক্তি, ফললাভের আকাঙ্খা, কর্তৃত্ববোধ, মমত্ববোধ পরিত্যাগ করা যায় তবে কর্ম করেও কর্ম করা হয় না, অর্থাৎ কৃতকর্ম বন্ধনের সৃষ্টি করে না। ধম্মপদে এই নির্দেশগুলি আছে, কিন্তু একটি সুসংবদ্ধ মত হিসাবে তা পরিবেশিত হয়নি।

ধর্মের পথে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক মুষ্টিমেয় মানুষ, সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে সামান্য কয়েকজন সিদ্ধিলাভের জন্য সচেষ্ট মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।[২০] এই অন্তর্দৃষ্টি ধম্মপদেরও আছে, মানুষের মধ্যে যাঁরা পারগামী তাঁরা সংখ্যায় অল্প — অপ্পকাতে মনুস্‌সেসু যে জনা পারগামিনো।[২১] এঁদের আলোচনার দার্শনিক পশ্চাৎপটে একটি সুগভীর মিল আছে। কর্মফলের নিগূঢ় বন্ধনে শৃঙ্খলিত মানুষ জন্মমৃত্যুর অলঙঘ্য ঘূর্ণনে আবর্তিত হচ্ছে। জাত ব্যক্তির মৃত্যু যেমন ধ্রুব, তেমনই ধ্রুব মৃতের পুনর্জন্ম। জন্মান্তর গ্রহণ যেন, জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করে নববস্ত্র পরিধান। বৌদ্ধদর্শনে একে বলে ভবচক্র। জন্ম হতে জন্মান্তরে কার্যকারণমালার প্রবাহ চলেছে — যে প্রবাহে পরস্পর সম্পৃক্ত দ্বাদশ নিদান চক্রাকারে সজ্জিত। এই চক্র দুঃখস্বরূপ, এর থেকে মুক্তিই নির্বাণ। বুদ্ধবর্গে আছে যে দুঃখ, দুঃখসমুৎপাদ, দুঃখের অতিক্রম ও দুঃখোপশমকারী অষ্টাঙ্গিক মার্গ, এই চারটি আর্যসত্য

সম্যক জ্ঞানের সঙ্গে দর্শন করলে সর্বদুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।[২২] অন্যত্র বলেছেন যে এই দুঃখ মুক্তিই নির্বাণ। গীতায় মোক্ষ বিশেষভাবে কর্মফলের শৃঙ্খল অতিক্রম করা।

ধম্মপদ বলছেন যে 'নিববানং পরমং সুখং' 'নিরবানং পরমং সুখং'।[২৩] কিন্তু গ্রন্থটি মূলত বিভিন্ন সময়ে বুদ্ধের প্রদত্ত উপদেশের সংকলন, সুতরাং কোনও ধারণাকেই এখানে বিশ্লেষণ করে অন্তর্নিহিত অর্থ গ্রহণ করা হয়নি। সুতরাং আমরা শুধু 'নিব্বান' সম্বন্ধে বিভিন্ন বর্গে যা বলা হয়েছে তা একত্রিত করতে পারি। নির্বাণের বিশেষণ 'অমৃতপদ', যিনি সেই অমৃতপদ দেখেছেন তাঁর একদিনের জীবনও একশত বছরের সাধারণ পরমায়ুর থেকে শ্রেষ্ঠ।[২৪] নির্বাণে মৃত্যুভয় দূরীভূত হয়, পুত্র, পিতা, স্বজনগণ কেহই মৃত্যুর কবল থেকে ত্রাণ করতে পারে না, সুতরাং জ্ঞানীরা নির্বাণলাভের পথ সুগম করবেন।[২৫] যাঁর চিত্ত বাসনায় নির্লিপ্ত অথচ নির্বাণে যাঁর অভিলাষ জন্মেছে, তিনি উর্ধ্বগামী।[২৬] নির্বাণলাভ করলে তৃষ্ণা ক্ষয় হয় — যিনি অকৃত (নিবান) জেনেছেন, তিনি কুশল-অকুশলের আসক্তি ও বাসনা ক্ষয় করেছেন।[২৭] তৃষ্ণার ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্জন্মের শেষ হয় — 'দুক্‌খা জাতি পুনঃ পুনঃ'। নির্বাণলাভ করে বুদ্ধ পরিপূর্ণ আনন্দে বলেছেন আমার চিত্ত সমস্ত তৃষ্ণাকে ক্ষয় করেছে, চিত্ত সংস্কারমুক্ত হয়েছে, গৃহকূট নষ্ট হয়ে গেছে, আর গৃহ নির্মান করতে পারবে না'।[২৮] এই পর্যন্ত মনে হয় যে নির্বাণ শুধু দীপ নিভে যাওয়া—এখানে তৃষ্ণার ক্ষয়, সংস্কারের লয়, পুনর্জন্মের শেষ। কিছু ইতিবাচক বর্ণনাও আছে, যেমন নির্বাণ যোগক্ষেম বা পরমশান্তি।[২৯] (গীতায় প্রচলিত অর্থে,-অলব্ধ বস্তুর লাভ ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ 'যোগক্ষেম' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়নি)। নির্বাণ অনক্‌খাত বা অনির্বচনীয়।[৩০] নির্বাণ অগতদিস বা অগম্যদিক যার জন্য মনে হয় বুদ্ধদেব 'সুগত'।[৩১] কিন্তু নেতিবাচক বিশেষণও আছে — এটি শূন্যতা ও অনিমিত্তরূপ বিমোক্ষ; নির্বাণপ্রাপ্তের আস্রবক্ষয় হয়েছে, তিনি অনাসক্ত, যাঁর গতি আকাশে পাখীর গতির ন্যায় দুর্জ্ঞেয়।[৩২]

দুঃখের বিষয় নির্বাণ সম্পর্কে এত কথা থাকা সত্ত্বেও ধম্মপদে নির্বাণ কিন্তু দুর্জ্ঞেয়ই থেকে যায়। আমাদের ব্যাবহারিক আত্মবুদ্ধি যদি আত্মসম্পর্কীয় অবিদ্যাজনিত হয়, সেই অবিদ্যার নাশ যদি নির্বাণ হয়, বৌদ্ধদর্শনের মূল যদি অনাত্তাবাদ হয়, নির্বাণ যদি আত্মার অনস্তিত্ব জ্ঞান হয়, তবে কে নির্বাণ লাভ করেন? কার তৃষ্ণাক্ষয় হয়, কে সেই অনির্বচনীয় অমৃতপদের অধিকারী হন? এই সব প্রশ্নের সম্যক উত্তর পাওয়া যায় না। গীতায় এই অবস্থাকে 'ব্রহ্মনির্বাণ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। বৌদ্ধ নির্বাণের মতনই এটি পরম শান্তিময় অবস্থা; নিস্পৃহ, নিরহংকার, মমত্বশূন্য পুরুষ ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করেন। ব্যাবহারিক ব্যক্তিব পারমার্থিক সত্তা এঁরাও স্বীকার করেন না, কিন্তু তবু গীতায় একটা সদর্থক দিক আছে। মধুসূদন সরস্বতী বলছেন যে এটি ব্রহ্মে নিবৃত্তি বা অভেদপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মরূপ অবস্থা।[৩৩] কিছু সদর্থক বর্ণনা গীতাতে পাওয়া যাচ্ছে। যিনি ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন, তিনি

ক্ষয়িত পাপ, ছিন্নসংশয়, কামক্রোধবিযুক্ত আত্মসংযমী, আত্মসুখী, আত্মরতি, অন্তর্জ্যোতিসম্পন্ন পুরুষ।[৩৪] এ ছাড়া, গীতা যে হেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাই ঈশ্বরের সহিত সম্পৃক্ত একটি পরম পদের কল্পনা গীতায় আছে। কিন্তু সে কথায় পরে আসছি।

গ্রন্থ দুটির গভীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় আদর্শ পুরুষের কল্পনায়। গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ বা গুণাতীত এবং ধম্মপদের সুপ্রবুদ্ধ ব্রাহ্মণের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নেই। ব্যক্তি মানুষের চাওয়া-পাওয়া আশা-আকাঙক্ষা দিয়ে এঁরা পরিচালিত হন না। ব্যাবহারিক পরিধি অতিক্রম করে গীতোক্ত পরম পুরুষ সমুদ্রের মতন অবিচল, আত্মমগ্ন, আপূর্যমান নদীর জল এঁর মধ্যে কোনও অস্থিরতা সৃষ্টি করে না। ইনি নিরাশী, নিরাসক্ত, নিরহংকার। ইনি ক্রোধ, লোভ, মোহ ত্যাগ করেছেন। অন্তকালে ইনি ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। ধম্মপদের ব্রাহ্মণও চন্দ্রের ন্যায় নির্মল, শুদ্ধ, প্রসন্নচিত্ত, নিষ্পাপ। ইনি পবিত্র, শান্ত, আপন জ্যোতিতে দীপ্যমান। ইনি ক্রোধ, তৃষ্ণা, আসক্তির শৃঙ্খল মোচন করেছেন। ইনি প্রত্যাশাহীন ও বাসনামুক্ত ইনি নির্ভীক, নিরাসক্ত, বিগতপাপ, প্রব্রাজিত ও শীলবান। চিরন্তন ভারত এইরকম ব্যক্তিকেই শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান করেছে।[৩৫]

এই আলোচনা থেকে প্রকট হয়ে উঠছে যে নীতিশাস্ত্র এখানে আত্মমুখী। আত্মার উন্নতিসাধন, পূর্ণতালাভ ও আত্মজ্ঞানই পরমকাম্য। নৈতিকতা মানেই আত্মানুসন্ধান, আত্মদীপন ও আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা। ধম্মপদের অনুশাসন — কবোহি দীপমত্তনো — নিজের জন্য দ্বীপ বা সুরক্ষিত আশ্রয় তৈরী কর।[৩৬] আরেকস্থলে — অত্তা হি অত্তনো নাথো, অত্তা হি অত্তনো গতি — আত্মাই আত্মার প্রভু, আত্মাই আত্মার গতি, আত্মার দ্বারা আত্মাকে উত্থান কর, আত্মার দ্বারা আত্মাকে পরীক্ষা কর।[৩৭] সমাজের উপস্থিতি অবশ্য দুটি গ্রন্থই স্বীকার করেছেন। বুদ্ধের ত্রিশরণ হচ্ছে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ। ধম্মপদ বলছেন যে যিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নেন ও চতুরার্য সত্য সম্যক জানেন, তিনিই দুঃখ থেকে মুক্তি পান।[৩৮] সুপ্রবুদ্ধ গোতমসাবকগণ অন্যান্য করণীয়ের সঙ্গে দিবারাত্র সঙ্ঘানুস্মৃতি ভাবনা করেন।[৩৯] বুদ্ধগণের উৎপত্তি, সদ্ধর্মদেশনা, সংঘের একতা ও সংঘবদ্ধের তপস্যা একইরকম সুখজনক।[৪০] গীতায় কৃষ্ণ লোকসংগ্রহের উল্লেখ করেছেন; ত্রিলোকে তাঁর কোনও কর্তব্য নেই, তাঁর কোনও কিছু অপ্রাপ্ত প্রাপ্তব্য নেই, তবু লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করেন। মধুসূদন সরস্বতী বিশ্লেষণ করে বলছেন যে লোকসংগ্রহ মানে লোকসকলকে স্ব স্ব ধর্মে প্রবৃত্ত করা ও উন্মার্গ হতে নিবৃত্ত করা।[৪১] অর্থাৎ কৃষ্ণ লোকশিক্ষার জন্য কর্মত্যাগ করেন নি। সংসারে শ্রেষ্ঠ লোক যে আচরণ করে, সাধারণ লোক তার অনুবর্তন করে। কিন্তু তবু আমরা বলব যে আত্মোন্নতিই এখানে মুখ্য। 'Greatest good of the greatest number' ইত্যাদি ধারণা প্রতীচ্যের ও আধুনিক। অপরের সুখসাধক যে সামান্য ধর্মগুলি প্রচলিত আছে, যথা, অহিংসা, দয়া, দান ইত্যাদি তারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মশুদ্ধির সহায়ক, শুধু পরম্পরায় অপরের মঙ্গল কারক। মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান। গীতা বলছেন,

আত্মাই আত্মার উদ্ধার করবে, আত্মা আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত করবে না; আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু। যাঁহার আত্মা, আত্মার দ্বারা জিত হয়েছে, তাঁহার আত্মা আত্মার বন্ধু; জিতাত্মা প্রশান্তি ও পরমসমাহিত হন।[৪২] শ্রেষ্ঠ পুরুষ হচ্ছেন আত্মজ্ঞানী ও যোগযুক্তাত্মা। গীতার এই উক্তির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ধম্মপদে — অত্তা হি অত্তনো নাথো কো হি নাথো পরো সিয়া? আত্মাই আত্মার নাথ, অপর কে নাথ আছে?[৪৩] অন্য সকলকে জয় করা অপেক্ষা নিজেকে জয় করা শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধে সহস্র লোককে জয় করা অপেক্ষা নিজেকে জয় করা কঠিন।[৪৪] বুদ্ধ সুন্দর তুলনা দিয়ে তার বক্তব্য বলছেন : বশীভূত অশ্বতর আজানেয় অশ্ব, কুঞ্জরা নামক বিশাল হস্তীর চেয়ে আত্মজয়ী শ্রেষ্ঠ।[৪৫] ধম্মপদে আত্মবর্গে আত্মসম্পর্কীয় নানা আলোচনা আছে। এই বর্গের শেষ শ্লোকে বলেছেন যে বহু পরার্থের অনুরোধেও মানুষ, আত্মহিত ত্যাগ করবে না, নিজের মঙ্গল সঠিক জেনে পরমার্থসাধনে তৎপর হওয়া উচিত।[৪৬] গীতায় ঠিক এতটা চরম উক্তি পাওয়া কঠিন।

এই তো গেল সাদৃশ্যের কথা। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে গ্রন্থ দুটির পার্থক্য কি শুধু ভাষাগত ও আঙ্গিকগত? দুটিতে কি দুই ভাবে অনুশাসিত একই নীতি নির্দেশ? ধম্মপদ পালি ভাষায় রচিত গীতা সংস্কৃতে। ধম্মপদে বুদ্ধের উপদিষ্ট ৪২৩টি গাথা আছে যে গুলি বিভিন্ন উপাখ্যানের সঙ্গে সম্পৃক্ত; ধর্মাধার মহাস্থবির বলছেন যে উপাখ্যানগুলি বুদ্ধঘোষ রচিত ধম্মপদের পালিভাষ্যে সংকলিত হয়। সাধারণ মানুষের জন্য রচিত গাথাগুলির বক্তব্য সহজ সরল ঋজু; গ্রন্থটিতে কোনও তত্ত্ববিচারের প্রয়াস নেই, কোনও বিতর্কের দ্বারা ভারাক্রান্ত নয়। গীতাকার অর্জুনকে শ্রোতা গণ্য করেছেন, মূলত এটি শিক্ষিত, পরিশীলিত, সুসংস্কৃত মানুষের নৈতিক সমস্যা ও মোহ দূরীকরণের জন্য রচিত। একটি বিশেষ সমস্যাকে সামনে রেখে নৈতিক জীবনের সামান্য নির্দেশগুলি সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিতর্ক না থাকতে পারে বিচার বিশ্লেষণ অনেক আছে। একটু গভীরে প্রবেশ করলেই গ্রন্থদুটির পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। জীবনের প্রতি মৌলিক মনোভাবই পৃথক। নীতিনির্দেশে প্রভেদ আছে। আর দেশনাগুলিকে যদি আমরা আধিবিদ্যক প্রেক্ষাপটের নিরিখে বিচার করি, তবে দেখব কি ভাবে একই নির্দেশ পৃথক ব্যঞ্জনায় ভাসিত হয়।

ধম্মপদে বৌদ্ধদর্শনের প্রচলিত পরিকাঠামো সম্পূর্ণরূপে বর্তমান। বিষমাখা শল্য বিদ্ধ করেছে মানুষের তার থেকে আর্ত মানবগণ যাতে পরিত্রাণ পেতে পারে, তাই পরম করুণাময় তথাগত উপদেশ বর্ষণ করছেন। কো নু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্জলিতে সতি? জগৎ যখন অহরহ জ্বলছে, তখন কিসের আনন্দ কিসের হাসি? অন্ধকারে আচ্ছন্ন থেকে তোমরা কি আলোর সন্ধান করবে না?[৪৭] নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, নানা উপমা ও আপাত বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছে যে জীবন দুঃখময়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলি সাজিয়ে আমরা বলতে পারি যে সম্পূর্ণ নীতিশাস্ত্রটি একটি তথ্য আর

দুটি অপ্রমাণিত আপাত তথ্যের উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। এদের থেকেই সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে যে নির্বাণ পরম সুখ।

তথ্যটি হচ্ছে যে মানুষের জীবন অনিত্য, নশ্বর এবং তাতে মৃত্যু, জরা, ব্যাধির প্রকোপ আছে। দেহকে তুলনা করেছেন মৃৎকুম্ভের সঙ্গে—কুম্ভুপম;[৪৮] মানুষের দেহ মৃৎকুম্ভের মতনই ক্ষণভঙ্গুর। অচিরেই এই দেহ প্রাণশূন্য হয়ে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর একখানি কাষ্ঠখণ্ডের মত মাটীতে পড়ে থাকবে।[৪৯] পণ্ডিতব্যক্তি জীবনকে বুররলক ও মরীচিকাব ন্যায় অসার ও নশ্বর বলে বুঝতে পারেন।[৫০] পণ্ডিত ব্যক্তি মানুষেব শরীর ফেণার মতন ক্ষণস্থায়ী এবং মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা জেনে মৃত্যুরাজ্যের সীমানা অতিক্রম করবার চেষ্টা কবেন।[৫১] বুদ্ধ দৈনন্দিন জীবন থেকে উপমা চয়ন করে জীবনের অকিঞ্চিৎকরতা ও ক্ষুদ্রতা প্রমাণ করতে চাইছেন। জীবনের মোহে মুগ্ধ থাকে মানুষ, অকস্মাৎ মৃত্যু এসে হানা দেয়। এই সত্য বিচিত্র ভাবে প্রকাশিত করে, পুনরুক্তির মধ্য দিয়ে, প্রভাবিত করতে চাইছেন শ্রোতাদের। বন্যার উপমা অন্ততঃ দুবার আছে ; বন্যা যেমন সুপ্তগ্রামকে ভাসিয়ে নেয় তেমনই পুষ্পচয়নকারী আসক্ত মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় মৃত্যু। মহাপ্লাবন যেমন সুপ্ত গ্রামকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমন করেই মানুষকে মৃত্যু নিয়ে যায়।[৫২]

আরও বলছেন যে জরা ও মৃত্যু প্রাণীর আয়ুকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যেমন গোপালক গরুর পালকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়।[৫৩] জরার উপর একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় আছে। বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত এই দেহ, ক্ষতে পরিপূর্ণ, অস্থি সমুন্নত রোগাতুর, অস্থায়ী। ব্যাধির আলয় ভঙ্গুর দেহ, মৃত্যুতেই হয় অবসান। শরৎকালের অলাবুর ন্যায় প্রক্ষিপ্ত ও কপোতের ন্যায় শুভ্র অস্থিসকল দেহের সার। দেহ যেন অস্থিদ্বারা প্রস্তুত এক নগর, যার বাইরে রক্ত মাংসের প্রলেপ। এই দেহ জরা, মৃত্যু, কাপট্য ও অভিমানের আশ্রয়মাত্র। সুচিত্রিত রাজরথও যেমন জীর্ণ হয়ে যায়, এই দেহও তেমনই ক্ষয়গ্রস্ত হয়।[৫৪]

এর সঙ্গে আমরা দেখি মানুষের জীবনকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে দুঃখময় প্রতিপন্ন করবার একটি প্রচেষ্টা, যাকে আমি আপাত তথ্য বলে মনে করি। প্রিয়বর্গে আমরা একগুচ্ছ গাথা পাই, যেখানে মানুষের জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে সংজড়িত যে সব আবেগ বা বৃত্তি তাদের দুঃখময়তা দেখিয়েছেন। বুদ্ধের এক পরমভক্ত উপাসক একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকে আত্মহারা, বুদ্ধ তাঁকে বলছেন যে প্রিয়বস্তু হতে শোক জন্মায়; ভয় জন্মায়; প্রিয়বস্তুর আসক্তি থেকে মুক্ত হলে শোক থাকে না, ভয় কি করে থাকবে? আবার উপাসিকা বিশাখা পৌত্রী সুদত্তাকে অকালে হারিয়ে শোকে অভিভূত—বুদ্ধ তাঁকে বলছেন যে প্রেম থেকে শোক জন্মায়, ভয় জন্মায়, প্রেম থেকে বিপ্রমুক্ত হলে শোক থাকে না, ভয় কি করে থাকবে? লিচ্ছবি রাজকুমারেরা এক বারনারীকে নিয়ে আমোদ প্রমোদ করছিলেন, যেখানে ঐ নারীর অধিকার নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদের সূত্রপাত হল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুদ্ধদেব বলছেন যে রতি বা আসক্তি থেকে শোক জন্মায়, ভয় জন্মায়, যিনি রতি

বা আসক্তি থেকে মুক্ত, তাঁর শোক নেই, ভয় কি করে থাকবে? আবার শ্রাবস্তীর এক ধনীর পুত্র বিবাহ করতে অনুৎসুক ছিলেন। পরে পিতামাতার অনুরোধে স্বর্ণপ্রতিমা সদৃশী সুন্দরী নারী পাওয়া গেলে বিবাহ করতে রাজী হলেন। সেইরকম পরমাসুন্দরী কন্যার সন্ধান পাওয়া গেল, কিন্তু ভাবী বধূ আনীত হবার সময়, কালব্যাধির আক্রমণে মারা গেল। বুদ্ধদেব বলছেন যে কাম হতে শোক জন্মায়, ভয় জন্মায়, যিনি কামমুক্ত তাঁর শোক নেই, ভয় কি করে থাকবে? শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণের শস্যক্ষেত্র, অনেক পরিশ্রমের ফলে সোনালী ফসলে ভরে উঠল। কিন্তু অকাল বর্ষণের ফলে এ ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল। বুদ্ধ বলছেন যে তন্‌হা থেকে শোক জন্মায়, ভয় জন্মায়, যিনি তন্‌হা মুক্ত তাঁর শোক নেই, ভয় কি করে থাকবে? মানুষের জীবনকে যে সব বৃত্তি ও আবেগ মায়াময় করে তোলে, তাদের দুঃখময়তা প্রতিপন্ন করছেন এখানে। জীবনে অপ্রিয় সংযোগ তো কষ্টকর বটেই, কিন্তু প্রিয়সংযোগও নিখাদ আনন্দময় নয়, কারণ তার সঙ্গে নিশ্চিতভাবে আসে প্রিয়বিয়োগ। পিয়ানং অদসসনং দুঃখঃ অপ্‌পিয়ানঞ্চ দসসনং।[৫৫] জীবনে দুঃখের আধিক্য স্থাপন করা খুব প্রযোজন, কারণ বুদ্ধানুশাসনের কেন্দ্রে আছে চারটি আর্যসত্য যার মূল হচ্ছে দুঃখ। এখানে সারকথা হচ্ছে সুখ অনিত্য, সুতরাং শোক ও ভয়ের সঙ্গে জড়িত — সুখ নাশে শোক এবং নাশের আশঙ্কায় ভয়। যদি কেউ বলেন যে ক্ষণস্থায়ী হলেও সুখ সুখই— It is better to have loved and lost, than never to have loved at all — কোন কালেও না ভালবাসার চাইতে, ভালবেসে, ভালবাসার পাত্রকে হারানও শ্রেয় , বুদ্ধ বলবেন এঁরা অজ্ঞান, পার্থিব সুখের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করলে, নিত্য সুখের আস্বাদ পাওয়া যাবে। জ্ঞানী ব্যক্তি বিপুল সুখের সম্ভাবনা দেখে সামান্য সুখ ত্যাগ করেন।[৫৬]

এর সঙ্গে যুক্ত আছে দ্বিতীয় অপ্রমাণিত তথ্য - পাপের ফলে দুঃখ উৎপন্ন হয়, পাপ ও দুঃখের, তথা পুণ্য ও সুখের মধ্যে আবশ্যিক সম্বন্ধ আছে। ধম্মপদে প্রথম অধ্যায়েই আছে পাপকারী 'সোচতি', পুণ্যকারী 'মোদতি', পাপকারী 'তপপতি', পুণ্যকারী 'নন্দতি'। এই চিন্তার বিস্তার পাপবর্গে। বালবর্গে আছে যে পাপের ফল কুট হয়, পাপকর্ম আপাত মধুময় হলেও অন্তিমে দুঃখদায়ক হবেই। পাপ ভস্মে ঢাকা আগুনের মতন পাপীকে দহন করে ও অনুসরণ করে।[৫৭] পাপবর্গে অনুশাসন, কল্যাণকর্মে তৎপর হও, পাপ থেকে চিত্তকে নিবৃত্ত কর। পাপের সঞ্চয় দুঃখ, পুণ্যের সঞ্চয় সুখ। ফল যতক্ষণ না ফলে, পাপী ততক্ষণ পাপ কাজকে ভাল মনে করে, পুণ্য যতক্ষণ না ফলে ততক্ষণ তাকে অকল্যাণকর মনে হয। মৃত্যুর পর পাপীরা নরকে যায়, পুণ্যবান স্বর্গে যায়। অন্তরীক্ষে, সমুদ্রে কি পর্বতবিবরে -- জগতে এমন স্থান নেই যেখানে আশ্রয় নিলে পাপের ফলের হাত থেকে, মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে।[৫৮] ধম্মপদে, বুদ্ধের দায় নেই যুক্তিবিচাবেব সাহায্যে জগতে দুঃখের আধিক্য প্রতিষ্ঠা করবার, তার দায় দুঃখময় জগতে দুঃখী মানুষকে

দুঃখের গ্রাস থেকে পরিত্রাণ করবার। তাই তিনি করছেন। মনুষ্যজন্ম দুর্লভ কিন্তু দুঃখদায়ক। সুতরাং বুদ্ধের অনুশাসন সকল প্রকার পাপের অকরণ, কুশলকর্মের অনুষ্ঠান ও স্বীয় চিত্তের পবিত্রতা সাধন।[৫৯] পুনরায় আশ্বাস দিচ্ছেন যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙেঘর শরণ ও চারটি আর্যসত্যের জ্ঞান দ্বারা সর্ব দুঃখের নাশ হয়।[৬০] যেমন পাপের পথ ত্যাগ করে পুণ্যের পথ গ্রহণ করা শ্রেয়, তেমনই পাপ-পুণ্য উভয়কে অতিক্রম করতেও বলা হয়েছে। কারণ কিন্তু একই. এই ভাবে দুঃখকে অতিক্রম করা যায়। পাপ-পুণ্য উভয়কে পরিহার করেছেন যিনি, তিনি জাগরিত, তার ভয় নেই।[৬১] ধর্মস্থবর্গে পরপর দুটি মন্তব্য — পুণ্যপাপ অতিক্রম করে ভিক্ষু হন। পুনরায় যিনি মুনি, তিনি পাপ পরিবর্জনের দ্বারা মুনি।[৬২] যে সকল গাথায় আপেক্ষিকতা অতিক্রম করে দ্বন্দ্বাতীতের প্রশংসা আছে, সেখানেও মূল উদ্দেশ্য দেখান যে এইভাবে দুঃখকে অতিক্রম করা যায়। পণ্ডিতব্যক্তি নিন্দাপ্রশংসায় অবিচল থাকেন, সুখ-দুঃখ যাই আসুক তাঁরা উল্লসিতও হন না, অবসন্নও হন না।[৬৩] কোথাও বা বিকল্পের দুটি কোটীরই দোষ দেখানো হয়েছে -- ভয় শত্রুতার সৃষ্টি করে, পরাজয় দুঃখ আনে, শান্তচিত্ত ব্যক্তি উভয়ত্যাগ করে সুখে বাস করেন।

আসক্তি, আশা, অনুরাগ, ক্রোধ, তৃষ্ণা এ গুলি সব বর্জনীয়, কারণ এরা দুঃখের সঙ্গে জড়িত। মলবর্গে বলছেন যে আসক্তির সমান অগ্নি নেই, দ্বেষের সমান গ্রাসকারী নেই, মোহের ন্যায় জাল নেই, তৃষ্ণার সমান নদী নেই।[৬৪] এর ব্যাখ্যা ছড়িয়ে আছে গ্রন্থে সর্বত্র। নামরূপে অনাসক্ত ব্যক্তিকে দুঃখে পড়তে হয় না, তাই আসক্তি তথা ক্রোধ ও অহংকার পরিত্যজ্য।[৬৫] নামরূপময় বস্তুতে যাঁর মমত্ব নেই, তিনি এদের অভাবে শোক করেন না।[৬৬] প্রত্যাশা না থাকলে আশাভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে না। নিষ্কাম কর্ম কেন প্রশংসিত হয়েছে? কারণ স্বর্ণমুদ্রাবয়নেও কামের তৃপ্তি হয়না, পণ্ডিতেরা দিব্যকামেও অনুরক্ত হন না, তৃষ্ণাক্ষয়ে রত হন।[৬৭] ভোগতৃষ্ণা মানুষকে বদ্ধ করে, তৃষ্ণার ফলে সে বারংবার জন্মগ্রহণ করে। তৃষ্ণাকে অতিক্রম করলে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় শোকও দূর হয়। মূল থাকলে ছিন্ন বৃক্ষও বারংবার জন্মায়, এইরকম তন্‌হা থাকলে দুঃখও পুনঃপুন ফিরে আসে। মাকড়সা যেমন স্বীয় জালে বদ্ধ থাকে, রাগাসক্ত মানুষও তেমনই স্বীয়কৃত রাগস্রোতে পতিত হন। জালবদ্ধ শশকের মতন, তৃষ্ণাচালিত মানুষ বিক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তৃষ্ণাক্ষয় সর্বদুঃখ জয় করে — তণহক্‌খয়ো সরবদুক্‌খং জিনাতি।[৬৮] এখানে দৃষ্টিভঙ্গী প্রায়োগিক ও ব্যাবহারিক। দুঃখজয় একমাত্র কাম্য।

বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র নেতিবাচক। আত্মদীপ হবার আহ্বান আছে, কিন্তু আত্মজ্ঞানও উপায়মাত্র। কোন স্থায়ী আত্মাকে জানবার আহ্বান এটি নয়। আত্মাকে স্থায়ী মনে করে যে 'তন্‌হা' আমাদের দুঃখে নিমজ্জিত করছে, সেইরকম যে কোনও আত্মা নেই, সেই জ্ঞান লাভ করে, দুঃখ জয় করাই পরম উদ্দেশ্য ও শেষ কথা।

গীতার মনোভাব এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ধম্মপদে যে নির্বাণকাঙক্ষীদের কথা আলোচিত হয়েছে গীতার পরিভাষায় তাঁরা আর্ত। কিন্তু গীতার বিশ্লেষণ অনুসারে তত্ত্বান্বেষীদের মধ্যে জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানীরাও আছেন।[৬৯] গীতায় মোক্ষ, ব্রহ্মনির্বাণ, দুঃখবিনাশ ইত্যাদি সব কথাই আছে। পরমপদ সেখানে আত্মজ্ঞান - নিবাতস্থ দীপের মতন শান্ত, অচঞ্চল আত্মতুষ্টির অবস্থা। আত্যন্তিক সুখ সেই অবস্থাতে পাওয়া যায়, গুরু দুঃখও সেই অবস্থা থেকে বিচলিত করতে পারে না।[৭০] কিন্তু গীতার অন্তরস্পর্শিতার কারণ হল যে আত্মার স্বরূপের কথা এবং এই পরমপদের ধারণা স্মরণে রেখে, গীতা ব্যাবহারিক দৈনন্দিন জীবনে দিক নির্ধারণ করবার চেষ্টা করেছেন। এইজন্য ভারতীয় বিদ্বৎসমাজে গীতার আবেদন অপরিমেয়।

গীতার সূচনা একটি সমস্যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন যখন তাঁর প্রিয়জনদের অপর পক্ষে শস্ত্রপাণি দেখলেন, তখন তাঁর প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হল। তাঁর শরীর বেপথু হল, রোমাঞ্চ হল, ত্বক্ জ্বলতে লাগল, গাণ্ডীব হাত হতে খসে পড়ল। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন। আধুনিক প্রাবন্ধিক গিরীন্দ্রশেখর বসু বলছেন যে অর্জুন যুদ্ধ না করতে চেয়ে যে সব যুক্তি দিয়েছেন তাদের তিনভাগে দেখা যায়, কিছু ব্যক্তিগত আবেগ-প্রসূত কারণ — প্রিয়জনবধে অনীহা, দ্বিতীয়ত — সামাজিক কারণ — তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে বিপুল সংখ্যক সৈনিকদের মৃত্যুর পর স্ত্রীচরিত্র নষ্ট হবে, এবং তৎসঙ্গে কুলধর্মাদিও নষ্ট হবে। তৃতীয়ত — অলৌকিক কারণ — মনুষ্যবধ করে নরকগামী হতে হবে।[৭১] এই আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে যে তবে কি অর্জুনের সমস্যাটি নৈতিক সমস্যা ছিল না, অর্থাৎ সামনে কি নৈতিক সম্ভাবনা যুক্ত দুটি কোটী ছিল না? কোন কোন চিন্তক বলেন যে অর্জুনের সম্মুখে অহিংসারূপ সামান্যধর্ম এবং যুদ্ধরূপ বিশেষধর্ম এই দুটি কোটী উপস্থিত ছিল। আমরা বরঞ্চ দেখি যে তিনি অহিংসার উল্লেখ করেন নি, কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন না করে, সন্ন্যাস নিতে চাইছিলেন যদিও সন্ন্যাসের আবশ্যিক শর্ত বৈরাগ্য তাঁর মধ্যে ছিল না। তবে যাই হোক, তাঁর সমস্যা একটা ছিল, এবং তিনি নিজেকে ধর্মসংমূঢ় বলেছেন। এই সূত্রে কৃষ্ণ কর্তব্য-অকর্তব্য, ধর্মাধর্ম, কার্যাকার্যব্যবস্থিতি সম্পর্কে বিস্তাবিত আলোচনা করেছেন। পরিশেষে তিনি অর্জুনকে স্বাধীনতা দিয়েছেন নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করতে — বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথাকুরু'।[৭২] উত্তরে অর্জুন বলেছেন যে তিনি 'নষ্টমোহ' 'গতসন্দেহ' হয়েছেন, এখন কৃষ্ণনির্ধারিত পথ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব।[৭৩] অর্জুনের নৈতিক সমস্যার প্রসঙ্গে, সমস্যা সমাধানের জন্য ও মোহ দূরীকরণের জন্য গীতাশাস্ত্রের অবতারণা, সুতরাং গীতার আলোচনা অনেক বেশী সদর্থক।

গীতার ধর্ম সম্পর্কে আলোচনার আমরা তিনটি সুস্পষ্ট দিক দেখতে পাই। গীতা দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে বলেছেন। এই অধ্যাদেশ তিনভাবে প্রকাশিত হয়েছে — প্রথমত,

সমস্ত দ্বন্দ্ব ও আপেক্ষিকতা অতিক্রম করতে বলেছেন, দ্বিতীয়ত আসক্তি ত্যাগ করতে বলেছেন, তৃতীয়ত অহংবোধ ও মমত্ববোধ পরিত্যাগ করতে বলেছেন। এই দেশনাগুলি ধম্মপদেও উপস্থিত, তবু আমার মনে হয় যে দুটি গ্রন্থে উপদেশগুলির নিহিতার্থ ভিন্ন, কারণ গীতার উপদেশগুলি তার আধিবিদ্যক অবস্থানের পটভূমিকাতে বিচার করতে হবে, যার জন্য উভয়ের ব্যঞ্জনা পৃথক হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত কিছু সামান্যধর্মের কথা আছে, এই ধর্মগুলির অনুশাসন ধম্মপদেও আছে, যে কোনও নীতিশাস্ত্রে এদের সাক্ষাৎ মেলে। গীতা এগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। তৃতীয়ত কিছু বিশেষ ধর্মের উপদেশ দিয়েছেন যে আলোচনা গীতার অনেকটা নিজস্ব। ধম্মপদের দৃষ্টিতে সব মানুষ এক ছাঁচে ঢালা, সুতরাং ধর্মের পথ ও গন্তব্য লক্ষ্য সবারই এক। গীতার বিশ্লেষণে মানুষ পরস্পরের সদৃশও বটে, বিসদৃশও বটে। গীতা মানুষে মানুষে স্বভাবগত পার্থক্য স্বীকার করেছেন, এবং স্বভাবকে কর্তব্য নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক মনে করেছেন। ব্যক্তিগত স্বভাব অনুসারে মানুষের বর্গীকরণ হয়েছে এবং সেই বর্গ অনুসারে কর্তব্যের বিভাজন হয়েছে — এই কর্তব্যগুলি স্বধর্ম। এইখানে গীতা ধম্মপদ থেকে অনেক সরে এসেছেন। মানুষের সাদৃশ্য অনুসারে তার সামান্যধর্ম, বৈসাদৃশ্য অনুযায়ী তার বিশেষধর্ম এবং মানুষের পারমার্থিক স্বরূপের অনুগামী তার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী — এই তিন ভাগে গীতার বক্তব্যকে সাজানো যায়।

আরেকটু বিস্তারিত আলোচনায় আসি। গীতার সমগ্র নীতিশাস্ত্রের ভূমিকা হচ্ছে, আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা, যেটি প্রধানত দ্বিতীয় অধ্যায়েই পাওয়া যায়। এই আত্মা বেদান্তের ব্রহ্মস্বরূপ বা সাংখ্যের পুরুষ; ইনি নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ। সমস্ত কার্যকারণ সম্পর্কের বর্হিভূত বলে ইনি অজ, অবিনাশী ও অব্যয়। জ্ঞানের বিষয় করে এঁকে জানা যায় না, তাই ইনি অপ্রমেয়, অচিন্ত্য, অব্যক্ত। মূর্ত ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ দেখিয়ে, সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে যে ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য। এই আত্মা আমাদের সমস্ত অনুভূতির মূলে, এবং জীবনের মূল লক্ষ্য হল এই স্বরূপটি জানা, আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে এই ধারণাই হল গীতার নীতিকথার মূল প্রতিজ্ঞা। গীতার অনুশাসনগুলি সঠিক বুঝতে হলে, এই প্রতিজ্ঞাটি অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক প্রাবন্ধিক গিরীন্দ্রশেখর বসু গীতার এই অংশটিকে কৃষ্ণের শ্লেষোক্তি বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।[৭৪] দ্বিতীয় অধ্যায়ে মোহাবিষ্ট অর্জুনকে উপহাস করে (প্রহসন্) — কৃষ্ণ তাঁর উপদেশ শুরু করেন। আমরা মনে করি যে কৃষ্ণের ভঙ্গীমাত্র উপহাসাত্মক ছিল, বক্তব্যে কোনও ফাঁক ছিল না। গিরীন্দ্রশেখরের সকল যুক্তি আলোচনা না করেও এই কথা বলা যায় যে নীতিশাস্ত্র মাত্রেরই পশ্চাতে কোনও স্ফুট বা অস্ফুট আধিবিদ্যক সিদ্ধান্ত থাকে, গীতায় সেই সকল সিদ্ধান্ত প্রকট ভাবেই আছে সাংখ্য-বেদান্ত পটভূমিকায় এই শাস্ত্র রচিত এবং নানা অধ্যায়ে

সে কথা ছড়িয়ে আছে। যেমন আমরা দেখি যে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুরুষ ও প্রকৃতি দিয়ে মানুষের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং পুরুষকে সাক্ষী, উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা ইত্যাদি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং একটি অংশকে উপহাস মনে না করে ঐরকম আত্মা যে গীতার প্রাক্‌সিদ্ধ প্রতিজ্ঞা, তা স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। তবে, গীতাকে সঠিক বুঝে, তারপরে ঐ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ না করেও, আমরা তার নীতিনির্দেশকে আধুনিক জীবনের চাহিদার সঙ্গে সুসংগত করে গ্রহণ করতে পারি, আমাদের প্রয়োজনের উপযোগী করে পুনর্নির্মাণ করতে পারি, সে অন্য কথা। সে কথায় পরে আসছি।

মনোভাব পরিবর্তন প্রসঙ্গে কৃষ্ণ কি বলছেন, তা আলোচনা করা যেতে পারে। কৃষ্ণ অর্জুনকে তথা সঠিক পথের সন্ধানীকে দ্বন্দ্বাতীত হতে বলেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মবন্ত হবার জন্য সাধন হিসাবে নির্দ্বন্দ্ব হবার নির্দেশ আছে।[৭৫] চতুর্থ অধ্যায়ে মুক্তপুরুষের বর্ণনায় তিনি দ্বন্দ্বাতীত।[৭৬] পঞ্চমে বলছেন যে দ্বন্দ্ব অতিক্রম করলে অনায়াসে বন্ধনমুক্ত হওয়া যায়।[৭৭] পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে যে নিত্যঅধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বন্দ্ববিমুক্ত।[৭৮]

প্রশ্ন ওঠে এই দ্বন্দ্ব কি এবং এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে হবে কেন? পঞ্চদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলছেন যে এটি সুখদুঃখসংজ্ঞক দ্বন্দ্ব।[৭৯] গীতায় নানা দ্বন্দ্বের উল্লেখ আছে — শীতোষ্ণ, মানাপমান, হর্ষামর্ষ, শত্রুমিত্র, নিন্দাস্তুতি, শুভাশুভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি ইত্যাদি। দ্বন্দ্ব অতিক্রম করার আরেক নাম হচ্ছে সমত্ববুদ্ধি — গীতার মতে সমত্বইযোগ। আদর্শব্যক্তি আত্মজ্ঞানী তিনি সব আপেক্ষিকতার ঊর্ধ্বে। এইজন্য গীতা সার্থক ভাবেই বলছেন যে স্থিতপ্রজ্ঞ দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা ও সুখে বিগতস্পৃহ; বা ধীমান প্রিয়বস্তু প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না বা অপ্রিয়বস্তু প্রাপ্তিতে উদ্বিগ্ন হন না।[৮০] যে দ্বন্দ্ব মানুষের দৈনন্দিন ব্যাবহারিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে সংজড়িত, সেটি অতিক্রম করবার একটা প্রায়োগিক সুবিধাও আছে। সুখদুঃখ অতিক্রম করলে দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ধম্মপদ এই ব্যাখ্যা পছন্দ করবেন। দ্বাদশ অধ্যায়ে এই ব্যক্তিকে 'গতব্যথ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইনি 'ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি'। মধুসূদনের ব্যাখ্যা অনুসারে ইনি অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না, অনীপ্সিত বিষয়ের অধিগমে বিদ্বেষ করেন না, প্রাপ্ত ইষ্ট বস্তুর বিয়োগে শোক করেন না, ইষ্ট বস্তু অপ্রাপ্ত হলেও পেতে ইচ্ছা করেন না।[৮১]

তবে এই দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ও সিদ্ধি-অসিদ্ধি কর্তব্যকর্মের বিশ্লেষণে সাক্ষাৎভাবে প্রাসঙ্গিক। আমরা ব্যাবহারিক জীবনে, কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সুখী না দুঃখী হব তা বিচার করে, অনুরাগ বা বিদ্বেষের দ্বারা চালিত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু সুখদুঃখে সমবুদ্ধি থাকলে শুধু কর্তব্য বুদ্ধির দ্বারা কর্মে প্রণোদিত হব। কর্তব্য হচ্ছে সেই কর্ম যা না করলে পাপ হয়, এবং যা করলে আনুষঙ্গিক পাপ উৎপন্ন হলেও তা কর্তাকে স্পর্শ করে না। এই ব্যাখ্যা কিন্তু গীতার উপর আমাদের অভিক্ষেপ নয়। মধুসূদন

সরস্বতীর একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা অনুসরণ করলেই দেখা যাবে যে এই মত গীতায় আছে। শ্লোকটি হচ্ছে —

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।। ২/৩৮

অর্থাৎ সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ জয়-অজয় সমভাবাপন্ন হয়ে কর্তব্যতাজ্ঞানে যুদ্ধ করলে, তোমার পাপ হবে না, এর ব্যাখ্যায় মধুসূদন বলেছেন যে স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে, রাজ্যলাভের উদ্দেশ্যে এ যুদ্ধ নয়। স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা হলে, যুদ্ধ না করলে কাম্য কর্ম করা হত না, তাতে পাপ হত না। রাজ্যলাভ অর্থশাস্ত্রের বিধি, সে বিধি অহিংসারূপ সামান্যধর্মের চেয়ে দুর্বল, সুতরাং সে বিধি না মানলেও পাপ হয় না। ২/৩৩-এ বলা হয়েছে যে এ যুদ্ধ না করলে পাপ হবে। টীকাকার তাই দেখাচ্ছেন যে কোন মনোভাব থাকলে যুদ্ধ না করলে পাপ হবে এবং করলে পাপ হবে না। তার বক্তব্য যে সমতাপন্ন হলে এই মনোভাব লাভ হয়। সুখে, তার কারণ লাভে, তার কারণ জয়ে অনুরাগ না করে এবং দুঃখে, তার কারণ অলাভে, তার কারণ অজয়ে দ্বেষ না করে, স্বধর্মবুদ্ধিতে যুদ্ধ করা উচিত। অর্থাৎ কর্তব্যবুদ্ধি মাত্র যদি ক্রিয়ার প্রেরণা হয়, তবে সে কর্ম না করলে পাপ বা অন্যায় হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মুক্ত মানব আত্মপ্রতিষ্ঠ বলে স্বভাবতই দ্বন্দ্বাতীত, আবার দ্বন্দ্ব অতিক্রম সাধনাও বটে, কারণ তা নীতির পথ বেছে নেবার জন্য আবশ্যিক শর্ত।

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখি যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয় আসক্তি ত্যাগের দ্বারা। আদর্শ পুরুষের বর্ণনায় অনাসক্তির কথা ওঠে। আসক্ত হয়ে অবিদ্বান যে লোকসংগ্রহ করে, অনাসক্ত হয়ে বিদ্বান সেই লোকসংগ্রহই করে থাকেন।[৮২] যোগী কর্ম করেন আসক্তি ত্যাগ করে আত্মশুদ্ধির জন্য।[৮৩] আমি উদাসীনবৎ আসীন বলে আমাকে পাপ স্পর্শ করে না।[৮৪] এই সকল উক্তি কৃষ্ণের। আরও অনেক স্থানে অনাসক্তি, নির্লিপ্তির অনুশাসন আছে। অনাসক্তির আরেকটি পর্য্যায় শব্দ নিষ্কাম কর্ম। নির্বাসনা, নিষ্কামনা, নিরাশী হবার দেশনা ধম্মপদেও আছে কিন্তু আমরা দেখেছি যে সেখানে যুক্তি অনেক সহজ ও ঋজু — আসক্তি দুঃখের মূল, সুতরাং আসক্তি ত্যাগ করা কর্তব্য। কাম কখনও উপভোগের দ্বারা চরিতার্থ হয় না, অগ্নিতে হবির্বর্ষণের মতন তা উত্তরোত্তর লেলিহান হয়ে ওঠে, সুতরাং কামনা ত্যাগ করাই শ্রেয়। গীতা আরেকটু অন্যভাবে দেখছেন — কামনাত্যাগ করলে বন্ধনমুক্তি হয়। এই প্রসঙ্গে আরও দু-একটি কথা যোগ করে গীতা নিষ্কাম কর্মের ধারণায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। প্রথমত আত্মা সর্ব কর্মের ঊর্ধ্বে, এটি গীতার মৌল প্রতিজ্ঞা। সুতরাং নিঃশেষে কর্মত্যাগ গীতার চূড়ান্ত আদর্শ হতে পারত। কিন্তু সেটি অসম্ভব — জীবনযাত্রা তাতে ব্যাহত হয়। সেই জন্য কর্মত্যাগের পরিবর্তে গীতা কামনা ত্যাগ করতে বলছেন। — এখানে প্রাসঙ্গিক শ্লোক হল —

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মান্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যাভিধীয়তে।। ১৮/১১

দেহাভিমানী পুরুষ নিঃশেষে কর্মত্যাগ করতে পারে না, সুতরাং যিনি কর্মফলত্যাগী তিনিই ত্যাগী বলে অভিহিত হন।

আবার, কামনাত্যাগমাত্র যথেষ্ট নয়, কামনাত্যাগপূর্বক কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠান করা হচ্ছে ধর্ম। এই দ্বিতীয় নির্দেশ যোগ করে গীতার নীতিশাস্ত্র ইতিবাচক হয়ে উঠেছে, ধম্মপদ থেকে সরে এসেছে, এবং তার বক্তব্য স্বতন্ত্র ও অনন্য হয়ে উঠেছে।

গীতার এই বক্তব্য বিস্তার করবার জন্য, যে শ্লোকটিকে কর্মযোগের চতুঃসূত্রী বলা হয়েছে, তার অর্থ অনুধাবন করতে পারি। শ্লোকটি হল —

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহের্তুভূ মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি।। ২/৪৭

অর্থাৎ কর্মে মাত্র তোমার অধিকার আছে, ফলে তোমার অধিকার নেই, কর্মফলের হেতু হয়ো না, তোমাব অকর্মেও যেন আসক্তি না থাকে।

আপাতদৃষ্টিতে শ্লোকটির মধ্যে একটি অসঙ্গতি বা আত্মবিরোধ দেখা যায়। কর্মে অধিকার থাকলে, তার ফলে অধিকার না থাকে কি করে, বা কর্মফলের হেতু না হয়ে কর্মে অধিকার কি ভাবে হয়? এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গিরীন্দ্রশেখর অষ্টাদশ অধ্যায়ের একটি বিশ্লেষণের উল্লেখ করেছেন।[৮৫] সেখানে বলা হয়েছে যে কর্মের সিদ্ধি পাঁচটি শর্তের উপর নির্ভর করে — অধিষ্ঠান বা কর্মের বিষয়, কর্তা, করণ, চেষ্টা বা সাধনদ্রব্যের উপযুক্ত ব্যবহার এবং দৈব। গিরীন্দ্রশেখরের মতে 'কর্মফলে অধিকার নাই মানে তাহা সাধনায়ত্ত নহে। কর্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান সত্ত্বেও ফললাভ না হইতে পারে।' তার মতে ফলাফল অনিশ্চিত বলে ঈপ্সিত ফল লাভ না হলে দুঃখ পেতে হবে বলে, ফলের আশা করা অনুচিত। তিলকের বক্তব্যও অনুরূপ। 'আমি কর্ম করিতেছি, কর্মের অমুক ফল অবশ্যই [illegible]র পাওয়া উচিত' এই যদি কর্তার মনোভাব হয়, তবে বাঞ্ছিত ফললাভের পথে বাধা উপস্থিত হলে দুঃখপরম্পরার সূত্রপাত হবে। এই বাধা অনিবার্য বা দৈবকৃত হলে নিরাশা এবং মনুষ্যকৃত হলে ক্রোধ বা দ্বেষ উৎপন্ন হয়। এই সুবিধাগুলি প্রায়োগিক। ধম্মপদ এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করবেন। আধুনিক প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুও এই ধরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা গীতার পরবর্তী অনেক মন্তব্যেব সঙ্গে সুসঙ্গত নয়। যেমন কামসঙ্কল্প বর্জিত কর্ম হচ্ছে জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম, এই কর্ম বিশ্লেষণ করে গীতা বলছেন যে এই কর্মে ফলাসঙ্গ বা আসক্তি নেই, কর্তা এখানে নিত্যতৃপ্ত, সুতরাং তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হয়েও কিছুই করেন না — কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।[৮৬] গীতার মতে পবিবর্তিত মনোভাব হলে কর্তা কর্ম করলেও লিপ্ত হন না।

আসক্তিশূন্য কর্ম পদ্মপত্রে জলের সঙ্গে তুলনীয়।[৮৭] এই কর্ম আত্মশুদ্ধির কারণ। নিষ্কাম কর্মের এই দিকটি উপরের ব্যাখ্যায় ধরা পড়ে না।

এই শ্লোকটি সঠিক বুঝতে হলে কর্মবাদের প্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। কর্ম করলে সাক্ষাৎ কর্মফল তো সৃষ্ট হবেই, কিন্তু কর্মের নৈতিকমূল্য অনুযায়ী পাপ-পুণ্যরূপ নৈতিকফলও অনুনিষ্পন্ন হয়, এবং এই ফল অনুযায়ী কর্তার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারিত হয়। এই বিশেষফলই এই আলোচনাতে মুখ্য। মধুসূদন বলছেন যে, কদাচ — অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠানের আগে, পরে বা তৎসমকালে — যেন 'আমি ইহা ভোগ করব' এইরকম অধিকারবোধ না জন্মায়। এই অধিকারবোধ না থাকলে কর্তা কর্মফলহেতু হন না, ফল কামনায় কর্ম করলেই মাত্র কর্তা ফলের হেতু বা উৎপাদক হয়। 'ফল' কথাটির অর্থ অনেক। কর্ম সুষ্ঠুভাবে করবার জন্য ফলকামনা, অর্থাৎ কর্মের সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা তো থাকবেই। কর্তব্যবুদ্ধিও যদি প্রেরণা হয়, তবুও মনে হবে কাজটি যেন সিদ্ধ হয়, তা না হলে তো নিষ্ঠার অভাব দেখা দেবে। কিন্তু এইফল যদি আত্মকেন্দ্রিক হয়, স্বীয়স্বার্থবুদ্ধিতে যদি ফলকামনা করা যায়, বা ঐ নৈতিকফল যা স্বর্গ বা নরকে গমন নির্ধারণ করে তাই যদি কাম্য হয়, তবে কর্মফল মানুষকে উত্তরোত্তর শৃঙ্খলিত করবে। এটিই শ্লোকটির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদের অর্থ। সে কারণে কৃষ্ণ বলেছেন যে কর্মফলে আমার স্পৃহা নেই, তাই আমাকে কর্মসমূহ লিপ্ত করে না।[৮৮]

বাকি থাকে শ্লোকটির শেষপাদ — 'মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মনি' 'অকর্মে তোমার আসক্তি না হয়।' গীতায় কৃষ্ণের বক্তব্য হচ্ছে যে আক্ষরিক ভাবে নৈষ্কর্ম্য সম্ভবই নয়। রক্ষণশীল টীকাকারেরা গীতোক্ত কর্মের অর্থ করেছেন মীমাংসোক্ত নিত্যকর্মাদি। কিন্তু আমরা দেখি যে গীতাকার মানুষের তাবৎ কর্মকে কর্ম আখ্যা দিয়েছেন, যেমন— দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শণ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বসন, কথন, বিসর্জন, গ্রহণ, উন্মীলন, নিমীলন, ইত্যাদি।[৮৯] এই সমস্তই কর্ম বলে স্বীকৃত হলে, কর্মত্যাগ কি করে সম্ভব? মানুষ ক্ষণকালও কর্ম ব্যতিরেকে থাকতে পারে না, শরীরযাত্রাও সম্ভব নয় কর্ম ছাড়া।[৯০] আর গীতা বলছেন যে কর্মত্যাগের প্রয়োজনই বা কি, পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কর্ম করলে কর্ম তো আর বন্ধন স্বরূপ থাকে না। এই কর্ম অকর্মের চেয়ে শ্রেয়। কৃষ্ণ স্বয়ং লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করেন, জনকাদিও কর্মের মধ্য দিয়েই পরমপদ লাভ করেছেন। সুতরাং সর্বকর্মত্যাগ না করে সর্বকর্মফলত্যাগ করা বিধেয়। ঈশ্বরবাদী গীতা বলছেন যে কর্মযোগ ভক্তিযোগে পর্যবসিত হয়, ভক্ত সর্বকর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে। নবম অধ্যায়ে পরম স্নেহে কৃষ্ণ বলছেন —

> যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
> যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।

হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা কর, যাহা খাও, যাহা যজ্ঞ কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর সব কিছুই আমাতে অর্পণ কর।

কিন্তু অনাসক্ত কর্মের ব্যাখ্যা এইখানেই শেষ হয় না, আরেকটু আছে। কৃষ্ণের অর্জুনের প্রতি নির্দেশ — অনাসক্ত চিত্তে কর্তব্য কর্ম কর — তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর — নিরাসক্ত চিত্তে সর্বদা করণীয় কর্ম আচরণ কর।[৬১] আবার মন্তব্য করছেন তিনিই প্রকৃত যোগী এবং সন্ন্যাসী যিনি কর্মফল আশ্রয় না করে কার্য কর্ম করেন — অনাশ্রিতঃ কর্মফলঃ কার্যং কর্ম করোতি যঃ।[৬২] আবার সাত্ত্বিক পুরুষের বর্ণনায় আছে যে তিনি ফলাকাঙ্খী নহেন এবং 'যষ্টব্য' বা 'যজ্ঞ করা কর্তব্য' এই বুদ্ধিতে যজ্ঞ করেন বা 'দাতব্য' অর্থাৎ 'দান করা উচিত' এই বুদ্ধিতে দান করেন। এইভাবে কর্তব্যের ধারণা উপস্থাপিত করায় গীতার আদেশ বিশেষভাবে ইতিবাচক হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় অধ্যায় যুদ্ধকে 'ধর্ম্য' বলে বিশিষ্ট করেছেন।[৬৩] 'ধর্ম্য' মানে, যে ধর্ম পালনীয় কর্তব্য। 'ধর্ম্য' সংগ্রাম বলার মানে এই সংগ্রাম না করা পাপ, কর্তব্যচ্যুতি নামক অন্যায়। অনাসক্ত কর্ম শুধু বাসনাক্ষয় নয়, ব্যাবহারিক জীবনে তার যথেষ্ট একটি সদর্থক দিক আছে।

এই আলোচনার পরিপূরক হবে কর্তব্য বলতে গীতা কি বুঝিয়েছেন তার আলোচনা। কিন্তু তার আগে পরিবর্তিত মনোভাবের তৃতীয় অঙ্গ 'নির্মম ও নিরহংকার' বলে গীতাকার কি বুঝিয়েছেন তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ষোড়শ অধ্যায়ে অহংসর্বস্ব পুরুষের একটি চিত্র আছে। আজ আমার এই লাভ হল, আমার এই মনোরথ পূর্ণ হবে, এই আমার আছে, আমি আরও ধন লাভ করব। এই শত্রু আমি নিধন করেছি, আরও শত্রুদের বধ করব, আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, বলবান, সুখী। দাম্ভিক, ধনমানমদান্বিত, আসুরী স্বভাবের মানুষের এটি বর্ণনা। কাম্যবস্তু লাভ করার ও ভোগের জন্য অন্যায় ভাবে এঁরা অর্থ সংগ্রহ করেন। 'নিরহংকার' বা 'নির্মম' বলতে শুধু এঁদের বিপরীত চরিত্রের মানুষকেই বোঝানো হয় নি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞকে, ও দ্বাদশে ভক্তকে অন্যান্য বিশেষণের সঙ্গে নির্মম ও নিরহংকারও আখ্যা দেওয়া হয়। এই বিশেষণ দুটির ব্যঞ্জনা সুগভীর। ব্যাবহারিক জীবনে জীব বা ব্যক্তি দেহ-মনযুক্ত নিজেকে 'আমি' মনে করে। ধম্মপদও বলেছেন যে অজ্ঞানের বশে মানুষ পঞ্চস্কন্ধকে মমায়িত করে। গীতা এবং ধম্মপদ, উভয়েই বলবেন যে এটা ভুল জানা। গীতা দেখাচ্ছেন যে এই 'আমি'র পশ্চাতে যে নিত্য, অজ, অব্যয়, 'আমি' আছেন, তাকে আত্মস্বরূপ বলে জানলে, আমরা ক্ষুদ্র সীমিত ব্যাবহারিক আমির পরিধি অতিক্রম করতে পারব, যেটা জীবনের মূল লক্ষ্য। ধম্মপদ বলবেন যে ব্যাবহারিক আমি যে নেই, সেটা জানাই চরম জানা, তা হলেই কামনা-বাসনা ত্যাগ করা যায়। গীতার এই অধ্যাদেশ নৈতিকতার প্রসঙ্গেও মূল্যবান; আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তির পশ্চাতে আমাদের স্বীয় ইষ্টবুদ্ধি ও অনিষ্ট এড়াবার প্রয়াস কাজ করে। এই স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করলে, আমরা কর্তব্য কি তা সহজে বুঝতে পারব।

আরও দেখি যে এঁরা আত্মকেন্দ্রিক প্রবৃত্তি ত্যজ্য বলেছেন বলেই এঁদের দর্শনে কামক্রোধলোভভয় হচ্ছে পরিত্যজ্য রিপু। কৃষ্ণ বলছেন যে রজোগুণসমুদ্ভব কাম এবং ক্রোধ হল মানুষের পরম বৈরী।[৯৪] কাম, ক্রোধ, লোভ মানুষকে নরকে নিয়ে যায়, সুতরাং এরা পরিত্যজ্য। বীতরাগভয়ক্রোধ হলেন আদর্শ পুরুষ। ধম্মপদ বলবেন বীতরাগা রমিস্সন্তি — পদ্মপত্রে জলের মতন সুঁচের আগায় সরিষার মতন কামনা বাসনায় লিপ্ত হন না ব্রাহ্মণ।[৯৫] নিজের স্বার্থের প্রতি আকর্ষণ এইগুলির মূলে। প্রথমে থাকে অনুরাগ বা কামনা বা তন্‌হা, নিজের পরিপুষ্টির জন্য; তারই চরমরূপ লোভ; কামনা ব্যাহত হলে ক্রোধ, কাম্যবস্তু নষ্ট হবার আশঙ্কায় ভয়। নিরহংকার হবার আরেকটি দিক হল এই রিপুগুলি জয় করা। ধম্মপদে দেশনা—ক্রোধ সংবর, সম্পূর্ণ একটি বর্গে ক্রোধের আলোচনা আছে।

গীতায় অনেক নৈতিকগুণ প্রশংসিত হয়েছে যে গুলি ধম্মপদও গ্রহণ করবেন, যাকে সামান্য ধর্ম বলে। এর মধ্যে কয়েকটিকে আমরা পরিবর্তিত মনোভাবের অঙ্গ হিসাবে দেখেছি — যথা, সুখদুঃখে ঔদাসীন্য, সমতা, অনাসক্তি, আত্মতুষ্টি ইত্যাদি। গীতায় দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, আর্জব, সত্য, অক্রোধ, তেজ, ক্ষমা, শৌচ, সরলতা স্থৈর্য্য ইত্যাদি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত অসংখ্য সদ্‌গুণের উল্লেখ আছে।[৯৬] আমরা যদিও মনে করি যে অর্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদিত করবার নিমিত্ত, বা হিংসার ন্যায্যত্ব প্রতিপাদনের জন্য গীতা রচিত হয়েছিল, তবু দেখি বেশ কয়েকটি স্থলে অহিংসা শংসিত হয়েছে।[৯৭] শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা বা মনের দ্বারা যে প্রাণীপীড়ন তাই হিংসা, তার থেকে বিরত হওয়া অহিংসা। টীকাকারেরা বলবেন হিংসা অবশ্যই পরিত্যজ্য, কিন্তু কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে তা ন্যায্য হতে পারে। ধম্মপদ অনুযায়ী অহিংসা পরম ধর্ম, এবং কোন অবস্থাতেই কোন ব্যতিক্রম স্বীকার করবেন না। এই সমস্ত গুণের মধ্যে দুটি গ্রন্থই সংযমকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। ধম্মপদ ভিক্ষুবর্গে বলছেন যে সর্বপ্রকার সংযম হিতকর, এবং সংযত ভিক্ষু সকল দুঃখ থেকে মুক্ত হন। বিশদ করে এখানে চক্ষু, কর্ণ, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, বাক্য, মন সমস্ত কিছু সংযত করতে আদেশ করছেন।[৯৭] সংযমী পুরুষ নির্বাণের পথে অগ্রসর হন। ধম্মপদ ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্বের সহিত তুলনা করছেন — সংযত ইন্দ্রিয় যেন দমিত অশ্ব। ধাবমান অশ্বের গতিবেগ সংবরণের ন্যায়, যিনি ক্রোধ সংবরণ করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সারথি।[৯৮] সংযম আচরণীয়, কারণ সংযমের দ্বারা দুঃখমুক্তি হয়। গীতাতেও সংযমের বহুল প্রশংসা আছে। যজ্ঞের ব্যাখ্যায় গীতাকার বলছেন যে সংযমরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়গুলিকে আহুতি দিতে হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংযমের কিছু আলোচনা পাই। বিষয়ভোগে অক্ষমতা সংযম নয়; ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত করে, কেহ যদি মনে মনে বিষয়কে স্মরণ করে, সে মিথ্যাচারী। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়কে বশ করতে পেরেছেন তিনি স্থিতধী। বিষয়ের সঙ্গে মানুষের সকল সময় পারস্পরিক ক্রিয়া চলছে; এইসমস্ত বিষয় যেন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ

করবার অধিকার না পায়। বিষয় আধিপত্য বিস্তার করতে পারলে মানুষ ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। গীতা যদিও কূর্মের উপমা ব্যবহার করেছেন — কূর্মের অঙ্গের ন্যায় স্থিতপ্রজ্ঞের ইন্দ্রিয়াদি বিষয় হতে সঙ্কুচিত হয় — তথাপি ইন্দ্রিয়সংযম বলতে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, বা বহির্বিষয় ত্যাগ করে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখিনতা বোঝান নি। গীতাকার বলছেন যে আত্মবশ ইন্দ্রিয় নিয়ে, রাগ-দ্বেষ হতে বিমুক্ত হয়ে, স্বাধীন ভাবে বিষয়ে বিচরণ করে স্থিতপ্রজ্ঞ প্রসন্ন থাকেন। অর্জুন যখন কৃষ্ণকে স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তখন তার অন্যতম ছিল 'ব্রজেত কিম্'।[৯৯] অর্থাৎ বিষয় কি ভাবে গ্রহণ করেন। সেই প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোক। সংযমের আলোচনাতে গীতার ভঙ্গী সদর্থক। নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করে বিষয় গ্রহণ করা বিধেয়। এইস্থলে গীতার স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়।

এই সামান্যধর্মগুলি ছাড়াও গীতায় সক্রিয় ভাবে কর্তব্যপালনের নির্দেশ আছে। এই কর্তব্যকে গীতা বলছেন স্বকর্ম বা স্বধর্ম। স্বধর্মের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে স্ব বা কর্তা অনুযায়ী নির্ধারিত ধর্ম। আমরা দেখি যে মানুষের পারমার্থিক স্বরূপের বর্ণনা যেমন কৃষ্ণের প্রাথমিক অনুশাসনের উপক্রমণিকা, সেইরকম শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার আগে অর্থাৎ স্বধর্ম কি তা বিশ্লেষণ করবার পূর্বে, গীতাকার ব্যাবহারিক স্তরে মানুষের চরিত্রের প্রকারভেদ আলোচনা করেছেন। এখানে আধিবিদ্যক সিদ্ধান্ত হল যে অব্যয় দেহী বা আত্মা, স্বরূপে গুণাতীত হলেও, প্রকৃতিসম্ভূত তিনটি গুণের বন্ধনে সে দেহে আবদ্ধ হয়ে আছে। গুণগুলি প্রকৃতির উপাদান স্বরূপ। গীতাপ্রদত্ত লক্ষণ অনুসারে সত্ত্বগুণ নির্মল ও প্রকাশক, সে সুখের ও জ্ঞানের আসক্তির দ্বারা বন্ধন করে; রজ রাগাত্মক (সর্ববিধ সদর্থক আবেগ বা emotion হল রাগ) তৃষ্ণা ও আসক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে, কর্মের আসক্তির দ্বারা বন্ধন করে, তমোগুণ অজ্ঞানজ ও মোহজ-প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা বন্ধন করে।[১০০] গুণগুলিকে তৎকালীন জ্ঞানের প্রচলিত মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষা মনে করলে বলা যেতে পারে যে মানবমনের ও স্বভাবের গঠনবৈচিত্র্যের, তিনটি গুণের সাহায্যে বর্গীকরণ হয়েছে। আধিবিদ্যক সিদ্ধান্ত না মানলেও, এই বিভাগ যুক্তিযুক্ত মনে করা যেতে পারে। গীতা বলছেন যে গুণাতীত হওয়া পরম কাম্য, কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু অসঙ্গতি দেখা যায়। যে পরমপুরুষকে গীতা গুণাতীত, আদর্শপুরুষ বলে মনে করেছেন, তাঁর থেকে সাত্ত্বিক পুরুষের খুব বেশী পার্থক্য নেই।[১০১] বরঞ্চ অষ্টাদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলছেন যে পৃথিবীতে স্বর্গে বা দেবগণের মধ্যে এমন কেহ নেই যিনি তিন গুণ অতিক্রম করতে পারেন।

গুণের আধিক্যজনিত মানুষের শ্রেণীবিভাগ গীতায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হয়েছে।[১০২] যেমন গীতাকার বলছেন যে সাত্ত্বিকগণ দেবতাদের, রাজসগণ যক্ষরক্ষদের ও তামসগণ ভূতপ্রেতদের শ্রদ্ধা করে। খাদ্যের প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি — আয়ু, মনোবল, শারীরিক শক্তি, স্বাস্থ্য, সুখ ও তৃপ্তি বর্ধনকর, রসাল, রুচিকর, স্নেহযুক্ত ও সারবান খাদ্য সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের প্রিয়। তিক্ত, অম্ল, লবণাক্ত, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, স্নেহবর্জিত, জ্বালাকর পরিণামে

দুঃখজনক খাদ্য রাজসগণের প্রিয়। বাসী, শুষ্করস, দুর্গন্ধযুক্ত, বিকারপ্রাপ্ত উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র খাদ্য তামসগণের প্রিয়। এই শ্রেণীবিভাগ এক ধরণের ছিল। এরপব যজ্ঞ, দান, তপ, ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি, সুখ, ইত্যাদির শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এর মধ্যে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে তারা একটি বিশেষ ছকে পড়ে।

যেমন দেখি যজ্ঞের প্রকার ভেদ। ফলাকাঙক্ষাশূন্য হয়ে, কর্তব্য এই স্থিরবুদ্ধি নিয়ে বিধি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সাত্ত্বিক। ফলের আশায় দম্ভপূর্ণ ভাবে যে যজ্ঞ করা হয় তা রাজসিক। শাস্ত্রবিধিহীন, মন্ত্রহীন, শ্রদ্ধাহীন ও দক্ষিণাহীন যজ্ঞ তামসিক।

অনুমতভাবে তপেরও প্রকারভেদ করছেন। তপস্যা তিন রকমের হয় কায়িক, বাচিক ও মানসিক। সাত্ত্বিক পুরুষ এই তিন প্রকার তপস্যাই করেন শ্রদ্ধাসহকারে, যোগযুক্ত ও অফলাকাঙক্ষী হয়ে। মান ও পূজা পাওয়ার আশায় দম্ভ সহকারে তপস্যা করেন রাজসিক পুরুষ। মোহবশে। শরীরকে পীড়া দিয়ে, অন্যের বিনাশ কামনায় তপস্যা করে তামসিক মানুষ।

আপাতদৃষ্টিতে দানকে ধর্ম মনে হলেও দানের প্রকারভেদ দেখাচ্ছেন গীতাকার। প্রতিদানের প্রত্যাশা না রেখে, দান করা কর্তব্য এই মনোভাব নিয়ে, দেশকালপাত্র বিচার সহকারে যে দান করা হয় তা সাত্ত্বিক। প্রত্যুপকারের আশা নিয়ে, স্বর্গাদি ফল লাভের আকাঙক্ষাবশত, চিত্তে ক্লেশ সহকারে যে দান তা রাজসিক। অদেশে অকালে অপাত্রে সৎকাররহিত হয়ে অবজ্ঞা সহকারে যে দান তা তামসিক। যজ্ঞ, দান, তপ প্রশংসনীয় হলেও তা ফলাকাঙক্ষা ও আসক্তি বর্জনপূর্বক আচরণীয়।

একই ভাবে গীতাকার ত্যাগের বিচার করছেন। নিত্যকর্মাদি ত্যাগ করা উচিত নয় সর্বকর্মফল ত্যাগই ত্যাগ। আসক্তি ও ফলত্যাগ পূর্বক কর্তব্যবুদ্ধিতে নিয়ত কর্মের অনুষ্ঠান হল সাত্ত্বিক ত্যাগ। মোহবশে কর্মত্যাগ হল তামস ত্যাগ, দুঃখজনক এই বোধে কায়ক্লেশের বশে কর্মত্যাগ হল রাজস ত্যাগ। মধুসূদন ব্যাখ্যা কবছেন যে ফলাভিসন্ধিযুক্ত কর্ম বর্জনীয়, এই বর্জন ফলাভিসন্ধিরূপ বিশেষণ বর্জনেব দ্বারাও হ'তে পারে, আবার কর্মরূপ বিশেষ্য বর্জনের দ্বাবাও হ'তে পারে। অজ্ঞতাবসে বা ভয়হেতু বিশেষ্য বর্জন এখানে নিন্দিত, কর্মের অনুষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও ফলাভিসন্ধিরূপ বিশেষণ বর্জনের দ্বারা যে বিশিষ্টের বর্জন তা আচরণীয়।

সাত্ত্বিক কর্ম হল নিয়ত, আসক্তি রহিত, রাগদ্বেষের দ্বারা উদ্বুদ্ধ নয়, ফলাকাঙক্ষা এ কর্মের প্রেরণা নয়। বাজস কর্ম বহুল আয়াস যুক্ত, ফলাকাঙক্ষা ও অহংকারবোধ সমন্বিত। তামস কর্ম মোহবশে অনুষ্ঠিত হয়। কর্তা তামস কর্মে পরিণাম, নিজের ক্ষতি, কষ্ট বা ক্ষমতার পরিমাপ করে না। কর্তার শ্রেণীবিভাগও এর সঙ্গে সুসমঞ্জস। সাত্ত্বিক কর্তা 'মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো নির্বিকারঃ' অর্থাৎ তিনি আসক্তিরহিত, অহংভাব থেকে মুক্ত, সিদ্ধি বা কর্মের অসিদ্ধিতে নির্বিকার কিন্তু ধৃতি ও উৎসাহ সমন্বিত।

মধুসূদন বলছেন যে ধৃতি মানে ধৈর্য, যে অন্তঃকরণবৃত্তি বশে বিঘ্নাদি উপস্থিত হলেও প্রারদ্ধকর্ম ত্যাগ করা হয় না তাই ধৃতি। 'আমি ইহা করিব' এইরকম নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই উৎসাহ, ইহা ধৃতির হেতুস্বরূপ। রাজস কর্তা হচ্ছেন 'রাগী' অর্থাৎ emotion বা অনুরাগ ও দ্বেষরূপ আবেগ দ্বারা চালিত হন। ইনি ফললাভে আগ্রহী, হিংসুক, অপবিত্র এবং হর্ষ ও শোকরূপ কর্মফলের দ্বারা আকুলিত হন। তামস কর্তা অস্থিরমতি, প্রাকৃতস্বভাব, অনম্র ও শঠ আবার অসন্তুষ্টস্বভাব, অলস ও দীর্ঘসূত্রী।

এই আলোচনা থেকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিদের স্বভাববৈচিত্র্য পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। সাত্ত্বিক পুরুষ, অহংবুদ্ধিহীন, নিরাসক্ত, উদাসীন, তিনি কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা কর্মে প্রণোদিত হন, ধৃতি ও উৎসাহের স্বীকৃতি তাঁর স্বভাবে একটি নতুন ইতিবাচক মাত্রা যোগ করেছে। অর্থাৎ কর্মে তাঁর নিষ্ঠা আছে। রাজসিক ব্যক্তি অহংসর্বস্ব, আবেগ তাড়িত, ফলাশায় আকুলিত, এবং কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধির দ্বারা বিচলিত হন। তামস কর্তা অজ্ঞ, বিচারবুদ্ধিহীন, অলসমতি। কর্তব্যের প্রসঙ্গে গীতার এই যে ইতিবাচক দিকটি আছে, এটি ধম্মপদে অনুপস্থিত। আদর্শব্যক্তির অন্য লক্ষণগুলিকে ধম্মপদও মেনে নেবেন, কিন্তু এই মনোভাব নিয়ে সক্রিয়ভাবে কর্ম পালন করতে ধম্মপদ বলেন না। নৈতিক কর্তার এইরকম প্রকারভেদও ধম্মপদ স্বীকার করেন না। কিন্তু গীতাকে বুঝতে গিয়ে, এই প্রকারভেদের সম্মুখীন হয়ে আমরা একটি অসুবিধা বোধ করি। সত্ত্ব, রজ, তমকে প্রকৃতিসম্ভূত গুণ বলে উপস্থাপিত করছেন গীতা, কিন্তু যে সকল নৈতিক ধর্ম গীতার অনুশাসন, যাদের আমরা পরিবর্তিত মনোভাবের অঙ্গ মনে করেছি, সেগুলি সত্ত্বগুণীর লক্ষণ। প্রশ্ন ওঠে যে গুণ অনুসারে যে শ্রেণীবিভাগ তা কি স্বভাববৈচিত্র্য অনুসারে বিভাগ না নৈতিক মূল্যমান অনুসারে বর্গীকরণ?

যাই হোক, গুণগত পার্থক্য আলোচনার পটভূমিকায় কৃষ্ণ স্বধর্মের ধারণা উত্থাপন করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলছেন যে চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ[১০৩] — আমি চতুর্বর্ণব্যবস্থা সৃষ্টি করেছি গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে। বর্ণানুগত কর্মের বিশদ তালিকা দিচ্ছেন অষ্টাদশ অধ্যায়ে।[১০৪] ব্রাহ্মণের কর্ম হল শম, দম, তপ, শৌচ ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য, ক্ষাত্রকর্ম হল শৌর্য, তেজ, ধৃতি দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও প্রভুত্ব; বৈশ্য কর্ম হল কৃষি, পশুপালন ও রক্ষা, বাণিজ্য, শূদ্রের কর্ম হল পরিচর্যা। এই কর্মগুলিই স্বধর্ম, স্বকর্ম, বা আধুনিক পরিভাষায় বিশেষ কর্তব্য। স্বধর্মের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল স্বনিরূপিত ধর্ম, সুতরাং প্রশ্ন ওঠে যে স্ব কোন অবচ্ছেদে ধর্মের নিয়ন্ত্রক? আপাতদৃষ্টিতে এখানে একটি চক্রক দোষ আছে মনে হয় কারণ ধর্মগুলি উপস্থাপিত হয়েছে বর্ণক্রমে, আবার উদ্ধৃত উক্তি অনুসারে বর্ণের নিয়ন্ত্রক গুণ ও কর্ম। কৃষ্ণের আরেকটি উক্তি — কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ[১০৫] বা স্বভাবজাত গুণের দ্বারা কর্মবিভাগ হয়েছে। নির্গলিতার্থ দাঁড়াচ্ছে যে স্বভাবপ্রসূত গুণ, তথা গুণ নিরূপিত কর্ম অনুসারে

বর্ণবিভাগ হয়েছে। এইজন্যই কর্ম বা ধর্মগুলি বর্ণানুগত এবং এই কর্মগুলিই স্বধর্ম। কর্তার স্বভাবই (যাকে গুণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে) কর্মের এবং বর্ণের মূল নিয়ন্ত্রক। এইজন্যই কৃষ্ণ স্বধর্মকে স্বভাবনিয়ত, স্বভাবজ ও সহজ কর্ম বলেছেন।

স্বধর্মের ধারণা গীতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বধর্ম সম্পর্কে কৃষ্ণের কয়েকটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে স্বধর্ম অনুসারে তাঁর যুদ্ধ করা কর্তব্য, এবং ধর্মযুদ্ধে যোগদান না করলে তাঁর পাপ হবে। এর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে স্বধর্মরূপ কর্তব্য থেকে চ্যুত হওয়া অন্যায়।[১০৬] দ্বিতীয়ত কৃষ্ণ বলছেন যে বিগুণ স্বধর্মপালন সুসম্পাদিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেয়। তিনি আরও আশ্বাস দিচ্ছেন যে স্বধর্ম পরিপালনে আপাতদৃষ্টিতে পাপ সংজড়িত আছে মনে হলেও, কর্তব্যবুদ্ধিতে স্বধর্মাচরণ করলে পাপ হয় না।[১০৭] তৃতীয়ত মানুষ স্বীয় কর্মে নিরত থাকলে সিদ্ধি লাভ করে, এবং এই সিদ্ধি হচ্ছে পরমা সিদ্ধি, এবং স্বধর্মাচরণ ঈশ্বরের অর্চনাস্বরূপ।[১০৮]

স্বধর্মের ব্যাখ্যায় কয়েকটি প্রচলিত অভিমত সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন। প্রথমত আমরা মনে করি যে সুষ্ঠুভাবে সমাজ পরিচালনার জন্য ভারতবর্ষে বর্ণব্যবস্থার প্রচলন হয় এবং গীতায় কৃষ্ণ সেটি সমর্থন করছেন। সুতরাং স্বধর্ম হচ্ছে সমাজনির্দিষ্ট কর্ম এবং সমাজের হিত বা মঙ্গল এখানে মুখ্য। বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে এই অভিমত যথার্থ হলেও গীতায় কৃষ্ণ কিন্তু সমাজব্যবস্থাকে এত গুরুত্ব দেন নি। এমন কি যদিও প্রথম অধ্যায়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে অর্জুন আশঙ্কা করছেন যে যুদ্ধের ফলে কুলধর্ম নষ্ট হবে, তবু তাঁর আশঙ্কা মোচনের জন্যও কৃষ্ণ বলছেন না যে কুলধর্ম রক্ষা করবার জন্য স্বধর্মাচরণ আবশ্যক। মনে হয় সমাজনির্দিষ্ট কর্ম না বলে স্বভাব অনুগামী কর্ম বলেই কৃষ্ণ স্বধর্মকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু অনেক শ্রদ্ধার্হ আধুনিক চিন্তকেরা, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, বালগঙ্গাধর তিলক বা গিরীন্দ্রশেখর, যেমন স্বধর্মকে স্বভাব নিরূপিত বলে স্বীকার করেছেন তেমনই সমাজ অনুমোদিতও বলেছেন।

দ্বিতীয়ত আমরা মনে করি যে, যে বর্ণব্যবস্থা ভারতের চরম অধঃপতনের জন্য দায়ী, যে বর্ণ উত্তরাধিকার সূত্রে জন্ম দিয়ে নির্ধারিত হয়, যে বর্ণব্যবস্থা অনুসারে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হয়, তার সমর্থন পাওয়া যায় গীতায়। কিন্তু এই অভিমতও গ্রহণযোগ্য নয়, গীতা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের কর্মকে স্বভাবজ কর্ম বলেছেন। নৈতিককর্তার স্বভাবগত, গুণগত ভেদের আলোচনার পটভূমিতে তিনি বর্ণব্যবস্থা আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। বর্ণকে তিনি জন্মসূত্রে লব্ধ বলেন নি। এমন যদি হয় যে জন্মগত বর্ণব্যবস্থা সমাজে এত সুপ্রচলিত ছিল যে তা পৃথক করে উল্লেখ করা কৃষ্ণ প্রয়োজন মনে করেন নি, তবে সে অন্যকথা। কিন্তু স্বভাবগত ভেদ কর্মের নিয়ামক না হলে, এই প্রকারভেদের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয় না। কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, গীতার রক্ষণশীল টীকাকার, ভাষ্যকারেরা জন্মকেই বর্ণ তথা বর্ণগত কর্মের নিয়ামক মনে করেছেন।

গীতার বক্তব্যকে তাঁরা নিজেদের মতের সঙ্গে সুসঙ্গত করে সাজাতে পেরেছেন কারণ কর্মবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় এঁদের নিকট অলিখিত প্রাকসিদ্ধান্ত ছিল যে মানুষের স্বভাব আবশ্যিক ভাবেই বর্ণানুগত হয় সুতরাং বর্ণানুগত কর্ম নিশ্চিতভাবেই স্বভাবানুগত কর্ম। এতে একটি বিশেষ সুবিধা ছিল যে প্রত্যেক মানুষ কর্তব্য-অকর্তব্যের সুনিশ্চিত নির্দেশ পেতেন, নৈতিক সমস্যার সমাধান করা অপেক্ষাকৃত সহজ হত। আধুনিক প্রাবন্ধিকদের কর্মবাদে বিশ্বাস শিথিল হয়েছে, তাঁরা স্বভাবকেই মুখ্য নিয়ন্ত্রক মনে করেন, স্বভাব অনুযায়ী ধর্মই স্বধর্ম, বর্ণকে অনেকে অবাস্তব মনে করেন। এবং যাঁরা বর্ণব্যবস্থাকে সমাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মনে করেন, তাঁরাও স্বভাব অনুযায়ী বর্ণ নির্ধারিত হবে বলেন। এই ধরণের ব্যাখ্যাতে আমরা সমস্যা সমাধানের কোনও বস্তুগত মাপকাঠি পাই না, শুদ্ধ জীবন স্বধর্মের মাধ্যমে মানুষের অন্তরস্থিত সম্ভাবনার পূর্ণবিকাশ হয়ে ওঠে, এক ধরণের পূর্ণতাবাদের দিকে আমরা অগ্রসর হই। এই ধরণের ব্যাখ্যা কৃষ্ণের শেষ দিকের উক্তির সঙ্গে সুসঙ্গত হয়। তিনি বলছেন যে ঈশ্বর সর্বপুরুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, স্বভাব নিয়ত কর্ম তাই ঈশ্বর নির্দিষ্ট কর্ম। স্বধর্ম পালন তাই ঈশ্বরার্চনা।[১০২] নিরীশ্বরবাদী তাই পূর্ণতাবাদেই থেমে যেতে পারেন, ঈশ্বর বিশ্বাসীর নিকট ঈশ্বর শরণাগতিই গীতার শেষ কথা।

কৃষ্ণের স্বধর্ম বিশ্লেষণ অনুসরণ করলে কিছু অতৃপ্তি আমাদের থেকে যায়। গুণগত ভেদ অনুসারে তিনি চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু কোন বর্ণে কোন গুণের আধিক্য আছে তা বলেননি, এর জন্য আমাদের টীকাকার ভাষ্যকারদের উপর নির্ভর করতে হয়। আবার গুণগত প্রকারভেদের আলোচনায় তিনি একই কর্মের বিভিন্ন বিকল্প দেখিয়েছেন। যেমন সাত্ত্বিক দান, রাজসিক দান বা তামসিক দান। কিন্তু বর্ণবিভাগের ক্ষেত্রে কর্ম একেবারে পৃথক করে দেখাচ্ছেন, যেমন ব্রাহ্মণের স্বধর্ম জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলন হলে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম ক্ষত্রিয়োচিত বা রাজসিক ভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চা নয় তা শৌর্য-বীর্য-প্রজাপালন। আরও মনে হয় যে স্বভাবজনিত গুণগত ভেদকে মৌল ধরে কৃষ্ণ যদি নীতিশাস্ত্র গঠন করতে চাইতেন, তবে সাত্ত্বিকের কর্তব্যকে তার স্বধর্ম বা রাজসিক পুরুষের কর্তব্যকে তার স্বধর্ম বলে নির্ধারণ করলেই হত। চতুর্বর্ণকে টেনে এনে, তাকে গুণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে, স্বধর্মকে ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন ছিল না। আমরা দেখছি যে তিনি মানুষের ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্যকে মেনেছেন, আবার বৈসাদৃশ্যকে সাদৃশ্য অনুযায়ী সাজিয়েছেন। পূর্ণতাবাদ করতে চাইলে, স্বধর্মকে অন্তরস্থিত সম্ভাবনার অভিব্যক্তি মাত্র মনে করলে, প্রতিটি কর্তাকে অনন্য মনে করাও চলত। যাই হোক, ধম্মপদের সঙ্গে পার্থক্য এখানে সুপ্রকট। ধম্মপদ মানুষের একটিই ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সকলকে এক ছাঁচে ঢালা মনে করেছেন। সেই অনুসারে সকলের ধর্ম এক ও নেতিবাচক। অনাত্ত্বাবাদ অনুযায়ী আত্মাও নেই, বিষয়ও নেই, সুতরাং 'তন্‌হার' মূলে অজ্ঞান। বৌদ্ধমতে কার তৃষ্ণা, কিসের জন্য তৃষ্ণা, তার কোনও সন্তোষজনক উত্তর

নেই। ধম্মপদের উপদেশ সরল, কোনও সমস্যার মধ্যে প্রবেশ করেন নি। গীতা মানুষের পার্থক্যকে স্বীকার করে, কর্তব্যের মধ্যেও পার্থক্য দর্শন করছেন। এখানে গীতার দৃষ্টিভঙ্গী যথেষ্ট স্বতন্ত্র।

এখানে গীতার আরেকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গীতাও কিন্তু বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলছেন যে যাঁরা বেদবাদরত, অর্থাৎ যাঁরা বেদ ব্যতীত আর কিছু নেই মনে করেন যাঁরা কামনাময় স্বর্গাভিলাষী, তাঁদের সমাধিতে নিশ্চলাবুদ্ধি হয় না।[১১০] বা নবমে বলছেন যে সোমপাগণ স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ করে স্বর্গগমন করেন এবং পুণ্যক্ষয় হলে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন।[১১১] কিন্তু ধম্মপদের বিদ্রোহ অনেক বেশী চরম। গীতাকার বৈদিক জ্ঞানের সঙ্গে পরম্পরারক্ষা করে, আস্তিক চিন্তাকে আশ্রয় করে, কিছু সংস্কারের প্রয়াসী। যেমন যজ্ঞকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু বলছেন যে সর্বযজ্ঞের মধ্যে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ বা ইন্দ্রিয়গুলিকে আত্মসংযম যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। তিনি এইভাবেই হয়ত প্রচলিত চতুর্বর্ণব্যবস্থাকে যুক্তিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। রাজসিক ব্যক্তির কর্তব্য প্রজাপালনের জন্য ধর্মযুদ্ধ করা, অর্জুন রজোগুণী সুতরাং তাঁর কর্তব্য ধর্মযুদ্ধ করা, বললে ব্যাপারটা হয়ত সহজ ও সুদৃঢ় হত। কিন্তু ঐ কথা বললে গীতার এই ব্যাপ্তি ও প্রসার হত না, এবং যুগে যুগে তাকে নতুন করে বোঝাবার আর অবকাশ থাকত না।

ধম্মপদ সাধারণ মানুষের জন্য বর্ষিত বুদ্ধের অমৃতবাণী। তৎকালীন কথ্য ভাষায় রচিত অজস্র গাথা ও গাথাপ্রসঙ্গ কাহিনী সংবলিত। এতে বুদ্ধের নৈতিক দেশনার সঙ্গে সঙ্গে অজস্র সাংসারিক বিচক্ষণতার উপদেশ আছে। যেমন বুদ্ধ বলছেন যে অর্থহীন সহস্র কথার থেকে, যা শুনে লোকে শান্তি পায় এমন একটি অর্থপূর্ণ কথাও শ্রেয়। এ উপদেশের কোন নৈতিক মূল্যমান না থাকলেও এটি ব্যাবহারিক জীবনে অর্থবহ বটে। আবার কর্কশবাক্যের বিরুদ্ধে বুদ্ধের সাবধানবাণী — কাহাকেও কর্কশবাণী বোলো না, কারণ কর্কশবাক্যের প্রত্যুত্তর কর্কশই হবে। ক্রুদ্ধবাক্যমাত্রই দুঃখদায়ক, তার প্রত্যাঘাত শ্রোতাকে এসে লাগে। ভগ্নকাঁসরের মতন নিজেকে নীরব রাখতে পারলে নির্বাণ অধিগত হয়।[১১২] কর্কশবাক্যের পরিহার নির্বাণের পথে অগ্রসর হতে কি করে সাহায্য করে জানি না, তবে জীবনকে নিঃসন্দেহে সুসহ ও উপভোগ্য করে। এইরকম আরেকটি সুভাষিত —

> অক্‌কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
> জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং।। ১৭/৩

এর সঙ্গে তুলনীয় মহাভারতের উক্তি —

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্ অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম।।

এর থেকে বোঝা যায় যে এই ধরণের ব্যবহার সেই সমাজে ধর্মনির্বিশেষে প্রশংসিত হত।

বুদ্ধের আরেকটি মন্তব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে, যাকে স্বয়ং বুদ্ধ বলছেন যে এই জ্ঞানটি পুরাতন, অদ্যকার নয়। মন্তব্যটি হল — লোকে নীরবে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে নিন্দা করে, বহুভাষীকে নিন্দা করে, মিতভাষীকেও নিন্দা করে — পৃথিবীতে অনিন্দিত কেহ নাই। অন্যত্র বলছেন যে অন্যের বর্জনীয় দোষ সহজেই চোখে পড়ে, নিজের দোষ নজরে পড়ে না।[১১৩] লোকে অপরের দোষ ভুষির মতন ছড়িয়ে বড় করে দেখে আর বাঘের আত্মগোপনের ন্যায় নিজের দোষ লুকায়। সাধারণ মনুষ্যচরিত্রে বুদ্ধের সুগভীর অর্ন্তদৃষ্টির পরিচায়ক এই সুন্দর গাথাগুলি। এগুলি কোনও সুস্থির পরম লক্ষ্যের প্রতি একমুখী না হলেও সামান্যত চরিত্র গঠনে সহায়ক তো বটেই। ধম্মপদ নানা বিভিন্ন পরিবেশে প্রদত্ত বুদ্ধের বিচিত্র উপদেশের সংকলন গ্রন্থ। তাঁর সমগ্র মতবাদ পটভূমি হয়ে উপস্থিত, সুগঠিত নীতিবাদ হিসাবে পরিবেশিতও হয় নি, সামগ্রিক একটি মত হিসাবে তাকে পাওয়াও যায় না। দুঃখী মানুষের কাছে তার আবেদন এবং তাই ধর্মনির্বিশেষে তাব সমাদর অতি বিস্তৃত।

গীতার কেন্দ্রে অর্জুনের মোহজনিত সমস্যা, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই নিজ সমস্যা সমাধানের ও নির্মোহ হবার তাগিদ আছে। অর্জুনের সমস্যাকে সামনে রেখে নৈতিকতার মূলসূত্রগুলি আলোচনা করছেন কৃষ্ণ, যে নীতিবাদের ভূমিকায় আছে এক অধ্যাত্মবাদ এবং যার পরিণতি এক ঈশ্বরবাদে। আগেই বলেছি যে আধিবিদ্যক আধ্যাত্মিক প্রাক্‌সিদ্ধান্ত থেকে মুক্ত করেও গীতার নীতিনির্দেশকে বোঝা যায় ও গ্রহণ করা যায়। ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা একই। গীতার নৈতিক অনুশাসনকে ঈশ্বরের ধারণা আরো সুবোধ্য করে, কিন্তু ঈশ্বর গীতার মূল বক্তব্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। ধম্মপদেও বুদ্ধের শরণাগতির কথা বারংবার উল্লেখিত হয়েছে কিন্তু সেই বুদ্ধকে আর খুব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় নি। গীতায় ঈশ্বর বিশ্বতোমুখ; নানা ভাবে তাঁর বর্ণনা আছে, ঈশ্বর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আভাস একটি দেওয়া হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মানুষের ইতিহাসে সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রথম প্রয়াস বোধহয় গীতায়। কৃষ্ণ বৈদিকধর্মের সমালোচনা করেছেন, নতুন অর্থ করেছেন, কিন্তু পরম্পরা রক্ষা করেছেন। প্রচলিত অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর করুণা ও ঔদার্য্য অসীম। তিনি বলছেন যে অন্যধর্মাশ্রয়ী শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, নিষ্ঠা সহকারে অন্য দেবতার যজনা করে, তারাও অবিধিপূর্বক আমারই যজনা করে।[১১৪] বা যে যে ভক্ত যে যে মূর্ত্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্চনা করে, আমি সেই সেই ভক্তের সেই প্রকারই অচলা শ্রদ্ধা[১১৫] বিধান করি। যে যে ভাবে আমায় আশ্রয় করে, তাকে

আমি সেইভাবেই ভজনা করি, আমার পথেরই অনুগামী সমগ্র মানবকূল।

গীতার ঈশ্বরের বর্ণনা পরস্পর সুসংহত না হতে পারে কিন্তু বহুমুখী। বিভূতিযোগে ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যবান, জগতে যা কিছু সুন্দর, শুভ, শ্রেষ্ঠ তার মধ্যে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ। বিশ্বরূপদর্শন যোগে সর্বসংহারক প্রবুদ্ধ কালরূপী বিশ্বমূর্ত্তি ভগবান। জীবনের অমোঘ সত্য করাল মৃত্যুর অভিমুখে সমস্ত প্রাণী অনিরুদ্ধ বেগে অগ্রসর হচ্ছে কখনও নিজের অজ্ঞাতসারে স্রোতস্বিনী জলরাশির মতন, কখনও বা জেনে বুঝে প্রদীপ্ত জ্বলনের দিকে পতঙ্গের মতন। মানুষ যে বিশ্বপটে কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ, বৃথাই সে তার ক্ষুদ্র অহংবোধকে আঁকড়ে থাকে, বিশাল কর্মযজ্ঞে সে নিমিত্তমাত্র। কৃষ্ণের অনুশাসনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হচ্ছে অর্জুনের। পুরুষোত্তম যোগে ঈশ্বর সর্বব্যাপী বিরাট — ক্ষর-অক্ষরকে ধারণ করে আছেন তিনি। আবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে গীতার পরিসমাপ্তিতে কৃষ্ণ বলছেন যে সকলের হৃদ্দেশে অবস্থান করে ঈশ্বর, যন্ত্রারুঢ়ের ন্যায় মানুষকে পরিচালনা করছেন। এখানে এক অনতিক্রম্য নিয়তিবাদ। আবার একই সঙ্গে আশ্বাস দিচ্ছেন ও নির্দেশ দিচ্ছেন কৃষ্ণ সমস্ত নীতি-অনুশাসন বিশ্বরহস্যের উপদেশ সম্যক বুঝে — যথেচ্ছসি তথাকুরু — যাহা ইচ্ছা, তাহা কর। সারমর্ম এই যে প্রত্যেক মানুষের স্বধর্ম স্বতন্ত্র ও অনন্য, তাকে বর্ণানুসারে বিভক্ত করলেও তা স্বভাবনিয়ন্ত্রিত। স্বধর্ম বহিরাগত জন্মসূত্রে নির্ণীত কর্তব্য নয়। ঈশ্বর নির্দিষ্ট স্বভাবকে স্বীকার করে, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা থেকে মুক্ত হয়ে, স্বভাবের সঙ্গে সুসমঞ্জস কর্তব্য পরিপালনই জীবনে আদর্শ। এতে স্বভাবগত সম্ভাবনার বিকাশ হয়, এটিই ঈশ্বরের অর্চনা এবং এই জীবনই ঈশ্বরের নির্দেশের বহিঃপ্রকাশ। ধম্মপদ এইরকম জটিল নীতিনির্দেশ প্রস্তুত করবার প্রয়াসই করেননি।

টীকা ও তথ্যপঞ্জী

১। ধম্মপদ, সম্পাদক রণব্রত সেন, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা - ৭,
২। ঐ, পৃঃ ৪০
৩। ঐ, ১০/১
৪। গীতা. ১৯
৫। ধম্মপদ, ৭/৭
৬। ঐ, ২০/৯
৭। ঐ, ১৭/১৪
৮। ঐ, ২৫/১৯
৯। ঐ, ২৬/৯
১০। গীতা, ১৮/৫২
১১। ঐ, ১৭/১৪-১৭
১২। ঐ, ৫/১১

১৩। ঐ, ৬/১
১৪। ধম্মপদ, ১/৯
১৫। ঐ, ২২/২
১৬। ঐ, ১০/১৩, ১৪
১৭। ঐ, ১৯/৫, ৬
১৮। ঐ, ১৯/৯
১৯। গীতা, ৩/৬
২০। ঐ,
২১। ধম্মপদ, ৬/১০
২২। ঐ, ১৪/১৩
২৩। ঐ, ১৫/৭, ৮
২৪। ঐ, ৮/১৫
২৫। ঐ, ২০/১৬,১৭
২৬। ঐ, ১৬/১০
২৭। ঐ, ৭/৮
২৮। ঐ, ১১/৮, ৯
২৯। ঐ, ২/৩
৩০। ঐ, ১৬/১০
৩১। ঐ, ২৩/৪
৩২। ঐ, ৭/৩, ৪
৩৩। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা সহ, নলিনীকান্ত ব্রহ্ম সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স,
৩৪। গীতা, ৫/২৪, ২৫, ২৬
৩৫। গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায় ও ধম্মপদ-ব্রাহ্মণবর্গ।
৩৬। ধম্মপদ - ১৮/২, ৪
৩৭। ঐ, ২৫/২০, ২১
৩৮। ঐ, ১৪/১২
৩৯। ঐ, ২১/৯
৪০। ঐ, ১৪/১৬
৪১। গীতা, ৩/২০-২৪ ও মধুসূদনের টীকা
৪২। ঐ, ৬/৪, ৫
৪৩। ধম্মপদ ১৪/৪
৪৪। ঐ, ৮/৪, ৫
৪৫। ঐ. ২৩/৩

৪৬। ঐ, ১২/১০
৪৭। ঐ, ১১/১
৪৮। ঐ, ৩/৮
৪৯। ঐ, ৩/৯
৫০। ঐ, ১৩/৪
৫১। ঐ, ৪/৩
৫২। ঐ, ৪/৪; ২০/১৫
৫৩। ঐ, ১০/৭
৫৪। ঐ, জরাবর্গ
৫৫। ঐ, ১৬/২
৫৬। ঐ, ২১/১
৫৭। ঐ, ৫/৭,১০, ১২
৫৮। ঐ, ৯/১, ২, ৩, ৪, ৫, ১২, ১৩
৫৯। ঐ, ১৪/৪, ৫
৬০। ঐ, ১৪/১২-১৪
৬১। ঐ, ৩/৭
৬২। ঐ, ১৯/১২, ১৪
৬৩। ঐ, ৬/৬, ৮
৬৪। ঐ, ১৮/১৭
৬৫। ঐ, ১৭/১
৬৬। ঐ, ২৫/৮
৬৭। ঐ, ১৪/১৮
৬৮। ঐ, ২৪/৩৫
৬৯। গীতা, ৬/১৮, ২২
৭০। গীতা, ৬/১৮, ২২
৭১। ভগবদ্গীতা, গিরীন্দ্রশেখর বসু, কলিকাতা,
৭২। গীতা, ১৮/৬৩
৭৩। ঐ, ১৮/৭৩
৭৪। গীতা, গিরীন্দ্রশেখর বসু
৭৫। গীতা, ২/৪৫
৭৬। ঐ, ৪/২২
৭৭। ঐ, ৫/৩
৭৮। ঐ, ১৫/৫
৭৯। ঐ, ১৫/৫
৮০। ঐ, ২/৫৬, ৫/২০

৮১। ঐ, ১২/১৭
৮২। ঐ, ৩/২৫
৮৩। ঐ, ৫/১১
৮৪। ঐ, ৯/৯
৮৫। গীতা, গিরীন্দ্রশেখর বসু, পৃঃ ৫০
৮৬। গীতা, ৪/১৯, ২০
৮৭। ঐ, ৫/৭, ৯, ১০, ১১
৮৮। ঐ, ৪/১৪
৮৯। ঐ, ৫/৮, ৯
৯০। ঐ, ৩/৫, ৮
৯১। ঐ, ৩/১৯
৯২। ঐ, ৬/১
৯৩। ঐ, ২/৩১
৯৪। গীতা, ৩/৩৭
৯৫। ধম্মপদ, ২৬/১৯
৯৬। গীতা, ১৬/১
৯৭। ধম্মপদ, ২৫/১,২, ৩
৯৮। ঐ, ৭/৫, ১৭/২
৯৯। গীতা, ২/৬৩-৬৪
১০০। ঐ, চতুর্দশ অধ্যায়
১০১। ঐ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়
১০২। গীতা, ১৮/২৬
১০৩। ঐ, ৪/১৩
১০৪। ঐ, ১৮/৪১-৪৪
১০৫। ঐ, ১৮/৪১
১০৬। ঐ, ২/৩৩
১০৭। ঐ, ১৮/৪৭
১০৮। ঐ, ১৮/৪৫, ৪৬
১০৯। ঐ, ১৮/৬১
১১০। ঐ, ১৮/৪২-৪৪
১১১। ঐ, ৯/১১
১১২। ধম্মপদ, ১০/৫, ৬
১১৩। ঐ, ১৭/৭, ৮
১১৪। গীতা, ৯/২৩
১১৫। ঐ, ৭/২১

নির্দেশিকা

অঙ্গুত্তর-নিকায় ২৬১
অর্থাপত্তি/আক্ষেপ ২১৫-১৬
অর্থবাদ ২০৯
অদৃষ্ট/ধর্মাধর্ম/অপূর্ব ২১, ৩৬-৩৮, ৩৯, ৫৪, ১৯২, ১৯৩-৯৪, ২২১, ২৫১
অদ্বৈত বেদান্ত ২০, ৪৭, ৫৩, ৫৬, ১৮৫-২০৮, ২৪৮, ২৫১, ২৯৫
অনাগার ২৮৩
অবিদ্যা/অজ্ঞান ৪২, ১৯৬, ২৭০, ২৭১, ২৮৮
অষ্টাঙ্গিক মার্গ ২৭৩-৫, ২৮৭
আততায়ী ২৫. ১৪৬, ১৪৭
আত্মা ১৮, ২৬, ৪২, ৪৮, ৪৯, ৫২, ৫৩, ৭০, ৭১, ৮০, ৮৯, ১৫১-২. ১৫৯-৬০, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৭১, ১৭৪, ১৭৬, ২০০, ২১০, ২৫১, ২৮৮, ২৮৯-৯০, ২৯৩, ২৯৫, ৩০২, ৩০৬
আর্যসত্য ২৬৮, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৪, ২৮৭
ইষ্টসাধনতাজ্ঞান ২৪, ৩০, ৩৪, ৫৪, ২২৯-৪৩
উচ্ছেদবাদ ২৬৬
উদয়নাচার্য্য ২১২, ২৪০-২, ২৫৮
উদ্যোতকর ২৬৯
উপাদান ২৭০, ২৭১
ঋণ/মহাযজ্ঞ ১২, ১৪, ৩২, ৪৬, ৬৪, ৬৮-৯, ৭৩, ৮৭-৮, ১০০-৩
ঋত ২০, ২৯-৩০, ৬৪, ৭৪, ৮১, ৮২, ৮৪-৬
কণাদ ৩০
কর্তা-লক্ষণ ২২৮-৯
শ্রেণীবিভাগ ৩০৩-৪
কর্ম ২৪, ৪৯, ১০০, ১২০, ১২১, ১৫২, ১৫৩-৭৮, ১৮৮, ২০০, ২৪৯, ২৬৩, ২৮০, ২৮৭, ২৯৬, ২৯৮
কর্মবাদ ২০-১, ৩৪-৬, ৬৪, ২৫১, ২৫২, ২৮০-২, ২৯৯
কর্মবিভাগ ৩৭-৮, ১৬৯, ১৯৮, ২৩৩, ২৪৬
কাম্য ৩৮, ৪৬, ৬৮, ১৯২, ২৩৩, ২৯৭
নিত্য ৩৮, ৪৬, ৬৮, ১৯১, ১৯২, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২৩৩-৬, ৩০৩
নৈমিত্তিক ৩৮, ৪৬, ৬৮, ১৯৮, ১৯৯, ২৩৩-৬
কান্ট ২৮, ২৫, ২৭, ২৭৯
কাপালিক ২৫৪, ২৫৮
কালিদাস ভট্টাচার্য্য ৫৬-৮
কৃচ্ছ্রতাবাদ ২৬৭
কৃষ্ণমিশ্র ২৫৫
ক্রিয়া ২১০, ২৭৮, ২৮১
গিরীন্দ্রশেখর বসু ২৯৪-৫
গীতা (শ্রীমদ্‌ভগাবদ্) ১৮, ২৩, ২৫, ৩১, ৩২, ৩৭, ৫৮, ৫৯, ৯৬, ১২০, ১৪৫-১৮০, ১৮৫, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১, ২৬৩, ২৮৫-৩০৯

গুণরত্ন ২৫৮
চার্বাক ১২, ৪৮, ২৪৭-৬০
চিকীর্ষা ৩৩, ৩৪, ২২৯-৩১
চিত্ত ২৭০, ২৭২, ২৭৩, ২৭৫, ২৮৬, ২৮৮, ২৯৩
চেতনা ২৭০, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৮০
চেতয়িত্বা ২৭৭
জন্মান্তরবাদ ৩৫, ৭১, ২৫১, ২৫২, ২৮৭
জরামরণ ২৭০, ২৭১
জাতি ২৭০, ২৭১
জ্ঞানমার্গ ২৬৪
তিলক ৪৭, ৫৮, ২৭০, ২৭১, ২৮৮, ২৯৩, ২৯৮
তৃষ্ণ/তন্‌হা ২৬৭, ২৬৯, ২৮৬, ২৯১, ৩০৬
ত্রিপিটক ২৮৬
ত্রিবর্গ ২৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ১১৯-২৮, ১৪৬, ১৯৪
দয়াকৃষ্ণ ৪১, ৪৬
দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ২৫৩-৫
দেহাত্মবাদ ২৫২-৪
দুঃখসমুদায় ২৬৯
দ্বাদশনিদান ২৭১, ২৮৭
ধম্মপদ ২৮৫-৩০৮
ধর্ম ১০, ১২, ১৮, ২৯, ৪৫, ৮১-৮, ৯৫-৮, ১২৩, ১২৮, ১৫৪, ১৮৮-৯, ২৬১
 কুলধর্ম ১৪৬, ২৯৪, ৩০৫
 জীবধর্ম ১৮৬
 দেশধর্ম ৮৭
 বর্ণাশ্রমধম ১২-১৯, ৩১, ৪৬, ৭১-৭২, ৮২, ৮৬, ৯৭, ৯৮, ১০৩, ১০৯, ১১৮, ১২৮-৩৯, ১৩৩, ১৮৫-৭, ১৯৪, ২০১, ২০৩, ২৫২, ৩০৪, ৩০৬
 বিশেষ ধর্ম ৩০, ৪৬, ৩৮, ১১৮, ১৩১-৬, ১৫২,২৯৪, ২৯৫
 যুগধর্ম ১৯, ১০৩, ১৩৬, ১২৫-৬, ১২৮
 শীলভিত্তিক ২৬২, ২৭৫-৭
 শ্রৌত ধর্ম ১৮৫-৬
 সাধারণ/সামান্য ধর্ম ১২, ১৮, ১৯, ৩১, ৪৫, ৯৮, ১০৩, ১১৬, ১১৮, ১৯৭, ২৯৫-৬, ৩০১
 স্ত্রীধর্ম ১১৬-৭, ১৩৬, ২০১
 স্বধর্ম ১২, ১৭-৮, ১৬৩, ২৯৫, ২৯৭, ৩০২, ৩০৫-৭
নামরূপ ২৭০, ২৭১, ২৯৩
নিবৃত্তিমার্গ লক্ষণ ৫৬, ১৮৫-৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯৪-৫, ২৬৩, ২৬৫
নির্ধারণবাদ/নিয়ন্ত্রণবাদ ২০, ২১, ২৮২, ২৮৩
নির্বাণ ২৬১, ২৭১, ২৭২, ২৮৮, ২৯৩, ৩০১
সোপাধিশেষনিরোধ ২৭২
অনুপাধিশোষনিরোধ ২৭৩
নীতি ২১, ৮৫, ৯৫, ২৯০
নীতিবিদ্যা/শাস্ত্র ১১, ১৯-২১, ১৭৪, ২৯০, ২৯৩
কর্তব্যতাত্ত্বিক ২৩-৩৪
পরিস্থিতিনির্ভর ২৫-২৬,
ফলমুখী ২৩, ১২১
ন্যায়মত ২৩, ২৪, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৮, ৪৯-৫০, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ২০৯, ২১১, ২১২
পঞ্চস্কন্ধ ২৬৯, ২৭১

পঞ্চানন শাস্ত্রী ২৫৫-৭
পতঞ্জলি ৩৬, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬
পাণিনি ২১৬, ২১৭
পুরুষার্থ ১২-৩, ২০, ৩১-৫০, ১০৮-৩৯, ১৭০, ১৮৬, ১৮৮, ১৯৪, ২৩৫-৭, ২৪৮-৫০
মোক্ষ/মুক্তি ২২-৩, ৩৮, ৪১-৬০, ১১৯, ১২০, ১২১, ১৫৪, ১৫৫, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৭, ১৬৯, ১৭২-৫, ১৭৬, ১৮৭, ১৯২, ১৯৪, ২০২, ২৪৮, ২৬৪
প্রজ্ঞা ২৫৯, ২৭৩, ২৭৫
প্রতীত্যসমুৎপাদ ২৭০
প্রবৃত্তিমার্গ/লক্ষণ ৫৬, ৭৩, ১৮৫-৬, ১৮৭, ১৮৯, ১৯৪-৫, ২৬৩, ২৬৪
প্রযত্ন ৩৩, ২১০, ২২৫
প্রেয় ১৮, ৪৪, ৭২-৭৩, ১৪৮-৯, ১৮৮
প্লেটো ১৩, ২৬
বাৎস্যায়ন ৪২, ৫৪, ২০৯
বিজ্ঞান ২৭০, ২৭১
বিবেকানন্দ ৩১, ১৭৬
বিধি ১০, ২০, ২৩-৪, ৩৪, ৪৫, ৪৬, ৭৩, ১৮৬, ১৮৮, ১৯১, ১৯২, ২১২, ২০৯-৪৩, ২৪৯, ২৯৭
    বিশেষ বিধি ১৯
    সামান্য বিধি ১৯
    বৈয়াকরণ মত ২১২-৭
    ন্যায় মত ২২৪-৩৯, ২৪০-৩
    মীমাংসা মত ২১৭-২৪
বুদ্ধদেব ২৬৫, ২৮৩, ২৮৮, ২৮৯-৯০, ৩০৭-৮
বৃহস্পতি ২৪৭, ২৫১, ২৫২-৫৭
বেদ/শ্রুতি ২২, ৩৫, ৪৫, ৬৩-৭৪, ৭৭-৮৮, ১৫১-২, ১৭৭, ১৮৫-৭, ১৮৯-৯২, ১৯৪, ২০০, ২০৩-৫, ২০৯, ২৪৯, ২৫০, ২৮৫, ৩০৭
বেদনা ২৭০, ২৭১
বৈশেষিক দর্শন ৮১
বোধি ২৬৭
বৌদ্ধ দর্শন/মত ২৬, ৩৫, ৪২, ৪৭, ৪৯, ৫২, ৫৪, ৫৯, ২৬১-৮৪, ২৮৫-৩০৮
ভব ২৭০, ২৭১
ভবচক্র ২৭১, ২৮৭
ভাবনা ২১৫, ২১৬, ২১৭-২২
ভারচু এথিক্স ২৬-৭
মধুসূদন সরস্বতী ৫৪, ২৮৮, ২৮৯, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৯, ৩০৩
মধ্যপন্থা ২৬৬, ২৬৭
মহাভারত ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৫৪, ৭৭, ৯৭
মাধবাচার্য্য ২৪৭, ২৫১, ২৫৪, ২৫৫-৬
মীমাংসক ৪৫, ৪৮, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৮১, ১৮৫, ১৯২, ২০৯
    প্রাভাকর ২২, ২৩, ২৪, ৪৫, ৪৬, ৫৪, ২০১, ২০৯, ২২২, ২৫১, ২৯৯
    ভাট্ট ২৩, ২৪, ৪৫, ১৭০, ১৮৮, ২১১, ২৪২-৩
    গাগাভট্ট ৫৪, ২৩০-১
মূল ২৭৭
যজ্ঞ ৬৬-৭০, ৭১, ৭৩, ৭৮-৯, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৮৮, ১০০, ১০৫, ১০৭, ১৫৬-৭, ১৫৮, ১৬২, ১৬৭, ১৭৬, ১৭৭, ১৯০-২, ২১৮-২১, ২৪৯-৫০, ২৬৪, ৩০০, ৩০৩, ৩০৭

যাজ্ঞবল্ক্য ১৯, ৬৯-৭০, ৮৭-৮
যোগ ৩৬, ৪৭, ১৫৩-৮, ১৬০, ১৬৪, ১৭৮, ১৯৩, ১৯৬, ২৯৬, ৩০৯
  কর্মযোগ ১২১, ১৫৩-৭৭, ২৮৫, ২৯৬-৮
  জ্ঞানযোগ ১২১, ১৫৩, ১৫৮, ১৬৪, ১৬৫-৬, ১৬৭-৮, ১৭১-৭
  ভক্তিযোগ ১৫৩, ১৫৮, ১৬৫, ১৬৯, ১৭১-৭৭, ২৬৩, ২৯৯
  রাজযোগ ১৫৩, ১৫৮, ১৬৮-৯, ১৭১-৭
রাজেন্দ্রপ্রসাদ ৪৫, ৪৮
রামায়ণ ৪৪, ৯৫-১০৬
লক্ষণা ২১৫,২২৬
লাইবনিজ ৫১
শক্তি ২১০-১১, ২২৪
শাশ্বতবাদ ২৬৪
শীল আস্তিক দর্শনে ২৬
  বৌদ্ধ দর্শনে ২৬২, ২৭৩, ২৭৫-৭, ২৮৭
শোপেনহাওয়ার ৪৭
শ্রমণ ২৬১
শ্রীধরস্বামী ২৫
শ্রীরামকৃষ্ণ ৩৩
শ্রেয় ১৮, ৪৪, ৭২-৩, ৮২, ৮৪, ১৪৬, ১৪৭-৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৬১, ১৭৭, ১৮৮
শংকরাচার্য ৩৬, ৪৭, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৮৩, ৮৪, ১৪৮, ১৮৫, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৮, ২০৫
ষড়ায়তন ২৭০, ২৭১
সত্য ৩১, ৭১-৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯৯, ১০৩-১৩, ১২৩, ১৫১, ১৭৩, ১৭৭-৮, ১৯৭, ২০০, ২৬৬, ২৮৬
সমাধি ২৬২
সাগার ২৮৩
সাংখ্য ৪৯, ৫০-৫২, ১৬৪, ২৯৫
সুখবাদ ২৪৯-৫৪
স্পর্শ ২৭০, ২৭১
স্থিতপ্রজ্ঞ/সমদর্শী ১৪, ১৫০, ১৫৮, ১৭১, ২৮৯, ২৯৬, ৩০১-২
স্মৃতি ২২, ৪৫, ৭৭-৯০, ১৫৫, ১৮৫, ১৯৪,২০২, ২০৩
মনুস্মৃতি ১০, ৪৫, ৪৬, ৭৭-৮, ৮৩, ৮৮-৯, ৯৭, ১০৩, ২৫৭
সংস্কার ৩৮-৪০, ৮৮, ২৭০, ২৭১, ২৮৮